প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর

সম্পাদনা : বিমান বসু

বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি (রাজ্য কমিটি)
৭৯/৩এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড ● কলকাতা ১৪

BANGIYA SAKSHARATA PRASHAR SAMITY
79/3A, ACHARYA JAGADISH CHANDRA BOSE ROAD
C A L C U T T A-700 014

An anthology on Iswarchandra Vidyasagar

Prasanga Vidyasagar

Editor Biman Basu

First Print : 26th September, 1960

প্রাপ্তিস্থান: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭০০ ০৭৩
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-৭০০ ০৭৩

আলোকচিত্রী: অচ্যুত রায়, হীরক রায়, অনুপ সরকার

প্রকাশক: সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি

মুদ্রক: সমীর দাসগুপ্ত, গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট,
কলিকাতা-১৬

প্রচ্ছদ: ঈশা মহম্মদ

মুখবন্ধ

বিদ্যাসাগরের শততম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটি মূল্যবান সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি একটি অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন। আমরা আজকাল অনেক শতবার্ষিকী, দ্বিশতবার্ষিকী, ত্রি-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান করি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সব অনুষ্ঠান উৎসবে পরিণত হয়—সভা, সেমিনার, প্রদর্শনী, শোভাযাত্রা, আলোকসজ্জা, সঙ্গীত-নৃত্য বিচিত্রা, কিছুই বাদ পড়ে না। অনুষ্ঠান শেষ হয়, আবার আমরা তুলনীয় পরবর্তী অনুষ্ঠানের প্রতীক্ষায় থাকি। বহু অর্থব্যয় হয়, কিন্তু তার ফলে কোনো স্থায়ী সম্পদ নির্মিত হয় না।

"প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর" বইটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। যে রচনাগুলি বইটিতে সংকলিত হয়েছে তার প্রায় সবই পূর্বে প্রকাশিত মূল্যবান প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। এই লেখাগুলি আমরা অনেকেই আগে পড়েছি, কিন্তু একসঙ্গে সবগুলি হাতের কাছে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য। যাঁদের রচনা নিয়ে এই সংকলন তাঁদের মধ্যে আছেন একদিকে মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, মহাত্মা গান্ধী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আমাদের অগ্রজেরা। আর অন্যদিকে আছেন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-সমালোচক সুকুমার সেন, দেবীপদ ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, অমলেশ ত্রিপাঠী এবং আরো অনেকে। পাঠকের কাছে বইটির মূল্য বেড়েছে বিশেষ কয়েকটি সংযোজনে—যার মধ্যে প্রধান বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত, তাঁর ইচ্ছাপত্র এবং তাঁর সপক্ষে ও বিপক্ষে লেখা কবিতা ও ছড়া—যার মধ্যে অনেকগুলি বাংলাভাষায় প্রবাদের মত হয়ে গিয়েছিল।

বহু বিশ্রুতকীর্তি প্রতিভাকে আমরা সহজেই ভুলে যাই—শতবার্ষিকী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময়ে নতুন প্রজন্মকে তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। বিদ্যাসাগরকে কিন্তু আমরা ভুলিনি। তাঁর নামে আমরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার করেছি। কিন্তু তাঁর চেয়ে বড় কথা, বিদ্যাসাগর আজও আমাদের জীবনে অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন : আমরা বাংলা গদ্যের যে শৈলী এখনও অনুসরণ করি সেটা বিদ্যাসাগরের দান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের "প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা," এবং আরো বলেছিলেন যে, "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন"। যদি শুধু এটুকুই করতেন, তাহলেও তিনি আমাদের কলমের ভাষাতে অমর হয়ে থাকতেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ও কীর্তি ছিল বহুমুখী। তিনি আমাদের সম্মুখে বহুরূপে বিরাজিত।

মাইকেল তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বিদ্যাসাগরের মধ্যে "করুণার সিন্ধু" দেখেছিলেন। শতাব্দী কাল ধরে আমরা তাঁর সমাজসংস্কারের অদম্য প্রচেষ্টার (বিশেষত বিধবা-বিবাহের প্রবর্তনের) মূল্য অনুধাবন করে এসেছি। বিদ্যাসাগরের আমলে যা ছিল প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—এবং শাস্ত্রানুসারী ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের বিদ্রোহ—এখন তা সহজভাবে গৃহীত। হয়তো সব সময় আমাদের মনে থাকে না যে শিক্ষার প্রসারে বিদ্যাসাগর যে ভূমিকা নিয়েছিলেন সেটা তখন অতুলনীয় ছিল। রাজা রামমোহন প্রমুখ উনিশ শতকের প্রথম পাদের প্রাজ্ঞজনেরা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর সেই পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি শিশুশিক্ষার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন। এর সঙ্গে আজকালকার বয়স্ক শিক্ষা ও সাক্ষরতার সংযোগ খুবই নিকট।

আমাদের অনেকেরই প্রথমে চোখে পড়ে উচ্চশিক্ষার দিকটি। বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এবং বহুদিন সংস্কৃত কলেজে পড়িয়েছিলেন। মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্য হয়েছে। পদত্যাগ করেছেন এবং আবার ফিরে এসেছেন। সংস্কৃত কলেজের নবসৃষ্ট অধ্যক্ষের পদের প্রথম অধিকারী হয়ে যা ছিল মূলত স্কুল ও চতুষ্পাঠী তাকে মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলেন। আবার মতভেদ হল। এবারে সরকারি কাজ ছেড়ে দিয়ে ১৮৭২-এ প্রতিষ্ঠা করলেন কলকাতার প্রথম বেসরকারি কলেজ—মেট্রোপলিটন ইনস্টিট্যুট। (বঙ্গদেশের প্রথম বেসরকারি কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৫৩-তে বহরমপুরে)। এতদিন কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতেন সরকার ও মিশনারিরা। বিদ্যাসাগর নতুন জাতের কলেজ করলেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

বালিকা ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হলেন নিরলসভাবে। বেথুনসাহেবের সঙ্গে হাত মেলালেন মেয়েদের স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু এ সব-কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল শিশুশিক্ষার জন্য তাঁর প্রণীত পাঠ্যবইগুলি। বইগুলি এমনভাবে পারম্পর্য রেখে রচিত (যদিও সব ঠিক কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশিত হয়নি), যে এগুলি অবলম্বন করে একটা ধারাবাহিক প্রণালীবদ্ধ শিক্ষণ (যাকে আজকাল বলা হয় 'প্রোগ্রাম্ড লারনিং') শিশুবয়স থেকে কৈশোর পর্যন্ত কার্যকর করা যায়। প্রথমে 'বর্ণপরিচয়' দুই ভাগ, তারপরে 'কথামালা', তার পরে 'বোধোদয়'। যে শিশুটি 'বোধোদয়' পর্যন্ত পৌঁছে গেল তার ভাষাজ্ঞান একটা বাঞ্ছিত স্তরে এসে গিয়েছে। তারও পরে 'আখ্যানমঞ্জরী', 'চরিতাবলী', 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা'। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শেখানোর জন্য 'উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'ঋজুপাঠ'। শুধু বিদ্যাসাগরকে ভিত্তি করেই বাংলা আর সংস্কৃতে কলেজ-স্তরে যাবার প্রস্তুতি সম্ভব হল।

যাঁরা আজকাল সাক্ষরতার প্রসারে সচেষ্ট, তাঁদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি আমাদের সংবিধানের ১৯৫০-এর প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারতাম—যে দশ বছরের মধ্যে ছয় থেকে চোদ্দ বছরের সব শিশুকে বিদ্যালয়ে আনা হবে—তাহলে বয়স্ক শিক্ষা বা সাক্ষরতার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিত না। সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৫০-এ। দশ বছর, অর্থাৎ ১৯৬০-এর মধ্যে যদি আমরা নির্দিষ্ট বয়স-স্তরকে শিক্ষিত করতে পারতাম, তাহলে, তখন বয়স্ক নিরক্ষর খুব কমই থাকত। ১৯৬০-তে যাদের বয়স ছিল ১৪, এখন ত্রিশ বছর পরে ১৯৬০-তে তাদের বয়স ৪৪। অর্থাৎ সংবিধানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলে ৪৪ বছর বয়সের নীচের কোনো বয়স্ক পুরুষ বা নারী 'অশিক্ষিত' বা অন্তত নিরক্ষর থাকত না।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুশতবার্ষিকীতে আমরা আবার নতুন করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি। নতুন শিল্প, নতুন প্রযুক্তির পথে একুশ শতকে উপনীত হবার কথা এখন বারবার উঠছে। এদিকে কতটা কী হবে, সমাজের একটা বিরাট অংশকে আমরা উনিশ-শতকের অবস্থা থেকে টেনে তুলতে পারব কিনা, সে প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু শিশুশিক্ষা ও বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও যদি আমরা সঙ্কল্প গ্রহণ করি যে একুশ শতকের সূচনা হবার আগেই প্রত্যেকটি শিশুকে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষিত করে তুলব এবং দেশে কোনো বয়স্ক নিরক্ষর থাকবে না। তাহলে জীবনের মৌলিক গুণগত মান উন্নত হবে। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনকালে পথ দেখিয়েছিলেন। আজ তাঁর প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারি তাঁর সম্পূর্ণ স্বপ্নকে সর্বতোভাবে সফল করে। বিদ্যাসাগর আমাদের প্রেরণা দেবেন। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির সংকলনটি আমাদের পদে পদে উদ্বুদ্ধ করবে।

ভবতোষ দত্ত

কেন এই সংকলন

এ বছর আমাদের রাজ্যের সর্বত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। মৃত্যুশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি বিদ্যাসাগরের জীবনী, বৈচিত্র্যময় কর্মজীবন ও অমর কীর্তি-কাহিনীকে ঘিরে বিভিন্ন সময়ে সমাজজীবনের বিভিন্ন মনীষী থেকে শুরু করে একালের সাহিত্যসেবীদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা সংকলন আকারে প্রকাশের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে।

সমাজজীবনে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী কর্মকাণ্ডের অবিস্মরণীয় মহান পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর প্রস্তুত সংকলনটি আমাদের বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির এই ধরনের প্রথম প্রয়াস।

প্রশ্ন উঠতে পারে হঠাৎ বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আমাদের সংকলনের যাত্রা কেন শুরু। আমরা মনে করি, বিদ্যাসাগরের কর্ম, আদর্শবোধ, নিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষায় আমাদের সমিতির অসংখ্য কর্মীবাহিনীকে অনুপ্রাণিত করতে না পারলে আমাদের চলার পথ বন্ধুর হতে বাধ্য।

একথা আমাদের সকলেরই জানা রয়েছে যে, বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের আন্দোলনের এক প্রবাদপুরুষ বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ১৮২০ সালে ২৬শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই প্রয়াত হন। প্রায় ৭০ বছর বিদ্যাসাগর জীবিত ছিলেন। ডিরোজিও'র নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গলের নবজাগরণের আন্দোলনের ও নীলচাষীদের বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। আবার বাল্যকালে শিক্ষাগ্রহণের সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সতীদাহ রোধ আন্দোলনের বাতাবরণে বিদ্যাসাগর বড় হতে শুরু করলেন। বিদ্যাসাগরের জিজ্ঞাসু মন ও জ্ঞানপিপাসা অজানাকে জানার আবিষ্কারে মাতিয়ে তুলেছিল। স্থিতধী ও মেধাসম্পন্ন বিদ্যাসাগর অনতিবিলম্বে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা থেকে শুরু করে জ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রে বিচরণ করতে শুরু করলেন। ২১ বছর বয়সে শিক্ষা সমাপন করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা-বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজে যোগ দেন এবং ৩১ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পাঠক্রম পরিবর্তনের কাজে যুক্ত হলেন। বিদ্যাসাগর তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের দিয়ে নতুন পাঠক্রম গ্রহণ করিয়ে কার্যকরী করতে লাগলেন। একইসঙ্গে নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ প্রণয়ন করে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে সহজতর করলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা প্রদেশে মোট ৩৩টি বিধিবদ্ধ ও স্বীকৃত স্কুলে শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল। বিদ্যাসাগর প্রথমেই ১০১টি নতুন স্কুল গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে বেথুনসাহেব দেশে স্ত্রীশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনাও গ্রহণ করেন। শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগর ও বেথুনের প্রচেষ্টার মধ্যে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে, শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা খানিকটা সহজতর হয়। আবার শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করেই বেথুনসাহেবের নিজের তৈরি ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের সেক্রেটারির পদে বিদ্যাসাগরকে নিয়োগ করেন। তৎকালে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিরোধীদের 'স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করলে বিধবা হয়' এই আপত্তিকর

বক্তব্য খণ্ডন করে তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনকে জোরদার করতে উদ্যোগী হলেন। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাস পর্যন্ত ৭ মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন—এর মধ্যে হুগলী জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি এবং নদীয়ায় ১টি। এদের মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০। শুধু স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনেই নয় শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপরে লেখনী ধরে একের পর এক নতুন বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে শুরু করলেন।

শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগর নিরলসভাবে নিজেকে যুক্ত করতে গিয়ে কখনও নীতিহীন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে সমাজের সকলকে নীতিবাক্য শুনিয়ে নিজের জন্য তা প্রযোজ্য নয় এমন নীতিতে বিশ্বাসীও ছিলেন না। একবার—অ্যাটকিনসনসাহেব ভাষা শিক্ষা (ইংরেজি ও বাংলা উভয়) সম্পর্কে পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করার জন্য বিদ্যাসাগরকে কমিটির সদস্য করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। ঐ চিঠির উত্তরে বিদ্যাসাগর অ্যাটকিনসনসাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন যে, তাঁর প্রণীত নিজের বহু পাঠ্যপুস্তক থাকার কারণে উল্লিখিত কমিটিতে থাকা সম্ভব নয়। আজকালকার শিক্ষাজগতের কাজের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে এ ঘটনা কি উদাহরণ হিসাবে কাজ করবে?

নীতিনিষ্ঠভাবে শিক্ষাবিস্তারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা আমরা যেমন বিস্মৃত হতে পারি না একইভাবে সমাজসংস্কারের কাজেও ঋজু বিদ্যাসাগরকে আমরা কখনও ভুলতে পারি না। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রোধ হওয়ায় এবং তৎসংক্রান্ত প্রশ্নে আন্দোলন সংগঠিত হওয়াতে বিধবাদের সমাজে এক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। তাই বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলন করার মধ্য দিয়ে সমাজের লাঞ্ছিত এই স্ত্রীজাতির অংশকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক অভিযানে মেতে উঠলেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলন করার কাজটা তৎকালীন সমাজের নেতাদের আঘাত করেছিল। ফলে বিদ্যাসাগরকে এক বিরাট বাধার পাহাড় ডিঙোনোর আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছিল। এমনকি যে রাজা রাধাকান্ত দেব বিদ্যাসাগরের অন্যসব অভিযানকে সমর্থন করতেন তিনিও বিরোধিতায় মেতে উঠলেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের পক্ষে বিদ্যাসাগর জনমত সংগঠিত করার জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করলেন। বিরোধীরাও বিরোধিতার জন্য পাল্টা স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজে নেমে পড়লেন। এ যেন এক সম্মুখসমর। কিন্তু বিদ্যাসাগর পিছিয়ে যাবার চরিত্রে গঠিত না হওয়ায় যুক্তি-তর্কের বাতাবরণ তৈরি করে লোকাচারকে ধর্ম বলে চালিয়ে যাবার ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন ও বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে লিখতে শুরু করলেন। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হল। কিন্তু পাশ হলেও তা কার্যকরী করা সম্ভবপর হল না। সতীদাহ প্রথা পাশ হওয়ার পর যত সহজে কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছিল তার থেকে অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়াল বিধবা-বিবাহ প্রচলন। তাই পুনরায় 'নবজাগরণের' অন্যান্য নেতৃত্বের সহযোগিতায় বিধবা-বিবাহ বাস্তবে কার্যকরী করার আন্দোলন চলতে থাকল। আবার বিধবা-বিবাহ চালু করার মধ্য দিয়ে কিছু মানুষের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা যা তথাকথিত কুলীনসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা প্রসারিত হল। ফলে বিদ্যাসাগরকে আবার বহুবিবাহ রোধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হল। বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রোধের আন্দোলনের জন্যই বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা হল, তিনি যা বলতেন বা যা করা সঠিক বলে মনে করতেন তার জন্য জীবনপণ লড়াই করতে পিছপা হতেন না—তাকে কার্যকরী করতেন। একথা কি সত্য নয়—বিজ্ঞানের কল্যাণে আজকে আমরা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গুরুগম্ভীর ভাষায় অনেক কথা বলি যা কার্যকরী করি না বা করার চেষ্টা করি না। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের শিক্ষা আমাদের চলার পথে একটু সাহায্য করুক চাই—চাই বলেই এই সংকলন।

এই সংকলনে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর চল্লিশটি বাংলা পাঁচটি ইংরেজিতে যে লেখাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তা নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনের চলার পথে সাহায্য করবে।

এই সংকলন প্রকাশে যাঁদের সযত্ন সহযোগিতা, সাহায্য, পরামর্শ পেয়েছি তাঁদের কাউকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করার ধৃষ্টতা আমার নেই। শুধু বলব যাঁরা লেখা ছাপার অনুমতি দিয়েছেন বা নিজেরা লেখা দিয়েছেন তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন।

FOREWORD AS OUR RAISON D'ETRE

The Hundredth Year of Iswar Chandra Vidyasagar's demise is being suitably observed this year throughout the state of West Bengal.

To mark this occasion, the Bangiya Saksharata Prasar Samity has taken up a modest endeavour to publish an anthology of writings, published over the years, on the life of Vidyasagar, on his many-splendoured activities and on his immortal achievements. The authors, whose works have been included in this anthology, include the spectrum from the shining lights of the social milieu to the literatures of our times.

The present endeavour that seeks to bring to a meaningful focus the stunningly magnificent deeds of this great and unforgettable progenitor of masterful efforts in the realms of social life and educational activities, is the first of its kind from the Bangiya Saksharata Prasar Samity.

The question may very well be broached as to why we thought it necessary to start off our anthology on the theme of Vidyasagar. We do believe that unless we can get to inspire our vast echelons of workers in emulating the deeds, the idealism, the loving care, and the sagacious education of Vidyasagar, we shall but find our onward progress difficult and filled with pitfalls.

The fact is not unknown to any of us that Vidyasagar was the towering central figure in the Bengali and Indian Renaissance. Vidyasagar who was born on the 26th September of 1820 lived till 29th July of 1891, leading a very useful life spanning almost seven decades. Vidyasagar appears on the scene in the backdrop of the Derozio-led Renaissance Movement of the Young Bengal, and the 'Blue Mutiny' or the revolt of the Indigo farmers. The young Vidyasagar, one ought to remember, passed his formative and educative years in the environment suffused with the movement led by Ram Mohun Roy against the vile practice of *Sati*. The inquisitive mind of young Vidyasagar looked askance, full of an innate desire to learn, to get to know the unknown. Vidyasagar was composed in his outlook and possessed a sharp intellect, and very soon, he started to roam freely in the variegated world of knowledge, commencing his sojourn from the realm of learning of languages. On completing his formal education at the age of 21, Vidyasagar joined Fort William College as the Head of the Department of Bengali. When he was 31, Vidyasagar joined the Sanskrit College as Principal and engaged himself in changing and developing the subject and syllabus of education as a discipline. He made the British rulers of the day accpet his changed syllabi and have them implement it. At the same time, Vidyasagar took up a definite programme towards spread of education among women. He made the process of learning itself easier and less burdensome by writing the legendary introduction to the Bengali Alphabet in *Varna-Parichaya, Pratham Bhag* and *Dwitiya Bhag*.

During the first half of the 19th Century, the province of Bengal had

33 registered and recognised schools for imparting learning. Right from the beginning did Vidyasagar plan to set up 109 new schools. By this time, Norman Bethune had initiated a plan to help increase the scope of learning for women. We do, in fact, note some similarities in the endeavours of Vidyasagar and Bethune. No doubt this helped in the matter of tackling the organisational part of the spread of education. Realising the implicit need of Vidyasagar in the realm of widening the horizon of education and learning, Bethune had him appointed as the Secretary of the Calcutta Female School that Bethune had himself founded. Vidyasagar strongly refuted the common saying of the day that learning led women to widowhood, and augmented the ongoing movement to help spread education among the womenfolk. The short period between November of 1857 and May of 1858 comprising just seven months, witnessed Vidyasagar found no fewer than 35 schools for girls. Of this, 20 were set up in Hooghly, 11 in Burdwan, three in Midnapore, and one in Nadia. The total number of girl students stood at 1300. Vidyasagar did not limit his efforts to a mere spatial spread of education for women. He took up his proliferous pen to produce one volume after another of newer books for the learners.

In engaging himself tirelessly in the matter of spread of education, Vidyasagar never, for once, took any unprincipled decision. On the other hand, he never believed in the policy of preaching sermons of morality for others in the society, while proving unwilling to make them applicable for his own self. Once, so the story goes, Atkinson the educationist wrote to Vidyasagar, requesting him to accept the post of membership on a Committee that was being set up to consider and change the syllabi of the subject of learning languages (both Bengali and English). Thanking Atkinson for the offer, Vidyasagar politely turned the request down on the ground that there being very many text books written by him, it was not fair for him to be on a Committee of that kind. Would that this incident stand up as an example before the teachers and educationist among our midst who are connected with the realm of education!

Just as it is not possible for us to forget the glorious role emoted by Vidyasagar in organising principled efforts towards spread of education, so can we not let slip from our thoughts the prodigious endeavours unleashed by him in social reforms. When in 1829 the practice of *Sati* was leagally banned and when a movement was built up on the issue, the widows' world was confronted with a sharpedged crisis. In the circumstances, Vidyasagar devoted himself to set up the desolate and dishonoured victims of widowhood to their rightful place of dignity and honour in society, through initiating the practice and rites of widow remarriage. The issue of widow remarriage smote the established leadership of the society very badly indeed. As a consequence, Vidyasagar had to motivate efforts to surmounting a large and difficult hurdle. Even persons like Raja Radha Kanta Deb who had backed Vidyasagar to the hilt on his other social and

educational evndeavours, proceeded to oppose Vidyasagar quite vehemently on this issue. In order to mobilise public opinion in support of widow remarriage, Vidyasagar commenced to gather evidence. So, too, did his opponents, to bolster their stand against the practice. Soon, a war-like, face-to-face, confrontation developed. But Vidyasagar was never a person to run away from battle. He took up his pen against those who sought to create a facade of sham argumentation to pass off usage as religion. Vidyasagar started to write proliferously in support of widow remarriage. The widow remarriage act was formally passed in 1856. The issue of having it implemented was, however, something else, again. Compared to the ease with which the banning of the practice of *Sati* could be effected, the matter of commencement of widow remarriage proved a much tougher proposition.

And thus, a movement went apace in cooperation of the 'Renaissance' leadership to ensure the implementation of the practice. At the same time, howerver, widow remarriage encouraged polygamy to spill out from the confines of the so-called 'elite' and high-caste circles on to the society. This compelled Vidyasagar to build up a movement against the noxious practice of polygamy itself. It is through his dual efforts at encouraging widow remarriage and in building up a parallel movement to stop polygamy, that Vidyasagar remains luminiscent in our societyin memoriam. Whatever Vidyasagar spoke about and whatever he regarded as a righteous task, he fought for with a tigerish ferocity till he could have it implemented. This is one of the most significant teaching of Vidyasagar's innate strength of character that we learn with humility. Is it not a fact, we may ask ourselves, that in this age of science, we hold on to a mocrophone on a dais, and speak into it very many gems of wisdon in an ornate language and sonorous voice, and yet, we ourselves do not believe an iota of it, nor do we make the least effort to have our vaunted precepts get suitably implemented? In producing this anthology, it shall remain our fond belief that the teachings of Vidyasagar shall be of some guidance for us in such endeavours.

The anthology comprises 40 contributions in Bengali and Five in English on the many-sided genius of Vidyasagar's character. We do hope that these writings would help each one of us in our on going daily struggles.

We would not deign to belittle those whose cooperation. help and guidance we have gratefully received in producing the volume by offering them dry and formal thanks. We may only say, with humility, that we remain deeply grateful to all those who have either contributed themselves in writing for this volume or have come up with permission for reprints

॥ বিদ্যাসাগরের অন্তিম বিনিয়োগপত্র ॥

(চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ থেকে সংকলিত)

শরীরের অবস্থা দিন দিন নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সময়ে সময়ে এক একখানি অন্তিম বিনিয়োগপত্র (উইল) দ্বারা নিজের সম্পত্তি ও তাঁহার আয় হইতে কিরূপ ব্যয় হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। তাঁহার সর্বশেষ উইলের যে-যে অংশ সাধারণের জানিবার উপযোগী তাহাই এখানে প্রদত্ত হইল :

১। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পূর্বতন সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।

২। চৌগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, পাথরা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ, আমার ভাগিনেয় জনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিন জনকে আমার এই অন্তিম বিনিয়োগ পত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম। তাঁহারা এই বিনিয়োগ পত্রের মর্মানুযায়ী যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিবেন।

৬। আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমাব পোষ্যবর্গ ও কতকগুলি নিরুপায় জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয় প্রভৃতির ভরণ পোষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হইয়া আসিতেছে, ঐ সমস্ত ব্যয় এককালে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। কার্যদর্শীরা তাঁহাদের সম্মতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে এই বিনিয়োগ পত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়।

আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এবং মৃত আত্মীয় ও বন্ধুদিগের পরিবারবর্গের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার উইলে যে মাসিক দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার মোট সমষ্টি ৫৬১ টাকা, আর বৃত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৪৫। এতদ্ভিন্ন, প্রয়োজন হইলে অপর ৬ জনের সম্বন্ধে ১০৫ টাকার বৃত্তি নির্ধারণ করিয়াছিলেন' এবং এই শেষোক্ত বৃত্তি দান বিষয়ে কার্যদর্শিগণের উপর কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত বৃত্তি দানের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। তাহার অন্যথা হইলে, সে সকল বৃত্তি দান বিষয়ে নিষেধ বাক্যের উল্লেখ আছে।

১৪। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে সনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক তাহা নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে :

১·	জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয়		১০০ টাকা
২·	ঐ ঐ … … চিকিৎসালয	…	৫০ টাকা
৩·	ঐ ঐ … অনাথ ও নিরুপায় লোক	…	৩০ টাকা
৪·	বিধবাবিবাহ …	…	১০০ টাকা
		মোট	২৮০ টাকা

উইলের ১৪শ প্যারার নির্দেশ মতো দানের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায় যে তাঁহার কি-কি কার্যের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ ছিল। এদেশের শিক্ষাবিস্তার ও বিধবাবিবাহ প্রচলনপক্ষে যে তাঁহার জীবনব্যাপী অনুরাগ ছিল, তাঁহার অন্তিম বিনিয়োগপত্রেও তাহার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

১৫। যদি শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুড় এই তিনজন আমার দেহান্ত সময় পর্যন্ত আমার পরিচারক নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে,

কার্যদর্শীরা তাঁহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০ টাকা দিবেন।

১৮। এইক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্বত্ব আছে, যদি উত্তর কালে তাহার খর্বতা হয়, তাহা হইলে যাহাকে অথবা যে বিষয়ে যাহা দিবার নির্বন্ধ করিলাম, কার্যদর্শীরা স্বীয় বিবেচনানুসারে তাহার ন্যূনতা করিতে পারিবেন।

১৯। আবশ্যক বোধ হইলে কার্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

২০। আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইতেছে, আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের অধিকারী থাকবেন, তাবৎকাল পর্যন্ত আমার পুস্তকসকল ঐ স্থানে বিক্রীত হয়। তবে এক্ষণে যেরূপ সুপ্রণালীতে পুস্তকালয়ের কার্য নির্বাহ হইতেছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ও তন্নিবন্ধন ক্ষতি বা অসুবিধা হইলে কার্যদর্শীরা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।[৩১]

এই উইলের তারিখ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ সন ১২৮৭ সাল।[৩২]

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব,
মোঃ কলিকাতা

উইলের সাক্ষী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	*শ্রীনীলমাধব সেন (ডাঃ)*
শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	*শ্রীযোগেশচন্দ্র দে*
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	*শ্রীবিহারীলাল ভাদুড়ী*
শ্রীশ্যামাচরণ দে	*শ্রীকালীচরণ ঘোষ*

৩১ নানা কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই এই ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

৩২ ইহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া বন্ধুবান্ধব সন্নিধানে এই উইল পরিবর্তনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু কার্যতঃ হইয়া উঠে নাই। তাঁহার লোকান্তর গমনের অত্যল্পকাল পূর্বে তাঁহার অভিপ্রায়মতো এক সংশোধিত উইল প্রস্তুত হইয়াছিল, অপরাপর অংশ অনুমোদিত হইলেও মেট্রপলিটন কালেজ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিবার অবসর লইতে গিয়া পীড়া বৃদ্ধি হয়, পরিশেষে আর সংশোধিত উইল স্বাক্ষর করা হয় নাই।

প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর

সূচি

সমাজের সর্বস্তরের নর-নারী নির্বিশেষে মানুষের যে অংশ এখনও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের শিক্ষার স্বার্থে যারা জীবনপণ লড়াই করেছেন এবং এখনও করছেন তাদের উদ্দেশ্যে—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গ সাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমিষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গ ভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি ;
ভারতীর পূজা তরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে—
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির রচনা উপলক্ষে লিখিত, ২৪ ভাদ্র, ১৩৪৫

বিদ্যাসাগর চরিত

স্বরচিত : ১৮৯১

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

শকাব্দা ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনকজননীর প্রথম সন্তান।

বীরসিংহের আধ ক্রোশ অন্তরে, কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে ; ঐ গ্রামে, মঙ্গলবারে ও শনিবারে, মধ্যাহ্ন সময়ে, হাট বসিয়া থাকে। আমার জন্ম সময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না ; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" এই সময়ে, আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিনী ছিল ; তাহারও আজকাল প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য, পিতামহদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব, এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, "ও দিকে নয়, এ দিকে এস ; আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া, সূতিকা গৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।

এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে, অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে তিনি, সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "ইনি সেই এঁড়ে বাছুর ; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন ; তাঁহার পরিহাস বাক্য বিফল হইবার নহে ; বাবাজি আমার ক্রমে এঁড়ে গরু অপেক্ষাও এক গুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন।" জন্মসময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন ; জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল ; আর, সময়ে সময়ে কার্য্য দ্বারাও, এঁড়ে গরুর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।

বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হইয়াছে ; কিন্তু এই গ্রাম আমার পিতৃপক্ষীয় অথবা মাতৃপক্ষীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান নহে। জাহানাবাদের ঈশান কোণে, তথা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে বনমালিপুর নামে যে গ্রাম আছে, উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান। যে ঘটনাসূত্রে পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান বিসর্জ্জন দিয়া, বীরসিংহ গ্রামে আমাদের বসতি ঘটে, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান ; জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দেহত্যাগের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত কথান্তর উপস্থিত হইয়া ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদরের অবমাননাব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগে তদীয় অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যথিত হইল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি কতিপয় দিবস অতিবাহিত

করিলেন ; অবশেষে, আর এস্থানে অবস্থিতি করা কোনও ক্রমে বিধেয় নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এককালে, দেশত্যাগী হইলেন।

বীরসিংহ গ্রামে, উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণে সবিশেষ পারদর্শিতা বশতঃ, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় রাঢ়দেশে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে, মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ধনী চন্দ্রশেখর ঘোষ, মহাসমারোহে, মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধসভায় নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক প্রসিদ্ধ শঙ্কর তর্কবাগীশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, স্বীয় ব্যাকরণবিদ্যার বিশিষ্টরূপ পরিচয় দিয়া তর্কবাগীশ মহাশয়কে সাতিশয় সন্তুষ্ট করেন। তর্কবাগীশ মহাশয় মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদপ্রদান ও সবিশেষ আদর সহকারে, আলিঙ্গনদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, সর্ব্বত্র যার পর নাই মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গাদেবীর গর্ভে তর্কভূষণ মহাশয়ের দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস, জ্যেষ্ঠা মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয়া গোবিন্দমণি, চতুর্থী অন্নপূর্ণা। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক।

রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন ; দুর্গাদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া, বনমালিপুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনাভোগ ও তদীয় পুত্রকন্যাদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর এত দূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল যে, দুর্গাদেবীকে পুত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া পিত্রালয় যাইতে হইল। তদীয় ভ্রাতৃশ্বশুর প্রভৃতির আচরণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার ও তাঁহার পুত্রকন্যাদের উপর যথোচিত স্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস অতি সমাদরে অতিবাহিত হইল। দুর্গাদেবীর পিতা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ; এজন্য সংসারের কর্ত্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর বিদ্যাভূষণের হস্তে ছিল। সুতরাং তিনিই বাটীর প্রকৃত কর্ত্তা ও তাঁহার গৃহিণীই বাটীর কর্ত্রী। দেশাচার অনুসারে, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী তৎকালে সাক্ষিগোপালস্বরূপ ছিলেন ; কোনও বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব খাটিত না ; সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার, রামসুন্দর ও তাঁহার গৃহিণীর অভিপ্রায় অনুসারেই, সম্পাদিত হইত।

কিছু দিনের মধ্যেই পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্য্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ ; অনিয়ত কালের জন্য, সাতজনের ভরণপোষণের ভারবহনে তাঁহারা কোনও মতে সম্মত নহেন। তাঁহারা দুর্গাদেবী ও তদীয় পুত্রকন্যাদিগকে গলগ্রহবোধ করিতে লাগিলেন। রামসুন্দরের বনিতা, কথায় কথায়, দুর্গাদেবীর অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত, দুর্গাদেবী স্বীয় পিতা তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের গোচর করিতেন। তিনি সাংসারিক বিষয়ে, বার্দ্ধক্য নিবন্ধন ঔদাসীন্য অথবা কর্ত্তৃত্ব বিরহ বশতঃ, কোনও প্রতিবিধান করিতে পারিতেন না। অবশেষে, দুর্গাদেবীকে পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে, এক কুটীর নির্ম্মিত করিয়া দিলেন। দুর্গাদেবী পুত্রকন্যা লইয়া সেই কুটীরে অবস্থিতি ও অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে, টেকুয়া ও চরখায় সুত কাটিয়া সেই সুত বেচিয়া অনেক নিঃসহায় নিরুপায়

স্ত্রীলোক আপনাদের গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তিনি একাকিনী হইলে অবলম্বিত বৃত্তি দ্বারা অবলীলাক্রমে দিনপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাদৃশ স্বল্প আয় দ্বারা, নিজের দুই পুত্রের ও চারি কন্যার ভরণপোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা, সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন ; তথাপি তাঁহাদের আহারাদি সর্ব্ব বিষয়ে ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪/১৫ বৎসর। তিনি মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া উপার্জ্জনের চেষ্টায় কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

সভারাম বাচস্পতি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র, জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার, সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের নিকট অধ্যয়ন করেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলেন ; তাঁহার অনুগ্রহে ও সহায়তায় কলিকাতায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়েন। ঠাকুরদাস, এই সন্নিহিত জ্ঞাতির আবাসে উপস্থিত হইয়া, আত্মপরিচয় দিলেন এবং কি জন্য আসিয়াছেন অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহা ব্যক্ত করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল, অকাতরে অন্নব্যয় করিতেন ; এমন স্থলে দুর্দ্দশাপন্ন আসন্ন জ্ঞাতিসন্তানকে অন্ন দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে। তিনি সাতিশয় দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ঠাকুরদাসকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

ঠাকুরদাস, প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে, রীতিমত সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছিল এবং তিনিও তাদৃশ অধ্যয়ন বিষয়ে সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃতপাঠে নিযুক্ত হইলে তাহা সম্পন্ন হয় না। তিনি সংস্কৃত পড়িবার জন্য সবিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, যথার্থ বটে ; এবং সর্ব্বদাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেন যত কষ্ট, যত অসুবিধা হউক না কেন, সংস্কৃতপাঠে প্রাণপণে যত্ন করিব। কিন্তু জননীকে ও ভাই-ভগিনীগুলিকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, যখন তাহা মনে হইত তখন সে ব্যগ্রতা ও সে প্রতিজ্ঞা, তদীয় অন্তঃকরণ হইতে একেবারে অপসারিত হইত। যাহা হউক অনেক বিবেচনার পর, অবশেষে ইহাই অবধারিত হইল যাহাতে তিনি শীঘ্র উপার্জ্জনক্ষম হন সেরূপ পড়াশুনা করাই কর্ত্তব্য।

এই সময়ে মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম্ম হইত। এজন্য, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজী পড়াই তাঁহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। কিন্তু সে সময়ে, ইঙ্গরেজী পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন এখনকারমত, প্রতি পল্লীতে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, তাঁহার ন্যায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্য্যোপযোগী ইঙ্গরেজী জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে ঐ ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বিষয়কর্ম্ম করিতেন ; সুতরাং দিবাভাগে, তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না। এজন্য, তিনি ঠাকুরদাসকে সন্ধ্যার সময়, তাঁহার নিকটে যাইতে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে, ঠাকুরদাস প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, তাঁহার নিকটে গিয়া, ইঙ্গরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই, উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস ইঙ্গরেজী পড়ার অনুরোধে, সে সময় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না ; যখন আসিতেন তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না ; সুতরাং তাঁহাকে রাত্রিতে

অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নক্তন্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া, তিনি, দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। একদিন, তাঁহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতেছে,কেন ? তিনি, কি কারণে তাঁহার সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে, সেই স্থানে, শিক্ষকের আত্মীয় শূদ্রজাতীয় এক দয়ালু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং ঠাকুরদাসকে বলিলেন, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার ওরূপ স্থানে থাকা কোনও মতে চলিতেছে না। যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় আমার বাসায় রাখিতে পারি। এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, ঠাকুরদাস যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং পরদিন অবধি তাঁহার বাসায় গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল, আয় সেরূপ ছিল না। তিনি দালালি করিয়া, সামান্যরূপ উপার্জ্জন করিতেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া, ঠাকুরদাসের, নির্ব্বিঘ্নে দুই বেলা আহার ও ইঙ্গরেজী পড়া চলিতে লাগিল। কিছু দিন পরে ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে, তদীয় আশ্রয়দাতার আয় বিলক্ষণ খর্ব্ব হইয়া গেল, সুতরাং তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের, অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি, প্রতিদিন প্রাতঃকালে, বহির্গত হইতেন এবং কিছু হস্তগত হইলে কোনও দিন দেড় প্রহরের কোনও দিন দুই প্রহরের কোনও দিন আড়াই প্রহরের সময় বাসায় আসিতেন ; যাহা আনিতেন তাহা দ্বারা, কোনও দিন বা কষ্টে কোনও দিন বা স্বচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই সেই দিন, ঠাকুরদাসকে, সমস্ত দিন, উপবাসী থাকিতে হইত।

ঠাকুরদাসের সামান্যরূপ একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটী ছিল। থালাখানিতে ভাত ও ঘটীটিতে জল খাইতেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এক পয়সার সালপাত কিনিয়া রাখিলে, ১০/১২ দিন ভাত খাওয়া চলিবেক, সুতরাং থালা না থাকিলে কাজ আটাইবেক না অতএব, থালাখানি বেচিয়া ফেলি, বেচিয়া যাহা পাইব তাহা আপনার হাতে রাখিব। যে দিন, দিনের বেলায় আহারের যোগাড় না হইবেক, এক পয়সার কিছু কিনিয়া খাইব। এই স্থির করিয়া, তিনি সেই থালাখানি, নূতন বাজারে কাঁসারিদের দোকানে বেচিতে গেলেন। কাঁসারিরা বলিল, আমরা অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিতে পারিব না। পুরাণ বাসন কিনিয়া, কখনও কখনও বড় ফেসাতে পড়িতে হয়। অতএব আমরা তোমার থালা লইব না। এইরূপে কোনও দোকানদারই সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল না। ঠাকুরদাস, বড় আশা করিয়া থালা বেচিতে গিয়াছিলেন ; এক্ষণে, সে আশায় বিসর্জ্জন দিয়া, বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন, যে আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন ; দেখিলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস, তৃষ্ণার

উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি সাদর ও সস্নেহবাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইলেন, তাঁহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন. বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না, মা, আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন, পরে, তাঁহার মুখে সমস্ত অবগত হইয়া জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না। যাহা হউক, যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে, তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া ফলার করিয়া আসিতেন।

ঠাকুরদাস, মধ্যে মধ্যে, আশ্রয়দাতাকে বলিতেন, যাহাতে আমি কোনও স্থানে নিযুক্ত হইয়া, মাসিক কিছু কিছু পাইতে পারি, আপনি দয়া করিয়া তাহার কোনও উপায় করিয়া দেন। আমি ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, যাঁহার নিকট নিযুক্ত হইব, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব, এবং প্রাণান্তেও অধর্ম্মাচরণ করিব না। আমার উপকার করিয়া, কদাচ লজ্জিত হইতে বা কখনও কোনও কথা শুনিতে হইবেক না। জননী ও ভাই-ভগিনীগুলির কথা যখন মনে হয়, তখন আর ক্ষণকালের জন্যও, বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। এই বলিতে বলিতে চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত।

কিছুদিন পরে, ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে. কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্ম পাইয়া তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ব্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও, বেতনের দুইটি টাকা, যথা নিয়মে, জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও যার পর নাই পরিশ্রমী ছিলেন এবং কখনও কোনও ওজর না করিয়া, সকল কর্ম্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন ; এজন্য, ঠাকুরদাস যখন যাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন।

দুই তিন বৎসরের পরেই ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননী ও ভাই-ভাগিনীগুলির অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে, কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে, পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন ; তথায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দেখিতে না পাইয়া, বীরসিংহে আসিয়া, পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাঁহার সমাগমলাভে, সকলেই আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। শ্বশুরালয়ে বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন, এজন্য কিছুদিন পরেই পরিবার লইয়া বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু,

দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহ গ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল।

বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া তর্কভূষণ মহাশয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে তদীয় কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয় পাইয়া তিনি যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ ও সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বড়বাজারের দয়েহাটায়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়াশীল ও সদাশয় মনুষ্য ছিলেন, তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় দেশত্যাগ অবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রস্তাব করিলেন আপনি অতঃপর ঠাকুরদাসকে আমার বাটীতে রাখুন, আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার লইতেছি ; সে যখন স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে পারে, তখন আর তাহার কোনও অংশে অসুবিধা ঘটিবেক না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ; এবং ঠাকুরদাসকে সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া বীরসিংহে প্রতিগমন করিলেন। এই অবধি, ঠাকুরদাসের আহারক্লেশের অবসান হইল ! যথা সময়ে আবশ্যকমত দুই বেলা আহার পাইয়া তিনি পুনর্জ্জন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভঘটনা দ্বারা তাঁহার যে কেবল আহারের ক্লেশ দূর হইল এরূপ নহে, সিংহ মহাশয়ের সহায়তায়, মাসিক আট টাকা বেতনে এক স্থানে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, এই সংবাদে শুনিয়া তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

এই সময়ে ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন ! এই ভগবতীদেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভগবতীদেবী শৈশবকালে, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃহীনা ছিলেন না ; তথাপি, কি কারণে তাঁহাকে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতে হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত ও তৎসমভিব্যাহারে তদীয় মাতুল-কুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

পাতুলনিবাসী মুখটী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের চারি পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ; জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা তারা। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিজ বাটীতেই চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি স্বগ্রামে ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে সবিশেষ আদরণীয় ও সাতিশয় মাননীয় ছিলেন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা বিবাহযোগ্য হইলে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয় গোঘাটে একটি সুপাত্র আছে এই সংবাদ পাইয়া ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাত্রের নাম রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমান ও নিরতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন। অবাধে অধ্যয়ন করিয়া, একুশ, বাইশ বৎসরে, ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন এবং তর্কবাগীশ এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি ছাত্রকে অন্নদান এবং ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, এই পাত্রের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ব্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া আহ্লাদিতচিত্তে কন্যাদানে সম্মত হইলেন এবং বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, পুত্রদের সহিত

পরামর্শ করিয়া, রামকান্ত তর্কবাগীশের সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গার বিবাহ দিলেন।

কালক্রমে, গঙ্গাদেবীর গর্ভে তর্কবাগীশ মহাশয়ের দুই কন্যা জন্মিল ; জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী, কনিষ্ঠা ভগবতী। কিছুদিন পরে তর্কবাগীশ মহাশয়, সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে, তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনে সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। অতঃপর, অধ্যাপনাকার্য্যে তাঁহার তাদৃশ যত্ন রহিল না। তাঁহার অযত্ন দেখিয়া, ছাত্রেরা ক্রমে ক্রমে তদীয় চতুষ্পাঠী হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত না হইয়া অব্যাঘাতে তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে পারিব, এই ভাবিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়, অবশেষে, শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই শবসাধনের সমুচিত ফললাভ করিলেন। শবের উপর উপবিষ্ট হইয়া, জপ করিতে করিতে তিনি তুড়ি দিয়া "মঞ্জুর" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন! ফলকথা এই, সেই অবধি, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। অতঃপর কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসিলে, তিনি তুড়ি দিয়া ও মঞ্জুর বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। সময়ে সময়ে, ইহাও অবলোকিত হইত যখন তিনি উপবিষ্ট আছেন, কেবল তুড়ি দিতেছেন, ও মঞ্জুর মঞ্জুর বলিতেছেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহোদর বা অন্য কোনও অভিভাবক ছিলেন না। গঙ্গাদেবী, দুই শিশু কন্যা ও উন্মাদগ্রস্ত স্বামী লইয়া বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং নিরুপায় ভাবিয়া স্বীয় পিতা পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের নিকট এই বিপদের সংবাদ পাঠাইলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, কন্যা, জামাতা ও দুই দৌহিত্রীকে আপন বাটীতে আনিলেন। এক স্বতন্ত্র চণ্ডীমণ্ডপ উন্মাদগ্রস্ত জামাতার বাসার্থে নিয়োজিত হইল ; তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেন ; কন্যা ও দুই দৌহিত্রী পরিবারের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জামাতার বিশিষ্টরূপ চিকিৎসা করাইলেন ; কিছুতেই কোন উপকার দর্শিল না। অল্প দিনের মধ্যেই অবধারিত হইল, জামাতা এজন্মে আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন না। অতঃপর, কন্যা, জামাতা ও দুই দৌহিত্রীর ভরণপোষণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের ভার বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরেই বর্ত্তিল। তিনিও যথোচিত যত্ন ও স্নেহ সহকারে তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অবিদ্যমান হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ সংসারের কর্ত্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ ও চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় বিষয়কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। চারি সহোদরে যাবজ্জীবন একান্নবর্ত্তী ছিলেন ; যিনি যে উপার্জন করিতেন জ্যেষ্ঠের হস্তে দিতেন! জ্যেষ্ঠ, যার পর নাই সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। স্বীয় পরিবারের উপর তাঁহার যেরূপ স্নেহ ও যেরূপ যত্ন ছিল, ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, তিনি বরং তাহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ ও অধিক যত্ন করিতেন। ফলকথা এই, তাঁহার কর্ত্তৃত্বকালে, কেহ কখনও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ দেখিতে পান নাই!

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, একান্নবর্ত্তী ভ্রাতাদের অধিকদিন পরস্পর সদ্ভাব থাকে না ; যিনি সংসারে কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহার পরিবার যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকেন, অন্য অন্য ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, সেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকা কোনও মতে ঘটিয়া উঠে না। এজন্য অল্প দিনেই, ভ্রাতাদের পরস্পর মনান্তর ঘটে, অবশেষে, মুখদেখাদেখি বন্ধ হইয়া পৃথক হইতে হয়। কিন্তু, সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারিজনেই সমান ছিলেন ; এজন্য কেহ

কখনও ইহাদের চারি সহোদরের মধ্যে মনান্তর বা কথান্তর দেখিতে পান নাই। স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভাগিনেয়ীদের পুত্রকন্যাদের উপরেও. তাঁহাদের অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ভাগিনেয়ীরা, পুত্রকন্যা লইয়া মাতুলালয়ে গিয়া, যেরূপ সুখে সমাদরে কালযাপন করিতেন কন্যারা পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয়ে গিয়া সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্য্যা, এই পরিবারে, যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ঐ অঞ্চলের, কোনও পরিবারে এ বিষয়ে এই পরিবারের ন্যায়, প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ফলকথা এই, অন্নপ্রার্থনায় রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া, কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলেই পরম সমাদরে অতিথিসেবা ও অভ্যাগতপরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবদ্দশায়, এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের, স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী বহুতর গ্রামে, আধিপত্যের সীমা ছিল না। এই সমস্ত গ্রামের লোক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদভঞ্জন, বিপদ্‌মোচন, অসময়ে সাহায্যদান প্রভৃতি কার্য্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল ; কিন্তু সেই অর্থের সঞ্চয়, অথবা স্বীয় পরিবারের সুখসাধনে প্রয়োগ, এক দিন এককক্ষণের জন্যও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিয়োজিত ও পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, প্রাতঃস্মরণীয় রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত অমায়িক, পরোপকারি ও ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট আমরা অশেষ প্রকারে যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, মাতৃদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায় ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় মাস বাস করিতেন ; কিন্তু এক দিনের জন্যও, স্নেহ, যত্ন ও সমাদরের ত্রুটি হইত না। বস্তুতঃ ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্রকন্যাদের উপর এরূপ স্নেহ প্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার। জ্যেষ্ঠা ভাগিনেয়ীর মৃত্যু হইলে তদীয় একবর্ষীয় দ্বিতীয় সন্তান, বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, আদ্যন্ত অবিচলিতস্নেহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

আমি পঞ্চমবর্ষীয় হইলাম। বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। গ্রামস্থ বালকগণ ঐ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত। আমি তাঁহার পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদান বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। ইঁহার পাঠশালার ছাত্রেরা অল্প সময়ে, উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারিত, এজন্য, ইনি উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া, বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, পূজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয় দলের আদর্শস্বরূপ ছিলেন।

পাঠশালায় এক বৎসর শিক্ষার পর, আমি ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমি

এ যাত্রা রক্ষা পাইব, প্রথমতঃ এরূপ আশা ছিল না। কিছু দিনের পর, প্রাণনাশের আশঙ্কা নিরাকৃত হইল ; কিন্তু একেবারে বিজ্বর হইলাম না। অধিক দিন জ্বরভোগ করিতে করিতে, প্লীহার সঞ্চার হইল। জ্বর ও প্লীহা উভয় সমবেত হওয়াতে, শীঘ্র আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা রহিল না। ছয় মাস অতীত হইয়া গেল, কিন্তু রোগের নিবৃত্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।

জননীদেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল, রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, আমার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া বীরসিংহে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিয়া শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, আমাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। পাতুলের সন্নিকটে কোটরী নামে যে গ্রাম আছে, তথায় বৈদ্যজাতীয় উত্তম উত্তম চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহাদের অন্যতমের হস্তে আমার চিকিৎসার ভার অর্পিত হইল। তিন মাস চিকিৎসার পর, সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম এই সময়ে, আমার উপর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ও তদীয় পরিবারবর্গের স্নেহ ও যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে, বীরসিংহে প্রতিপ্রেরিত হইলাম, এবং পুনরায়, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া, আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তথায় শিক্ষা করিলাম। আমি গুরুমহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলাম। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, পাঠশালায় সকল ছাত্র অপেক্ষা, আমার উপর তাঁহার অধিকতর স্নেহ ছিল। আমি তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার দেহাত্যয়ের কিছু দিন পূর্ব্বে এক মাত্র তাঁহার উপর আমার ভক্তি বিচলিত হইয়াছিল।

—শাকে, কার্ত্তিক মাসে, পিতামহদেব, রামজয় তর্কভূষণ, অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন, কোন অংশে কাহার নিকট অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোনওপ্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায় অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, এজন্য অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য, তাঁহার পক্ষে, কস্মিন্ কালেও আবশ্যক হয় নাই।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তর্কভূষণ মহাশয়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক বীরসিংহবাসে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্যালক, রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানা প্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না, তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে তাঁহাকে সময়ে সময়ে, প্রকৃত প্রস্তাবে, এক ঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইতেন না।

তাঁহার শ্যালক প্রভৃতি গ্রামের প্রধানেরা নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন,

আপন ইষ্টসাধন বা অভিপ্রেত সম্পাদনের জন্য না করিতে পারিতেন, এমন কর্ম্মই নাই। এতদ্ভিন্ন, সময়ে সময়ে এমন নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেন, যে তাঁহাদের কিছুমাত্র বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, এরূপ বোধ হইত না। এজন্য, তর্কভূষণ মহাশয়, সর্ব্বদা, সর্ব্বসমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে, বলিতেন, এ গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলই গরু। এক দিন, তিনি এক স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ঐ স্থানে, লোকে মলত্যাগ করিত। প্রধান কল্পের এক ব্যক্তি বলিলেন, তর্কভূষণ মহাশয় ঐ স্থানটা দিয়া যাইবেন না। তিনি বলিলেন, দোষ কি। সে ব্যক্তি বলিলেন, ঐ স্থানে বিষ্ঠা আছে। তিনি কিয়ৎক্ষণ স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, এখানে বিষ্ঠা কোথায়, আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না ; যে গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সেখানে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক।

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন, কি ছোট, কি বড়, সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন. কেহ রুষ্ট অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন, আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান, ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন,বটে কিন্তু তদীয় আকারে, আলাপে, বা কার্য্যপরম্পরায় তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া, কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ, অথবা তদীয় অনিষ্ট চিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না ; এবং কোনও বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত, ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য সকলেই তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। বনমালিপুর হইতে প্রস্থান করিয়া, যে আট বৎসর অনুদ্দেশপ্রায় হইয়াছিলেন, ঐ আট বৎসর কাল কেবল তীর্থপর্য্যটনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্ব্বতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল, উহা হস্তে না করিয়া, তিনি কখনও বাটীর বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে, কি প্রত্যূষে, কি মধ্যাহ্নে. কি সায়াহ্নে, অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল। এজন্য, অনেকে সমবেত না হইয়া, ঐ সকল স্থল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায়, সকল সময়ে, ঐ সকল স্থল দিয়া, একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই চারিবার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্তরূপ অক্কেলসেলামি পাইয়া, আর তাহাদের তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।

একুশ বৎসর বয়সে, তিনি একাকী মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে অতিশয় জঙ্গল ও বাঘ ভালুক হিংস্র জন্তুর ভয়ানক উপদ্রব ছিল। এক স্থলে খাল পার হইয়া, তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, ভালুকে আক্রমণ করিল। ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি তদীয় উদরে উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। এইরূপে, এই ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন বটে, কিন্তু তৎকৃত ক্ষত দ্বারা তাঁহার শরীরের শোণিত অনবরত বিনির্গত হওয়াতে, তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইস্থান হইতে মেদিনীপুর প্রায় চারি ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। ঐ অবস্থাতে তিনি অনায়াসে পদব্রজে, মেদিনীপুরে পঁহুছিলেন, এক আত্মীয়ের বাসায়, দুই মাস কাল, শয্যাগত থাকিলেন, এবং ক্ষত সকল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে, বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ সকল ক্ষতের চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার শরীরে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত।

পিতৃদেবের ও পিতামহীদেবীর মুখে, সময়ে সময়ে পিতামহদেব সংক্রান্ত যে সকল গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহারই স্থূলবৃত্তান্ত উপরিভাগে লিপিবদ্ধ হইল।

পিতামহদেবের দেহাত্যয়ের পর, পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা স্থির করিলেন। তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বড়বাজার নিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সময়ে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্ব্বে সিংহ মহাশয়ের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্ত্তা। এই সময়ে, জগদ্দুর্লভ বাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার এক পুত্র, এইমাত্র পরিবার। জগদ্দুর্লভ বাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্য শব্দে সম্ভাষণ করিতেন ; সুতরাং আমি তাঁহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম। তাঁহাকে দাদা মহাশয়, তাঁহার ভগিনীদিগকে, বড় দিদি ও ছোট দিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া, এক দিনের জন্যও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু, কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিন্ কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে, আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিমগুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ

সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতামহীদেবের একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমতঃ কিছুদিন, তাঁহার জন্য, যার পর নাই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে, তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহে ও যত্নে, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।

এই সময়ে, পিতৃদেব, মাসিক দশ টাকা বেতনে, জোড়াসাঁকোনিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের নিকট নিযুক্ত ছিলেন। বড়বাজারের চকে, মল্লিক মহাশয়ের এক দোকান ছিল। ঐ দোকানে লোহা ও পিতলের নানাবিধ বিলাতি জিনিষ বিক্রীত হইত। যে সকল খরিদ্দার ধারে জিনিষ কিনিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পিতৃদেবকে টাকা আদায় করিয়া আনিতে হইত। প্রতিদিন, প্রাতে এক প্রহরের সময়, কর্ম্মস্থান যাইতেন ; রাত্রি এক প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন। এ অবস্থায় অন্যত্র বাসা হইলে, আমার মত পল্লীগ্রামের অষ্টমবর্ষীয় বালকের পক্ষে, কলিকাতায় থাকা কোনও মতে চলিতে পারিত না।

জগদ্দুর্লভ বাবুর বাটীর অতি সন্নিকটে, শিবচরণ মল্লিক নামে এক সম্পন্ন সুবর্ণবণিক ছিলেন। তাঁহার বাটীতে একটি পাঠশালা ছিল। ঐ পাঠশালায় তাঁহার পুত্র, ভাগিনেয়, জগদ্দুর্লভ বাবুর ভাগিনেয়েরা, ও আর তিন চারিটি বালক শিক্ষা করিতেন। কলিকাতায় উপস্থিতির পাঁচ সাত দিন পরেই, আমি ঐ পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। অগ্রহায়ণ. পৌষ, মাঘ, এই তিন মাস তথায় শিক্ষা করিলাম। পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।

ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে আমি রক্তাতিসাররোগে আক্রান্ত হইলাম। ঐ পল্লীতে দুর্গাদাস কবিরাজ নামে চিকিৎসক ছিলেন ; তিনি আমার চিকিৎসা করিলেন। রোগের নিবৃত্তি না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিলে, আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই, এই স্থির করিয়া, পিতৃদেব বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র, পিতামহীদেবী, অস্থির হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, এবং দুই তিন দিন অবস্থিতি করিয়া, আমায় লইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিনা চিকিৎসায়, সাত আট দিনেই, আমি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে, আমি পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলাম। প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, একজন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ চলিয়া, আর চলিতে না পারিলে. ঐ ভৃত্য খানিক আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া আসিত। এবার আসিবার পূর্ব্বে, পিতৃদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, চলিয়া যাইতে পারিবে, না লোক লইতে হইবেক। আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবেক না, আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব। তদনুসারে আর লোক লওয়া আবশ্যক হইল না। পিতৃদেব আমায় লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। মাতৃদেবীর মাতুলালয় পাতুল বীরসিংহ হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই ছয় ক্রোশ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিলাম। সেদিন পাতুলে অবস্থিতি করিলাম।

তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রামনগর নামক গ্রামে আমার কনিষ্ঠা পিতৃষ্বসা অন্নপূর্ণাদেবীর

শ্বশুরালয়। ইতিপূর্ব্বে অন্নপূর্ণাদেবী অসুস্থ হইয়াছিলেন, এজন্য পিতৃদেব, কলিকাতায় আসিবার সময়, তাঁহাকে দেখিয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারে, আমরা পরদিন প্রাতঃকালে, রামনগর অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। রামনগর পাতুল হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। প্রথমতঃ দুই তিন ক্রোশ অনায়াসে চলিয়া আসিলাম। শেষ তিন ক্রোশে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। তিন ক্রোশ চলিয়া আমার পা এত টাটাইল, যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না। ফলকথা এই, আমার চলিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র রহিল না। অনেক কষ্টে চারি পাঁচ দণ্ডে আধ ক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না। বেলা দুই প্রহরের অধিক হইল, এখনও দুই ক্রোশের অধিক পথ বাকী রহিল।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া, পিতৃদেব বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। আগের মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, ঐখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব। এই বলিয়া তিনি লোভ প্রদর্শন করিলেন; এবং অনেক কষ্টে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইলেন। তরমুজ বড় মিষ্ট লাগিল। কিন্তু পরে টাটানি কিছুতেই কমিল না। বরং খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না। ফলতঃ, আর এক পা চলিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা রহিল না। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে তুই এই মাঠে একলা থাক, এই বলিয়া ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমায় ফেলিয়া খানিক দূর চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া, দুই একটা থাবড়াও দিলেন।

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া পিতৃদেব আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ছিলেন, অষ্টমবর্ষীয় বালককে স্কন্ধে লইয়া অধিক দূর যাওয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। সুতরাং খানিক গিয়া আমায় স্কন্ধ হইতে নামাইলেন এবং বলিলেন, বাবা খানিক চলিয়া আইস, আমি পুনরায় কাঁধে করিব। আমি চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চলিতে পারিলাম না। অতঃপর, আর আমি চলিতে পারিব, সে প্রত্যাশা নাই দেখিয়া, পিতৃদেব খানিক আমায় স্কন্ধে করিয়া লইতে লাগিলেন, খানিক পরেই ক্লান্ত হইয়া আমায় নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই ক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দেড় প্রহর লাগিল। সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্বে আমরা রামনগরে উপস্থিত হইলাম, এবং তথায় সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়া, পরদিন, শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপর দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্য্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ, স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন। শিক্ষা বিষয়ে আমার কিরূপ ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ে আলোচনা হইতে লাগিল। সেই সময়ে, প্রসঙ্গক্রমে, পিতৃদেব মাইলষ্টোনের উপাখ্যান বলিলেন। সে উপাখ্যান এই—

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধারাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন। তিনি আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইলষ্টোন। আমি বলিলাম, বাবা মাইলষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ

ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা আছে, উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে, এই পাথরের অঙ্ক উনিশ, ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় "একের পিঠে নয় উনিশ" ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এইটি ইঙ্গরেজীর এক, আর এইটি ইঙ্গরেজীর নয়। অনন্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পরে যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, আজ দুই পর্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইলষ্টোন যেখানে পোতা আছে, আমরা সে দিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, একদিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, সেটি দেখিবার আর দরকার নাই, এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই, আমি ইঙ্গরেজীর অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইলষ্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটীতে দশম মাইলষ্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইল-ষ্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া চালাকি করিয়া, নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল-ষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না; অনন্তর, পঞ্চম মাইলষ্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন্ মাইলষ্টোন বল দেখি। আমি বলিলাম, বাবা, এই মাইলষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে, এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি আমার চিবুক ধরিয়া "বেস বাবা বেস" [?] এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, দাদামহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখা পড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে মানুষ হইতে পারিবেক। যাহা হউক, আমার এই পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা সকলে যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহ্লাদ দেখিয়া, আমিও তদনুরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

মাইলষ্টোনের উপাখ্যান শুনিয়া পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়রা একবাক্য হইয়া, "তবে ইহাকে, রীতিমত ইঙ্গরেজী পড়ান উচিত" এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিলেন। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, সিদ্ধেশ্বরী তলার ঠিক পূর্ব্বদিকে একটি ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল। উহা হের সাহেবের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরামর্শদাতারা ঐ বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উহাতে ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে, ঐ স্থানে ইহাকে পড়িতে দাও; যদি ভাল শিখিতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইবেক, হিন্দু কলেজে পড়িলে ইঙ্গরেজীর চূড়ান্ত হইবেক। আর যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও অনেক কাজ দেখিবেক, কারণ মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, হাতের লেখা ভাল হইলে, ও যেমন তেমন

জমাখরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম্ম করিতে পারিবেক।

আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত ব্যবসায়ী ; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্য বশতঃ ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই, ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। এজন্য পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ তাঁহার মনোনীত হইল না। তিনি বলিলেন, উপার্জ্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া, তিনি আমার ইঙ্গরেজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে, আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক ; আর যদি চাকরী করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে, সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া, যাহারা ল কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, আমার বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেওয়াই উচিত। চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কালেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণ রূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর, বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।

'বিদ্যাসাগর চরিত' (স্বরচিত) : সেপ্টেম্বর ১৮৯১

প্রবন্ধাবলি

শিবনাথ শাস্ত্রী

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে নিম্নলিখিত বচনটি প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ ।
স জীবতি মনো যস্য মননেনহি জীবতি ।।

অর্থ—তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পশু পক্ষীও জীবন ধারণ করে ; কিন্তু সেই প্রকৃতরূপে জীবিত, যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।

মনন শব্দের অর্থ মনের ক্রিয়া বা ব্যাপার। লুতাতন্তুর ন্যায় অথবা ক্ষৌমকীটের ক্ষৌমকোষের ন্যায় মন সর্ব্বদাই কিছু বুনিতেছে ; আপনার অন্তর্নিহিত জ্ঞান-সামগ্রী সকলের সাহায্যে সর্ব্বদাই নব নব আদর্শ রচনা করিতেছে ; মনের এই যে অবিশ্রান্ত গঠনকার্য্য ইহার নাম মনন। ইহা মানবেরই স্বধর্ম্ম, অপর জীবে নাই।

মানুষের যেন দুইটা জীবন আছে, এক দেহ-রাজ্যে, আর এক এই মনন-রাজ্যে। দেহ-রাজ্যের জীবন সামান্য, সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ এবং শক্তি, সময় ও সুবিধাদিদ্বারা নিয়মিত ; কিন্তু মনন-রাজ্যের জীবন অতি মহৎ, সুদূর-প্রসারিত ও গগন-সঞ্চারী বায়ুস্রোতের ন্যায় স্বাধীন। জগতের মহামনা ব্যক্তিগণ দেহরাজ্যের জীবনকে তুচ্ছ জানিয়া মনন-রাজ্যের জীবনকেই সার জ্ঞান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যাঁহারা মানব-সমাজের সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাঁহারা আপনাদের মনন-রাজ্যেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। তাঁহাদের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তন্মধ্যে কতকগুলি উপাদান দৃষ্ট হয়। তাহার মধ্যে প্রধান বর্ত্তমানে অতৃপ্তি। ইহাও মানব-প্রকৃতির স্বধর্ম্ম বলিলে হয়। মানব স্বীয় অবস্থাতে কখনই পরিতৃপ্ত নহে। মানব যাহা একবার পায়, তাহার প্রতি আর ফিরিয়া তাকায় না ; যাহা পায় নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে পাইতে পারে, সেই পথ চাহিয়া থাকে। বর্ত্তমান দেখিয়া আমরা সর্ব্বদাই অসুখী। আমরা যেন সর্ব্বদা বলিতেছি,—আমি আপনার মনের মত হইতে পারিলাম না ; আমার গৃহ পরিবার, আমার সমাজ, আর এই প্রকাণ্ড মানব-সংসার, আমি যে দিকে তাকাই, কেহই, কিছুই, ঠিক্ মনের মত নহে ; মনের মধ্যে যে পূর্ণতার আদর্শ আছে সকলই যেন তাহার নিম্নে পড়ে। মানবের আচার ব্যবহারে, কার্য্য কলাপে, আইন আদালতে, যতটা সত্য, যতটা ন্যায় বা যতটা প্রেম আছে, যেন তাহা যথেষ্ট নহে ; আমরা আরও চাই ; ইহাই যেন মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব। এই যে অতৃপ্তি, যাহা তোমার আমার হৃদয়ে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় থাকে, উস্কাইলেই পাই, প্রশ্ন করিলেই দেখা দেয়, ইহাই জগতের ধর্ম্ম বা সমাজ-সংস্কারকদিগের হৃদয়ে ঘনীভূত আকারে প্রকাশ পায় ; এই অতৃপ্তি নর-প্রেমের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে ঘোর দুঃখে নিমগ্ন করে।

তাঁহাদের সহিত আর একটি বিষয়ে আমাদের প্রভেদ আছে। আমাদের অতৃপ্তি অনেক সময়ে দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় হৃদয়ে উদয় হইয়াই লয় প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু নির্ম্মলচিত্ত মহামনা ব্যক্তিদিগের অন্তরে তাহা স্থায়ী ফল প্রসব করে। তাঁহারা এই অতৃপ্তি লইয়া বসিয়া থাকেন না ; মনন-শক্তির বলে ভবিষ্যতের ছবি গড়িতে থাকেন। ইহা যেন কতকটা

ছায়াবাজী বা ম্যাজিক লণ্ঠনের ন্যায় । মন নিজের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার আদর্শকে ভবিষ্যতের পটে ফেলিয়া সেই শোভা দর্শন করিতে থাকে ও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া বর্ত্তমানের হীনতা ভুলিয়া যায় । বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চক্ষে এই ভবিষ্যতের ছবি মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় বোধ হইতে পারে ; মৃগতৃষ্ণিকা যেমন জলের মত দেখায়, অথচ জল নয়, এই ছবিও সেইরূপ সত্যের মত দেখাইলেও সত্য নহে । ইহার জন্য সেরূপ ব্যক্তি এক পয়সাও ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন । কিন্তু জগতের এক শ্রেণীর লোকের নিকট ইহা অপেক্ষা অধিক সত্য আর কিছুই নাই । চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থকে দর্শন করে, তাঁহারাও ইহাকে সেইরূপ উজ্জ্বল ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন । ইহা তাঁহাদের ধ্যান জ্ঞানে প্রবেশ করে ; তাঁহাদের চিত্তকে সিক্ত ও আপ্লুত করে ; তাঁহাদের কল্পনাকে উত্তেজিত করে ও হৃদয়কে জাগ্রত করে ! তৎপরে জগতের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকদিগের আর একটি লক্ষণ আছে, তাহাও মানব-প্রকৃতির স্বধর্ম্ম বলিলে হয় । সেটি নিজ মনন-গঠিত আদর্শে অনুরাগ । অনুরাগের এই প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় । আজি যদি সকলে শুনেন, একজন চিত্রকর নিজে এক নারীমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া তাহার সহিত এমনি প্রেমে পড়িয়াছে যে, তজ্জন্য সে আহার-নিদ্রা-বিবর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা হইলে সকলে তাহাকে বাতুল মনে করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । আমি দেখি, মানব-প্রকৃতিতে এই বাতুলতা বিদ্যমান রহিয়াছে । মানুষ আপনার মনন-শক্তির দ্বারা যে ছবি বা যে আদর্শ সমুৎপন্ন করে, তাহাতে এমনি আসক্ত হয় যে, জীবনকে জীবন জ্ঞান করে না । ইহা প্রতিদিন প্রত্যেকে দেখিতেছেন, লক্ষ লক্ষ লোক স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বা গৌরবের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্বাধীনতা বা জাতীয় গৌরব কি বস্তু ? ইহার আকৃতি প্রকৃতি কি প্রকার ? ইহা কোন্ স্থানে বাস করে ? ইহার অপেক্ষা সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক পদার্থ আর কি হইতে পারে ? ইহা মানবের মনন-রচিত, কল্পনা-সমুদ্ভূত আদর্শ মাত্র । একজন ইংরাজ যে জাতীয় গৌরবের জন্য প্রাণ দেয়, একজন কাফ্রী সে জাতীয় গৌরব দেখিতে পায় না কেন ? গত শতাব্দীর শেষ ভাগের ফরাসি বিপ্লবের অধিনায়কগণ সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য যেরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন, কোন্ পুরুষ কোন্ স্ত্রীলোকের জন্য আজি পর্যন্ত ততদূর ক্ষিপ্ত হইয়াছে ? তাই বলি মানুষ আপনার মনন-শক্তির রচিত ছবিকে এত ভালবাসিতে পারে যে, কোনও পুরুষ স্ত্রীকে বা কোনও স্ত্রী পুরুষকে তত ভালবাসে না । বিষয়াসক্তিশূন্য, নিঃস্বার্থ, প্রেমিক প্রকৃতিতে এই প্রেম পূর্ণ মাত্রায় জাগিয়া থাকে । তাঁহারা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইহাতে একেবারে নিমগ্ন হইয়া যান, এবং মানুষ যেমন আলেয়ার পশ্চাতে ছোটে, তেমনি তাহার পশ্চাতে ছুটিতে থাকেন । আবার ভাবিয়া দেখ, এই যে বর্ত্তমানে অতৃপ্তি, এই যে ভবিষ্যৎ রচনা, ও এই যে মনন-রচিত আদর্শে আসক্তি, ইহাদের অন্তরালে কি ? কোন্ ছবিতে মানুষকে বাতুল করে ? ন্যায় ও অন্যায়, সাম্য ও বৈষম্য, সত্য ও অসত্য, ইহার মধ্যে কোন্‌টীতে মানব-চিত্তকে উন্মাদগ্রস্ত করে ? কোনটীর জন্য মানুষ প্রাণ মন সমর্পণ করে ?

সাম্যের পরিবর্ত্তে বৈষম্য যদি ফরাসি-বিদ্রোহের অধিনায়কদিগের লক্ষ্যস্থলে থাকিত, তাহা হইলে কি তাঁহারা সেরূপ ক্ষিপ্ত হইতে পারিতেন ? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, পরীক্ষা করিয়া দেখ, যেখানেই মানব-চিত্ত ভবিষ্যতের কোনও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উন্মাদগ্রস্ত হইতেছে, সেখানে সত্য, ন্যায়, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাই দেখিতে চাহিতেছে ; এবং এই গুলিই হৃদয়ে থাকিয়া হৃদয়কে উত্তেজিত করিতেছে । বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও

আমেরিকার সভ্যদেশ সকলে ভূমিকম্পের ন্যায় যে ঘন ঘন সমাজ-কম্প হইতেছে. এবং ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজাতে যে ঘোর বিদ্রোহ চলিতেছে, সেখানেও মানুষের দৃষ্টি সত্য, ন্যায়, প্রেম প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

কিন্তু সত্য, ন্যায়, প্রেম প্রভৃতি ঈশ্বরের স্বরূপ। অতএব যদি বলি যে স্বয়ং ঈশ্বর মানব-আত্মাতে নিহিত থাকিয়া মানব-সমাজকে আপনার অভিমুখে লইতে চাহিতেছেন, তাহা হইলে কি অত্যুক্তি হয় ? ঈশ্বর আমাদের প্রকৃতিতে নিহিত আছেন বলিয়াই আমাদের এ প্রকার বাতুলতা রহিয়াছে। ইহা হৃদয়বাসী ঈশ্বরের নিঃশ্বাস, ইহা তাঁহারই ফুৎকার। এই বাতুলতাতেই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। আমরা জগতের অসত্য, অন্যায়, অপ্রেমের বিষয় চিন্তা করিয়া পাগল হইতে পারি, এইটুকুই আমাদের মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব কেন, এটুকু আমাদের দেবত্বও বটে ; কারণ এখানে দেব মানবে সম্মিলন। যদি বল সকলে ত পাগল হয় না, আমি বলি, মনুষ্যনামধারী সকলে ত মানুষ নয়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা এরূপ পাগল মানুষ দুই চারি জন পাই। তাহা না হইলে মনুষ্য-সমাজের গতি কি হইত ? আমি এরূপ একজন পাগল মানুষের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে যাইতেছি। তিনি পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে পাগল বলিতেছি ? যিনি গতানুগতিকের পথ পরিত্যাগ করিয়া, জগতের ধনধান্য সম্ভোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের আরাম, বিশ্রাম, আত্মীয়তাদির সুখ পায়ে ঠেলিয়া, পরের জন্য আপনাকে দুরন্ত শ্রমে নিক্ষেপ করিলেন, যিনি হাজার হাজার টাকা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিলেন, যিনি অম্লানচিত্তে লোকনিন্দা ও নির্যাতনের মুকুট মাথায় তুলিয়া পরিলেন, যিনি লোক নিন্দার বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া বালবিধবাদিগকে কর্দ্দম হইতে তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, এমন মানুষকে পাগল বৈ আর কি বলিব ? বিদ্যাসাগর মহাশয় মনে করিলে দেহরাজ্যের সামান্য জীবনে কি সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না ? তিনি নিজের শ্রমের অন্ন কি সুখে আহার করিতে পারিতেন না ? নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে পণ্ডিতকুলের মধ্যে যশস্বী হইয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ক্রোড়ে কি বাস করিতে পারিতেন না ? বঙ্গদেশে এমন কোন্ পদ কে অধিকার করিয়াছে, যাহা বিদ্যাসাগর মনে করিলে অধিকার করিতে পারিতেন না ? কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে সে পথে যাইতে দিলেন না। কি যেন কিসের জন্য তাঁহাকে পাগল করিয়া জগতের মহৎ ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহার নাম লিখিয়া দিলেন।

আমরা সচরাচর বলি, তিনি দেশমধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য পাগল হইয়াছিলেন ; তিনি পর দুঃখে কাঁদিয়াছিলেন ; ওটাত বাহিরের মানুষের কাজ। তাঁহার ভিতরের মানুষটা কি ছিল, অগ্রে তাহাই একটু আলোচনা করা যাউক। তাহা কি যদ্দ্বারা বিদ্যাসাগরের বিদ্যাসাগরত্ব হইয়াছিল ? যাহা তাঁহাকে পার্থিব ধন মানের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতে দেয় নাই, যাহা তাঁহাকে সোজাপথে নিজ অভীষ্টের দিকে লইয়া গিয়াছিল ? এ জগতে সোজাপথে চলা কি বড় সহজ ? একটা লক্ষ্য স্থির না থাকিলে কি সোজা পথে চলা যায় ? যদি গগনে ধ্রুবতারা না থাকিত, তাহা হইলে নাবিকগণ কি সোজা পথে চলিতে পারিত ? সেইরূপ এই তেজস্বী পুরুষসিংহগণ যে জীবনে সোজাপথে চলিয়াছেন, তাহার মূলে কি ? আমি এ জীবনে যে অল্পসংখ্যক মানুষকে সোজাপথে চলিতে দেখিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার মধ্যে একজন প্রধান। আমি যখন আট বৎসরের বালক, তখন প্রথমে তাঁহার সহিত আমার

পরিচয় হয়। সেই দিন হইতে আমাকে ভাল বাসিতেন. এবং সেই দিন হইতে আমি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি, এমন সোজাপথে চলিবার মানুষ আমি অল্পই দেখিয়াছি। আমি তাঁহার অত্যুজ্জ্বল গুণাবলীর পার্শ্বে দুই একটা উৎকট দোষও দেখিয়াছি ; কিন্তু সেই তেজঃপুঞ্জ চরিত্রের সোজাপথে চলা যখন স্মরণ করি, তখন আর কোনও দোষের কথা মনে থাকে না ; বলি, হায় ! হায় ! এমন মানুষ আবার কতদিনে পাইব ?

তবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মেরুদণ্ড কি ? সে কি জিনিস যাহা হৃদয়ে থাকাতে তিনি সোজাপথে চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ? তাহা মানব-জীবনের মহত্ত্ব-জ্ঞান। কথাটি শুনিতে ছোট, কিন্তু ফলে অতিশয় বড়। তুমি আমি এ জগতে কি হইব বা কোন্ স্থান অধিকার করিব, তাহার অনেকটা ইহার উপরে নির্ভর করে। তুমি যদি স্বীয় জীবনকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখ, তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাতেই সন্তুষ্ট হইবে, যদি মহৎ করিয়া দেখ, তবে মহত্ত্বের দিকে তোমার দৃষ্টি পড়িবে। তাহা হইলে জীবনের সামগ্রী অপেক্ষা জীবনকে বড়ই উচ্চ বোধ হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিকা অপেক্ষা নিজ মনুষ্যত্বকে অনন্তগুণে অধিক উচ্চ পদার্থ মনে করিতেন। তাঁহার মনুষ্যত্বের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তিনি সেই প্রভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন। যেমন ক্ষুদ্রকায় বনজ গুল্ম সকলের মধ্যে দীর্ঘদেহ শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই সেই পুরুষ-সিংহ নিজ মহৎ মনুষ্যত্বে স্বসমকালীন জনগণকে বহু নিম্নে ফেলিয়া উর্দ্ধ-শিরা হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পাখানা তুলিয়া টক্ করিয়া লাথি মারিতে না পারি।" ঠিক্ কথা ! এরূপ তেজস্বী পুরুষের নিকটে রাজা রাজড়া কোথায় লাগে ? সমগ্র দেশের লোকের বাহু একত্রে বাঁধিলে এমন একটা মানুষকে আঁকড়াইয়া ধরা ভার। তিনি স্বদেশবাসীদিগকে বিধবাবিবাহ বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন বটে, বাহিরে দেখিতে শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন শাস্ত্রের নিম্নে না পড়িয়া শাস্ত্রের উপরে উঠিয়া শাস্ত্রকে আদেশ করিয়াছিল,—"আমি এইটা চাই, তোমাকে ইহা প্রমাণ করিতেই হইবে।" শাস্ত্র তাঁহার হস্তে কাদার তালের ন্যায় যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই দিয়াছিল। এই মনুষ্যত্বের বিক্রম সম্বন্ধে কেবল একজন মহাপুরুষের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে, তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন রায়ের মনুষ্যত্ব ভারতবর্ষে ধরে নাই ; উছলিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল ; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বও দেশে ও শাস্ত্রে ধরে নাই ; উছলিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার নিজের মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পরদুঃখকাতর হৃদয় ছিল ; সেই জন্যই অপরের প্রতি অত্যাচার দেখিলে, কাহাকেও অন্যায়রূপে কোনও মনুষ্যত্বের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত দেখিলে ; তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। রামমোহন রায়ের ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা এইজন্য ; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টাও এই জন্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসত্য ও অন্যায়ের গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেন না, তাহার কারণ এই, অসত্য বা অন্যায়কে তিনি মানব-জীবনের পক্ষে এত হীনতা মনে করিতেন যে, তাঁহার চিত্ত তাহার চিন্তনেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিত। অনেকে জানেন, তিনি এক কথায় পাঁচশত টাকার চাকুরি ছাড়িয়াছিলেন। তাহার মূলে কি ? এই অদম্য, অনমনীয়, মনুষ্যত্ব। ডিরেক্টর তাঁহাকে এরূপ কিছু কাজ করিতে বলিলেন, যাহা তাঁহার বিবেচনায় সত্যানুগত নহে। তিনি সে কথা ডিরেক্টরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, ডিরেক্টর

শুনিলেন না। বলিলেন, "You must! You must!" এই শব্দদ্বয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনুষ্যত্বের উপরে জ্বলন্ত অয়োগোলকের ন্যায় পড়িল। তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না ; এ চাকুরি তাঁহার বিষবোধ হইতে লাগিল ; কেহই তাঁহাকে তাহাতে রাখিতে পারিল না। তৎপরে স্বয়ং লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া পুনরায় স্বীয় পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন, তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। লেপ্টন্যাণ্ট্ গবর্ণর যখন বলিলেন, "তোমার ব্যায়-নির্ব্বাহ হইবে কিসে ?" তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—"আপনি কি মনে করেন যে আপনাদের দ্বারস্থ না হইলে আমার দিন চলিবে না ? আপনি ভাবেন কি ? এই কলিকাতা সহরে আমি ৫্ টাকাতে দিন চালাইতে পারি।" তিনি আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলী রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার প্রধান কারণ রাজপুরুষদিগকে দেখান যে, তাঁহাদের দাসত্ব না করিয়াও তিনি সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ।

পূর্ব্বে যে বর্ত্তমানে অতৃপ্তি, ভবিষ্যৎ রচনা ও নিজ আদর্শে আসক্তি এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, যাহা মানব-প্রকৃতির গভীর রহস্য এবং যাহা মানব-জাতির মুখপাত্র স্বরূপ প্রত্যেক মহাজনে দৃষ্ট হইয়াছে, উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি হৃদয়ে যে ছবি দেখিতেন ও অন্তরের অন্তরে যাহা চাহিতেন, তাহার সহিত তুলনাতে বর্ত্তমানকে তাঁহার এতই হীন বোধ হইত, যে, বর্ত্তমানের বিষয়ে কথা উপস্থিত হইলে তিনি সহিষ্ণুতা হারাইতেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে যখন আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় খাটিবার শক্তি ছিল না; তখন এই অতৃপ্তি ভূগর্ভশায়ী প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় তাঁহার অন্তরে বাস করিতেছিল ; প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই ঐ অনল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বালারাশি প্রকাশ করিত। তাঁহার কোমল ও পরদুঃখ কাতর হৃদয়ে বর্ত্তমান সমাজের অসারতা, কৃত্রিমতা ও অসাধুতা এতই আঘাত করিত যে, বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তাঁহাকে যাতনাতে অস্থির করিয়া তুলিত।

এমন কি তিনি ক্ষোভে দুঃখে ঈশ্বরকে গালাগালি দিতেন একদিন তিনি কোন এক হতভাগিনী বিধবাকে দেখিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ; তখন তাঁহার পরিচিত কয়েক জন বন্ধু বসিয়াছিলেন , তাঁহারা তাঁহাকে উত্তেজিত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ; তিনি বলিলেন,—"এই জগতের মালিককে যদি পাই, তাহলে একবার দেখি ! এ জগতের মালিক থাক্‌লে কি এত অত্যাচার সহ্য করে ?" এই বলিয়া কিরূপে দুষ্ট লোকে ঐ বিধবাটির সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে, তাহা বলিতে লাগিলেন, ও দরদর ধারে তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। ফল কথা এই যে, তিনি যত সত্বর স্বদেশবাসীদিগকে অগ্রসর দেখিতে চাহিতেন, তাহারা তত সত্বর অগ্রসর হইবার লক্ষণ দেখাইত না বলিয়া, তিনি তাহাদের প্রতি অগ্নিদৃষ্টির ন্যায় বিরাগ বর্ষণ করিতেন।

বর্ত্তমানে অতৃপ্তির ন্যায় ভবিষ্যৎ-রচনার শক্তিও তাঁহার ছিল। তিনি নিজ অন্তরে ভাবী ভারতের কি ছবি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনও স্থানে সমগ্রভাবে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু দেশ মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণাদির চেষ্টা দ্বারা তিনি জানিতে দিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ভারতসমাজের একটি ছবি তাঁহার হৃদয়ে ছিল, তিনি সেই ছবির দিকে স্বদেশকে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ; এবং শীঘ্র যায় না বলিয়া সহিষ্ণুতা হারাইতেছিলেন। সে ছবিটির সমগ্র আয়তন ও পরিসর

নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই ; কিন্তু স্থূলতঃ তাহার মূলভাবটি নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে বর্ত্তমান সময়ের প্রত্যেক যুগ-প্রবর্ত্তক ব্যক্তির ন্যায় তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানে, আমরা জানি তাঁহার ন্যায় প্রতীচ্যজ্ঞানে অভিজ্ঞ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই ছিলেন। তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তকালয় তাহার প্রমাণ। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রতীচ্য দর্শন, বিশেষতঃ ফরাসি দেশ-প্রসিদ্ধ কোমৎ দর্শন বিষয়ে সর্ব্বদা বিচার হইত। একদিন বিচারান্তে বিদ্যাসাগর মহাশয় উঠিয়া গেলে, মিত্র মহাশয় উপস্থিত বন্ধুদিগকে বলিলেন, "বাবা রে একটা giant। দেখ্‌লে কেমন বুদ্ধি বিদ্যার দৌড়। মানুষটার যেমন heart তেমনি head !" এ কথা অবাধে বলা যায় যে, তিনি প্রতীচ্য সভ্যতার সকল বিভাগই সমুচিতরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতীচ্য জগৎ হইতে যে কিছু জীবনের আদর্শ পাইয়াছিলেন, তাহা প্রাচ্যভাব ও প্রাচ্যজীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করিতেন ; প্রাচ্য প্রীতি, ভক্তির উপরে প্রতীচ্য কর্ম্মশীলতা স্থাপন করিবার প্রয়াস করিতেন। এই প্রাচ্য প্রতীচ্যের একত্র সমাবেশের গুণেই তিনি বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র স্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের অদ্ভুত সমাবেশ করিয়া নবসাহিত্যের আবির্ভাব করিয়াছেন, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় মানব-চরিত্রের আদর্শে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমাবেশ করিয়া নবচরিত্র ও নবসমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। সে কার্য্য এখনও চলিতেছে ও পরেও চলিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা এখন চারিদিকেই বিদ্যালয় দেখিতেছি ; প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, শুনিতেছি ; আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, এই শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যখন নিজে পাশ্চাত্য জ্ঞানের আস্বাদন পাইলেন, তখন তাহা স্বদেশবাসীদিগকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গবর্ণমেণ্টকে প্ররোচনা দিয়া তাঁহাদের সাহায্যে স্থানে স্থানে মডেল স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। কি অসুবিধাতেই তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইয়াছিল ! না ছিল উপযুক্ত শিক্ষক, না ছিল উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক। নিজে পাঠ্য পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন ; এবং অনেক স্থলে টোলের পণ্ডিতদিগকে ধরিয়া ভূগোল জ্যামিতি প্রভৃতি কিনিয়া দিয়া পড়াইয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইয়াছে।

তিনি যে কেবল পুরুষদিগের মধ্যেই এই প্রতীচ্য জ্ঞানালোক বিস্তার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি বর্ত্তমান বীটন অথবা বেথুন স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও উক্ত কলেজে গিয়া বালিকাদিগকে বিধিমতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন দেশের নানা স্থানে বহুসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই বিষয়ে ডিরেক্টারের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হয় ; সেই মতভেদ হইতেই মনান্তর জন্মে। রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যজীবনে প্রতীচ্য জ্ঞানের সমাবেশ না হইলে দেশ উঠিবে না। অতএব বলিতেছি, তিনি বর্ত্তমানে অতৃপ্ত হইয়া নিজ মনে মনে একটা ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া তদভিমুখে স্বদেশকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

এ জগতে দুই শ্রেণীর লোকের দুই প্রকার ভাব দেখি। এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃতিতে শ্রদ্ধার মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক ; তাঁহারা অতীতের প্রতি এমনি শ্রদ্ধাসমন্বিত, যে, বর্ত্তমানের প্রতি যখনি তাঁহাদের অতৃপ্তি জন্মে, তখনি তাঁহারা আবেগের সহিত অতীতের দিকে যাইতে

চান। তাঁহাদের চিত্ত অতীতের দ্বারেই ঘুরিয়া বেড়ায় ; অতীতের চিন্তার মধ্যেই তাঁহারা বাস করিতে ভালবাসেন। অপর শ্রেণী সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের দিকে মুখ ফিরিয়া রহিয়াছেন ; ভবিষ্যতের মধ্যেই তাঁহারা বাস করেন ; আশার চক্ষে ভবিষ্যৎকে দেখেন ও সেই দিকে স্বদেশ ও স্বজাতিকে লইতে চান। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শাক্য, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ইদানীং কালে রামমোহন রায় এই প্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায়, এই প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগেরই মানব-মনের উপরে সমধিক প্রভাব হইয়া থাকে। কারণ আশার অপেক্ষা ভাল জিনিষ আর নাই। যে মানুষকে আশা দেয়, সেই জীবন দেয়। যিনি বলেন তোমরা এখন মলিন বটে, কিন্তু চিরদিন মলিন থাকিবে না ; তোমাদের জন্য শুভদিন আসিতেছে, চল তদভিমুখে অগ্রসর হই ; তিনি আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আমরা এরূপ সেনাপতির বিজয়-বৈজয়ন্তীর তলে দাঁড়াইতে ভালবাসি। এ জীবন যেন রণ-ক্ষেত্রের ন্যায়। এখানে আমরা সহস্র প্রকার প্রতিকূলতার মধ্যে স্বীয় স্বীয় জীবনের আদর্শসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছি ; নিরন্তরই আশা নিরাশার আন্দোলনে দুলিতেছি ; বিষাদ ও অনুশোচনার যাতনা সহিতেছি ; অতি বলবান্ হৃদয়ও এই কঠোর সংগ্রামে সময়ে সময়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। যখন আমরা নির্জ্জনে জীবনের ভার বহনে ম্লান ও ম্রিয়মাণ হই, তখন যদি কোনও বলবান্ পুরুষের আশাজনক বাণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, যদি শুনিতে পাই একজন বলিতেছেন, অগ্রসর হও ! অগ্রসর হও ! ভয় নাই, জয়শ্রী সম্মুখে ; তাহা হইলে আমাদের অবসন্ন মনে তড়িত-প্রবাহ প্রবাহিত হয় ; আমরা স্বতঃই তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হই। এইরূপ বিক্রমশালী ও আশাপূর্ণ ব্যক্তিরাই মানব-সমাজের নেতৃস্থান অধিকার করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় তেজস্বী পুরুষকে একবার দেখাও পরমলাভ ; একবার দেখিলে তাহা চিরজীবনের শক্তির উৎস হইয়া থাকিতে পারে।

এই সকল চরিত্র জাতীয় সম্পত্তি। ইঁহাদিগকে জন্ম দিবার জন্য জাতিকে উচ্চ হইতে হয় এবং ইঁহারা জন্মিয়াও জাতিকে উচ্চ করিয়া তোলেন। ইঁহারা যখন অন্তর্হিত হন, তখন উত্তরাধিকারসূত্রে ইঁহাদের চরিত্র-সম্পত্তি পাইয়া আমরা ধনী হই। ইঁহাদের চরিত্রের গুণাবলী অজ্ঞাতসারে আমাদের আত্মার অস্থি মজ্জাতে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে উচ্চতর ভূমিতে লইয়া যায়। বিধাতার এই সত্যময় রাজ্যে এক কণা খাঁটি জিনিষ নষ্ট হয় না। কেহ কি এরূপ মনে করেন যে, যদি আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটিও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন না করি বঙ্গ-সমাজ বিদ্যাসাগরহীন হইবে ? তাহা কি সম্ভব ? বিদ্যাসাগরকে জন্ম দিয়া বঙ্গভূমি উঠিয়াছে, আর কে তাহাকে নামাইতে পারে ? বহুক না কেন প্রতিকূল স্রোত, কিছুদিন বহিতে দেও, যে মহৎ চরিত্রের কার্য্য আবার দেখিতে পাইবে। রামমোহন রায়েরও কোনও স্মৃতিচিহ্ন নাই, কিন্তু তাঁহার জীবন কি বিফলে গিয়াছে ? অপেক্ষা কর, দেখিবে অচির কালের মধ্যে রামমোহন রায় ভারতাকাশে উজ্জ্বলতাতে প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্ররূপে শোভা পাইবেন

আবার বলি, যাঁহারা মননের দ্বারা জীবিত থাকেন, তাঁহারাই সার্থক জীবিত, তাঁহাদের চরিত্র জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত হয়। তাঁহাদিগকে লইয়াই জাতির গৌরব। যেমন দূর হইতে হিমালয়ের ক্ষুদ্র পাদশৈল সকল ভাল করিয়া দেখা যায় না, কিন্তু চিরতুহিনাবৃত শৃঙ্গরাজি লক্ষিত হইতে থাকে, এবং হিমালয়ের মহত্ত্ব জ্ঞাপন করে; তেমনি অপর জাতি সকল দূর হইতে এই সকল অসাধারণ পুরুষের আলোকমণ্ডিত মস্তক দর্শন করিয়া জাতিগত

মহত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকে। ইঁহাদিগকে বুঝিতে পারা এবং সমুচিত শ্রদ্ধা দিতে পারাও মহত্ত্বে উঠিবার সোপান স্বরূপ।

আমরা বালককালে লোকের মুখে শুনিতাম, চোরেরা তৈলাক্ত হইয়া গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করে, যদি ধরা পড়ে যেন পিছলিয়া পলাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই এক শ্রেণীর পবিত্রচেতা মানুষ যেন তৈলাক্ত হইয়া এ সংসারে প্রবেশ করেন। তাঁহারা এখানকার পথে গতায়াত করেন, অথচ, এখানকার কর্দ্দম পঙ্ক তাঁহাদিগের আত্মাতে লাগে না, এবং এখানকার পাপ প্রলোভনে ধরিলেও তাঁহারা পিছলিয়া পলাইয়া যান। যাহা সৎ তাহার আচরণ করাই ইঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, যাহা অসৎ তাহা ইঁহারা দেখিয়াও দেখিতে পান না। সকল সাধুভাব, সকল মঙ্গলভাব, স্বাভাবিকরূপেই ইঁহাদের অন্তরে আশ্রয় পায়! অসাধুভাব এসকল হৃদয়ে প্রবেশের দ্বার পায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি যখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পিতার সহিত বাস করেন, আর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি সংসার হইতে অবসৃত হইলেন, এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি জীবনের কত পথেই ভ্রমণ করিয়াছেন, কত প্রলোভনের সহিত সাক্ষাৎকার হইয়াছে, কত পাপের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে শিশুর ন্যায় সরল, অকপট, হৃদয়টি লইয়া চলিয়া আসিলেন! ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়! তাঁহার যৌবনকালে কলিকাতার কি ভয়ানক অবস্থা ছিল! আমরা বাল্যকালে এই কলিকাতা সহরকে যাহা দেখিয়াছি, তাহা এখন স্মরণ করিতেও হৃদয় কম্পিত হয়। তিনি কিরূপে এই সহরে নানা অবস্থার মধ্যে বাস করিলেন, অথচ পাপপঙ্ক তাঁহার আত্মাতে লাগিল না? এরূপ ধর্ম্মে অনুরাগ কিরূপে রাখিলেন, যাহাতে তাঁহার চিত্তটি চিরদিন সরল ও সত্যানুরাগী রহিল? জীবনের মহৎ লক্ষ্যের প্রতি ঐকান্তিক অভিনিবেশ ইহার কারণ। প্রত্যেক মহামনা ব্যক্তির জীবনে এই ঐকান্তিক অভিনিবেশ দেখিয়াছি। যে আকাশের তারার দিকে চাহিয়া পথ চলে, সে কি পথের দুই ধারে কি আছে, তাহার সংবাদ পায়? তেমনি যাঁহারা ধর্ম্মের মহা নিয়মের প্রতি দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিয়া এই সংসারে পথ চলিয়া থাকেন, এখানকার পাপ প্রলোভন কি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয়? আমরা সকলেই চলিবার সময় নীচের দিকে দেখি, আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে দুই চারি জন তারা-দেখা লোক না জন্মিলে আমাদের গতি কি হইত? আমি নির্জ্জনে বসিয়া যখন এই তারা-দেখা লোকদিগের বিষয় ভাবি, তখন মন বড়ই উচ্চ হয়। এই সকল মানুষের চরিত্র যেন কস্তুরীর ন্যায়, ইঁহারা যাহাকে স্পর্শ করেন তাহাতেই সুবাস মাখাইয়া দিয়া যান। চিন্তা করিয়া দেখ বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদেশে কি সৌরভ মাখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, যাহাতে আমাদের চিত্ত ভরপুর হইয়া রহিয়াছে! পৃথিবীর হাতে এমন কোনও রজ্জু নাই যাহাতে এই তারা-দেখা লোকদিগকে বাঁধিতে পারে। ইঁহারা মুক্ত জীব। ইঁহারা গৃহধর্ম্ম করিয়াছেন, বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াছেন, সংসারের ভাবনা চিন্তা সকল বোঝাই বহিয়াছেন, অথচ যেন পদ্মপত্রের জলের ন্যায় এখানে বাস করিয়াছেন; কিছুতেই আসক্ত হন নাই। ভগবদ্গীতার উপদেশ স্বাভাবিক ভাবে ইঁহাদের জীবনে ফলিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্যত্বের মহৎ আদের্শর প্রতি অবিচলিত দৃষ্টিই এই অনাসক্তির কারণ। তুমি যদি চরিত্রের মহত্ত্ব সাধনকেই আপনার জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে কর এবং জীবিকার উপায় সকলকে উপলক্ষ্য মনে কর, তাহা হইলে সেই উপলক্ষ্যগুলি আর তোমাকে বাঁধিতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে তাহাই ঘটিয়াছিল।

রামমোহন রায়ের ন্যায় তাঁহার মনের সর্ব্বতোমুখীন গতি ছিল। রামমোহন রায় যেরূপ প্রধানতঃ ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে রত থাকিলেও, সমাজসংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, সাহিত্যের সৃষ্টি, রাজনীতির আন্দোলন প্রভৃতি সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ দেশের হিতকর সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ

সর্ব্বতোমুখ স্বদেশপ্রিয়তা প্রায় দেখা যায় না। এক সময়ে ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি একসময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংযুক্ত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। ক্রমে নানা কারণে সে সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে চিরদিন জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য যে বিভাগে যখনি সাহায্যের প্রয়োজন হইত, তখনি সে বিষয়ে সহায়তা করিবার নিমিত্ত তিনি বদ্ধপরিকর হইতেন। তাঁহার প্রণীত "বেতাল পঞ্চবিংশতি" প্রথমে সুমিষ্ট সুললিত বাঙ্গালা রচনার প্রণালী প্রদর্শন করিল। তৎপরে বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, বঙ্গভাষা সে দশা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সেই পুরাতন সংস্কৃতের ছায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ে নূতন পথপ্রদর্শকের মহিমা কি কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে? তাঁহার "সীতার বনবাসের" বাঙ্গালা কি আমরা কখনও ভুলিতে পারিব? বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবের উপসংহারভাগ মরণের দিন পর্য্যন্ত কি আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইবে না? আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গভাষা কি পরিমাণে যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ঋণী, তাহা কি নির্দ্দেশ করা যায়? একদিকে তিনি যেমন বিশুদ্ধ, কোমল, হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অপরদিকে বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিয়া শিক্ষার বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন দেখিলেন, গবর্ণমেণ্টের মনোগত অভিপ্রায় উচ্চশিক্ষাকে কতিপয় সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ রাখা, এজন্য তাঁহারা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করিতেছেন, অথচ অনুভব করিলেন যে, এই উচ্চশিক্ষাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদের জীবিকা অর্জ্জনের ও মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায়, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বালকদিগের উচ্চশিক্ষার্থ নিজ ব্যয়ে নিজ বাসগ্রামে ট্রান্স স্কুল ও কলিকাতায় মেট্রপলিটান কলেজ স্থাপন করিলেন। এজন্য তাঁহাকে কত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। একদিকে তিনি যেমন শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইলেন, অপরদিকে দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। স্বর্গগত প্যারীচরণ সরকার মহাশয় যখন সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার একজন প্রধান সহায় ও উৎসাহদাতা ছিলেন। হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকার প্রথম সম্পাদক খ্যাতনামা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, পরলোকগত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবার পরিজনের নিকট হইতে পেট্রিয়ট কিনিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে ঐ পত্রিকা অবসন্ন দশাপ্রাপ্ত হইয়া যখন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তখন তিনি মধ্যে পড়িয়া উহার সম্পাদকতা ভার কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম উদ্যমে কৃষ্ণদাস পাল সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শের অনুগত হইয়া চলিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তাতেই তিনি স্বকর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন কয়েকজন ভদ্রলোক উদ্যোগী হইয়া "হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড" স্থাপন করেন, যদ্দ্বারা বহুসংখ্যক পরিবার উপকৃত হইতেছে, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার একজন উৎসাহদাতা ছিলেন এবং এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ফলকথা এই, তিনি যে কার্য্যে দেখিতেন দেশের কিছু কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, তাহাতেই সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন। তাঁহার অর্থ ও সামর্থ্য সে কার্য্যে লাগিত। তাঁহার স্বদেশানুরাগ যেমন সর্ব্বতোমুখীন ছিল, তাঁহার বন্ধুতা, আতিথ্য, সৌজন্য সমুদায় সেইরূপ সর্ব্বতোমুখীন ছিল। তাঁহার প্রীতি ও দয়া জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি ধাবিত হইত। কোন কোন ইংরাজের সহিত তাঁহার এতদূর প্রীতি হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে তিনি পরম মিত্র বলিয়া জানিতেন। ইংরাজেরা সচরাচর এদেশীয়দিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে যিনি একবার দেখিতেন, তিনিই সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার ব্যবহারে এমন

একটা আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান থাকিত, এমন একটা নিজ চরিত্রের গুরুত্ব ও গৌরবের প্রকাশ পাইত, যে, তাঁহারা তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা দেখিতেন, বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ পুরুষ, স্বার্থসাধনের মানসে তাঁহাদের দ্বারস্থ হন না, পরার্থের জন্যই তাঁহাদের সাহায্য চান, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। দুটি জিনিসকে ইংরাজেরা বড়ই ঘৃণা করেন, প্রথমতঃ স্বার্থসাধনার্থ বন্ধুতা, দ্বিতীয় 'না' বলিবার সাহসের অভাব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে উক্ত উভয় দোষের কোনটিই ছিল না। তাঁহার মত নিঃস্বার্থ প্রকৃতির পুরুষ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সততই 'না' কথাটা বলিতে সাহসী হইতেন। এজন্য ইংরাজগণ তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের সহিত মিশিবার সময়ে তিনি পূর্ণ মাত্রায় আত্ম-সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার চিত্তে আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান এতদূর প্রবল ছিল যে, তাঁহার কর্ম্মত্যাগের কয়েক বৎসর পরে বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের ব্যয়ভারে তিনি যখন ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তৎকালীন লেপ্টন্যাণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে আবার কর্ম্ম লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে সময়ে একবার তাঁহার প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের কর্ম্ম লইবার কথা হয়। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে লিখিয়াছিলেন যে, যদিও তিনি ঋণদায়ে ব্যতিব্যস্ত, তথাপি ইংরাজ প্রোফেসারদিগের অপেক্ষা অল্প বেতন দিলে কখনই উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পারেন না। ঘোর ঋণদায়ে যখন বিব্রত তখনও তাঁহার আত্মসম্মান-জ্ঞান এত উজ্জ্বল! এই জন্যই তিনি বঙ্গসমাজের শিরোভূষণ হইতে পারিয়াছিলেন।

এই তো গেল তাঁহার চরিত্রের প্রধান প্রধান সদ্গুণের কথা ; কিন্তু যে গুণের জন্য তিনি দেশের লোকের নিকটে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহার উল্লেখ এখনও করা হয় নাই। তাহা তাঁহার ভুবনবিখ্যাত দয়া। এ বিষয়ের অসংখ্য গল্প দেশে প্রচলিত আছে। সে সকলের উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইবে এবং তাহা আমার সাধ্যায়ত্তও নহে। তবে তাহার দয়া যে কিরূপ জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলিঙ্গন করিত তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। এক বার মান্দ্রাজ প্রদেশীয় দুইটি ভদ্র ঘরের ছেলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার আশয়ে বোম্বাই সহরে যায়। সেখান হইতে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ তাহাদিগকে কলিকাতাতে আনয়ন করেনন। কলিকাতাতে আসিয়া তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এ দিকে তাহারা জাতিভ্রষ্ট, স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেও হঠাৎ যাইতে পারে না। খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণও তাহাদের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন সভার অধিবেশনের দিন সেখানে গিয়া কলিকাতার দলপতি বাবুদিগকে ধরিল। তাঁহারা কেহ দুই টাকা, কেহ এক টাকা, এইরূপে কয়েক টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিলেন। দুই জনের অভাব পক্ষে চৌদ্দ পনর টাকা চাই, তাহার মধ্যে ৮/১০ টাকা স্বাক্ষরিত হইল। যাহা স্বাক্ষরিত হইল, তাহাও আদায় হয় না ; এক এক স্থানে দুই চারি বার যাইতে যাইতে তাহাদের সমুদয় সময় যাইতে লাগিল, পড়াশুনা এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। এই অবস্থাতে তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারে উপস্থিত হইল। তিনি তখন মাতৃশোকে কাতর হইয়া চিৎপুরের এক নির্জ্জন উদ্যানে একাকী বাস করিতে ছিলেন। সেখানে তাহারা উপস্থিত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদিগকে দেখিয়া ও তাহাদিগের সহিত কথা কহিয়াই জানিতে পারিলেন যে, তাহারা ভদ্রঘরের সন্তান। তৎপরে যখন শুনিলেন যে, দশটি টাকা স্বাক্ষর করাইয়া তাহারা প্রায় এক মাস কাল দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে, তখন ক্ষোভে ও ক্রোধে পূর্ণ হইয়া তাহাদের চাঁদার বহিখানি ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা গিয়া পড়াশুনা কর, প্রতি মাসের

২রা কি ৩রা তোমাদের জন্য ১৪টি টাকা ও দুই জোড়া কাপড় তোমাদের বাসাতে যাইবে।" তাহারা যত দিন এখানে ছিল, ততদিন এই মাসিক ১৪টি টাকা ও দুই জোড়া কাপড় তাহাদের জন্য আসিত। সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার হৃদয় কি প্রশস্ত ও উদার ছিল!

সর্ব্বশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি প্রধান গুণের উল্লেখ করিতেছি, সেটি তাঁহার অকৃত্রিমতা। হায়! হায়! এমন স্পৃহণীয় অকৃত্রিমতা আর কোথাও দেখিব না। প্রকৃতির হাতে গড়া এমন আভাঙ্গা মানুষটি প্রায় পাওয়া যায় না। যে দুঃসময়ে আমরা পড়িয়াছি, তাহাতে এরূপ চরিত্রের মূল্য বড় অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে। কি কৃত্রিমতার মধ্যেই আমরা পড়িয়াছি! নব্য শিক্ষিতদিগের ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে চাই, মুখে নিষ্ঠা ভক্তির ছড়াছড়ি! সংবাদপত্রে স্বধর্ম্মানুরাগের ভোর জোয়ার, বক্তৃতাতে সংসার-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু কার্য্যে অসারের অসার, অন্তঃসারবিহীন, আস্থাবিহীন, নিষ্ঠাবিহীন আচরণ। নব্য শিক্ষিতদিগের সমাজের দিকে চাই, কোথায় মনুষ্যত্ব, কোথায় গাঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কোথায় প্রকৃত ধর্ম্মভীরুতা! নব্য শিক্ষিতদিগের সাহিত্যের দিকে চাই, তাহা সাবানের ফেনা, ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া তুলিতেছে; ভাষার চটকে তাক লাগাইয়া দিতেছে; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রসাদে, বঙ্গভাষাকে সাজাইয়া, গুছাইয়া, মনোমোহিনী করিয়া, রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করিতেছে; কিন্তু তন্মধ্যে মনুষ্যোচিতে প্রতিজ্ঞা নাই; জীবন্ত ভাষায় জীবন্ত হৃদয়ের জীবন্ত ভাব নাই; স্বকর্ত্তব্য সাধনে যাঁহারা প্রাণ মন দিয়াছেন এমন মানুষের উক্তি নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবের উপসংহার ভাগ পাঠ কর, অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ভূমিকা পড়িয়া দেখ, সোমপ্রকাশের পুরাতন ফাইল খুলিয়া দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের উক্তি সকল পাঠ কর, ইঁহারা কেহই লঘুচেতা লোক ছিলেন না। প্রাণে আগুনের মত যাহা জ্বলিয়াছে, ভাষা তাহাই উদ্গীরণ করিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যের সেই সকল অংশের সহিত বর্ত্তমান সময়ের ফাঁপা, ফোলা, ফেনান সাহিত্যের তুলনা কর, চক্ষে জল আসিবে; বলিবে, কি মানুষের হাত হইতে কি সব মানুষের হাতেই পড়িয়াছি! চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গিয়া খদ্যোতের আলোকের উপরে নির্ভর করিতেছি! বাগ্‌দেবীর বীণাধ্বনির পরিবর্ত্তে যেন চৈত্র মাসের ঢক্কার ধ্বনি শুনিতেছি! এরূপ অসার সাহিত্য অসার খাদ্যদ্রব্যের ন্যায়, বহুমাত্রায় আহার করিলে অল্পমাত্রায় উপকার হয় এবং জাতিটা স্ফীতোদর হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

এই অসারতা ও কৃত্রিমতার উপর হইতে চক্ষু তুলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অকৃত্রিম চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি স্পৃহণীয়ই বোধ হয়। প্রকৃতির হাতে গড়া আভাঙ্গা মানুষ; কৃত্রিমতা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। তোমরা দশজনে তাঁহাকে কি দেখিবে ও কি বলিবে তাহা তাঁহার মনেই হইত না। তিনি গিরিপৃষ্ঠজাত, অযত্নসম্ভূত, প্রকাণ্ড ওক্‌বৃক্ষের ন্যায় শৈবালরাশিতে আকীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সে তরু বাবুদের বাগানে থাকিবার উপযুক্ত নহে; কিন্তু তাঁহার সেই স্বভাবজাত বন্ধুরতার মধ্যেও এক প্রকার গাম্ভীর্য্য-সম্বলিত মনোহারিত্ব ছিল। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভালবাসিতাম যে, তাঁহাতে তাজা খাঁটি, ষোল আনা মানুষটি পাইতাম। তাঁহার সকল বৃত্তিই সতেজ ও উৎকট ছিল, ভালবাসাটাও উৎকট, বিদ্বেষটাও উৎকট। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে ভালবাসিতেন প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। তাঁহার বন্ধুতা, বাৎসল্য, দয়া, সমুদয় সতেজ ছিল। এমন প্রেমিক

বন্ধু বঙ্গদেশে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি জানি না। রামতনু লাহিড়ী, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে, কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ের প্রিয় যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার যে অবিচলিত প্রেম দেখিয়াছি, ভাষাতে তাহার বর্ণনা হয় না। বন্ধুগণকে ভালবাসিয়া, উপহার দিয়া, খাওয়াইয়া, তাঁহার কখনই তৃপ্তি হইত না। তাঁহার বন্ধুগণ পরলোকগত হইলেও তাঁহার প্রেম তাঁহাদের পরিবার পরিজনকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিত। ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। তাঁহার একজন প্রিয় বন্ধু পরোলকগত হইলে, তিনি তাঁহার পরিবার পরিজনকে আপনার জ্ঞান করিতেন। একবার তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার বন্ধুর কন্যা উন্মাদ রোগগ্রস্তা হইয়া এই খেয়াল ধরিয়াছেন, যে, বিদ্যাসাগর খাওয়াইয়া না দিলে খাইব না ; সেই জন্য তিনি অনাহারে আছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা শুনিয়া, তাঁহার বিবিধ কাজের মধ্যে সময় করিয়া, ঐ বন্ধুর কন্যাকে দুই বেলা খাওয়াইতে যাইতেন। এরূপ অনেক দিন করিতে হইয়াছিল। সকল বিষয়েই এইরূপ। এরূপ মাতৃভক্ত কে কবে দেখিয়াছে? তাঁহার আরাধ্যা জননী দেবীর স্বর্গারোহণ হইলে, নিকটের লোকে প্রায় দুই তিন বৎসর কাল সতর্ক থাকিতেন, তাঁহার সহিত কথোপকথনে তাঁহার জননীর উল্লেখ করিতেন না ; কারণ তাহা হইলে তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার প্রেম যেমন তেজস্বী ছিল, বিদ্বেষও তেমনই তেজস্বী ছিল। যাহার স্বভাব চরিত্র দেখিয়া একবার চটিতেন, তাহার নাম আর শুনিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার এই আশ্চর্য্য মহত্ত্ব ছিল যে, বিপদে পড়িলে সেই সকল ব্যক্তির সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। একবার কলিকাতার একটি ধনী পরিবারের একটি যুবক স্বীয় পিতার সহিত বিরোধ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যায়। উক্ত যুবকের পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন বন্ধু ছিলেন। সে স্বীয় পিতার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়া গিয়াছিল, তাহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ যুবকের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। ঐ যুবকের সহিত বালককালে আমার আত্মীয়তা ছিল। কিছুকাল পরে আমি যখন বি, এ ক্লাশে পড়ি, তখন ঐ যুবক হঠাৎ একদিন স্ত্রী ও পুত্র সমভিব্যাহারে আমার ভবনে আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম সে কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত। আমি তাহাকে স্বীয় ভবনে রাখিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। পীড়ার উপশম না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে আমরা তাহার জীবনাশা পরিত্যাগ করিলাম। সেই সময়ে সে একদিন আমাকে বলিল,—"যদি পার আমার পিতাকে আনিয়া একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেও ; আমি তাঁহার কাছে মার্জ্জনা চাহিব।" এই অনুরোধটা আমার মনে বড়ই লাগিল। অথচ তাহার পিতার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। কাহার সাহায্যে এই ঘটনা সংঘটিত করি, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। শেষে নির্দ্ধারণ করিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরাণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গতি নাই। তাঁহার কোপের কথা জানিতাম, তথাপি তাঁহার ভালবাসার প্রতি নির্ভর করিয়া, আব্দার করিয়া ধরিব ভাবিয়া, তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রে, কি মনে করে?" আমি বলিলাম,—"একটা অনুরোধ করতে এসেছি, কিন্তু বলতে ভয় করছে।" তিনি অভয় দান করিলে অনুরোধটি জানাইলাম। এত ত অভয় দিয়াছিলেন, তথাপি তাহার নাম শুনিবামাত্র মনের আবেগ রক্ষা করিতে পারিলেন না ; আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"তুই এরূপ লোকের সঙ্গে বন্ধুতা রাখিস্, যাকে দেখলে জুতাতে ইচ্ছে করে! তার অনুরোধ আমার কাছে আনিস্! আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।" আমি সেই কুপিত সিংহের গর্জ্জনে ভীত ও স্তব্ধ

হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। শেষে বলিলাম,—"যদি মহাশয়ের দ্বারা না হয়, তবে আর কাহারও দ্বারা হবে না ; তবে বুঝলাম মানুষটার মৃত্যুকালের অনুরোধ রাখতে পারলাম না।" আমার মুখ দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিলেন আমি দুঃখিত অন্তরে তাঁহার ঘর পরিত্যাগ করিতেছি। উঠিবার সময় বলিলেন,—"বোস্, যাস্ নে, কাল প্রাতে ৮টার সময় তার বাপকে তোর বাড়ীতে আনবো, তুই ঘরে থাকিস্।" তৎপরে যে করিয়া তিনি সেই গর্ব্বিত ধনী পিতাকে আমার ভবনে ধরিয়া আনিলেন, তাহা বলিবার নয় ; অপর কাহারও সাধ্যে তাহা হইত না। পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ ও মিলন হইয়া গেলে তাঁহার মুখে আমি আশ্চর্য্য সন্তোষের লক্ষণ দেখিলাম। তিনি আমাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন,—"ওর স্ত্রীর হাতে ত কিছু নাই, দেখিস্ ওর চিকিৎসার যেন ত্রুটি হয় না, আর ওর স্ত্রী পুত্রের যেন ক্লেশ হয় না। এই দশটা টাকা রাখ্, ওর স্ত্রীকে দিস্, আর প্রয়োজন হলে আমাকে জানাস্, তুই যেন ঋণগ্রস্ত হোস্ নে।" আমি সে দিনের কথা কি জীবনে ভুলিব ? তেমন তাজা মানুষ আর দেখিব না। তিনি তাঁর কোনও প্রবৃত্তিকেই যেন কখনও রোধ করেন নাই ; সকলেই পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়াছিল। নিকটে গেলেই দোষে গুণে জড়িত আসল মানুষটি দেখিতাম, এই জন্যই তাঁহার চরিত্র চিন্তা করিতে ভাল লাগে। আমরা একবার একটি বিধবা বিবাহ দিয়া কিছুদিন সমাজের পরিত্যক্ত হইয়াছিলাম। তখন তিনি আমাদের বাসাতে প্রায় আসিতেন। আমাদের বাসার একটি যুবক তাঁহার মুখের উক্তি বলিয়া একটি কথা প্রচার করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর বলিলেন,—"ওরূপ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হতেই পারে না।" সে বলিল,—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে নাই, উনি কিন্তু ও কথা বলেছেন।" এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য অর্থাৎ সেই বালকের সঙ্গে ঝগড়া করিবার জন্য, একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাসাতে আসিলেন। আসিয়া তুমুল ঝগড়া করিলেন। সে যুবকও নিজের গোঁ ছাড়িল না। তিনি তাহাকে কতকগুলা কটূক্তি করিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই ফিরাইতে পারিলাম না। বৈকালে আমরা সকলে সেই যুবককে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া মাপ চাহিবার জন্য তাঁহার নিকটে প্রেরণ কবিলাম। সে গিয়া বসিয়া আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন ; আসিয়াই তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"মাপ চাইতে এসেছিস্ বুঝি ? আরে দুদিন সবুর কর্ ; প্রাতে রেগে এসেছি, দুদিন যাক্, রাগটা একটু পড়ুক !" কি অমায়িক ! কি অকৃত্রিম ! কি মহামনা মানুষ ! একবার এক বিধবা বিবাহের নিমন্ত্রণ সভাস্থলে তাঁহার একজন বন্ধু নিজের একটি সপ্তম কি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকাকে আনিয়া তাঁহাকে প্রণাম করাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"বেঁচে থাক মা, বিয়ে হোক্, বিধবা হও, আমি আবার বিয়ে দি।" এই আশীর্ব্বাদ শুনিয়া সভাস্থ সকলে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"আরে, আমার বন্ধুদের মেয়েরা বিধবা না হলে আমি বিবাহ দেব কার ?" তাঁহার কাজ কর্ম্ম, আলাপ পরিচয়, আমোদ প্রমোদ, সকলের মধ্যে এমন এক অকৃত্রিমতা দেখিতাম, যাহা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা মানুষ, আমরা আসল মানুষ ধরিতে পারিলে বড় সুখী হই। এইজন্য বড় লোকদিগের জীবন-চরিত পাঠ করিবার সময় তাঁহারা দশের মাঝে কি কাজ করিয়াছিলেন, প্রকাশ্য সভায় কি বলিয়াছিলেন, উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য অত ব্যগ্র হই না ; কিন্তু গৃহে, পরিবারে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কি করিয়াছিলেন বা কি বলিয়াছিলেন তাহা শুনিতে ভালবাসি ; কারণ সেখানে আসল মানুষটি ধরিতে পারা যায়। আমাদের যে

এই আসল মানুষ দেখিবার কামনা, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ে সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইয়াছিল।

পরিশেষে যে উক্তি স্মরণ করিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহাই পুনঃ স্মরণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে যাইতেছি। ঋষি ঠিক্ কথা বলিয়াছেন, মননের দ্বারা যে জীবিত থাকে, সেই প্রকৃত ভাবে জীবিত। জীবনের ধনধান্য লইয়া জীবন নহে, কে কত উপার্জ্জন করে, কে কত সঞ্চয় করে, তাহা লইয়া জীবনের বিশালতা ও বিস্তৃতি নহে; কিন্তু কে-কি চিন্তা করে, কে কি আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে, কে কি আদর্শ অনুসারে চলে, তাহা লইয়াই জীবনের বিচার। দৈহিক জীবনের ঘটনা সকল আজ আসে, কাল চলিয়া যায়; সুখ বা দুঃখ চিরদিন থাকে না; সম্পদ্ বিপদের মুখ সকলকেই দেখিতে হয়; বঙ্গের প্রিয় কবি মধুসূদন বলিয়াছেন;

"চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে!"

জীবন-নদীর নীর স্থির থাকে না; কত অবস্থাই আসিতেছে, কত অবস্থাই যাইতেছে; কিন্তু সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্, ঘটনা অবস্থা কেহই বৃথা আসে যায় না। কিছু রাখিয়া যায়, কিছু গড়িয়া যায়, কিছু লইয়া কিছু দিয়া যায়। লইয়া যায় জীবনের শক্তি, দিয়া যায় চরিত্র। মানুষ এ জগতে ভাবিয়া, চিন্তিয়া, হাসিয়া, কাঁদিয়া, উঠিয়া, পড়িয়া, খাটিয়া একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইতেছে সেটা তার চরিত্র। সেটী অনিত্যের মধ্যে নিত্য, মৃত্যুর মধ্যে অমরধর্ম্মী, সেইটিই মানুষের সঙ্গে যায়। হে মানুষ! এজগতে তুমি কি হইয়া দাঁড়াইবে তাহাই তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা, তাহাই আলোচ্য; তুমি কি খাইবে বা কি পরিবে, তোমার গৃহিণীর অঙ্গে দুইখানা অলঙ্কার থাকিবে কি দশ খানা অলঙ্কার থাকিবে, সেটা সামান্য কথা, তাহা আলোচ্যের মধ্যে নহে। তুমি দেখ, তুমি কি দাঁড়াইতেছ, জগতের পট যে তোমার চারিদিকে প্রসারিত রহিয়াছে, তাহাতে তোমার কি ছবি পড়িতেছে? এই চরিত্র-পদার্থ যাঁহাদের সাধনার বিষয় হয়, তাঁহারা মনন-রাজ্যেই বাস করেন এবং দেহ-রাজ্যকে সামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় এক হস্তে যেমন হাজার হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন, তেমনি আর এক হস্তে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত মত ধনাগমের একটা উপায় করিতেন, কিন্তু আপনার চরিত্রকে সর্ব্ব প্রযত্নে বাঁচাইতেন। থাক্ ধর্ম্ম যাক্ পদ, থাক্ ধর্ম্ম যাক্ অর্থ, থাক্ ধর্ম্ম যাক্ বন্ধুতা, এই কথা সর্ব্বদাই বলিতেন। ইহা বলিতে না পারিলেও এ জগতে চরিত্রবান্ হওয়া যায় না। ঝড় উঠিলে কৃপণ আপনার বাক্সটা লইয়া পলায়, জননী আপনার শিশুটিকে লইয়া পলায়, যেটি যার প্রিয় তাহাকেই সে বাঁচাইবার চেষ্টা করে; বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তি বিপদের ঝড়ে সর্ব্বাগ্রে আপনার চরিত্র বাঁচাইবার চেষ্টা করেন. ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া পলান, কারণ ধর্ম্মই তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এইরূপ চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ যে দেশে উত্থিত হন সে দেশ ত্বরায়-মহত্ত্ব ও গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর করুন, আমাদের দেশ সেই গৌরব-পদবীতে উন্নীত হউক। এইরূপ সোজা-পথে চলা, তারা-দেখা ও আলেয়ার পিছে ছোটা মানুষ আমাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে আসুন।

কর্ম্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

'কর্ম্মাটাড়' শব্দের অর্থ—করমা নামে একজন সাঁওতাল মাঝি ছিল, তাহার টাঁড় অর্থাৎ উঁচু জমি যাহা বন্যায়ও ডুবিয়া যায় না। এখন কর্ম্মাটাঁড়ে একটি ই· আই· আর· লাইনের এই ষ্টেশন হইয়াছে। উহা জামতাড়া ও মধুপুর ষ্টেশনের মধ্যে। ১৮৭৮ সালে ষ্টেশনের পাশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বাংলা ছিল। বাংলাটিতে দুটি হল, চারটি ঘর ও দুটি বারাণ্ডা ছিল; বাংলার চারিদিকে একটি চারচৌরশ জমি, চার-পাঁচ বিঘা হইবে,—সেইটি বাগান; বাগানটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা দেশ হইতে আঁবের কলম আনিয়া পুঁতিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি লতানে আঁব গাছ ছিল; বিদ্যাসাগর মহাশয় গাছগুলির বিশেষ যত্ন করিতেন। বাগানে আরও নানা রকমের গাছ ছিল। বাগানের বাহিরে গোটাকতক সেকেলে অশ্বত্থগাছ ছিল। তখনকার ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় ওখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন—I am the monarch of all I survey—বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মাটাঁড়ে যাওয়ায় তাঁহার আধিপত্যের একটু ক্ষতি হইয়াছিল, তাই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সুনজরে দেখিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম প্রথম তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন কিছু হইল না, তখন তিনি নন-কোঅপারেশন করিয়া বসিলেন।

আমি ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ যাই। এখানে আমার সর্ব্বদা ম্যালেরিয়া জ্বর হইত; সেইজন্য লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃত প্রফেসারের একটিনি করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু যাইবার আট-দশ দিন পূর্ব্বে আমার ভয়ানক জ্বর হয়, তখন আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখি—আমি একটানা লক্ষ্ণৌ যাইতে পারিব না, আপনার ওখানে একদিন থাকিয়া যাইব। ঠিক দিনে পৌঁছিবার আশায় আমি পথ্য করিয়াই যাত্রা করি; আমার সঙ্গে আমার গ্রামের মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের একটি ছেলে ছিল; তাহারও ম্যালেরিয়া জ্বর, তাই তাহার বাপ আমার সঙ্গে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

আমরা কর্ম্মাটাঁড়ে পৌঁছিয়া আমাদের মালপত্র ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলায় গেলাম। প্ল্যাটফরমের নীচেই বাংলা, বাগানের গেটে ঢুকিতেই দেখি, তিনি বাংলার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা গিয়া প্রণাম করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এটি কে? আমি পরিচয় দিলে তিনি বলিলেন—আমি উহাদের খুব চিনি। ও যে তোমার সঙ্গে এত অল্প বয়সে এতদূর কেমন করিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিতেছি না। তিনটার পর গাড়ি পৌঁছিয়াছিল;—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গল্পগুজবে কাটিয়া গেল। তিনি আমার বাড়ির প্রত্যেকের খবর নিলেন, আমিও তাঁহার অনেক খবর লইলাম। আমি লক্ষ্ণৌয়ে সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেছি—এম্· এ· ক্লাসেও পড়াইতে হইবে—বিশেষ হর্ষচরিতখানা পুরা পড়াইতে হইবে—শুনিয়া তিনি একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন—বইটা বড় কঠিন। তিনি নিজে আট ফর্ম্মা মাত্র ছাপাইয়াছিলেন এবং তাহা পূর্ব্বেই কলিকাতায় আমায় দিয়াছিলেন। বলিলেন—বাকীটা বড় গোল। আমি বলিলাম—রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলেন—ইহার সংস্কৃত বড় কাঁচা। তিনি বলিলেন—তাই ত, রাজকুমার এতবড় পণ্ডিত হইয়াছে, যে কাঁচাপাকা সংস্কৃত চিনিতে পারে?—যাহা হউক তিনি আমাকে হর্ষচরিত এবং অন্যান্য বই পড়াইবার কিছু কিছু কৌশল বলিয়া দিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার

হইয়াছিল। আহারাদির পর রাত্রে শুইবার সময় তিনি আমার ঘরে আসিলেন এবং স্বহস্তে যে-কটি জানালা ছিল বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবিকুলুপ লাগাইয়া দিলেন এবং একটি চাবিকুলুপ আমার হাতে দিয়া বলিলেন—তুমি দরজাটিও চাবি বন্ধ করিয়া শুইবে, এখানে বড় চোরের ভয়।

পরদিন সকালে তালা খুলিয়া আমি ও সতীশ বাহির হইলাম। বাহির হইয়া যে-ঘরে পড়িলাম—দেখিলাম তাহার চারিদিকে ব্রাকেটের ওপর তাক, তাকের নীচে এক জায়গায় দেখি—এক হাঁড়া মতিচুর ও এক হাঁড়া ছানাবড়া, বোধ হয় বর্দ্ধমান হইতে আমদানি হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বারাণ্ডায় পাইচারি করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে টেবিলে বসিয়া কথামালা কি বোধোদয়ের প্রুফ দেখিতেছেন। প্রুফে বিস্তর কাটকুট করিতেছেন। যেভাবে প্রুফগুলি পড়িয়া আছে, বোধ হইল, তিনি রাত্রেও প্রুফ দেখিয়াছেন। আমি বলিলাম—কথামালার প্রুফ আপনি দেখেন কেন, আর রাত জেগেই বা দেখেন কেন? তিনি বলিলেন—ভাষাটা এমনি জিনিষ, কিছুতেই মন স্পষ্ট হয় না; যেন আর একটা শব্দ পাইলে ভাল হইত;—তাই সর্ব্বদা কাটকুট করি। ভাবিলাম—বাপ রে, এই বুড়া বয়সেও ইঁহার বাংলার ইডিয়মের ওপর এত নজর।

রৌদ্র উঠিতে-না-উঠিতেই একটা সাঁওতাল গোটা পাঁচ-ছয় ভুট্টা লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল—ও বিদ্যেসাগর, আমার পাঁচ গণ্ডা পয়সা নইলে আজ ছেলেটার চিকিৎসা হইবে না; তুই আমার এই ভুট্টাকটা নিয়া আমায় পাঁচ গণ্ডা পয়সা দে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ পাঁচ আনা পয়সা দিয়া সেই ভুট্টাকটা লইলেন ও নিজের হাতে তাকে তুলিয়া রাখিলেন। তারপর আর একজন সাঁওতাল,—তার বাজরায় অনেক ভুট্টা; সে বলিল—আমার আট গণ্ডা পয়সার দরকার। বিদ্যাসাগর মহাশয় আট গণ্ডা পয়সা দিয়াই তাহার বাজরাটি কিনিয়া লইলেন। আমি বলিলাম—বাঃ, এ ত বড় আশ্চর্য্য! খরিদ্দার দর করে না, দর করে যে বেচে। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিলেন, তারপর দেখি—যে যত ভুট্টা আনিতেছে, আর যে যত দাম চাহিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই দামে সেই ভুট্টাগুলি কিনিতেছেন আর তাকে রাখিতেছেন। আটটার মধ্যে চারিদিকের তাক ভরিয়া গেল, অথচ ভুট্টা কেনার কামাই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এত ভুট্টা লইয়া আপনি কি করিবেন? তিনি বলিলেন—দেখ্‌বি রে দেখ্‌বি।

এইরূপ ভুট্টা কেনা চলিতেছে, ইতিমধ্যে দুটা কুড়ি-বাইশ বছরের সাঁওতাল ছুঁড়ি আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের কিছু খাবার দে। তাহারা উঠানে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই রকে উঠিল না। আমি বলিলাম—ওরা খাবার চাচ্ছে, আপনার এত মতিচুর ছানাবড়া রহিয়াছে, দু-একটা দেন না। তিনি বলিলেন—দূর হ', ওরা কি ওর স্বাদ জানে, না রস জানে? দিলে টপ্ টপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিবে। ওদের খাবার হইলেই হইল, ভালমন্দ খাবার ওরা বোঝে না। ওর জন্যে আবার আর এক রকমের লোক আছে। এখান থেকে এক ক্রোশ দূরে কোরা বলিয়া এক গ্রাম আছে, সেখানে এক মারহাট্টা রাজা আছে। বারগীর হাঙ্গামার সময় এইখানে উহারা একটি ছোটখাট রাজত্ব করে। এখনও সেখানে অনেক মারহাট্টা আছে; ব্রাহ্মণও আছে, অন্য জাতও আছে। কিন্তু সাঁওতালের সঙ্গে থেকে সাঁওতালের মত হইয়া গিয়াছে। তাদের কেবল ভাল খাবার দিলে তারা এক কামড় খাইয়া দেখে, পরীক্ষা করে, কি কি জিনিষে তৈরি জিজ্ঞাসা করে, কোথা থেকে আনানো হয়েছে; তখন আমি বুঝিতে পারি, এদের জিব আছে; আর এই এদের কিছুই নেই। মুড়ি

চিঁড়াও যেমন খায়, সন্দেশ রসগোল্লাও তেমনি খায়।

আমার কথায় মতিচুর ছানাবড়া দিলেন না দেখিয়া আমি বলিলাম—তবে আমি এক কাজ করি, আমার সঙ্গে কতকগুলা পরশু-ভাজা লুচি আছে, আমি সেগুলি ইহাদিগকে দিয়া দি! তিনি বলিলেন—তোর সঙ্গে আছে নাকি? কই, দেখি। আমি দৌড়িয়া ষ্টেশনে গিয়া পোঁটলা খুলিয়া কলাপাতায় বাঁধা প্রায় দুদিস্তা লুচি লইয়া আসিলাম। বলিলাম—দুদিন বাঁধা আছে, কলাপাতাগুলা সেদ্ধ হইয়া গিয়াছে, লুচিতেও কলাপাতার গন্ধ হইয়াছে। বলিয়াই সেগুলা ঐ ছুঁড়িদের দিতে যাইতেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—আমায় দে, ওদের কি অমন ক'রে দিতে আছে? বলিয়া লুচিগুলি লইয়া কলাপাত খুলিয়া একটু হাওয়ায় রাখিয়া বলিলেন—এই দেখ্ কিছু গন্ধ নেই। তার পর মাঝখান হইতে চারখানা লুচি লইয়া বেশ সাবধানে তুলিয়া রাখিলেন। আমি বলিলাম—আপনি ও কি করছেন? তিনি বলিলেন—খাবো রে। তোর মায়ের হাতের ভাজা? আমি বলিলাম—না বড়বউয়ের। তিনি বলিলেন—তবে আরও ভাল। নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর বিধবা পত্নীর? নন্দ আমার বড় প্রিয়পাত্র ছিল। তার পর উপর হইতে দুখানি লুচি তুলিয়া সাঁওতালনীদের দিলেন। তারা টপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন—দেখ্‌লি, ওরা কি স্বাদ জানে, না রস জানে?

ভুট্টা কেনা চলিতে লাগিল। একটু অন্য কাজে গিয়াছি, আসিয়া দেখি—বিদ্যাসাগর নেই। সব ঘর খুঁজিলাম—নেই, রান্নাঘরে নেই, বাগান সব খুঁজিলাম নেই, শেষ বাগানের পিছন দিকে একটা আগড় আছে—সেটা খোলা; মনে করিলাম, এইখান দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন; সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, একটা আল্‌পথে বিদ্যাসাগর মহাশয় হন্ হন্ করিয়া আসিতেছেন, দর্ দর্ করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে একটা পাথরের বাটি। আমাকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুই এখানে কেন? আমি বলিলাম—আপনাকে খুঁজিতেছি, কোথায় গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—ওরে খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালনী আসিয়াছিল; সে বলিল—বিদ্যেসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস্। তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই বাটি ক'রে নিয়ে গিছলাম। আশ্চর্য্য দেখিলাম—এক ডোজ ওষুধে তার রক্তপড়া বন্ধ হইয়া গেল। ইহারা ত মেলা ওষুধ খায় না, এদের অল্প ওষুধেই উপকার হয়, কলিকাতার লোকের ওষুধ খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়িয়া গিয়াছে, মেলা ওষুধ না দিলে তাদের উপকার হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কতদূর গিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—ওই যে গাঁ-টা দেখা যাচ্ছে, মাইল-দেড়েক হবে। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব হাঁটিতে পারিতেন।

বাংলায় আসিয়া চাহিয়া দেখি, বাংলার সম্মুখের উঠান সাঁওতালে ভরিয়া গিয়াছে—পুরুষ মেয়ে ছেলে বুড়ো—সব রকমের সাঁওতালই আছে। তারা দল বাঁধিয়া বসিয়া আছে, কোনো দলে পাঁচ জন, কোনো দলে আট জন, কোনো দলে দশ জন। প্রত্যেক দলের মাঝখানে কতকগুলা শুক্‌না পাতা ও কাঠ। বিদ্যাসাগরকে দেখিয়াই তাহারা বলিয়া উঠিল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের খাবার দে। বিদ্যাসাগর ভুট্টা পরিবেশন করিতে বসিলেন। তাহারা সেই শুক্‌না কাঠ ও পাতায় আগুন দেয়. তাহাতে ভুট্টা সেঁকে, আর খায়;—ভারী ফুর্ত্তি। আবার চাহিয়া লয়—কেহ দুটা, কেহ তিনটা, কেহ চারটা ভুট্টা খাইয়া ফেলিল। তাকের রাশীকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরাইয়া আসিল। তাহারা উঠিয়া বলিল—খুব খাইয়েছিস্ বিদ্যেসাগর। ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন; আমিও আশ্চর্য্য

হইয়া দেখিতে লাগিলাম; ভাবিলাম এ রকম বোধ হয় আর দেখিতে পাইব না।

তাহারা চলিয়া গেলে, বিদ্যাসাগর আমাদের স্নানাহার করাইলেন। বিদ্যাসাগর কখন যে কি খাইলেন এবং কোথায় খাইলেন আমরা তাহা কিছুই টের পাইলাম না। বারটার পর আমরা তাঁহার টেবিলে আসিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন—তোর জন্যে আমার একটু ভয় হয়েছে। তুই লক্ষ্ণৌয়ে পড়াইতে যাইতেছিস্, পারবি কি? আমি বলিলাম—কেন, কিছু ভয়ের কারণ আছে না-কি? তিনি বলিলেন—আছে বইকি। সেখানে পুনো জ্যাঠা বলিয়া এক বাঙালী ছেলে আছে; আমি যখন লক্ষ্ণৌয়ে গিয়েছিলাম, তখন সে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। আমি যে-কদিন ছিলাম, রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর বাড়িতেই ছিলাম, রাজকুমারও আমাকে খুব যত্নে রাখিয়াছিল। অনেকে আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন, অনেকে শুধু দেখিতে আসিতেন। একদিন পূর্ণচন্দ্র আসিয়া হাজির। আসিয়াই বলিল—রাজকুমারবাবু, এখানে ত অনেক লোক বসে আছেন, এর মধ্যে বিদ্যাসাগর কোন্‌টি? রাজকুমার আমায় দেখাইয়া দিলে সে বলিল—ওমা, এই বিদ্যাসাগর। উড়ে-কামানো-কামানো, পাল্কীর নীচে গেলেই হয়। তাহার বক্তৃতায় রাজকুমার ত অধোবদন, আমিও কতকটা তাই। তারপর কিছু আলাপচারী করিয়া আমায় বলিল—বিদ্যাসাগর মহাশয়, আপনি ত কলিকাতা ইউনিভারসিটির সিনিয়ার ফেলো, কিন্তু এটা হয় কেন বলুন দেখি। যে-ছেলেটা সেকেন ক্লাস থেকে বা'র হয়ে যায়, সেও লেখে I has; যে এন্ট্রেন্স পাস করে, সেও লেখে I has; যে এল্‌· এ· পাস করে, সেও লেখে I has; যে বি· এ· পাস করে, সেও লেখে I has; যে এম্‌· এ· পাস করে, সেও লেখে I has; এ জিনিষটা কেন হয়? এর কি কিছু প্রতিকার নেই? আপনারাই ত ইউনিভারসিটির মা-বাপ। এইখানে বলিয়া রাখি যে সে-সময় লাহোর ছাড়া উত্তর-ভারতে আর ইউনিভারসিটি ছিল না। আগরা হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত কলিকাতা ইউনিভারসিটির অধীন ছিল, নাগপুরও ছিল, সিলোনও ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—আমি দেখিলাম পুনোর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করা ত আমার কাজ নয়; আমি তাহাকে বলিলাম—পূর্ণবাবু, এটি বুঝাইবার জন্য আপনাকে দুটি গল্প বলিব। মনোযোগ দিয়া শুনুন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, কেন এরূপ হয়।

প্রথম গল্প।—আপনি জানেন সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুস্কুল একই হাতার মধ্যে। হিন্দুস্কুলের ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা মদ খাইত; আমরা দেখিতাম, আমাদের পয়সা ছিল না, মদ খাইতে পারিতাম না। দেখিয়া দেখিয়া আমাদের একটা নেশা করার ঝোঁক হইল। আমরা কতকগুলি উপর-ক্লাসের ছেলে ছিটে ধরিলাম। অল্প পয়সায় বেশ নেশা হইত। ক্রমে একটু পাকিয়াও উঠিলাম। আট-দশ ছিটে পর্য্যন্ত আমরা একটানে খাইতে পারিতাম; তখন আমাদের একটা সখ হইল—বাগবাজারের আড্ডায় গিয়া বড় বড় গুলিখোরের সঙ্গে টক্কর দিব। আট মূর্ত্তি সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইলাম; বাগবাজারে গুলির আড্ডায় যাইতে গেলে একটি গলির মধ্যে দিয়া যাইতে হয়, গলির সুমুখেই আড্ডার দরজা। আমরা গলির আর এক মুড়ায় ঢুকিতেই আড্ডাধারী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন এতগুলো ফরসা কাপড়ওয়ালা লোক আসিতেছে, আমার বুঝি আজ কপাল ফিরিবে। আমরা কাছে গেলে খুব আদর করিয়া তিনি অভ্যর্থনা করিলেন ও ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম একটি খোলায়-ছাওয়া হল, তার কিন্তু ওই একটি দরজা, পাছে গুলিখোররা পয়সা না-দিয়া পালায় সেইজন্য ওই একটি দরজা রাখা হইয়াছে, আড্ডাধারী সেইখানে থাকেন। আমাদের কিন্তু আড্ডাধারী খুব খাতির করিলেন। আমরা যতক্ষণ ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। দেখিলাম

প্রায় দুশো আড়াইশো গুলিখোর বসিয়া আছে; সকলেরই সাম্‌নে একটা কল্‌সীর কানা, তার উপর একটা থেলো হুঁকো, নল্‌চেটি ছোট, নলটা খুব লম্বা; নল্‌চের উপর একটা কলিকা, কিন্তু উপরভাগটা ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে। গুলিখোরেরা সেই ভাঙা কলিকার উপর ছিটা বসাইতেছে, চিমটা করিয়া আঙরার কয়লা তার উপর দিতেছে, নল দিয়া টানিয়া সেই ধোঁয়া গিলিবার চেষ্টা করিতেছে ও এক-একবার একটু একটু চাট মুখে দিতেছে। এ চাট আর কিছু নয়,—সামনে মাল্‌সায় একটু গুড়ের জল আছে ও তাহাতে এক টুকরা সোলা ফেলা আছে। ধোঁয়া টানিয়াই এই সোলাখানা চুষিতেছে। আমরা দেখিলাম—হলের পূব দিকে সবাই মাটিতে বসিয়া গুলি খাইতেছে, উত্তর দিকেও তাই, পশ্চিম দিকেও তাই। কেবল দক্ষিণ দিকে যাহারা গুলি খাইতেছে, তাহারা ইটের উপর বসিয়া আছে। আমরা আড্ডাধারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা ইটের উপর বসিয়া আছে কেন? তিনি বলিলেন—আমাদের এ আড্ডার নিয়ম এই যে, যে-কেহ একটানে ১০৮টা ছিটে খাইতে পারিবে, তাহাকে একখানা ইট দেওয়া হইবে। কথাটা শুনিয়াই আমাদের যে উচ্চ আশা ছিল, তাহা একেবারেই উপিয়া গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—ওই যে একজন লোক আটখানা ইটের ওপর বসিয়া আছে, ও কত ছিটে খাইতে পারে? আড্ডাধারী বলিল—৮৬৪। আমাদের সকলের মুখ পাঙ্গাস বর্ণ হইয়া গেল। মদন আমার কানে কানে বলিল—টক্কর দেওয়া ত হ'ল না, কিন্তু একবার এইসব গুলিখোরেরা কি গল্প করে শোনা যাক্‌। তাই আমরা তাহাদের কাছ ঘেঁষিয়া গেলাম। পাছে ধোঁয়া বাহির হইয়া যায়, সেইজন্য গুলিখোরেরা অতি আস্তে আস্তে কথা কয়, হাত-পা নাড়িয়াই কথা কওয়ার কাজ সারে। তাই আমরা খুব কাছে গেলাম। শুনিলাম তাহারা কলের গল্প করিতেছে।

যে একখানি ইটের উপর বসিয়াছিল, সে বলিতে লাগিল—চাণক চাণক। গোল করাত—মস্ত গোল, তার ওপর বাহাদুরি কাঠ ফেলিয়া দিতেছে; ফর ফর ফর ফর করিয়া কাঠ চিরিয়া যাইতেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কড়ি, কোথাও বরগা, কোথাও দোর, কোথাও জানালা, কোথাও টেবিল, কোথাও কোচ, কোথাও কেদারা—এই সব বাহির হইতেছে।

যে দুখানা ইটের উপর বসিয়াছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিল—ও কি কল! কল ত গরফের। একখানা পাথরের বারকোশ—মস্ত—ঘর-জোড়া, তার ওপর 'দুখানা মোটা পাথরের চাকা আড়ে ঘুরিতেছে। আর সাহেবরা বস্তা বস্তা মসিনা সেখানে ফেলিয়া দিতেছে; কলের দুটো মুখ, একটা দিয়া পিপে পিপে তেল বাহির হইতেছে, আর একটা দিয়া থান থান খোল বাহির হইতেছে।

তিনখানা ইটের ওপর যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—ও-বা কি কল! আক্‌ড়ায় দেখিলাম—পাঁজায় পাঁজায় মাঠ ছাইয়া গিয়াছে, কলের ভেতর সেই ইট ঢোলাই করিয়া দিতেছে। কলের সামনে এক আকাশপাতাল ছাঁকনি। কলের গুঁড়া গিয়া তার উপর পড়িতেছে। কোথাও ১ নং, কোথাও ২ নং, কোথাও ৩ নং সুরকী, কোথাও কুরুই পড়িতেছে।

বিদ্যাসাগর বলিলেন—পূর্ণচন্দ্র, সব গুলিখোরের গল্প দিয়া আমি আর তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না, শেষ গল্পটা দিয়াই তোমার কথার জবাব দি। যিনি আটখানা ইটের ওপর বসিয়াছিলেন, তিনি কথা না কহিয়াই হাত ঘুরাইয়া বলিয়া দিলেন—ওসব কল কিছু না।

তিনি বলিলেন—আমার বাড়ি ফরাসডাঙ্গা। বাড়ি গিয়া দেখি কোথাও বাড়ি নাই, ঘর নাই, পুকুর নাই, গাছ নাই, পালা নাই, সব মাঠ হইয়া গিয়াছে। ছিরামপুর থেকে চুঁচড়ো পর্য্যন্ত সব ধূ ধূ করছে মাঠ। ছিরামপুরের গঙ্গার ধার থেকে একটা সুরঙ্গ আর চুঁচড়োর গঙ্গার ধার থেকে আর একটা সুড়ঙ্গ; একটা দিয়ে পালে পালে পালে গরু যাইতেছে, আর একটা দিয়া°গাড়ি গাড়ি আক যাইতেছে: মাটির ভিতর কোথায় যায়, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনেক খুঁজিয়া বুঝিলাম—মাটির ভিতরে কল আছে, কলের ১০০টা মুখ তারকেশ্বরের কাছে গিয়া বাহির হইয়াছে। কোনটা দিয়া রাতাবী, কোনটা দিয়া মনোহরা, কোনটা দিয়া কাঁচাগোল্লা, কোনটা দিয়া রসগোল্লা, কোনটা দিয়া ছানাবড়া, কোনটা দিয়া পানতুয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু ভাই, খেয়ে দেখ সবই একরকম তার। এক পাকের তৈরি কি না!

বিদ্যাসাগর বলিলেন—তাই বলি পূর্ণচন্দ্র, আমাদের যে-সব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাহিনা নিই, পাখ্যা ফি নিই, একজামিনেশন ফি নিই, নিয়ে কলের দোর খুলি,—দেখাইয়া দিই, এইখানে মাষ্টার আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে, এইখানে বই আছে, এইখানে বেঞ্চি আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এইখানে কালি কলম দোয়াত পেন্সিল সিলেট সবই আছে। বলিয়া তাহাদের কলের ভেতর ফেলিয়া দিয়া চাবি ঘুরাইয়া দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈয়ারী হইয়া তাহারা কেহ সেকেন ক্লাস দিয়া, কেহ এন্ট্রেন্স হইয়া, কেহ এল্· এ· হইয়া, কেহ বি· এ· হইয়া, কেহ বা এম এ· হইয়া বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে I has; এক পাকের তৈরি কি না!

দ্বিতীয় গল্প।—পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, আপনারা যে ছেলেদের কাছ থেকে মাইনে নেন, নানারকম ফি নেন, বই, কাগজ, খাতাপত্র ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট বক্স, রঙের বাক্স—এই সব কেনান, তাদের শেখান কি?—দেন কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—পূর্ণবাবু, আপনি কখনও আমাদের দেশে যান নাই। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে বন্যা হয়; ঘর-বাড়ি, মাঠ-ঘাট, ক্ষেত-খামার, বাগান-বাগিচা—সব জলে জলময় হইয়া যায়। সেই সময়ে যারা আমাদের গ্রাম থেকে ঘাটালে যায়, তারা আপনি যা বললেন তার মর্ম্ম জানে। সব ত জলে জলময়,—কেবল মনের আট্‌কালে রাস্তাটা কোথা দিয়ে ছিল—তারা তাই আঁচিয়া লয় এবং সেই রাস্তায় চলিতে থাকে। পায়ের তেলো সর্ব্বত্রই ডুবিয়া যায়। ডাঙ্গাজমি দেখা যায় না। তার ওপর কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমর-জল; মাঠে এর চেয়ে বেশী জল হয় না; এই জল কাটাতে কাটাতে প্রায় চার ক্রোশ গিয়া তারা একটা বাঁশের টঙ দেখিতে পায়—জল ছাড়া প্রায় বিশ হাত উঁচু। টঙে ঘাটমাঝি-মশাই বসিয়া আছেন, একখানা মই তাতে লাগানো। অনেক কষ্টে টঙের কাছে আসিয়া সে মাঝিকে বলিল—মাঝি, আমায় পার ক'রে দাও। সে বলিল—মশাই, আপনি ওপরে আসুন। ওপরে আসিলে সে বলিল—পারের কড়ি রাখুন। অন্য সময়ে যাহা রাখেন তার আটগুণ রাখিতে হইবে। বেচারা কি করে, তাই রাখিল। তখন ঘাটমাঝি বলিল—ওই দেখিতেছেন নৌকা আছে; নৌকায় বোটে আছে, দাঁড় আছে, হাল আছে, লগি নাই; বন্যার সময় নদীতে লগি দিয়া থাই পাওয়া যায় না। আপনি বোটে বাইতে বাইতে ওই ওপারে চলিয়া যান। ওপারে যে টঙ দেখিতেছেন, উহার কাছে নৌকা রাখিয়া যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যান।

আমরা সেই ঘাটমাঝির মত টঙ বাঁধিয়া বসিয়া আছি। ছেলেরা পড়িতে আসিলে তাদের

কাছ থেকে নানারকম ফি আদায় করিয়া বলি—ঐ স্কুল আছে, বেঞ্চি আছে, চেয়ার আছে, মাষ্টার আছে, পণ্ডিত আছে, কাগজ কলম বই কিনিয়া পড় গে। মাসে মাসে আমার এখানে ফি-টি দিয়া যাইও।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প শেষ হইতে হইতেই ষ্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা পড়িল, বুঝা গেল আমাদের গাড়ি আসিতেছে। আমরা উঠিয়া ষ্টেশনের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলাম, মনে করিলাম এদিনের ব্যাপারটা চিরদিনই আমাদের মনে গাঁথা থাকিবে। আমরা যেন কোনো মহর্ষির আশ্রম হইতে বাহির হইতেছি। দেখুন, প্রায় বাহান্ন বছর পরেও সেদিনের কথা আমার কেমন মনে আছে।

জীবনান্তে আলোচনা

রমেশচন্দ্র দত্ত

সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত নানা গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয় ইংরেজিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিয়াছেন। পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। সে ভূমিকায় অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। নিম্নে সে ভূমিকার মর্মানুবাদ প্রকাশিত করিলাম ঃ

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি সুন্দর জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই মাননীয় পণ্ডিতের যশ শুধু বাঙ্গালার মধ্যেই আবদ্ধ নহে; উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রধান কর্মবীর বলিয়া তিনি ভারতের সর্বত্রই বিখ্যাত। স্যার সেসিল বীডনের বন্ধু ও ড্রিন্‌ক্‌ওয়াটার বেথুনের সহযোগী এই উন্নতমনা বাঙ্গালীর মহৎ চরিত্র ও কীর্তিকলাপের প্রশংসা করেন নাই, এরূপ ইংরেজ তৎকালে অতি অল্পই ছিলেন। এইজন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত ইংরেজিতে প্রণয়ন করিয়া শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র অতি উত্তম কার্যই করিয়াছেন এবং তাঁহার পুস্তক এই সম্বন্ধে একটি প্রকৃত অভাব পূরণ করিবে।

ভারতের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই অতি উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। ইংরেজ-রাজত্ব ও ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এদেশে নব আশা, নূতন ভাব ও নূতন উদ্যমের সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে এবং পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্যে ইহার পরিচয়।

এই দুই কর্মবীরের জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটনা প্রায় একই সময়ে ঘটে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় সমাজ ও ধর্মসংস্কার সম্বন্ধীয় তাঁহার চূড়ান্ত কার্য ব্রাহ্মসমাজ বা একেশ্বরবাদী হিন্দুসমাজ স্থাপন করেন; পর-বৎসর বালক ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জীবনের কার্যোপযোগী বিদ্যাশিক্ষার্থ জন্মস্থান হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন, ইহার কয়েক বৎসর পরেই ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়ন সমাপনান্তে দক্ষতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'বিদ্যাসাগর' এই উপাধি লাভ করেন।

বিলাত হইতে যে সকল অল্পবয়স্ক সিবিলিয়ান এদেশে আসিতেন, তাঁহাদের বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি এদেশীয় ভাষাসকল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে একুশ বৎসর বয়সে ইহার প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই পদপ্রাপ্তি হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সৌভাগ্য-গৌরব সূচিত হয়। ইতিপূর্বে তিনি অতি অল্পই ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময় প্রয়োজনবশতঃ তাঁহার উত্তমরূপে ইংরেজি ভাষা শিখিবার বাসনা বলবতী হয়। তিনি সমবয়স্ক ও একাগ্রচিত্ত রাজনারায়ণ বসুর সহিত ইংরেজি শিক্ষা করেন। এই রাজনারায়ণবাবু পরে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের এই অংশ কতকগুলি বিশেষ গুরুতর ঘটনার জন্য চিরস্মরণীয়। তাঁহাকে এই সময় কতিপয় বিশিষ্ট ইংরেজ ও কয়েকজন দেশীয় কর্মবীরের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তাঁহারই সাহায্যে অল্পবয়স্ক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা) ফোর্ট উইলিয়াম

কলেজের হেড রাইটারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুসমাজের তৎকালীন নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নিকট পরিচিত হন ও এই সময়েই অসাধারণ প্রতিভাশালী অক্ষয়চন্দ্র দত্তের সহিত তাঁহার জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের প্রথম সূত্রপাত।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্তা হয়। পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে যখন বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে একশত একটি 'হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়' স্থাপিত হইল, তখন সেই সমুদয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-নির্বাচনের ভার মার্শাল সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। এই প্রভূত ক্ষমতার পরিচালনে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহার উপর যে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার অর্পিত হইয়াছিল, তিনি সর্বতোভাবে তাহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া যোগ্যতর ব্যক্তিকে উচ্চ পদলাভে সাহায্য করিতেন, তাহার একটি সুন্দর মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে মার্শাল সাহেবের সুপারিশে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। ঐ পদের বেতন ৯০ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে ৫০ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। তিনি কিন্তু ঐ পদ গ্রহণে অসম্মত হন; কারণ তাঁহার বিবেচনায় প্রসিদ্ধ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় যোগ্যতর ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ই ঐ পদে মনোনীত হইলেন এবং তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় পদব্রজে কলিকাতা হইতে কালনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই অপূর্ব স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় অতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে বলিয়াছিলেন, "ধন্য বিদ্যাসাগর! তুমি মানুষ নও, তুমি মনুষ্যাকারে দেবতা!"

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। তখন খ্যাতনামা বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ উদ্যমের পরিচয় পাইয়াছিলেন। সহকারী সম্পাদকের পদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে তিনি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করেন। বেতন বৃদ্ধি করা হইল না বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদে মনোনীত হইলেন। ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রণালী সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। সংস্কারসম্বন্ধীয় তাঁহার কঠোর ব্যবস্থাসকল দেখিয়া রসময়বাবু পর্যন্ত ভীত হইলেন এবং তাঁহার কতিপয় প্রস্তাব অনুমোদিত না হওয়ায় বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কারসম্বন্ধীয় একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত করেন। রসময়বাবু দেখিলেন, এক্ষণে তাঁহার পদত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। তখন সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ এক হইয়া প্রিন্সিপাল পদের সৃষ্টি হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন ও তাঁহাকে ইচ্ছামত সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। তিনি বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত জমিদারগণের দ্বারা বন্ধুরূপে পরিগণিত হইলেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ এই নূতন সহযোগীকে পাইয়া আনন্দসহকারে ইহার সংবর্ধনা

করিলেন। যে সকল সহৃদয় ইংরেজ ভারতের উন্নতিকল্পে ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা একজন উপযুক্ত সাহায্যকারী পাইলেন। তিনি এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচলনে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন এবং এতদ্‌সম্বন্ধে মহানুভব বেথুন সাহেবকে অনেক সাহায্য করেন। বঙ্গের প্রথম ছোটলাট স্যার ফ্রেড্‌রিক হ্যালিডে সাহেব তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর 'বেথুন স্কুল' নামক বালিকা বিদ্যালয়ের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন এদেশে বাঙ্গালা ও ইংরেজি বিদ্যালয়-সংস্থাপিত করা গবর্নমেন্টের অভিপ্রেত হয় তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট লেখেন। এই রিপোর্ট পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে ২০০ টাকা বেতনে হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলাসমূহের একজন বিশেষ ইন্‌স্পেক্টাররূপে নিযুক্ত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের বেতন ৩০০ টাকাও পাইতেন। তিনি ঐ চারিটি জেলায় বালকবালিকাগণের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সময়ে তাঁহাকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ও নর্ম্যাল স্কুলের কার্যের তত্ত্বাবধান করিতে হইত। তাঁহার একান্ত অনুরোধে অক্ষয়কুমার দত্ত নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

এই সমস্ত কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্য-চর্চায় বিরত হন নাই। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বাঙ্গালা 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হইল। ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক 'সীতার বনবাস' প্রকাশিত হয়। বর্তমান কালের বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য ইহার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট ঋণী। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণের ভাষা তেজোময়ী ও ভাব-প্রকাশক হইলেও অতীব জটিল ও দুর্বোধ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমারবাবুই যে আধুনিক মনোহারী বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করা হয় না। যে সকল ইংরেজ লেখক রাজ্ঞী অ্যানের সময়ে ইংরেজি গদ্য বর্তমান ছাঁচে ঝালিয়া ভাষার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার স্বদেশীয় সাহিত্যসেবা বিষয়ে তুলনায় সমকক্ষ।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি গুরুতর কার্যে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করিলেন যে, শাস্ত্রে হিন্দু-বিধবাদিগের চিরবৈধব্য-বিধি নাই এবং বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। চতুর্দিকে ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বাঙ্গালার প্রত্যেক নগরে এবং প্রত্যেক গ্রামে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দাশরথি রায় এই নব্য সমাজ-সংস্কারককে ব্যঙ্গ করিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলেন। গ্রামে গ্রামে উৎসবাদি উপলক্ষে বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গান গীত হইতে লাগিল। শান্তিপুরের তন্তুবায়েরা স্ত্রীলোকদিগের শাড়ির পাড়ে এই সম্বন্ধে গান বুনিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরে ঘরে স্ত্রী-পুরুষ, সকলেরই মুখে কেবল এই কথা। অতঃপর এই সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব স্বয়ং গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করিলেন।

এই প্রবল ঝটিকার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অচল ও অটল। বিরুদ্ধ-মতসকল খণ্ডন করিয়া তিনি আর একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। ইহাতে তিনি যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে এই আন্দোলন প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নিজ মতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর পুনর্বিবাহিত

হিন্দুবিধবাগণের সন্তানসন্ততিকে আইনসম্মত উত্তরাধিকারী করিবার জন্য গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করা হয় এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয়ক আইন পাস হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন ইহার সভ্য-সংখ্যা ৩৯ জন মাত্র। তন্মধ্যে কেবল ছয়জন এ-দেশীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে শিক্ষাবিভাগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শেষ হইয়া আসিল। এডুকেশন কাউন্‌সিলের স্থানে ডাইরেক্টার অব্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকসন পদের সৃষ্টি হইল ও গর্ডন ইয়ং সাহেব প্রথম ডাইরেক্টার নিযুক্ত হইলেন। ইনি একজন নবীন ও অল্পদর্শী কর্মচারী। এস্থলে সেই পুরাতন নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থাই হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীসংস্কারক, বাঙ্গালা শিক্ষার জন্মদাতা, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনকারী, একাগ্রচিত্ত সংস্কারক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবক হইয়াও স্বদেশের শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ পদলাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। কারণ তিনি এ-দেশীয়। আবার যিনি তাঁহার উপরে নিযুক্ত হইলেন, সেই গর্ডন ইয়ং সাহেব তাঁহার গুণগ্রহণে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু তাঁহার সহিত বিশেষ ভাল ব্যবহারও করিতেন না, এইরূপ শুনা যায়। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় মর্মাহত হইয়াছিলেন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে তিনি গবর্নমেন্টের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। তাঁহার এতদিনের কার্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি কোনরূপ পেন্‌সন বা পুরস্কারও পাইলেন না। তাঁহার কর্মত্যাগ মঞ্জুর করিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর গবর্নমেন্ট যে পত্র লিখেন, তাহার শেষে লেখা ছিল, দেশীয় শিক্ষার জন্য তিনি যে দীর্ঘব্যাপী ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা গবর্নমেন্ট স্বীকার করিতেছেন।

ইহা অবশ্য অতিশয় সুখের বিষয় যে, এই কর্মত্যাগের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপর অপর কার্যে দানশীলতার সুবিধা হইয়াছিল এবং তিনি পূর্বাপেক্ষা মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। যতদিন না বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সাধারণে বুঝিয়াছিল, ততদিন সাহিত্যিক হিসাবে বাঙ্গালায় তাঁহার সমকক্ষ অপর কেহই ছিল না। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল পরোপকারী এবং আর্ত ও দরিদ্রদিগের দুঃখমোচনকারী মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান। তাঁহার পুস্তকের প্রভূত আয় আর্ত ও দরিদ্রদিগের দুঃখ দূর করিতে ব্যয়িত হইত, শত শত দরিদ্র-বিধবা জীবিকার জন্য ও শত শত অনাথ বালক শিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাঁহার নাম কীর্তন হইত, কী ধনী, কী দরিদ্র সকলেই তাঁহাকে সমভাবে ভালবাসিত।

যাঁহারা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারাও ইঁহাকে ইঁহার সহযোগীদের ন্যায় মান্য করিতেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জমিদারগণ এই শ্রদ্ধাস্পদ সরল অসমসাহসী ও অসীম দয়াবান্ পণ্ডিতকে সম্মানিত করিয়া আনন্দিত হইতেন। তৎকালীন ছোটলাট স্যার সেসিল বীডন এই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাকার্যে বিশেষ পারদর্শী পণ্ডিতের সহিত প্রায়ই পবামর্শ করিতেন এবং তাঁহার সহিত সর্বদা আলাপ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত এবং তাঁহার জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর আমি তাঁহার সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগের কার্য-সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের উল্লেখ করিলে তিনি তখনও উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। তিনি যাঁহাদিগের সহিত একযোগে কার্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখনকার দিনে এক একজন কর্মবীর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেকেই এই

তালিকাভুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর আমাদের জাতীয় কার্যের ইতিহাস আশার শুভ্র আলোকে সমুজ্জ্বল এবং ইহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের ইতিহাস সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মভাবে জড়িত।

আমি প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাত-ভ্রমণের সঙ্গী হইতাম এবং কখনও কখনও তাঁহার সহিত তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতাম; তখন আমি তাঁহার সংগৃহীত ইংরেজি ও সংস্কৃত পুস্তকরাশি দেখিবার অনুমতি পাইতাম। তাঁহার কথাবার্তায় তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের অনেক গল্পই শুনা যাইত এবং তাঁহার সরস রসিকতা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহাতে বর্তমান ছিল।

আমি যখন আমার কর্মস্থলে পুস্তকালয় স্থাপন করিলাম, তখন তিনি প্রায়ই স্বরচিত পুস্তকাবলী আমাকে প্রেরণ করিতেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমি প্রতিবাদের ভীষণ ঝটিকার মধ্যে ঋগ্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করি, তখন মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয় আমায় বিশেষরূপে সাহায্য করেন।

এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি প্রায়ই কলিকাতা ছাড়িয়া কর্মটাড়ের বাটীতে বায়ুপরিবর্তনের জন্য গমন করিতেন। তখন সরল গ্রামবাসিগণ দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিত এবং তিনি তাহাদের বিপদে আপদে সর্বদাই সাহায্য করিতেন; তিনি এই দরিদ্রদিগের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। তাঁহার দয়ায় ইহারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে সকলই ফুরাইল, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে এই সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী আমাদের ছাড়িয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর কর্তৃক লিখিত

কলিকাতার টাকশালের ভূতপূর্ব দেওয়ান সুলেখক সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতে কয়েকটি নূতন কথা লিখিয়াছেন। নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল ঃ

সবিনয় নিবেদনমেতৎ—

আপনার প্রণীত বিদ্যাসাগর-চরিতের তৃতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, এ সংবাদে আমি যার-পর-নাই প্রীতিলাভ করিলাম। এই নাটক-নভেল-প্লাবিত দেশে, এরূপ সারবান্ গ্রন্থের যে তৃতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা রচয়িতা ও পাঠক উভয়েরই গৌরবের বিষয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে আমার নিম্নলিখিত কয়েকটি গল্প আছে। এগুলি যদি আপনার সংগৃহীত গল্পগুচ্ছের মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে (যদি আবশ্যক মনে করেন) নূতন সংস্করণে এগুলি ব্যবহার করিতে পারেন।

১

কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বুদ্ধিহীনতা সম্বন্ধে কথা উঠিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"উনি কিরূপ বোকা জান? এক চাষার বালক্-পুত্র মাতার নির্দেশে এক মুদীর দোকানে এক পয়সার কড়ি কিনিতে গিয়াছিল। মুদী ব্যস্ত থাকায় বালককে বলে—'ঐ কল্‌সির ভিতর কড়ি আছে। কুড়ি গণ্ডা ভাগা দিয়া লও।' বালক ভাগা দিতেছে; এমন সময়ে মুদী ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল যে পাঁচটা করিয়া ভাগ হইতেছে। মুদী বলিল—'বেটা, পাঁচটা করিয়া গণ্ডা হয়?' বালক থতমত খাইয়া উত্তর দিল—'আমি ত জানি না।' মুদী বলিল—'জানিসনে? আচ্ছা দেখ্।' এই বলিয়া সে তিনটা করিয়া ভাগা দিয়া বালককে

কহিল, 'এই রকম কুড়িটা ভাগ করিয়া লও।' বালক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে মুদী জিজ্ঞাসা করিল—'দাঁড়িয়ে রহিলি যে?' বালক মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—'তা হ'লে মা যে বকবে!' ধনবান্‌টি সেই চাষা বালকের ন্যায় বুদ্ধিহীন!"

২

কলিকাতার কোন উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্মচারী পীড়িত হইলে, চিকিৎসক তাঁহাকে বায়ু-পরিবর্তন করিবার পরামর্শ দেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মটাড়স্থ বাড়িটি কিছু দিনের জন্য চাহিয়া লইবার উদ্দেশে রোগীকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে গমন করেন। চিকিৎসক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচিত, কিন্তু রোগী পরিচিত ছিলেন না। চিকিৎসক রোগীর পরিচয় দিয়া বলিলেন—"ইনি অতিশয় ভদ্রলোক।" বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন—"উঁহার সঙ্গে যখন আমার আলাপ নাই, তখন আপনার কথা স্বীকার করিয়া লইতে আমি বাধ্য। এ পর্যন্ত যাঁহাদের সহিত আমার আলাপ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে ত বড় একটা ভদ্রলোক দেখিতে পাই নাই!"

৩

বহুদিনের পর জনৈক সব-জজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কথায় কথায় জানিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সে সব-জজ মহাশয় প্রথমা পত্নীর বিয়োগান্তে আবার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"তবে ত তোমার স্বর্গের দোর একেবারেই খোলা হে?" সব-জজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি রকম, মহাশয়?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"তবে শোন, মরণের পরই মানুষমাত্রেই স্বর্গে প্রবেশ করিবার জন্য স্বর্গের দ্বারে হুড়াহুড়ি করে; দ্বারপাল একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি পৃথিবীতে কি কার্য করিয়া আসিয়াছ?' যাহারা পুণ্যকার্য করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে স্বর্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, অপরগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নরকে পাঠান হয়। জনৈক স্বর্গপ্রার্থী এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কোন বিশেষ পুণ্য বা পাপ কার্যের পরিচয় দিতে পারিল না। কথায় কথায় দ্বারপাল জানিতে পারিল যে, সে ব্যক্তি বৃদ্ধ-বয়সে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ করিয়াছে। দ্বারপাল বলিল—"তুমি এখনই স্বর্গে প্রবেশ করিতে পার, পৃথিবীতেই তোমার নরকভোগ হইয়া গিয়াছে!"

৪

কোন অনুগত কর্মপ্রার্থীকে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমার পরিচিত কোন লোকের অধীনে কোন কর্ম খালি থাকিলে, আমাকে জানাইও, আমি চিঠি দিব।" অনেক অনুসন্ধানের পর একদিন সেই লোকটি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানাইল যে, টেলিগ্রাফ আফিসে অমুক সাহেবের অধীনে একটি কর্ম খালি আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"সে সাহেবের সঙ্গে ত আমার আলাপ নাই, তাঁহাকে কেমন করিয়া চিঠি দিব?" লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"তা হ'লে আমার আশা-ভরসা কিছুই নাই!" এই বলিয়া সে ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার কাতরভাব দর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি রাস্তা হইতে সেই লোকটিকে ফিরাইয়া আনিয়া, টেলিগ্রাফ অফিসের সেই সাহেবের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন এবং তাঁহার নামে তৎক্ষণাৎ কর্মপ্রার্থীর অনুকূলে একখানি অনুরোধ-পত্র লিখিয়া দিলেন। লোকটি পত্রখানি লইয়া যাইবার পরে, পার্শ্বস্থ জনৈক বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন,—"মহাশয়, আপনি অপরিচিত সাহেবকে পত্র লিখিলেন কেমন করিয়া?" বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর দিলেন,

"তাতে দোষ কি? সাহেব যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন, তাহলে গরিবটির অন্নকষ্ট দূর হয়, আর যদি না করেন, তাহলে আমি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত তাতে আমার লজ্জা আর অপমানই বা কি?" পরে জানা গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাক্ষরিত পত্র পাইয়া সাহেব আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং পত্রবাহককে প্রার্থিত কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ত্বদীয়

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বসু

১০ই আশ্বিন, ১৩১৭ ১৬৭ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কর্তৃক লিখিত

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেহান্তর হইবার পর তাঁহার স্মৃতি-সম্মানার্থ যে কয়েকটি সভা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সভায় পঠিথ প্রবন্ধের ভাব লইয়া বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যাহা আলোচনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল ঃ

বিদ্যাসাগর যেমন বাঙ্গালার বর্তমান যুগে অসাধারণ ব্যক্তি, তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশে যে শোকোচ্ছ্বাস লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাও তেমনই অসাধারণ। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র বঙ্গদেশ যেন স্বজন-বিয়োগ-বেদনাবিধুর হইয়াছিল। তৎপূর্বে সমগ্র দেশে এরূপ শোকোচ্ছ্বাস আর দেখা যায় নাই। ছাত্রগণ নগ্নপদে বিদ্যালয়ে গমন করিত, যুবকগণ বিদ্যাসাগরের নিকট আপনাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ স্মরণ করিয়া তাঁহার বিষয় আলোচনা করিত, প্রৌঢ়গণ তাঁহার গুণপরিচয় দিতেন। বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অল্পদিনের ব্যবধানে দুইজনের মৃত্যু হয়। উভয়েই বরেণ্য, উভয়েই বাঙ্গালীর ভক্তি অর্জন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল সব্যসাচী রূপে একদিকে রচনায় ও অপর দিকে সমালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কৃতকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা জনসাধারণের ছিল না। তাঁহার কার্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা কোবিদদিগেরই ছিল; এবং তাঁহার যশ স্বদেশে ও বিদেশে কোবিদসমাজেই আবদ্ধ ছিল। বিশেষ তিনি যে কার্য করিয়াছিলেন, যে মত প্রতিষ্ঠিত করিতে জীবনব্যাপী শ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বাঙ্গালীর পক্ষে তাঁহার যশোমুকুটের হীরক-দীপ্তিতে আপনাদের জাতীয় জীবনের সঞ্চিত অন্ধকার দূর করা সম্ভব হইলেও তিনি কেবল বাঙ্গালীরই ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের কথা স্বতন্ত্র। তিনি যে কার্য করিয়া সমগ্র ভারতে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছলেন, যে অসাফল্যকে তিনি সাফল্য অপেক্ষা অধিক আদরণীয় মনে করিতেন, সেই বিধবাবিবাহ প্রচলনচেষ্টার উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার শিক্ষাবিস্তার কার্যে তাঁহার স্বকার্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি বাঙ্গালার শিক্ষাকে নূতন উন্নত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যখন পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়, তখনকার শিক্ষিত বাঙ্গালীরা তাঁহারই 'বর্ণপরিচয়ে' বাঙ্গালা বর্ণমালার সহিত পরিচিত। তখন 'শিশুবোধের' কথা বৃদ্ধদিগের স্মৃতিতে বিরাজিত। 'বর্ণপরিচয়' ঘরে-ঘরে পরিচিত। সেইজন্য তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী স্বজন-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিয়াছিল।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর কয় বৎসর কলিকাতায় তাঁহার স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সকল সভায় রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। রজনীবাবু ও

রামেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ 'সাহিত্যে', শিবপ্রসন্নবাবুর প্রবন্ধ 'প্রয়াসে', রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ 'সাধনায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের বিশেষ অধিবেশনে বর্তমান লেখক কর্তৃক পঠিত একটি প্রবন্ধও 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর ও রাজা রাজেন্দ্রলাল উভয়ের শোকসভায় যেরূপ জনসমাগম হইয়াছিল, সভায় সেরূপ জনসমাগম তৎকালে সুলভ ছিল না। বাঙ্গালার ছোটলাট সে সভার সভাপতি ছিলেন। সে সভার বক্তৃগণ ও উল্লিখিত প্রবন্ধলেখকগণ সকলেই বাঙ্গালার শিক্ষাবিস্তারকল্পে বিদ্যাসাগরের কৃতকার্যের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার এই ক্ষেত্রে তাঁহার বিরাট কীর্তি। রবীন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"তাঁহার কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনও সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়, যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল—সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন সৃজন করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে। বঙ্গভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য করিয়াছে, এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গালায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা ঝুলিমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কার্যটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মুনষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে,—জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত, প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছিলেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল অতিক্রম করিয়া সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু যিনি সেই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।"

এই বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কৃত কর্ম বিশেষত্বব্যঞ্জক। উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছিলম,—"বিদ্যাসাগর মৌলিক রচনায় বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া 'বর্ণপরিচয়' হইতে 'সীতার বনবাস' পর্যন্ত নানা পুস্তক রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছিলেন। তিনি যদি মৌলিক উপায়ে ভাষা শিক্ষার পথ সুগম না করিয়া মৌলিক রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে আজ বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি লক্ষ্য করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়, বিদ্যাসাগর যশের আশায় দাঁড় ধরিয়া দ্রুত ফেনপুঞ্জমাত্রের সৃষ্টি করেন নাই, পশ্চাতে হাল ধরিয়া বঙ্গভাষার তরণীকে সাবধানে গন্তব্য স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই জন্য তরণী চড়ায় বাধে নাই, ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া নিমজ্জিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর একটা বেদী নির্মাণ করিয়া তাহার উপর আপনি দেবতা

সাজিয়া দাঁড়ান নাই; দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে আপনার যশোঘোষণা করিবার চেষ্টা করেন নাই; অসাধারণ ধৈর্য সহকারে নিপুণতাব সহিত বঙ্গভাষার মন্দির নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন; ভক্তের মত তিনি সে মন্দিরের সোপান হইতে চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া আপনি তৃপ্ত হইয়াছেন। তিনি সে মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা অবাধে সে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে পূজা করিয়া ধন্য হইতে পারিতেছি। বিদ্যাসাগর যে মৌলিক রচনা না করিয়া দেশের লোকের হিতের জন্য মৌলিক উপায়ে বঙ্গভাষা শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব ও স্বার্থত্যাগই প্রকাশ পাইয়াছে। যশোলাভের অপেক্ষা স্বার্থত্যাগের গৌরব অনেক অধিক। দধীচির গৌরব তপস্যায় নহে, স্বার্থত্যাগে—আত্মত্যাগে। সেরূপ তপস্যা অনেকের পক্ষে সম্ভব; সেরূপ স্বার্থত্যাগ নিতান্ত দুর্লভ।"

রবীন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন, "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের ব্যতিক্রম হয়," এবং "বিশ্বকর্মা যেখানে সাত কোটি বাঙ্গালী নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন।" বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সেইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম। রামেন্দ্রবাবুও তাঁহার প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন, "এই হতভাগ্য দেশে হতভাগ্য জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কীরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার পক্ষে একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন কেহ নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন-বিপত্তি ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ মিথ্যাচার ও কপটাচার হইতে আপনাকে সর্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন করিয়াছিল, তাঁহার বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর মধ্যে আবির্ভাব, একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইত, সন্দেহ নাই।" পরে স্বাভাবিক নৈপুণ্য সহকারে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে—ভারতে ও জগতের অন্য দেশে প্রভেদ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন;—"ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃত-প্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।"

রজনীবাবু তাঁহার প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরকে অতি উচ্চস্থান দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মহৎকার্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাঁহাদের অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি প্রতিভাশালী পণ্ডিত অপেক্ষাও মহত্তর, যেহেতু তিনি প্রতিভার সহিত অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন, তিনি তেজস্বী মহাপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর, যেহেতু তিনি তেজস্বিতার সহিত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি দানশীল ব্যক্তিগণ অপেক্ষা মহত্তর, যেহেতু তিনি দানশীলতা প্রকাশের সহিত বিষয়বাসনা ও আত্মগৌরব ঘোষণার ইচ্ছা সংযত রাখিয়াছেন।"

যে সকল সভায় উপরিলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল, সে সকল সভায় জনসমাগমের অভাব হয় নাই। বিদ্যাসাগরের কথা শুনিতে বাঙ্গালীর আগ্রহের অন্ত নাই। এই আগ্রহের আর এক প্রমাণ—বিদ্যাসাগরের তিনখানি বিস্তৃত জীবনী রচিত হইয়াছে। আর কোন্ বাঙ্গালীর ভাগ্যে এরূপ ঘটে নাই।

বিদ্যাসাগরের হিতৈষণা ও স্বদেশপ্রীতি লইয়া অনেক কথা শুনা গিয়াছে। এই Philanthrophy ও patriotism জিনিস দুইটা আমাদের বহুদিনের; কিন্তু নাম দুইটা

বিদেশের। আমাদের দেশে লোকহিতৈষণা ধর্মের অঙ্গ ছিল—তাহার স্বতন্ত্র নামের প্রয়োজন হইত না। যে সমাজে মানুষ সমাজেরই ছিল—সে সমাজে স্বদেশপ্রীতি স্বাভাবিক ছিল।

রামেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন,—"পাশ্চাত্যগণের মধ্যে ফিলানথ্রপি নামে একটা পদার্থ আছে, তাহার বাঙ্গালা নাম লোকহিতৈষণা। তাঁহাদের এই লোকহিতৈষণাটি কোন সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে, সমগ্র মানবজগৎ এই হিতৈষণার বিষয়ীভূত। এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই হিতৈষণা পলিটিক্যাল ইকনমি শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। *** বিদ্যাসাগরকে এইরূপ ফিলানথ্রপিস্ট বলিলে গালি দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এবং এই মৌলিক বিভেদই তাঁহার চরিত্রকে পাশ্চাত্য চরিত্র হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটি অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।"

বিদ্যাসাগরের Patriotism সম্বন্ধে ১৩০৬ সালের ৪ঠা বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব।—"দেশের হিত-সাধনকারী philanthropist স্বতন্ত্র, আর কায়মনোবাক্যে দেশের স্বীয় মাহাত্ম্যের সমর্থনকারী patriot স্বতন্ত্র। যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্য এবং সব রক্ষা করিয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেন, তিনিই patriot। তিনি যদি নেপোলিয়নের ন্যায় রুধিরস্রোতে দেশকে ভাসাইয়া দিয়া দেশের অহিত সাধন করেন. আর বলেন যে, দেশের মহত্ত্ব যদি না রহিল, তবে তাহার হিতে কাজ নাই, তথাপি তিনি patriot। পক্ষান্তরে যাঁহারা কাটাছাঁটা আঁটাসাঁটা পোশাক এবং দোকান-সাজানিয়া গৃহসজ্জাতেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখেন, স্বদেশের কিছুই দুচক্ষে দেখিতে পারেন না, এমন কি, স্বদেশের সর্ববাদিসম্মত বিশিষ্ট উৎকর্ষ স্থানটিকেও যাঁহারা কেবল অন্যের দেখাদেখি নাক মুখ সিটকাইয়া ভালবাসেন, বলেন,—তা বইকি, তাহার ভালত্ব আপন চক্ষে দেখেনও না, দেখিতে জানেনও না, যাঁহারা স্বদেশের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না, তাহা দূরে থাকুক, উল্টা আরো যাঁরা স্বদেশকে নীচু করিয়া আপনারা উঁচু হইবার চেষ্টায় 'যাচিয়া মান' এবং 'কাঁদিয়া সোহাগের' কর্দমাক্ত পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হন, তাঁহারা যদি দেশের 'মাথা হেঁট করা' দেহের যাঁতা চালাইবার উপযোগী মহা মহা বহ্বাড়ম্বরে ব্যাপৃত হইয়া দেশহিতৈষিতার ধ্বজা উড়াইতে একমুহূর্তও ক্ষান্ত না হন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাদিগকে Garibaldi বলিব না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ওরূপ Garibaldi ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে আমরা patriot বলিতেছি। তিনি যদি একশত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন, দশ কোটি বিধবার মৃত সাধব্য পুনর্জীবিত করিতেন, তাহা হইলে বলিতাম, তিনি মস্ত একজন philanthropist। তাঁহাকে patriot বলিতেছি আরেক কারণে, যখন তিনি Woodrow সাহেবের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল হস্তে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক লেখনীযন্ত্র দ্বারা জীবিকা সংস্থানের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বুঝিলাম যে, হাঁ, ইনি patriot. যেহেতু ইনি খাওয়া-পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয়

বলিয়া জানেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সারাংশ সমস্তই ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে সভ্যতার কৃত্রিম কুহকাংশে পদাঘাত করিয়া স্বদেশীয় উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা বিদ্যা-বিনয়-দয়া-দাক্ষিণ্য-মহত্ত্ব এবং সদাশয়তা—সমস্তই আপনাতে মূর্তিমান্ করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, এ ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ সত্য সত্যই patriot ছাঁচে গঠিত। যখন দেখিলাম যে, 'এদেশের কিছু হইবে না' বলিয়া তিনি অকেজো মৌখিক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সংসর্গে বিমুখ হইয়া বাষ্পগদগদলোচনে গৃহ-কোটরে ঢুকিয়া আপনাতে আপনি ভর করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন—দীপ্ত দিবাকর অল্পে অল্পে তেজোরশ্মি গুটাইয়া অস্তাচলশিখরে অবনত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম যে, পূর্বজন্মে ইনি প্রাচীন রোম নগরের কোন একজন খ্যাতনামা patriot ছিলেন—পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে নিপতিত হইয়া মনের খেদে ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইতেছেন; অথচ কেহ তাঁহাকে পুঁছিতেছে না।”

স্ত্রীশিক্ষায় বিদ্যাসাগর

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৪৯ খৃস্টাব্দে কয়েকজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের সাহায্যে ও ভারতবন্ধু প্রাতঃস্মরণীয় জে· ই· ডি· বেথুন মহোদয়ের উদ্যোগে, কলিকাতা মহানগরীতে বর্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হইলেও, ইহার অনেক পূর্বে কলিকাতার নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত ও বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৮২০ খৃস্টাব্দের শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে দেখা যায় যে, উক্ত বৎসরের পাঠশালার পরীক্ষা গ্রহণ কালে দরিদ্র পরিবারের প্রায় ৪০টি বালিকা পরীক্ষা দিয়া নানাবিধ পারিতোষিক পাইয়াছিল। বালিকাগণের পরীক্ষা গ্রহণে সন্তুষ্ট হইয়া হিন্দুপ্রধান রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর লিখিয়াছিলেন : 'মহিলা শিক্ষাসমিতি দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাদিগকেও পরীক্ষা করা গেল, তাহাদের পড়া বানান অতিশয় সন্তোষজনক।'[১] ইহা হইতে বেশ জানা যাইতেছে যে, ঐ বৎসরের পূর্ব হইতে কলিকাতায় বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছিল। উক্ত বৎসরের সন্তোষজনক ফল দর্শনে উৎসাহিত হইয়া উক্ত সমিতির কর্তৃপক্ষ, শোভাবাজার, শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটিলিতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর উক্ত সমিতির হস্তে স্বরচিত 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন। স্ত্রীশিক্ষার উপযোগীতা ও আবশ্যকতা বুঝাইবার জন্য এবং উহা যে উচ্চশ্রেণীর ভদ্রসন্তানদের রীতিনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি উক্ত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়া সুশিক্ষিতা আর্য মহিলাগণের নামোল্লেখ দ্বারা তিনি স্ত্রীশিক্ষার গৌরব বর্ধন করিয়া উক্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, এবং আরও বলিয়াছিলেন যে 'যদি এই স্ত্রীশিক্ষাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়, তবে ইহার দ্বারায় প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।'[২] আমরা এই 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছি, এবং তাহা হইতে দুই-একটি আধুনিক অত্যাশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না ; 'আর এইক্ষণকার স্ত্রীদিগের মধ্যেও দেখ। মুরশিদাবাদে বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণী রানী ভবানী ছিলেন, তিনি বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আপন রাজ্যের তাবৎ বিষয়কর্মের হিসাব আপনি দেখিয়া ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতেন। ...আর রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে এক জন ছিলেন, তিনি বাল্যকালে নিজ গৃহকার্যের অবকাশে অধ্যয়নাদি করিয়া ক্রমে ক্রমে এমন

---

১ Raja Radhacaunt in his Report says, 'Several native girls educated by the Female Society were also examined whose proficiency in reading and spelling gave great pleasure.' Biography of David Hare by Pyary Chand Mittra Page 53

২ Raja Radhacaunt offered the Society, the manuscript of a pamphlet in Bengali the 'Stri Siksha Vidhayaka' on the subject of female education the object of which was to show that female education was customary among the higher classes of Hindus, that the names of many Hindu females celebrated for their attainments were known, and that female education, 'if encouraged will be productive of most beneficial effects.' Page 55, Biography of David Hare.

পণ্ডিত হইলেন যে, সকল শাস্ত্রের পাঠ দিতেন। পরে তিনি কাশীতে বাস করিয়া গৌড়দেশীয় ও তদ্দেশীয় অনেক লোককে পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার সুখ্যাতি দেদীপ্যমানা হইয়া সেখানকার সকলে তাঁহাকে অধ্যাপকের ন্যায় নিমন্ত্রণাদি করিতেন এবং তিনিও সভায় আসিয়া সকল পণ্ডিত লোকের সহিত বিচার করিতেন। এবং জেলা ফরিদপুরের কোটালীপাড়া গ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণের স্ত্রী ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ন্যায় দর্শনের শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীও মহামহোপাধ্যায়। ইহা অনেকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। এবং কলিকাতার রাজবাটীর[৩] সকলেই প্রায় লেখাপড়া জানেন।'[৪] এইরূপ উৎসাহ পাইয়া তিন-চারি বৎসর এই মহিলা শিক্ষা-সমিতির কার্য বেশ চলিয়াছিল। অনেকগুলি বালিকা বাৎসরিক, ষাণ্মাষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে উপস্থিত হইত। কিন্তু পরিশেষে এই শুভানুষ্ঠানের প্রথম অঙ্কুর অর্থাভাবের উত্তপ্তক্ষেত্রে পড়িয়া শুষ্ক হইয়া যায়। সকলের সমান আগ্রহ না থাকায় এবং যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে না পারায়, ইহা সূচনাতেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ১৮২৪ খৃস্টাব্দে ইহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিসমাপিত হইলে পরবর্তী ২৫ বৎসর কাল ইহা শ্মশানভস্মরূপে জনসাধারণে উপস্থিত হইয়া পড়িয়াছিল। শাপগ্রস্তা অহল্যা যেমন যুগযুগান্তর ধরিয়া পাষাণ কলেবরে কালাতিপাত করিতে করিতে সহসা শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে স্বমূর্তি পরিগ্রহ করিল ও নিজ কর্তব্য সাধন মানসে আপনার পথে চলিয়া গেল, তেমনি মানব-কুলের মুকুটস্বরূপ দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন বেথুন-সমাগমে শ্মশানভস্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। নূতন উৎসাহে নূতন করিয়া স্ত্রীশিক্ষার সূচনা হইল। বেথুনের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না, তিনি কায়মনোবাক্যে বঙ্গীয় অবলাকুলের কল্যাণ সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। যে কাজে যেমন গুরু, সেকাজে তেমনি শিষ্যও জুটিয়া থাকে। বেথুন বড়[লাটের] দরবারের ব্যবস্থাসচিব ছিলেন। বেতন পাইতেন অনেক টাকা। মান সম্ভ্রমে বড় লাটের প্রায় তুল্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু ব্যবহারে সরল অমায়িক লোক—বালকসদৃশ ছিলেন। তাঁহার নিকটস্থ হইলে তাঁহার সহিত কথা কহিলে বোধ হইত না যে, বড় লাটের বড় দরবারের ব্যবস্থা সচিবের নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছি, বোধ হইত যেন আপনাদের কোনো প্রবীণ আত্মীয় কিম্বা গুরুজনের সহিত আলাপ করিতেছি। এতদৃশ গুণসম্পন্ন মহাত্মা না হইলে কি এই নিগ্রহগ্রস্ত কৃষ্ণকায় জাতির প্রতি তাঁহার এমন গভীর প্রেমের সঞ্চার হইত? পরোপকারপরায়ণ বেথুন বঙ্গীয় ললনাগণের সুশিক্ষা সাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আর এক জন কৃষ্ণকায় মহাপুরুষ পশ্চাৎ হইতে বেথুন-হৃদয়কে বঙ্গীয় কুলকন্যাদের কল্যাণ সাধনে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন ; ইনিই অমরকীর্তিসম্পন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই সময়ে একবার হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও হিন্দু কালেজের সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণের পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হন, তিনি 'স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, রচনার বিষয় নির্ধারিত করেন। পরীক্ষায় কৃষ্ণনগর কালেজের নীলকমল ভাদুড়ী সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া এক স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত হন। উক্ত প্রবন্ধ সে সময়ের সংবাদ পত্রে ও শিক্ষা বিভাগীয় রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছিল। পারিতোষিক বিতরণ সভায় স্ত্রীশিক্ষার পরম বন্ধু বেথুন উপস্থিত ছিলেন, এবং উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা সভাস্থ সকলকে উৎসাহিত

---

৩ শোভাবাজার রাজবাটী।

৪ স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক, ১৫।১৬ পৃষ্ঠা।

করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের সদুপায় অবলম্বনের জন্য এবং বঙ্গদেশের নানা স্থানে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বদাই বেথুন-ভবনে গমন করিতেন। এই যাতায়াতে পরস্পরের মধ্যে গভীর আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল।

বেথুন সে সময়কার শিক্ষা সমিতির সর্বাধ্যক্ষ বা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপূর্বে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনপূর্বক বিষয় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শেল, ময়েট প্রভৃতি শিক্ষাবিভাগীয় সম্ভ্রান্ত কর্মচারিগণের এতই শ্রদ্ধা ও সমাদরের পাত্র হইয়াছিলেন যে, শিক্ষা বিভাগের কোনো কর্মই প্রায় তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন হইত না। অতি অল্প দিনের মধ্যে বেথুন ও বিদ্যাসাগরের সহোদরাধিক ভ্রাতৃভাবের সূত্রপাত হইবার ইহাও একটি কারণ। ক্ষুদ্রকায়া তটিনী যেমন পর্বতদেহ অতিক্রম করিয়া নিম্ন দিকে অবতরণ করিতে করিতে বৃহদায়তনা হইয়া প্রবল আবর্তে সাগরাভিমুখে ধাবমানা হয়, বেথুন-বিদ্যাসাগর সৌহার্দও সেইরূপ ত্বরিতগতিসম্পন্না স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবলতর ও গভীরতর আকার ধারণ করিল, সেকালে বেথুন ও বিদ্যাসাগরের সখ্যই বঙ্গমহিলাগণের সৌভাগ্যাকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল, সেই বন্ধুতার ফলস্বরূপ স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সংসাধিত হইয়াছে। এক্ষণে বিধাতার নিকট প্রার্থনা এই, যেন সেই মণিকাঞ্চন-যোগ-প্রসূত অমৃতধারা চির-প্রবাহিত থাকিয়া বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহার সিদ্ধিকামনায় তিনি নিজের শরীর, মন, ধন, মান, সুখ ও সম্পদ—সকলই উৎসর্গ করিতে সর্বদা মুক্তহস্তে অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা, তাঁহার এতাদৃশ গুণাবলীর চিরপক্ষপাতী ছিলেন। গুণময় বিদ্যাসাগর-বন্ধুমণ্ডলী শত শত বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অগ্রসর হইলেন। এই কার্যে সহায়তা করিতে গিয়া, সে সময় যাঁহারা সমাজকর্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বহুসম্মানাস্পদ মহোদয়গণের নামাবলী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা এরূপ ভাবে এই কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন যে, ইঁহারা প্রত্যেকেই বেথুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ইঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার জন্য সে সময়ে ইঁহাদিগকে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা সে উপদ্রবকে উপদ্রব বলিয়া মনে করেন নাই। দৌরাত্ম্যের ভাগটা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপরেই কিছু অধিক হইয়াছিল। কারণ সকলের মধ্যে তিনিই আবার তাঁহার ভুবনমালা ও কুন্দমালা নাম্নী কন্যাদ্বয়কে সর্বাগ্রে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এজন্য লোকের বিদ্বেষের পরিমাণটা তাঁহাকেই মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছিল। এ কার্যের জন্য উপরোক্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেককেই নানা প্রকারে ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল ; এমন কি সে সময়ে সংবাদ পত্র সকলও ইঁহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

বেথুন, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ও উন্নতি সাধন কল্পে আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। বেথুন, বিদ্যাসাগর, সমভিব্যবহারে সর্বদাই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসিতেন। ডেভিড্ হেয়ারের ন্যায় বেথুনও আসিবার সময়ে বালিকাদিগের জন্য নানা প্রকার খেলিবার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিতেন। বিদ্যালয়ে আসিয়া বালিকাদিগকে ঐ

সকল খেলনা দিতেন এবং বালক সাজিয়া তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতেন। প্রমাণ : 'তিনি প্রায়ই স্বভবন গমনকালে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে উভয় কক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয়াবাসে লইয়া যাইতেন। তাহাদের বালিকাসুলভ জুগুপ্সিত অত্যাচার সকল তিনি আহ্লাদপূর্বক সহ্য করিতেন। ভুবনমালা ও কুন্দমালা বেথুনের এতদূর স্নেহভাজন হওয়াতে লেডী ড্যাল্‌হাউসি প্রভৃতিও তাহাদিগকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন।'[৫] এইভাবে বিদ্যালয়ের কার্য বেশ সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। বেথুনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে অল্প দিন মধ্যে বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল। এত দিন বিদ্যালয়ের পৃথক আলয় ছিল না। বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোগী 'দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থানাভাব নিবন্ধন কিছুদিন পরে, সেখান হইতে গোলদীঘির দক্ষিণপূর্ব কোণের বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের বাটী নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। বালিকাদিগকে বিনা বেতনে ও তৎপরে অল্প বেতনে পড়ান হইত। শিক্ষকগণের বেতনের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইত, তাহাও অধিকাংশ বেথুন আহ্লাদ সহকারে নিজ হইতে ব্যয় করিতেন। বালিকাদিগকে বাড়ি হইতে গাড়ি করিয়া আনিতে হইত, সেজন্যও মাসে মাসে অনেক অর্থ ব্যয় হইত। সমগ্র ব্যয়ের অধিকাংশই বেথুন সাহেব নিজে গ্রহণ করিয়া এই বালিকা বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

১৮৫১ খৃস্টাব্দের বর্ষাকালে বেথুন গঙ্গার পরপারে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্তী জনাই গ্রামের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে সেখানকার বিদ্যালয় পরিদর্শন মানসে গমন করিয়াছিলেন। পথে বহুক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও বহুদূরব্যাপী কর্দমময় পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তিনি জনাই গ্রামে উপস্থিত হন। সহৃদয় বেথুন উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই তাঁহার শেষ কার্য হইল। সহসা তাঁহার দুরারোগ্য জ্বরের সূচনা হইল, এবং তিনি সেই পীড়ায় লোকলীলা সংবরণ করিলেন। বেথুন-বিয়োগে বিদ্যাসাগর বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। ভারতের পরম বন্ধু বঙ্গমহিলাগণের চিরসুহৃদ বেথুনের লোকান্তর গমনে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল ধরিয়া অতি বিষণ্ণভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন এবং তৎপরে বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অনেক চিন্তা ও অনেক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। শেষে নানা প্রকার মতদ্বৈধ নিবন্ধন তিনি বেথুন-বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার পরিত্যাগ করেন। প্রতিষ্ঠার সময়ে বিদ্যালয়ের নাম ছিল হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়। বেথুন নিজের উইলের দ্বারা এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই অর্থে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ হয় এবং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁহারই নামে উক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে।

বেথুনের লোকান্তর গমনে বিদ্যালয় লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিপন্ন হন, তখন প্রাতঃস্মরণীয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর পত্নী সদাশয়া লেডী ক্যানিং বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে অগ্রসর হন, এবং ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বারা প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। লেডী ক্যানিং-এর চেষ্টায় রাজসরকার হইতে বিদ্যালয় রক্ষার জন্য বিশিষ্টরূপ চেষ্টা হইয়াছিল। সেই জন্য পরবর্তী অনেক ঘটনাসূত্রে উক্ত বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক সময়ে বেথুনের নামের দোহাই দিয়া এবং লেডী ক্যানিং-এর সহকারিতার উল্লেখ করিয়া বিদ্যালয়ের জীবন রক্ষা

---

৫ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত, ২৩ পৃষ্ঠা।

করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সেকালে বেথুন বিদ্যালয়ের যে গাড়িতে বালিকারা পড়িতে আসিত, তাহার গাত্রে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়তিযত্নতঃ' এই শাস্ত্রবচন লিখিত থাকিত। এরূপ লিখিয়া দিবার তাৎপর্য এই যে, লোকে বুঝিবে যে স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রসম্মত ও সদাচারানুমোদিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের লোক সহজে কিছু বুঝিতে চায় না, অনেক স্থলে বুঝিয়াও বুঝে না, ষোল আনা বুঝিলেও তদনুসারে কাজ করিতে পারে না। এই স্ত্রীশিক্ষার স্রোত এত মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া আমাদের কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে। সে কালের স্ত্রীশিক্ষা প্রচার তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাদের সহায়তায় যেরূপ সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিল, বর্তমান কালেও মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয়, রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণের সহায়তা ও সংস্রবে যে যথাবিধি পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু এক শ্রেণীর লোক চিরদিনই সকল প্রকার সদনুষ্ঠানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে ও তাহার দোষ প্রচার করিতে নিত্য ব্যস্ত। অন্যে ভাল খাইলে, ভাল পরিলে, অন্যকে সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে দেখিলে, যাহাদের চক্ষু টাটায়, সেরূপ উন্নতিকাতর লোকমণ্ডলী চিরদিনই কোনো প্রকার সদনুষ্ঠানের সূচনা হইতে না হইতেই, তাহার সর্বনাশ সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে। ছায়া যেমন মনুষ্যের চিরসঙ্গী হইয়া সর্বত্র সমভাবে বিরাজ করে, কোনো প্রকার শুভানুষ্ঠানের সূচনাতে বিরোধীদলের অভ্যুদয়ও চিরসহচররূপে বিরাজিত থাকা তদনুরূপ অপরিহার্য। স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ত একটা অতি বৃহৎ ব্যাপার, গোল আলু প্রচলন সময়ে সুসভ্য ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডে একটা ছোট খাট যুদ্ধ হইয়াছিল। কয়েকটা লোক সে বিরাট ব্যাপারে প্রাণ হারাইয়াছিল, অনেকে জখমও হইয়াছিল। যে গোল আলু ভারতে নির্ব্বিবাদে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই প্রথম প্রচলনে যখন সুসভ্য ইংরাজমণ্ডলীর মধ্যে একটা বিরাট ব্যাপার হইয়াছিল, তখন আর স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রচলনে কেন যে ভারতে কুরুক্ষেত্রের সমর-প্রাঙ্গণ প্রকটিত হইবে না, ইহা আমাদের বোধাতীত। তবে একটা কথা এই যে, যাঁহারা গোল করেন তাঁহারাই আপনাদিগকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মনে করেন তাঁহারাই যেন ভারতের সুপবিত্র নামের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতেছেন। এতাদৃশ সুসন্তানগণ যদি স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে খড়্গহস্ত হন, তবে তাঁহারা তদ্দ্বারা আপনাদেরই অপদার্থতার পরিচয় দিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খনা ও লীলাবতীর নামে, সীতা ও সাবিত্রীর নামে, পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর নামে গৌরবস্ফীত বক্ষে ও উচ্চকণ্ঠে আত্মপ্রশংসা করিয়া তাহাতে হাবুডুবু খাওয়া তাঁহাদের ভাল দেখায় না। যে দেশ গার্গী ও আত্রেয়ীর নামে গৌরবান্বিত, যে দেশের শাস্ত্রবিশেষের গঠন কার্য রমণীর মুখনিঃসৃত ও পবিত্র উক্তি সকলের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, যে দেশে আধুনিক কালেও স্ত্রীলোক বিদ্যালঙ্কার উপাধি পাইয়া অধ্যাপকমণ্ডলীর সভায় সমাদৃত, সে দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ দেশে অধঃপতনের পরিচয়স্থল।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, স্ত্রীশিক্ষা ত এক প্রকার প্রচলিত হইয়াছে, তবে আর এ সকল কথার অবতারণা কেন ? অবতারণার কারণ এই যে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পরমবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুনাম ও প্রতিষ্ঠার প্রতি দেশের লোকের অবজ্ঞা জন্মাইবার জন্য স্ত্রীশিক্ষার সংস্রবে এখনও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিন্দুবুদ্ধির বিপর্যয় ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে,

সত্য সত্যই কি স্ত্রীশিক্ষা ধর্মবিরুদ্ধ সংস্কার, না সাময়িক দেশাচারবিরুদ্ধ সংস্কার ? হিন্দু সমাজের অভিভাবক স্থানীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' রচনা করিয়া তাহাতে বলিয়াছেন :

'অতএব তাহাদিগকে যেমন গৃহকার্যাদি শিক্ষা করান তেমন বাল্যকালে যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত হয়। ...আর দ্বিতীয়তঃ কোন শ্রুতি ও স্মৃতিতে স্ত্রীলোককে বিদ্যাভাস করিতে নিষেধ বচন লিখেন নাই। ...নীতি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে স্ত্রীলোককে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক. ইহাতে স্ত্রীলোককে পাঠ করান অবশ্য কর্তব্য হয়। ...এখন সকলের উচিত হয় যে আপন আপন পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতী স্ত্রীকে আনাইয়া বাটীতে রাখিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান এবং যাহারা নির্ধন তাহাদিগকে অনুমতি দিয়া যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎকাল পাঠশালায় পাঠান।'[৬] তাঁহার বেলায় 'সাত খুন মাপ' ! যখন রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া স্ত্রীশিক্ষা পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, নিজে বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন দোষ হয় নাই ; দোষ হইল, যখন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্মজ্ঞ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য অনুভব করিয়া এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ! এখন সেই চিরনীরব ও পরলোকগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র নামে নিন্দা দাগ পাড়িতে অগ্রসর হওয়া কি ভাল দেখায় ? আমরা বুঝিতে পারি না দুরদৃষ্ট কোন্‌টি ? আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের ঐরূপ অসঙ্গত সমালোচনা, না বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে সহকারিতা ? জনৈক বিদূষী বঙ্গমহিলার কাব্য-কানন পরিভ্রমণ উপলক্ষে হিন্দুপ্রধান মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন : 'এই রচনাগুলি দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষার যে সুফল ফলিয়াছে, ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।' আর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন : 'একটি খাঁটি মন, একটি ঋজু হৃদয়, একটি সত্ত্বগুণের মূর্তি দেখিলাম। ...মনে হইয়াছে আমাদের স্থূল প্রাণীকে নিষ্কাম বিশ্বজনীন ধর্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, এমন প্রাণীও দেশে এখনও আছে।'[৭] বর্তমান সময়ে স্ত্রীশিক্ষাবিরোধীদলের অসার ও ভ্রান্ত মতের এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ঠ ও উপযুক্ত প্রতিবাদ আর কি হইতে পারে ?

নারিকেলের জল উত্তম বস্তু, কিন্তু কাংস্য পাত্রস্থ হইলে তাহার উৎকৃষ্টতা লোপ পায়—তাই বলিয়া কি ডাবের জল চিরনিষিদ্ধ, কেহ আর ডাবের জল পান করিবে না ? পাত্রদোষে স্ত্রীশিক্ষার ফল মন্দ হইতে পারে, তাই বলিয়া জনসমাজের অর্ধাধিক লোককে নিরক্ষর করিয়া রাখাই কি বুদ্ধিমানের কাজ ? সে হিসাবে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্বোধ লোক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহারাই মনুষ্যোচিত কার্য করিয়া জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে যাঁহারা বেথুন-বিদ্যালয়ের সহিত সংসৃষ্ট আছেন, তাদৃশ কোনো ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলেই বেথুন-স্কুলের সংবাদ লইতেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির বৎসরাধিককাল পূর্বে,একদিন,তাঁহার প্রাচীন বন্ধু বোলপুর নিবাসী প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয় তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহের বিলাত যাওয়ার সম্ভাবনা নিবন্ধন পুত্রবধূ

৬ রাজা রাধাকান্ত দেব প্রণীত স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক, ১৮।২০।২১।২২ পৃষ্ঠা।
৭ শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত কাব্যকুসুমাঞ্জলির সমালোচন-পুস্তিকা।

শ্রীমতী সুশীলাবালা সিংহকে বেথুন কালেজে স্থায়ীভাবে ভর্তি করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লেখেন, তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় হেমেন্দ্রবাবুর পত্নী সুশীলাবালাকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে গিয়া, বালিকা ও শিক্ষায়িত্রীদিগকে দেখিয়া আনন্দে অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন। আসিবার সময়ে সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। সত্যযুগের একটি ঝি তখনও জীবিত থাকিয়া পুরাতন কীর্তি কাহিনীর স্মৃতি রক্ষা করিতেছিল, সে সম্মুখে আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে যখন প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল এবং সেই পুরাতন কথা সকল স্মরণ করাইতে লাগিল, তখন মধুর প্রকৃতি বিদ্যাসাগর-হৃদয় উথলিয়া উঠিল, সাগরে তুফান দেখা দিল, বানের জলের ন্যায় চক্ষু হইতে সবেগে জলধারা প্রবাহিত হইল। স্কুলের দালানে বেথুনের প্রস্তরমূর্তির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বহুক্ষণ অশ্রুপাত করিলেন। সেই পুরাতন দাসীকে নূতন বস্ত্র দিয়া আর সকলের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া গৃহে আসিলেন। শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া, দালান হইতে প্রাঙ্গণে অবতরণ কালে দেখিলেন যে, ৩।৪টি শিক্ষক মাত্র তাঁহার স্নেহ প্রদর্শনে বঞ্চিত হন, তখন সঙ্গে পাল্‌কি বেহারাদের জন্য একটি টাকা ছিল, তাহাই তাঁহাদের একজনের হাতে দিয়া বলিলেন, 'এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে, তোমরাও এই যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিও, বাদ যাওয়া বিধেয় নহে।' গৃহে আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সুনির্মল নীলাকাশসদৃশ স্বচ্ছ হৃদয় বিষাদ মেঘে আবৃত হইল। তাঁহাকে অনেক সময়ে দেখিয়াছি, কিন্তু সে দিন সে মুখমণ্ডল যে ঘোর বিষাদের ছায়া দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম[৮] সেরূপ অতি অল্পই দেখিয়াছি। অতিমাত্র ব্যাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার অসুখ কি খুব বাড়িয়াছে?' কোনো জবাব নাই। ক্ষণকাল পরে অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা আমাকে সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে বলিলেন। আস্তে আস্তে বসিলাম। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, 'না আমার অসুখ বাড়ে নাই। যেমন তেমনি আছে। আমি বলিলাম, 'তবে আপনাকে এত কাতর দেখিতেছি কেন?' তিনি বলিলেন,'বেথুন স্কুলে গিয়াছিলাম, সব দেখে শুনে বড়ই সুখ হইল।' আমি হতভাগ্য, সাগরের তরঙ্গভঙ্গির তলদেশে কি অমূল্য রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহা না বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাতে দুঃখ কি?' সেই বীরপুরুষ বিরোচিত আগ্রহ সহকারে বলিলেন, 'এতগুলি মেয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে, তারাই আবার সেই স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিল, সে দেখিল না। নিজের পদমর্যাদা ভুলিয়া যে ব্যক্তি বালিকাদের সঙ্গে খেলা করিত, আর নিজে ঘোড়া হইয়া, হামা দিয়া, বালিকাদিগকে পিঠে তুলিয়া ঘোড়ায় চড়াইত, যাহার পিঠের উপর বালিকারা বসিয়া খেলা করিত সে দেখিল না!' এই বলিতে বলিতে অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি নিজের পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পাঠককে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, বেথুন-স্মৃতিই বিদ্যাসাগরহৃদয়ে শোক-প্লাবন প্রবাহিত করিয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সন্দর্শনে তাঁহার উদার হৃদয়ে আনন্দের যে বিজলী-লীলা বিকশিত হইতেছিল সুহৃৎশোকজনিত ঘন অন্ধকারে তাহা অচিরে লুক্কায়িত হইল। তিনি গভীর বিষাদভরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'কি লোকই আসিয়াছিল!'

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কেবল কলিকাতার বেথুন-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন কার্যে

---

৮ তিনি বেথুন-স্কুল হইতে আসিয়া যখন একাকী কালাতিপাত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম।

সহায়তা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। পূর্বে আমরা বলিয়াছি, ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের বাচনিক আদেশে মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়া জেলার নানাস্থানে বহুসংখ্যক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং সেই সকল বালিকাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লইয়াই শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত স্থায়ী মনান্তরের সূচনা হইয়াছিল। (১০০ পৃষ্ঠা ও কর্ম পরিত্যাগ বিষয়ক ১৩শ ও ১৪শ পত্র, ১১৬-১৭ পৃষ্ঠা) বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ সকল বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে ছোট লাট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুরোধ সম্বন্ধে কোনো সরকারী কাগজপত্র কিংবা লিখিত আদেশ ছিল না। কাজে কাজেই অনাত্মীয়তা স্থলে ইয়ং সাহেব বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার উন্নতিকল্পে অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন, এবং সে চেষ্টায় কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। ঐ চারি জেলার নানাস্থানে প্রায় পঞ্চাশটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সমুদায় ব্যয়ভার নিজস্কন্ধে গ্রহণ করা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দুইজন পণ্ডিত ও একটি করিয়া দাসী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ইহাদের বেতন ভিন্ন অন্য ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। বালিকারা বিনা বেতনে পড়িত। তাহাদের পাঠ্যপুস্তক, লিখিবার কাগজ, শ্লেট, পেন্সিল, সমস্তই দিতে হইত। এই বৃহৎ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া কর্ম পরিত্যাগ করায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

বালিকাবিদ্যালয় বিষয়ক বিল মঞ্জুর না হওয়াতে, ছোট লাট বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিজের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি কখনও কাহারও নামে নালিশ করি নাই, অতএব আপনার নামে কি প্রকারে অভিযোগ করিব, ঐ টাকা আমি নিজে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিব।'[৯] বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কর্তৃপক্ষের এইরূপ আচরণে মর্মাহত হইয়া কেবল ঋণভার স্কন্ধে লইয়াছিলেন তাহা নহে, পাঁচশত টাকার চাকুরিটি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ সকল বালিকাবিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিষয়েও তৎপরে বহুদিন পর্যন্ত আগ্রহসহকারে নিযুক্ত ছিলেন। এই কার্যে তাঁহার ইংরাজ বন্ধুদের কেহ কেহ মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। স্যার সিসিল বিডনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৬৩ খৃস্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে স্যার সিসিল বিডন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ : 'প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়, ...এই বৎসরের এপ্রিল, মে, জুন এই তিন মাসের বালিকাবিদ্যালয়ের ফণ্ডের মাসিক চাঁদা হিসাবে, এতৎসহ ১৬৫ টাকার একখানি হুণ্ডি পাঠাইতেছি।'[১০]

ইং, ১৭ আগস্ট, ১৮৬৬

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সমীপে।

প্রিয় মহাশয়,

এক্ষণে আহ্লাদ সহকারে আমি বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য স্যার সিসিল বিডনের ১৮৬৬

---

৯ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত, ১২৮ পৃষ্ঠা।

১০ My dear Pundit...I enclose a cheque for Rs.165 on account of my subscription to your Female School Fund for April, May & June 1863—Yours very truly, C Beadon

সালের প্রথম অর্ধেকের মাসিক চাঁদা হিসাবে ৩৩০ টাকার একখানি হুণ্ডি পাঠাইতেছি। চেক বইখানি কলিকাতায় ফেলিয়া আসায় এইরূপ বিলম্ব হইয়াছে।

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন
(স্বাক্ষর) এইচ্ রাবান্

এই সকল বিদ্যালয়ের অনেকগুলি বহুকাল জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। এই সমুদায় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামেও একটি বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতের বেতন ও বালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তকাদি হিসাবে মাসে মাসে অন্যূন ৩০ টাকা ব্যয় হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল ধরিয়া এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্যার বার্টল ফ্রেয়ারকে যে সুবৃহৎ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করা গেল : "আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়া সুখী হইবেন যে মফঃস্বলের যে সকল বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে আপনি অনুগ্রহ করিয়া সাহায্য করিয়াছেন, সে সকল বিদ্যালয়ের কার্য বেশ চলিতেছে। কলিকাতার নিকটবর্তী জেলা সমূহে স্ত্রীশিক্ষার আদর ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে এবং এক একটি করিয়া বালিকাবিদ্যালয়ও সময়ে সময়ে স্থাপিত হইয়াছে।'

তিনি কোনো কার্যের ভার লইয়া প্রতিকূল ঘটনা নিবন্ধন তাহা ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। ধরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, করিতে বসিয়া না করা, আশ্বাস দিয়া নিরাশ করা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। শত শত বাধা বিঘ্ন, অভাব ও অসুবিধায় পড়িয়াও যখন তিনি এইরূপে নিজ ব্যয়ে ও বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রাণ রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের শেষভাগে পরহিতৈষণাব্রতধারিণী কুমারী কার্পেন্টার ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। বালিকা কার্পেন্টার মহাত্মা রামমোহন রায়কে দেখিয়া অবধি ভারতবর্ষকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলেন, 'রাজা রামমোহন রায়ই তাঁহার মনে ভারতের হিতসাধনেচ্ছা প্রথম উদ্দীপ্ত করিয়া দেন।'[১১] তিনি জগদ্বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বক্তৃতা বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষবাসী নরনারীমণ্ডলীকে আরও অধিকতর স্নেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মিস্ কার্পেন্টারের শুভপদার্পণে ভারতের নানাস্থানে অভ্যর্থনা ও সমারোহের বহুবিধ আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী উপনগর সকলেও সেরূপ অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় নাই। বরাহনগর ও উত্তরপাড়ার অনুষ্ঠানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুমারী কার্পেন্টার কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া বেথুন-সুহৃদ্ ও অবলাবান্ধব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তদনুসারে তদানীন্তন ডিরেক্টর এট্‌কিন্‌সন্ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক পত্র লিখেন, সেই পত্র এই :

২৭শে নভেম্বর, ১৮৬৬

প্রিয় পণ্ডিত মহাশয়,

মিস্ কার্পেন্টারের নাম অবশ্যই আপনি শুনিয়া থাকিবেন। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ

---

১১ রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ২২২ পৃষ্ঠা।

করিতে ও ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে আলাপ ও সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে চাহেন। আপনি কি আগামী বৃহস্পতিবার সাড়ে এগারটার সময় বেথুন স্কুলে আসিতে পারেন ? আমি তাঁহাকে সেই সময়ে, বেথুন বিদ্যালয় প্রথম দেখাইবার জন্য লইয়া যাইব। একটু গোপনভাবেই যাওয়া হইবে, আমাদের সঙ্গে অপর কেহ থাকিবে না, সেই জন্য আপনার সহিত আলাপ করাইয়া দিবার বেশ সুবিধা হইবে। ইহার পর আর এক সময়ে বিদ্যালয়ের কমিটির সভ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্ভবতঃ তিনি খুব সম্মত। মিস্টার সিটন কার যতদিন কলিকাতায় ফিরিয়া না আসেন, ততদিন ঐরূপ প্রকাশ্যভাবে সকলের সহিত আলাপ স্থগিত রাখাই ভাল।

একান্ত আপনারই
ডব্লিউ· এস· এট্‌কিন্‌সন্

মিস কার্পেন্টারের সহিত পরিচয় হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রপাত হইল। আলাপ পরিচয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এমন কি মিস্ কার্পেন্টার যেখানে যখন যাইতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিতেন। সকল স্থানে না হইলেও, কোনো কোনো স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয় মিস্ কার্পেন্টারের সঙ্গী হইতেন। উত্তরপাড়া বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় মিস্ কার্পেন্টারের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সঙ্গে গিয়াছিলেন। উড্রো ও এট্‌কিন্‌সন্ সাহেবও সেই সঙ্গে ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি বগিগাড়িতে বালী স্টেশন হইতে উত্তরপাড়া যাইতেছিলেন, উত্তরপাড়ার অতি নিকটে পথে একস্থানে মোড় ফিরিবার সময়ে গাড়িখানি উল্টাইয়া পড়ে, সেই পতনে বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ি হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হন। গুরুতর আঘাতে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রাজপথের অনতিদূরে তিনি একস্থানে পতিত হইলেন, ঘোড়াও গাড়ি সমেত অন্যত্র পতিত হইল। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া পথের লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছিল, কিন্তু কেহই তাঁহার সহায়তায় অগ্রসর হয় নাই। মিস্ কার্পেন্টারের গাড়ি আসিলে পর, তিনি সেই লোকারণ্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সত্বরপদে নিকটে গেলেন এবং তিনি সেই পথের পার্শ্বে নিম্নভূমিতে বিদ্যাসাগরকে ক্রোড়ে তুলিয়া বসিলেন এবং রুমাল দিয়ে মুখ মুছাইয়া দিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে আমাদিগকে বলিয়াছেন : 'যখন আমার চেতনা হইল, আমার বোধ হইল যেন আমার মাতৃদেবী আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছেন, আর স্নেহভরে পুত্রের সেবা করিতেছেন। স্বশরীরে সেই একবারে স্বর্গভোগ করিয়াছিলাম। সে দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও আমি মিস্ কার্পেন্টারের সেই স্নেহপূর্ণ বাৎসল্য লাভ করিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম।' বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন তখন তাঁহার মুখের ভাবে ও অশ্রুজলে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গভীর ভক্তির চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছিল। এই শকট হইতে পতনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুস্থ শরীরে রোগ, সবল শরীরে দুর্বলতা এবং শান্ত চিত্তে অশান্তির সূত্রপাত করিল। তাঁহার যকৃতে গুরুতর আঘাত লাগে। তাঁহার দেহ অপটু হইল, তাঁহার স্বাস্থ্য নাশ হইল। মধ্যাহ্ন সূর্যের তীক্ষ্ণ তেজ ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পড়িয়া যাওয়াতে সে সময়ে চরিদিকে এক মহা হুলস্থূল

পড়িয়াছিল এবং সে সময়ের সুবিখ্যাত গায়ক ধীরাজ এই ঘটনা অবলম্বনে এক গীত রচনা করিয়াছিলেন।

('বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর' গানের সুর)

অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে,
করে তুলেছে তোলাপাড়ি, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি,
মিস্ কার্পেন্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে,
এখন এসে কলকেতাতে (এবার) বাঙ্গালীদের নে' পড়েছে।
উত্তরপাড়া স্কুল যেতে, বড়ই রগড় হলো পথে,
এট্‌কিন্‌সন্ উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে ;
নাড়া চাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে,
গাড়ি উল্টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে ॥[১২]

সেই পতনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যকৃতে এরূপ গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল যে, ঐ স্থানের বেদনায় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি সুযোগ্য চিকিৎসকগণ যকৃত-স্ফোটক (লিবার এবসেস্) হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। মিস্ কার্পেন্টার দীর্ঘকাল কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন, এবং সর্বদা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংবাদ লইতেন। কলিকাতা ত্যাগের কিছু পূর্বে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা এই :

প্রিয় মহাশয়,—আপনি পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম ; এবং সেই জন্য আমার ভয় হইতেছে যে, আগামী বুধবার প্রাতঃকালে আমার কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে আপনার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না।

আমি আগামী কল্য অপরাহ্ণ চারিটার সময়, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য অনেকগুলি দেশীয় বন্ধুকে আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকিলে, আশা করি, আপনিও আসিবেন।

আপনার চিরবিশ্বাসভাজন,
মেরি কার্পেন্টার

বেথুন স্কুলে স্বতন্ত্রভাবে কতকগুলি মহিলাকে শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়, মিস্ কার্পেন্টারের এইরূপ ইচ্ছা ছিল, এবং যাহাতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, সে বিষয়েও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, চেষ্টা কার্যে পরিণত হইয়াও স্থায়ী হয় নাই। স্থায়ী হইলে ফল কিরূপ হইত বলা যায় না।

স্যার উইলিয়ম গ্রে, মিস্টার সিটনকার, মিস্টার এট্‌কিন্‌সন্ প্রভৃতি সাহেবগণ এবং বাঙালীদেরও কেহ কেহ মিস্ কার্পেন্টারের উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিয়াছিলেন। কিন্তু

---

১২ শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত বিদ্যাসাগর-বিষয়ক পুস্তিকা, ১৬ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই প্রস্তাবে বিরোধী হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থায়ী সহানুভূতির অভাবেই, প্রধানতঃ উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করার জন্য মিস্ কার্পেন্টারের প্রস্তাবমতো বেথুন বিদ্যালয়েই একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য স্যার উইলিয়ম গ্রে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং সেই কার্যের ঔচিত্যানৌচিত্য অবধারণের জন্য ১৮৬৭ খৃস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর একখানি দীর্ঘ পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। সে পত্রে তিনি শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করণের পক্ষ সমর্থন ও তদভাবে বেথুন বিদ্যালয়ে বহু অর্থ ব্যয় যে বৃথা হইতেছে, তাহার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যুক্তি প্রণালী অবলম্বনে তাঁহার প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ করিয়া নিজের মত প্রবল রাখেন এবং যে বৃহৎ পত্রখানির চাপে সে সময়ের সে প্রবল আয়োজন বিফল হইয়া গিয়াছিল, তাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। সেই পত্র পাঠে দেখা যায় যে, তিনি কেমন সুন্দর উপায়ে সকল দিক বজায় রাখিয়া উন্নতি সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা এত অধিক মাত্রায় অনুভব করিতেন বলিয়া, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের সেই প্রথম অবস্থায়—দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া অতিমাত্রায় অগ্রসর হওয়ায় পাছে সমূলে সর্বনাশ সাধন হয়, এই আশঙ্কায় সর্বদা সতর্ক হইতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সুবিবেচনা-পরিচালিত পথে স্ত্রীশিক্ষার শৈশবকাল কাটিয়াছিল বলিয়াই আজ স্ত্রীশিক্ষার স্রোত কথঞ্চিৎ প্রবল গতিতে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছে। তিনি যে যুক্তিমার্গ অবলম্বনে উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পত্রে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই পত্রখানি এই :

কলিকাতা
১লা অক্টোবর, ১৮৬৭

মাননীয় স্যার উইলিয়ম গ্রে
প্রিয় মহাশয়,

আপনার সহিত শেষ দেখা হওয়ার পর আমি বিশেষ সাবধানতা সহকারে অনুসন্ধান করিয়াছি, এবং বিশেষভাবে চিন্তাও করিয়াছি কিন্তু মিস্ কার্পেন্টারের প্রস্তাবিত হিন্দুসাধারণের গ্রহণোপযোগী একজন শিক্ষয়িত্রী, বেথুন স্কুলের হউক, বা অন্যত্রই হউক, প্রস্তুত করার পথে বিষম অন্তরায় রহিয়াছে বলিয়া আমার যে ধারণা আছে, সে ধারণার পরিবর্তন করিবার কোনো কারণ দেখিতেছি না। এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আমি যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমার দৃঢ়রূপে এই প্রত্যয় জন্মিতেছে যে, হিন্দুভাব ও হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থা এই অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরোধী ; ইহার দ্বারা কোনোও শুভফলের প্রত্যাশা নাই বলিয়াই, আমি গভর্ণমেন্টকে সাক্ষাৎভাবে এই কার্যের ভার লইতে ন্যায়তঃ কোনো পরামর্শ দিতে পারি না। আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, কোনো সম্ভ্রান্ত হিন্দু তাঁহার বয়ঃস্থা আত্মীয়াগণকে শিক্ষয়িত্রীর কার্যে রত হইতে দিবেন না। তাঁহারা বর্তমান সময়ের সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া ১০/১১ বৎসরের বিবাহিতা বালিকাদিগকেও অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে দেন না। একমাত্র আত্মীয়-স্বজনশূন্য অসহায়া বিধবাদিগকে এরূপ কার্যে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এদেশীয় পুরনারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উপযুক্ত কিনা, সে প্রশ্ন না তুলিয়া, আমি কেবল এই বলিতে চাই যে তাহারা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিলেই লোকের মনে আপনা আপনি নানা প্রকার সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কারণ

উপস্থিত হইবে, এবং তদ্দ্বারা গভর্ণমেন্টের এই অনুষ্ঠানের সাধু উদ্দেশ্য সহজেই বিনষ্ট হইবে।

এই বিষয়ের সফলতা সাধনের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি সরকারি বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত হইয়াছে—এ বিষয়ে (Grant-in-aid) অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হওয়াই, লোকসাধারণের মনের ভাব বুঝিবার সুন্দর উপায় বলিয়াই বোধ হয়। যদি এদেশের লোক মিস্ কার্পেন্টারের প্রস্তাবিত স্ত্রীশিক্ষাপদ্ধতি পছন্দ করে, তাহা হইলে অর্থসাহায্য চাহিয়া আবেদন করিলে. গভর্ণমেন্ট প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া তখন তাহাদের কার্যের সহায়তা করিতে পারেন। যদিও আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এদেশের অধিকাংশ লোকই ঐরূপ সাহায্যের প্রার্থী হইবে না, তথাপি যে সকল লোক ইহার সফলতায় অতিমাত্র আশা স্থাপন করিতেছেন, সত্য সত্যই যদি তাঁহাদের আগ্রহ ও অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, গভর্ণমেন্ট প্রদত্ত সাহায্য গ্রহণ করিয়া এ অনুষ্ঠানের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।

আমি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতেছি যাঁহারা এই অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী তাঁহাদের কার্যে আমার বিশেষ আস্থা নাই। কিন্তু ভারত গভর্ণমেন্টের প্রচারিত নিয়ম বিদ্যমান থাকিতে তাঁহাদের আর অনুযোগ করিবার কোনো সুযোগ থাকিবে না।

বলা বাহুল্য যে আমি স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষয়িত্রীর অবশ্যকতা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকি এবং যদ্যপি আমার স্বদেশীয়দিগের সামাজিক সংস্কার এরূপ দুরতিক্রমণীয় বাধারূপে না দাঁড়াইত, তাহা হইলে সকলের অগ্রে আমি এই কার্যের পোষকতা ও সহকারিতা করিতে অগ্রসর হইতাম। কিন্তু যখন দেখিতেছি যে কোনোমতেই এ কার্যে কৃতকার্য হওয়া সম্ভবপর নহে, এবং গভর্ণমেন্ট এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে আপনারাই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অপদস্থ হইবেন, তখন আমি কোনোমতেই এ কার্যে সহকারিতা করিতে সম্মত নহি।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে বেথুন স্কুলের উন্নতিকল্পে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, ফল তাহার অনুরূপ হয় নাই। এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলি যে, তাই বলিয়া বিদ্যালয়টি একেবারে উঠাইয়া দেওয়া আমার মতে কোনো প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। ভারতে স্ত্রীজাতিয় জ্ঞানোন্নতির চিহ্নরূপে, যে পরসেবাব্রতপরায়ণ মহাত্মার নামে উক্ত বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে আমার বিবেচনায় ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে গভর্ণমেন্টের সাহায্য করা নিতান্ত কর্তব্য। তৎপরে ইহাও বাঞ্ছনীয় যে, এদেশের রাজধানীতে একটি সুপরিচালিত বালিকাবিদ্যালয় বিদ্যমান থাকিয়া মফঃস্বলের নানাস্থানের বালিকাবিদ্যালয়সমূহের আদর্শরূপে কার্য করিতে পারে। হিন্দু সমাজের উপর বর্তমান বিদ্যালয়টির নৈতিক শক্তির প্রভাব অনেক। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিদ্যালয়টি ইহার নিকটবর্তী জেলাসমূহে স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধন করিয়াছে। এইজন্য আমার বিবেচনায় বৎসর বৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই বিদ্যালয়টি রক্ষা করাতে যে লাভ হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু বোধ হয় চেষ্টা করিলে ব্যয়সঙ্কোচ ও উন্নতি সাধন উভয়ই করা যাইতে পারে। সুবিবেচনা সহকারে চেষ্টা করিলে বিদ্যালয়ের কোনো ক্ষতি না করিয়া বোধ হয় অর্ধেক ব্যয় কমান যাইতে পারে।

আমি স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় দীর্ঘকালের জন্য উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইবার মানস করিতেছি। যদি আপনি বেথুন স্কুলের নূতনরূপ ব্যবস্থা করিতে চান, আর সে বিষয়ে আমার

মতামত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি আপনার কলিকাতায় ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে এবং এ বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে সানন্দে সম্মত আছি।

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন
(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

সুন্দরবন, ১৪ই অক্টোবর, ১৮৬৭

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা সমীপে
প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১লা অক্টোবরের পত্র পাইয়া অত্যন্ত অনুগৃহীত হইলাম। পত্রখানি বহুবিধ জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, আশা করি, আপনি কোনো কারণেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া স্থগিত রাখিবেন না। আমায় বিশ্বাস এই যে স্থান পরিবর্তনে আপনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইবেন।

যদি আমি আর কয়েকদিন পরে কলিকাতা গিয়া আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি, বেথুন বিদ্যালয়ের নূতন সংস্কারকার্য বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া পরম সুখী হইব, নতুবা আপনি অবসর মতো পত্রের দ্বারা আপনার অভিপ্রায় আমাকে উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে লিখিয়া জানাইবেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কোনো সাহেবসুভার নিকট পরিচয়-পত্রের প্রয়োজন হইলে আমি সেজন্য আপনার একটু প্রয়োজন সাধন করিয়া বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিব। ১৫ই হইতে আমি বেলভেডিয়ারে থাকিবে।

আপনার একান্ত বিশ্বাসভাজন
(স্বাক্ষর) ডব্লিউ· গ্রে

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এই বিষয় লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী তর্কবির্তকের পর শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করণের জন্য নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্য দান স্থির হইয়া যায়। প্রায় দুই বৎসর কাল ধরিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া থাকে। এক দিবস প্রয়োজনোপলক্ষে ভূতপূর্ব অবলা-বান্ধব-সম্পাদক বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তদানীন্তন ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, প্রসঙ্গক্রমে উক্ত রায় বাহাদুর মহাশয় 'স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দুই বৎসর ধরিয়া মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া আছে,' এই সংবাদ দিয়া বলিলেন, যদি সম্ভব হয়, এখনও চেষ্টা করিতে পারেন। দ্বারকাবাবু এই উপলক্ষে শিক্ষা বিভাগীয় ডাইরেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং নিজেই ছাত্রী সংগ্রহের ভার লইলেন। তাঁহারই সংগৃহীত ৫/৬টি ছাত্রী লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয়। প্রায় দেড় বৎসরকাল এই বিদ্যালয়ের কার্য চলিয়াছিল। পরে সহসা সেই সময়ের বঙ্গীয় ছোট লাট স্যার জর্জ ক্যাম্বেল বিদ্যালয় উঠাইয়া দেন। বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার কোনো বিশিষ্ট কারণের উল্লেখ নাই।[১৩] স্ত্রীশিক্ষা উন্নতিপথের এই অন্তরায় দূর হইতে অনেক সময়

---

১৩ স্ত্রীশিক্ষার চিরসুহৃদ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

লাগিয়াছিল। এখনও সে অভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই।

মতভেদ নিবন্ধন, বিশেষতঃ তাঁহার স্বদেশীয় বন্ধুদের কাহারও কাহারও অত্যধিক উৎপীড়নে, শেষে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন স্কুলের সহিত সাক্ষাৎ সংস্রব ত্যাগ করেন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধনকল্পে যে সকল অনুষ্ঠান আয়োজন হইত, তাহাতে তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হৃদয়ের পূর্ণ যোগ ছিল। কোথাও ঐরূপ কার্যের অনুষ্ঠান হইলে, তাহাতে সাহায্য করিতে কখন বিরত থাকিতেন না। পুরনারিগণের শিক্ষা দিবার জন্য বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় যে সকল স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়িনী সম্মিলনী স্থাপিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সাধন করিতেছে, সে সকলের প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল। উত্তরপাড়া হিতকারী, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ সম্মিলনী, ফরিদপুর সুহৃৎসভা, বাখরগঞ্জ হিতসাধিনী, বিক্রমপুর সম্মিলনী, মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনী প্রভৃতির কার্য-বিবরণ শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। আমরা কোনো সম্মিলনীর পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে তাঁহার নিকট পুস্তকাদি সাহায্য প্রার্থনার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া যাইতাম। সে সময়ে প্রসঙ্গক্রমে এই সকল সম্মিলনীর বিষয় অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। ঐরূপ কোনো সম্মিলনীর দ্বারা বিশেষভাবে স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা হইতে শুনিলে, গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেন। চলিত কথায় লোকে বলে, 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী', কিন্তু তিনি অল্প, অধিক সকল প্রকার বিদ্যারই উৎসাহদাতা ছিলেন। আজকাল মেয়েদের অল্প লেখা পড়া শিখায় বড় একটা আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষায় লোকের বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ-বহ্নি অত্যধিক মাত্রায় জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু সকলে শুনিয়া অবাক হইবেন যে, বেথুন বিদ্যালয়ের বর্তমান কর্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু এম· এ· মহোদয়া যখন বর্তমান সময়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় গভীর আনন্দের পরিচায়ক এক প্রস্থ সেক্সপিয়ারের গ্রন্থাবলী[১৪] উপহারসহ তাঁহাকে যে সুন্দর পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা সেই পত্রখানিকে সর্বাবয়বে অমর করিবার মানসে এখানে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম। এবং উক্ত পারিতোষিকের প্রথম গ্রন্থে যেটুকু লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও যথাবৎ তুলিয়া দিলাম :

SRIMATI
KUMARI CHANDRAMUKHI BASU,
The first Bengali Lady,
Who has obtained the Degree of Master of Arts,
OF THE CALCUTTA UNIVERSITY.
From her sincere Well-wisher
ISVARACHANDRA SARMA

স্ত্রীশিক্ষা সংস্রবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ বঙ্গললনাগণ, সেই মহাপুরুষের স্বর্গারোহণের পর, সকলে সমবেত হইয়া ১৬৭০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ঐ টাকা বেথুন বিদ্যালয়ের কমিটির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। হিন্দুগৃহের কোনো বালিকা তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে অগ্রসর হইলে, পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য তাহাকে উক্ত সঞ্চিত অর্থের আয় হইতে একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই অনুষ্ঠান যে সম্পূর্ণরূপে বঙ্গবাসিনী রমণিগণের উপযুক্ত

---

১৪ Cassel's Illustrated Shakespeare—Edited and Annotated by Charles and Mary Cobden Clarke.

হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীজাতির পরম সুহৃৎ; ভারতসন্তানদের মধ্যে বর্তমান যুগের প্রারম্ভে যুগপ্রবর্তক মহাত্মা রামমোহনের সহায়তা লাভ করিয়া যাঁহারা নানা বিপদে উদ্ধার যুগপ্রবর্তক মহাত্মা, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই ক্ষেত্রে, সেই পুণ্য কার্যে, মহাত্মা রামমোহনের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে অধিকতর সুখের অবস্থায় স্থাপিত করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার নারীসেবার সুবৃহৎ কীর্তিস্তম্ভ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অবলা রমণিগণ যাহা করিয়াছেন, আক্ষেপের বিষয় যে শতপ্রকারে উপকৃত সুশিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণ তদনুরূপ কিছুই এ পর্যন্ত করিলেন না; বঙ্গরমণিগণ ধন্য! তাঁহারা দেবসুলভ গুণালঙ্কৃত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিন্দুপ্রমাণ কৃতজ্ঞতাও প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।[১৫]

১৫ In the presence of His Excellency the Viceroy and Governor General of India—Lord Elgin, and many other notable European and Indian gentlemen—Bethune College—5th March 1894—Report.... The Committee beg to announce that they have recently received the sum of Rs. 1,670 from the Secretary to the Ladies' Vidyasagar Memorial Committee in Calcutta, for the establishment of an annual Scholarship tenable for two years to be awarded to a Hindu girl who after passing the Annual Examination in the Third Class of the School, desires to prepare herself for the University Entrance Examination. The late Pundit Iswar Chandra Vidyasagar was the co-adjutor and fellow-worker of Mr. Bethune, when the School was founded and since then continued so long as he lived, to take the keenest interest in its welfare. It is therefore a source of great gratification to the Committee to find that a body of Hundu Ladies in Calcutta should have interested themselves in this manner to perpetuate the memory of the late Pundit Vidyasagar, who during his life time, in addition to the philanthropic work to which he devoted his whole life, had done so much to promote Female Education in Bengal.

M. Ghose
Secretary.

বিদ্যাসাগর চরিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালিজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়—যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল, সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

বাংলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য করিয়াছে এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে; জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার-ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া. সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগর যাহার উপর আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা প্রবহমান, পরিবর্তনশীল। ভাষা নদীস্রোতের মতো—তাহার উপরে কাহারও নাম খুদিয়া রাখা যায় না। মনে হয়, যেন সে চিরকাল এবং সর্বত্র স্বভাবতই এইভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক সে যে কোন্ কোন্ নির্ঝরধারায় গঠিত ও পরিপুষ্ট তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজানমুখে গিয়া পুরাবৃত্তের দুর্গম গিরিশিখরে আরোহণ করিতে হয়। বিশেষ গ্রন্থ অথবা চিত্র অথবা মূর্তি চিরকাল আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আপন রচনাকর্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোটো বড়ো অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবনলাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরূপে কাহারও নাম ঘোষণা করে না।

কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই : কারণ, বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না।

প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বত্রব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, আর মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতাবশতই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে, এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতাগুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য সন্দেহ নাই : তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরও বেশি দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলংকারশাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধিরচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলংকারশাস্ত্রের কোনো নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোনো বিরোধ হয় না ; তেমনি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য

প্রতিভায় যেমন 'ওরিজিন্যালিটি' অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্রবিকাশেও সেইরূপ অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়।—অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল; এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই-একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনন্যতন্ত্রতা শব্দটা শুনিবামাত্র তাহাকে সংকীর্ণতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; মনে হইতে পারে, তাহা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত তাহার যোগ নাই। কিন্তু সে কথা যথার্থ নহে। বস্তুত আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকি যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুত্তলের মতো হইয়া যাই; অধিকাংশ কাজই সংস্কারাধীনে অন্ধভাবে সম্পন্ন করি; নিজত্ব কাহাকে বলে জানি না, জানিবার আবশ্যকতা রাখি না। আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় সুপ্তভাবেই কাটাইয়া দেয়, তাহার স্থানে কাজ করে একটা নিয়ম-বাঁধা যন্ত্র। যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্বপ্রভাবে এক দিকে স্বতন্ত্র, একক—অন্য দিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায় আচার-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন; স্বজাতির শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় কেন, সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কী নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্যময়—আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত—কিন্তু ইহা দেখা যায়, সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো।

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই।

মেদিনীপুর জেলায় বনমালীপুরে তাঁহার পৈতৃক বাসভবন ছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়বিভাগ লইয়া সহোদরদের সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তর্কভূষণ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী দুর্গাদেবী ভাশুর ও দেবরগণের অনাদরে প্রথমে শ্বশুরালয় হইতে বীরসিংহগ্রামে পিত্রালয়ে পরে সেখানেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার লাঞ্ছনায় বৃদ্ধপিতার সাহায্যে পিতৃভবনের অনতিদূরে এক কুটিরে বাস করিয়া, চরকা কাটিয়া দুই পুত্র ও চারি কন্যা-সহ বহুকষ্টে দিনপাত করিতেছেন। তর্কভূষণ ভ্রাতাদের আচরণ শুনিয়া নিজের স্বত্ব ও তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ভিন্নগ্রামে দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু যাঁহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ত্ব আছে, দারিদ্র্যে তাঁহাকে দরিদ্র করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাঁহার পিতামহের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন স্থানে স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।—

'তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন ; কোনো অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনোপ্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকারপ্রত্যাশায় অথবা অন্য কোনো কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।'[১]

ইহা হইতেই শ্রোতৃগণ বুঝিতে পারিবেন, একান্নবর্তী পরিবারে কেন এই অগ্নিখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা পাঁচ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই নীহারিকাচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্কের মতো আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একান্নবর্তী পরিবারের বহুভারাক্রান্ত যন্ত্রেও তাঁহার কঠিন চরিত্রস্বাতন্ত্র্য পেষণ করিয়া দিতে পারে নাই।

'তাঁহার শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহা বুঝিতে পারিলে তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন ; কিন্তু রামজয় কোনো কারণে ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে তাঁহাকে সময়ে সময়ে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার-উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচ্চিত্ত হইতেন না।'[১]

তাঁহার তেজস্বিতার উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জমিদার যখন তাঁহাদের বীরসিংহগ্রামের নূতন বাস্তবাটী নিষ্করব্রহ্মোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন, তখন রামজয় দানগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই বসতবাটী লাখেরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এমন লোকের পক্ষে দারিদ্র্যও মহৈশ্বর্য, ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ্ জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তোলে।'[২]

কিন্তু তর্কভূষণ যে আপন স্বাতন্ত্র্যগর্বে সর্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে থাকিতেন তাহা

নহে। বিদ্যাসাগর বলেন—

'তর্কভূষণমহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহংকার ছিলেন ; কি ছোটো, কি বড়ো, সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটাচারী মনে করিতেন তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সংকুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনো কারণে তিনি কখনও কোনো বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন তাঁহাদিগকেই ভদ্র বলিয়া গণ্য করিতেন ; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্ ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।'[১]

এ দিকে তর্কভূষণমহাশয়ের বল এবং সাহসও আশ্চর্য ছিল। সর্বদাই তাঁহার হস্তে একখানি লৌহদণ্ড থাকিত। তখন দস্যুভয়ে অনেকে একত্র না হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না, কিন্তু তিনি একা এই লৌহদণ্ড-হস্তে অকুতোভয়ে সর্বত্র যাতায়াত করিতেন ; এমন-কি, দুইচারিবার আক্রান্ত হইয়া দস্যুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। একুশ বৎসর বয়সে একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন।

'ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি তদীয় উদরে উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন।'[১]

অবশেষে শোণিতস্রুত বিক্ষতদেহে চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মেদিনীপুরে এক আত্মীয়ের গৃহে শয্যা আশ্রয় করেন ; দুই মাস পরে সুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিতে পারেন।

আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলে তর্কভূষণের চরিত্রচিত্র সম্পূর্ণ হইবে।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অদূরে কোমরগঞ্জে মধ্যাহ্নে হাট করিতে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ তাঁহাকে ঘরের একটি শুভসংবাদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে পুত্রের সহিত দেখা হইলে বলিলেন, 'একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।' শুনিয়া ঠাকুরদাস ঘরে আসিয়া গোয়ালের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন ; তর্কভূষণ হাসিয়া কহিলেন, 'ও দিকে নয়, এ দিকে এসো।' বলিয়া সূতিকাগৃহে লইয়া নবপ্রসূত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

এই কৌতুকহাস্যরশ্মিপাতে রামজয়ের বলিষ্ঠ উন্নতচরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বোধ হইতেছে। এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালির মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকারবণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্র-মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ লোক ছিলেন না। যখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ-পনেরো বৎসর, এবং যখন তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী চরকায় সুতা কাটিয়া একাকিনী তাঁহার দুই পুত্র এবং চারি কন্যার ভরণপোষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরদাস উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার আত্মীয় জগন্মোহন তর্কালংকারের বাড়িতে উঠিলেন। ইংরেজি শিখিলে সওদাগর সাহেবদের হৌসে কাজ জুটিতে পারিবে জানিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় এক শিপ্-সরকারের বাড়ি ইংরেজি শিখিতে যাইতেন। যখন বাড়ি ফিরিতেন তখন তর্কালংকারের বাড়িতে উপরি-লোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত, সুতরাং তাঁহাকে রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত। অবশেষে তিনি তাঁহার শিক্ষকের এক আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় লইলেন। আশ্রয়দাতার দারিদ্র্যনিবন্ধন এক-একদিন তাঁহাকে সমস্তদিন উপবাসী থাকিতে হইত। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার যথাসর্বস্ব একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোটো ঘটি কাঁসারির দোকানে বেচিতে গিয়াছিলেন। কাঁসারিরা তাহার পাঁচসিকা দর স্থির করিয়াছিল, কিন্তু কিনিতে সম্মত হইল না ; বলিল, অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরানো বাসন কিনিয়া মাঝে মাঝে বড়ো ফেসাদে পড়িতে হয়।[২]

আর একদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিবার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্যন্ত গিয়া এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁর চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন ; দেখিলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়িমুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইলেন তাহা একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না মা, আজ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইয়ো না, একটু অপেক্ষা করো। এই বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন ; পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।'[১]

এইরূপ কষ্টে কিছু ইংরাজি শিখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে মাসিক ২ টাকা ও তাহার দুই-তিন বৎসর পরে মাসিক পাঁচ টাকা বেতন উপার্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী দুর্গাদেবী যখন শুনিলেন তাঁহার ঠাকুরদাসের মাসিক আট টাকা মাহিনা হইয়াছে তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না এবং ঠাকুরদাসের সেই তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থে লিথোগ্রাফ-পটে এই দেবীমূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসার পর্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির

দিগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া—

'দেশস্থ যে-সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।'[২]

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যাকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতো অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব দেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতো দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড়ো কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, নিজের কোনোপ্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম-কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট্ সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যোপলক্ষে তিনি যে-সকল ইংরাজ প্রধান কর্মচারীদের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনও মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্বিত সাহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে।—একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপল্ কার্-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁর বুট-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে উর্ধ্বগামী করিয়া দিয়া বাঙালি ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতারক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার্-সাহেব কার্যবশত সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজুতা-সমেত তাঁহার সর্বজনবন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহংকৃত ইংরেজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্তৃপক্ষের মতান্তর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র কর্মত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েট-সাহেব অনেক উপরোধ অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার পণ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার চলিবে কি করিয়া।' তিনি বলিলেন. 'আলুপটল বেচিয়া, মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব।' তখন বাসায় প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি অন্নবস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন—তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিলেন না। তাঁহার পিতা পূর্বে চাকরি করিতেন—বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে কার্যত্যাগ করিয়া বাড়ি বসিয়া সংসার-খরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ

ট্যাঁকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।'[২]

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন তখন প্রতিবেশী মথুরামণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধকরি এমন কাজ কখনও করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবন-চরিত লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ-রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়োবাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃতকালেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জয় বালকের শরীরটি খর্ব, শীর্ণ ; মাথাটা প্রকাণ্ড—স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে 'যশুরে-কৈ', ও তাহার অপভ্রংশ 'কসুরে জৈ' বলিয়া খেপাইত ; তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা বলিতে পারিতেন না।[২]

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্মানিগির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যমভ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথবাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলু-পটল-তরকারি ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাটনা বাটিয়া উনান ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এই তো অবস্থা। এ দিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন তখন স্কুলের ছাত্র যাঁহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন, ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার, দারোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র

উন্নত, এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয় কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি হিন্দুধর্মাবলম্বী কি অন্যধর্মাবলম্বী, সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি।'[২]

শম্ভুচন্দ্র অন্যত্র লিখিতেছেন—

'১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য সমাধা হয়। ঐ-সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজমহাশয় বিশেষরূপ যত্নবান ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপন দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে এ-কারণে জননীদেবী ঐ-সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র এক পাত্রে ভোজন করিতেন।'[২]

অথচ তখন বিধবাবিবাহের আন্দোলনে দেশের পুরুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণ সংহারের জন্য গোপনে আয়োজন করিতেছিল, এবং দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটূক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন। আর, এই রমণীকে কোনো শাস্ত্রের কোনো শ্লোক খুঁজিতে হয় নাই ; বিধাতার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদ্‌ঘাটিত ছিল। অভিমন্যু জননী-জঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

আশঙ্কা করিতেছি, সমালোচক মহাশয়েরা মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগর-সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জননী সম্বন্ধে এতখানি আলোচনা কিছু পরিমাণবহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু একথা তাঁহারা স্থির জানিবেন, এখানে জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি। তাহা ছাড়া, মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরের নানা কার্যে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎ নারীর ইতিহাস তাঁহার পুত্রের চরিত্রে, তাঁহার স্বামীর কার্যে রচিত হইতে থাকে—এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না। অতএব, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ভালোরূপ আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে। আর আমরা যে মহাত্মার স্মৃতিপ্রতিমাপূজার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, যদি তিনি কোনোরূপ সূক্ষ্ম চিন্ময় দেহে অদ্য এই সভায় আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যদি এই অযোগ্যভক্তকর্তৃক তাঁহার চরিত-কীর্তন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, তবে এই রচনার যে অংশে তাঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর মাহাত্ম্য মহীয়ান হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার দিব্যনেত্র হইতে প্রভূততম পুণ্যাশ্রুবর্ষণ হইতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্‌টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কালেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, না আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না ; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া

প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু উর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়—এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোন পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।

ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য ছিল। অগ্নিদাহে বীরসিংহগ্রামের বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি বলিলেন, 'যে-সকল দরিদ্র লোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহারা কী খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে?"[২]

দয়াবৃত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাই-শলাকার মতো কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয় সূর্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথা-সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন যে, একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ছয় সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভালো, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভালো?' ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন, 'গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।' এ কথাটি সহজ কথা নহে। তাঁহার নির্মল বুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া, প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জন করিতে পারে, ইহা আমার নিকট বড়ো বিস্ময়কর বোধ হয়। লৌকিক প্রথার বন্ধন রমণীর কাছে যেমন দৃঢ়, এমন আর কার কাছে। অথচ কী আশ্চর্য, স্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি জড়তাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্যজ্যোতির্ময় অনন্ত বিশ্বধর্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এ কথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কী করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা। তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।

সিবিলিয়ান হ্যারিসন সাহেব যখন কার্যোপলক্ষে মেদিনীপুর জেলায় গমন করেন তখন ভগবতী দেবী তাঁহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন—

'জননীদেবী সাহেবের ভোজনসময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দুস্ত্রীলোক সাহেবের ভোজন-সময়ে চিয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।... সাহেব হিন্দুর মত জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইল। জননীদেবী, প্রবীণ হিন্দুস্ত্রীলোক, তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয়

বন্ধুবান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্ আদর্শ বাঙালিজাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালি-হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালি-দুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃতকলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল-সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন, তাঁহার চাকরি লইবার ইচ্ছা আছে কি না, অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেই দিনই ত্রিশ ক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠিঅভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পর দিনে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।[২] পরের উপকারকার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে ; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয় ; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে, তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

একবার গবর্মেন্টের কোনো অত্যুৎসাহী ভৃত্য জাহানাবাদ-মহকুমায় ইনকমট্যাক্স ধার্যের জন্য উপস্থিত হন। আয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত যে-সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের অধীনে না আসিতে পারে, গবর্মেন্টের এই সুচতুর শিকারী তাহাদের দুই-তিন জনের নাম একত্র করিয়া ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ার গ্রামে অ্যাসেসর-বাবুর নিকট আসিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। বাবুটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট্ গবর্নরের নিকট বাদী হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট্ গবর্নর বর্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন-সাহেবকে তদন্ত-জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে দুই-মাস-কাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া তিনি এই অন্যায়নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।[২]

বিদ্যাসাররের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ

স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদগুণের-ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।'[১]

স্ত্রীজাতির স্নেহ-দয়া-সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে। কিন্তু ক্ষুদ্রহৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। যাহা-কিছু সহজেই পায় তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে ; নিজের দিক হইতে যে কিছুমাত্র দেয় আছে তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়। আমরাও সংসারে মাঝে মাঝে রাইমণিকে দেখিতে পাই ; এবং তিনি যখন সেবা করিতে আসেন তখন তাঁহার সমস্ত যত্ন এবং প্রীতি অবহেলাভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরম অনুগ্রহ করিয়া থাকি ; তিনি যখন চরণপূজা করিতে আসেন তখন আপন পঙ্ককলঙ্কিত পদযুগল অসংকোচে প্রসারিত করিয়া দিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জ স্পর্ধাভরে সত্যসত্যই আপনাদিগকে নরদেবতারূপে নারীসম্প্রদায়ের পূজাগ্রহণের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু এই-সকল সেবক-পূজক অবলাগণের দুঃখমোচন এবং সুখস্বাস্থ্যবিধানে আমাদের মতো মর্ত্যদেবগণের সুমহৎ ঔদাসীন্য কিছুতেই দূর হয় না ; তাহার কারণ, নারীদের কৃত সেবা কেবল আমরা আমাদের সাংসারিক স্বার্থসুখের সহিত জড়িত করিয়া দেখি, তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার অবকাশ পায় না।

বিদ্যাসাগর প্রথমত বেথুন-সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার করিয়া দেন। অবশেষে যখন তিনি বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবাবিবাহ-প্রচলনের চেষ্টা করেন তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গালি-মিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গাল-বর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরো একটি ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহারও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক। তখন সংস্কৃতকলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।

সংস্কৃতকলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধানকীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিট্যুশন্। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন ; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন—এবং সংস্কৃতবিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন :

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটিকে একাগ্রচিত্তে প্রাণাধিক যত্নে পালন করিয়া, দীনদরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জনা করিয়া,

ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমাসে ধার করিয়া পঞ্চাশ টাকা বাড়ি পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময় ময়েট্‌-সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কাপ্তেন ব্যাঙ্ক-নামক একজন ইংরেজকে কয়েকমাস বাংলা ও হিন্দি শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, তিনি বলিলেন, "আপনি ময়েট্‌-সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট্‌-সাহেব আমার বন্ধু—আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।"

১৮৫০ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খৃস্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপল-পদে নিযুক্ত হন। আট-বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সহিত মনান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে তিনি কর্মত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রের লোক ছিলেন। অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন। উপরিতন কর্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনোরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সংকল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। কর্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্মচারী বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে, বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসংগত বোধ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতকলেজে নিযুক্ত তখন কলেজের কাজকর্মের মধ্যে থাকিয়াও এক প্রচণ্ড সমাজসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন বীরসিংহবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত বীরসিংহস্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই।"[২] মাতার পুত্র উপায়-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট ; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

বিদ্যাসাগর শৈশবে জগদ্দুর্লভবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। জগদ্দুর্লভের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্‌ধৃত করা যাইতে পারে।

'রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা, এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্‌বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণবিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদীয় অপ্রতিমগুণের কীর্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি

দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর। আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ; কিন্তু একখানি নৌকা যেখানে বিপন্ন,অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য-চেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেক স্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সংকট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতা রক্ষার নিয়মলঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোনো এক গ্রাম্য মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিসংকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয়পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুকুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজেই 'আহা উহু' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ—পুরুষোচিত। এইজন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার ; তাহা কোথাও সূক্ষ্মতর্ক তুলিত না, নাসিকাকুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না ; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজুরেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসংকোচে আপন কার্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখনো রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন কি, (চণ্ডীচরণবাবুর গ্রন্থে লিখিত আছে) কার্মাটাড়ে এক মেথর জাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটিরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ধমান-বাস-কালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবনচরিতে লিখিতেছেন—

'অন্নসত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজমহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈলবিতরণ করিত তাহারা, পাছে মুচি হাড়ি ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তফাত হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজমহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন।'[২]

এই ঘটনা শ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে—কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে-একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্ম-বশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালোমানুষ অমায়িক প্রভৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ, কর্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন তাঁহাদের বেদান্ত-অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতিবন্ধন

ছিল। বাচস্পতি মহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিলেন। গুরু বারম্বার কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্তন করিলেন না। তখন বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক সুন্দরী বালিকাকে বিবাহপূর্বক তাহাকে আশু বৈধব্যের তটদেশে আনয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্‌ধৃত করি—

"বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার মাকে দেখিয়া যাও।' এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয় 'অকল্যাণ করিস না রে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরবাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্যকঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না।"

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙালির বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরিতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত তবে যিনি এক সময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি অকুতোভয়ে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া, স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া, জীবনের মধ্যপথে স্বচ্ছলস্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে তিনি ভূরি ভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সংকল্পের ঋজুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায় কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্রপরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সংগতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিনশক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস-শাখাপল্লব-সম্পন্ন সরলমহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্তবলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন—ইহাতে বিদ্যাসাগরের

কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই *যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি,* এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না। এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল।

যেমন কর্মবুদ্ধি তেমনি ধর্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন : ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে, কিন্তু ধর্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের, তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংস্রবের সকল জিনিসকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে। যাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত উদার, যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক ও বায়ুর ন্যায় মনুষ্যসাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি তাহাকে দুর্মূল্যদুর্গম করিয়া দেয়। সেইজন্য সহজ কথা ও সরল ভাব প্রচারের জন্য লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত সহজ, তাহার মধ্যে কোনো নূতনত্বের অসামান্য নৈপুণ্য নাই। তিনি প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক অমূলক-কল্পনালোক সৃজন করিতে আপন শক্তির অপব্যয় করেন নাই। তিনি তাঁহার 'বিধবাবিবাহ' গ্রন্থে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিষ্কার হইবে।

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ !... অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ ; তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ ; ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ ; কিন্তু, কী আশ্চর্য ! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ।

তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় ; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না ; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কী বিষময় ফলভোগ করিতেছ !"

রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মচর্যমাহাত্ম্যের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই ; তিনি তাঁহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল

সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিঁড়াকে সরল করিতে সেই চায় যাহার দধি নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দধির অভাব না থাকাতে বাক্‌পটুতার প্রয়োজন হয় নাই। দয়া আপনি দুঃখের স্থানে গিয়া আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, প্রকৃত সংসারে বিধবা হইবামাত্র বালিকা হঠাৎ দেবী হইয়া উঠে না এবং আমরাও তাহার চতুর্দিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই ; এমন অবস্থায় সেও দুঃখ পায়, সমাজেরও রাশি রাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। সেই দুঃখ সেই অকল্যাণ-নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না, আমরা সে স্থলে সুনিপুণ কাব্যকলা প্রয়োগপূর্বক একটা স্বকপোলকল্পিত জগতের আদর্শ-বৈধব্য কল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। কারণ, তাঁহার সরল ধর্মবুদ্ধিতে তিনি সহজেই যে বেদনা বোধ করিয়াছেন, আমরা সেই বেদনা যথার্থরূপে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। সেইজন্য এ সম্বন্ধে আমাদের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, সরলতা প্রকাশ পায় না। যথার্থ সবলতার সঙ্গে সঙ্গে একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে।

এই সরলতা, কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপটচিত্তে উত্তর দিলেন, 'এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মতো নরাধম আর নাই।' ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, 'তবে আপনি কী মানেন।'[২] বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, 'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।'[২]

যে বিদ্যাসাগর হীনতম শ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপট ভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।

নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই দৃষ্টান্ত দেখানো গিয়াছে, নিজের তিলমাত্র সম্মানরক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহার দরিদ্রা 'জননীদেবী চরকাসূতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।'[২] সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেফ্‌টেনান্টগবর্নর হ্যালিডে-সাহেব তাঁহাকে রাজ-সাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দুই-একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয় তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না।' হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্তবেশে আসিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর

পরিয়া সর্বত্র সম্মান লাভ করেন বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেইসঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না ; বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অপমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়িয়া যায়—মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে-এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন চারি দিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই।

তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন—আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না ; আড়ম্বর করি, কাজ করি না ; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না ; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না ; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না ; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না ; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি ; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্ এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিন সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।

বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজে সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন , সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন ; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই ; কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া—সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া—সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি ; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ,

তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব—এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।[3]

১৩০২ ভাদ্র

১· স্বরচিত বিদ্যাসাগর-চরিত

২· শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত

৩· বর্তমান প্রবন্ধ, ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্ণে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থসভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে এমারেল্ড থিএটার রঙ্গমঞ্চে পঠিত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণে ক্ষমতা ছিল না। অগত্যা 'মরা' 'মরা' বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কিনা, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তী অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পলাশির লড়াইএর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্‌যত, কর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্ব্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্ত্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সহৃদয়তার এত অভাব ও মৌখিকতার এত প্রভাব যে, অদ্য যে আমরা তাঁহার স্মৃতির উপাসনার জন্য সমবেত হইয়াছি, এই উপাসনা ব্যাপারটাই একটা ভণ্ডামি নহে, তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর। আমরা তাঁহার তর্পণোদ্দেশে যে বক্তৃতাময় বারির অঞ্জলি প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার প্রেতপুরুষ যদি অবজ্ঞার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষসমর্থনে বলিবার কথা কি আছে, সহজে খুঁজিয়া পাই না।

বিদ্যাসাগরের উপাসনায় এই অধিকার-অনধিকারের কথা আসে বলিয়া, প্রথমেই আমাকে রত্নাকরের নজীর আশ্রয় করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের উপাসনায় আমাদের অধিকার না থাকিতে পারে; এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের ও বিদ্যাসাগরের চরিতের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াও হয়ত অসম্ভব; তথাপি এই সাংবাৎসরিক উপাসনা বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ক্রমশঃ ধৌত করিবে, এই আমাদের একমাত্র ভরসা। পূজিতের প্রীতি-উৎপাদন বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধতর্পণাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য নহে; পূজক আত্মোন্নতি বিধানের জন্য ঐ সকল অনুষ্ঠান-সাধনে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের প্রেতপুরুষের প্রীতিজনন আমাদের অসাধ্য হইলেও আমরা স্বার্থের অনুরোধে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

কিন্তু প্রথমেই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিব কিনা, সেই ঘোর সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। সেই প্রকাণ্ড মানবতাকে সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালীত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতে তাঁহার স্বজাতি তাঁহার নিকট আপনার যে মূর্ত্তি দেখাইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনকাহিনী-পাঠে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণের সম্পর্কে আসিয়া তাঁহাকে যে পদে পদে

লজ্জিত ও প্রতারিত হইতে হইয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকামধ্যে সঙ্কলিত আছে। যদি কোন বৈদেশিক আমাদের জাতীয় চরিত্রের ছবি আঁকিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহাকে মসীবর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিতলেখকগণ প্রচুর-পরিমাণে ঐ সকল সামগ্রী একাধারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিষকে বড় কারয়া দেখায়; বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। দুই চতুস্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি ধবলপর্ব্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনর্থক আত্মগ্লানির অবতারণা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে আপনার বলিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলে তুলনায় আত্মগ্লানি আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণিসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্য্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভরশক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

একটা কথা আজকাল অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান রাজকীয় শাসনে চারিদিকে আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে যখন হিন্দু রাজা হিন্দুরাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তখন আমাদের জাতীয় অবস্থা যে সমধিক উন্নত ছিল, অনেকে এ কথা অস্বীকার করেন না; অন্ততঃ হিন্দুজাতির পুরাবৃত্তের অভাবে এ কথা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক-বিতর্ক চালান যাইতে পারে। কিন্তু গত কয় শত বৎসরে আমাদের দুর্দ্দশার যে একশেষ ঘটিয়াছিল, এবং বর্ত্তমানকালে আমাদের সামাজিক জীবন সঙ্কটাপন্ন মুমূর্ষু অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। এই নবজীবন-সঞ্চারের কয়েকটি বড় বড় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা প্রধান লক্ষণ, আমাদের জাতীয় রুচির পরিবর্ত্তন ও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ। বেহুলার নাচ দেখিয়া স্বর্গের দেবগণ যতদূর তৃপ্তিলাভ করিতেন আমরা মর্ত্তদেহ ধরিয়াও কোনরূপেই ততটা পারি না। এখন বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের হাতে মানবজীবনের উৎকট সমস্যাগুলার আলোচনা কবিতাকারে দেখিতে চাই। দ্বিতীয় একটা লক্ষণ, আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা এবং তৎসহকারে স্বায়ত্তশাসন-লাভের প্রবল প্রয়াস।

কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা যে উন্নতির সোপানে উঠিতেছি, এই বাক্য নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। এক শত বা দেড় শত বৎসরের মধ্যে কলির প্রকোপ সহসা এতদূর বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, বাঙ্গালীর পরমায়ুঃ একেবারেই পঁচানব্বই হইতে পঁয়ত্রিশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ধর্ম্মের চারিপায়ের মধ্যে তিনটি

একেবারে চিরদিনের মত খণ্ড হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এরূপ বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য নহি। কিন্তু আবার আমাদের সামাজিক গগনের পূর্ব্বাকাশে তরুণ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে এবং অরুণ সারথি হস্তধৃত হরিদশ্বগণের রশ্মিগুচ্ছ আর যে ঘুরাইতে দিবেন না, ইহার স্বীকারেও আমার সাহস হয় না। বঙ্গসাহিত্যের অভ্যুদয় সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিতে চাহি না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বঙ্কিমের প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; কিন্তু আশা করি, নবীনচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের তূলিকা অক্ষয় হইয়া আমাদের চিত্তবিনোদনে ও সন্তাপহরণে নিযুক্ত থাকিবে। * কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। শ্রোতৃবর্গ অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

বস্তুতই শতাধিক বর্ষব্যাপী সুশাসনে আমরা নিতান্ত আদুরে ছেলে হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের পরিণামও বোধ করি আদুরে ছেলের পরিণামের অপেক্ষা অধিকতর আশাপ্রদ নহে। পল্যঙ্কের উপর সুখ-শয্যাশায়ী শিশুকে যখন আরামের সহিত তূলিযোগে চুমুকে চুমুকে দুগ্ধপান করিতে দেখা যায়, তখন বয়ঃস্থ লোকের মুখ হইতে "আহা মরি শিশুকাল" ইতি কবিতাবাণী সনিঃশ্বাসে নির্গত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে এই শিশুকেই আবার কিছুদিন মধ্যে সেই বয়ঃস্থের স্থান গ্রহণ করিযা, জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত হইতে হয়। আমাদের স্নেহময়ী গবর্ণমেন্ট-জননীর অনুগ্রহের মাত্রা ও আমাদের আবদারের মাত্রা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আর আমরা সেই আরামের পল্যঙ্ক ও তূলির দুধ সহজে ছাড়িতে চাহিতেছি না এবং আমাদের স্বচ্ছন্দতার অণুমাত্র ত্রুটি ঘটিলেই শৈশবসুলভ সানুনাসিক কণ্ঠধ্বনি বাহির করিয়া, জননীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইতেছি। বাস্তবিকই আমাদের মত সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী কোন জাতির উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাসে লেখে না।

আমাদের মেরুদণ্ডের সনাতন কোমলতা হইতেই এই অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে, আবার সেই অবস্থা হইতেই মেরুদণ্ডের কোমলতা বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা কথায় কথায় আমাদের চরিত্র-সংশোধনের প্রস্তাব করি এবং এই চরিত্র-সংশোধন না হইলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এই মর্ম্মে মহতী ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি। চরিত্র-সংশোধন না হইলে যে উন্নতি ঘটিবে না, ইহা সত্য কথা; কিন্তু চরিত্র-সংশোধন ব্যাপারটাই কি এত সহজ জিনিষ? যেন ইচ্ছা করিলেই চরিত্রটা আপনা আপনি শোধিত হইয়া যাইবে! কিঞ্চলুকা যেন ইচ্ছামাত্রই আপনাকে কুম্ভীরে পরিণত করিবে! ডারুইনবাদীরা বলেন, কুম্ভীরেরও পূর্ব্বপুরুষ এককালে কেঁচোর মত ছিল; কিন্তু সেই কুম্ভীরত্বে পরিণতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাকে কত যুগব্যাপী জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে। ইচ্ছামাত্রেই চরিত্র-সংশোধন ঘটে না এবং প্রস্তাব দ্বারাও জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের সম্মুখীন হইতে হইলে আমাদের ক্ষুদ্রত্বের উপলব্ধি জন্মিয়া আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, এইরূপে সে আত্মগ্লানির কতকটা ওজন মিলিতে পারে।

আমরা যে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে দাঁড়াইতে সঙ্কুচিত হই, এইরূপে তাহার কতকটা সান্ত্বনা মিলিতে পারে; কিন্তু এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র

---

* যখন এই প্রবন্ধ পঠিত হয়, তখন নবীনচন্দ্র জীবিত ছিলেন।

বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল;—বঙ্গদেশে তাহার আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দ্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্দ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে; আমাদের মত যাহারা তূলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

সেইজন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে মনে দ্বিধা জন্মে। অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্ত্য-জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকটে নিষ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষাকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্ত্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতাপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদায় বিপত্তি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক-সমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে, অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্য্যন্ত একেবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্ব্বেই সম্যগ্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল; আর নূতন মসলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্ত্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিকট জন্তু প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরাজী একেবারে না শিখিতেন, বা ইংরাজের স্পর্শে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা

হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা সহরের অবস্থাটা ঠিক এমন না হইতেও পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্য্যন্ত তেমনি বাঙ্গালীটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাঁহার কখন প্রয়োজন হয় নাই; এমন কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিত যে তিনি বলপূর্ব্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখন ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই।

সম্প্রতি আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন মাননীয় কোন মহাশয় এইরূপ একটা কথা তুলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্যগণের সহিত আমাদের সামাজিক কুটুম্বিতাস্থাপন না ঘটিলে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কথাটা লইয়া আমাদের সমাজমধ্যে অনেকটা আন্দোলন চলিয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য বেশভূষার ও পাশ্চাত্ত্য আচারের পক্ষপাতী, তাঁহারা এই আন্দোলনে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বৈদেশিকের সহিত কুটুম্বিতাস্থাপন ও বিদেশের আচারগ্রহণ-সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করিতে গেলে কি ফল ঘটিত, বোধহয়, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। তাঁহার খাঁটি দেশীয় পরিচ্ছদ হইতেই তাহার উত্তর মিলিতে পারে। চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও তিনি মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

আচারবিষয়ে অন্যের অনুকরণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই-একটা পদার্থ ছিল, যাহাতে পাশ্চাত্ত্য মানব হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল; এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়া আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি।

পাশ্চাত্ত্যদেশে ফিলানথ্রপি নামে একটা পদার্থ আছে; তাহার বাঙ্গালা নাম মানবপ্রীতি। এই মানবপ্রীতি কোন সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে, সমস্ত মানবসমাজ এই হিতৈষণার বিষয়ীভূত এবং ইহাও বলা যাইতে পারে, এই হিতৈষণা পলিটিক্যাল ইকনমি শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। এই লোকহিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া দিগদিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং ইহার প্রভাবে যে কত অলৌকিক ঘটনার, কত অসাধারণ স্বার্থত্যাগের উদাহরণ মিলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই লোকহিতৈষণার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, প্রাচ্যদেশে তাহার তুলনা মিলে না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভিতর এমন একটা স্ফূর্ত্তি রহিয়াছে, যেন তাহা আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া আপনা হইতে উছলিয়া বাহির হয় এবং অন্য কোন মূর্ত্তিধারণের সুবিধা না পাইলে, এই মানবপ্রীতির ও বিশ্বহিতৈষণার আকৃতি পরিগ্রহ করে। যে স্ফূর্ত্তির বশে ইংরাজের ছেলে সাঁতার দিয়া নায়াগারা পার হইতে গিয়া জীবনটাকে অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দেয়, এই হিতৈষণাও যেন সেই অমানুষিক স্ফূর্ত্তি হইতে উদ্ভূত। এই পরার্থপরতার মূলে যেন ব্যক্তিগত স্ফূর্ত্তি বর্ত্তমান

রহিয়াছে। আপনার ব্যক্তিত্ব যেন নিজের ভিতর স্থান না পাইয়া, অপরের উপর সবেগে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রাণের প্রবাহ যেন আপনার বেগ আপনি সহিতে না পারিয়া, পরের দিকে ধাবিত হইতেছে। পরের উপকার যেন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; আপনার নিজত্বের অভিব্যক্তিই যেন তাহার প্রণোদক।

বিদ্যাসাগরকে এইরূপ ফিলানথ্রপিষ্ট বলা চলে না। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের ধর্ম্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক, তাহার প্রতীকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্ব্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে, কি অপকার হইবে ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্ব-ঘটিত ও সমাজতত্ত্ব-ঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন; পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন ব্যক্তির কি উপকার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ার করা একরকম অসম্ভব। তাঁহার জীবনচরিত-লেখকেরা যেগুলা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই পড়িতে পড়িতে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। শ্রোতৃবর্গ ভয় পাইবেন না; আমি সেই ফর্দ্দ এক্ষণে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সুদীর্ঘ ফর্দ্দের মধ্যে প্রায় শতকরা নব্বইটা কার্য্য অর্থনীতির অনুমোদিত নহে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর একটা নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানবনীতির অঙ্গীভূত।

ইউটিলিটির হিসাবে ভাল-মন্দ নির্ণয় করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ইউটিলিটির হিসাবটা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সমাজের স্থিতির ও গতির নিয়মগুলা এতই জটিল যে, সেই নিয়মগুলাকে যতই আয়ত্ত করিতে যাওয়া যায়, তাহারা ততই যেন হাত হইতে পিছলাইয়া পড়ে। সমাজতত্ত্ব-সম্বন্ধে আজকাল আলোচনা যতই অধিক হইতেছে, সমাজের আভ্যন্তরিক প্রকৃতিসম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা ততই যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। একটা অকর্ম্মণ্য, অলস, কুচরিত্র ব্যক্তির আহার দিয়া প্রাণ বাঁচাইলে আমাদের পরিমিত খাদ্যসমষ্টির পরিমাণ অকারণে হ্রাস করা হয় এবং মনুষ্যজাতির জীবনসংগ্রামকে কিয়ৎপরিমাণে আরও তীব্র করিয়া তোলা হয়, এই হিসাবে এইরূপ দয়াপ্রকাশ গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া আজকালকার অনেক সমাজতাত্ত্বিক নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দয়া প্রকাশ-ব্যাপার কত দিকে কত উপায়ে গৌণভাবে ও পরোক্ষভাবে শুভফলের আনয়ন ও উৎপাদন করে, তাহা আমাদের স্থূল হিসাবে ধরা পড়ে না; কাজেই ইউটিলিটির জমাখরচের খাতায় জমার অঙ্কে শূন্য পড়িয়া যায়। রাজশাসন ও সমাজশাসন আর ধর্ম্মের শাসন, লোকাচার ও দেশাচার, নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র, বিদ্যার বিস্তার ও জ্ঞানের বিস্তার, সহস্র উপায় অবলম্বন করিয়া সহস্র গির্জ্জাঘর ও

সহস্র কারাগার আর সহস্র বিদ্যালয় ও সহস্র ধর্ম্মাধিকরণ মনুষ্যের জীবনসময়ের উৎকর্ষতার লাঘবসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। বর্তমান সমাজতত্ত্ব দুঃখের সহিত বলিতেছে, মনুষ্যের এই যুগযুগান্তরব্যাপী সমবেত চেষ্টার একমাত্র ফল নিষ্ফলতা। মনুষ্যচরিত্রে স্বার্থপরতার মাত্রা কোনরূপে কমাইতে না পারিলে, বোধ করি, এই দ্বন্দ্বের ভীষণতার কোনরূপ লাঘব হইবে না। সন্তানকে দেখিলে জননীর স্নেহের উৎস আপনা হইতে উথলিয়া উঠে; কোনরূপ ক্ষতিলাভ-গণনার বা কর্ত্তব্যনির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র উপস্থিত হয় না। মনুষ্যের চরিত্র যদি কখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, স্নেহাকৃষ্ট জননীর মত দুঃখক্লেশাতুর মনুষ্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য সে আপনা হইতেই বাধ্য হইবে, তাহা হইলেই মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের আশা করিতে পারা যায়। অনেক হিসাবনিকাশ জমাখরচ বিচারের পর কর্ত্তব্যনির্ণয় এইরূপ ব্যাপার; আর আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-কর্ত্তৃক প্রণোদিত ও তাড়িত হইয়া কর্ত্তব্যের দিকে ধাবিত হওয়া আর এক রকম ব্যাপার। এই শেষোক্ত স্থলে কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিটা স্বভাবের সহিত এমনভাবে মিশিয়া যায় যে, উহাকে স্বভাব হইতে আর পৃথক্ করিয়া লওয়া চলে না; পৃথক্ করিতে গেলে সমগ্র স্বভাবটাই ভাঙ্গিয়া যায়। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষে পরের কাজ করে; কেন না, পরের কাজটা ভাল কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ; উহাতে নিজেরও লাভ আছে, সমাজেরও লাভ আছে। ইহলোকে, এবং হয়ত ইহলোকের পর আর একটা যে লোক আছে শুনা যায়, সেইখানে, এই কাজের জন্য বিশেষ প্রতিপত্তিলাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু মানুষ যেমন ক্ষুধার উত্তেজনায় খাইতে চায়, পিপাসার উত্তেজনায় জলার্থী হয়; শারীর-বিজ্ঞানঘটিত কোন তত্ত্ব তখন তাহার মনে স্থান পায় না; এমন কি, ক্ষুধার ও পিপাসার তাড়নায় এমন খাদ্য ও এমন পানীয় সে উদরস্থ করিয়া ফেলে যে, শারীরবিজ্ঞান তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ পরার্থপরতা তখনই স্বাভাবিক প্রকৃতির মধ্যে স্থান পাইবে, যখন মনুষ্য সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থের মুখে আপনা হইতে ধাবিত হইবে। তাহার এই কার্য্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গল হইবে, কি অমঙ্গল হইবে, তাহা চিন্তা করিতে সে সময় পাইবে না। মনুষ্যের ইতিহাসে যদি কখন এইরূপ দিন আইসে, যখন মনুষ্যের প্রবৃত্তি এইরূপে মনুষ্যকে পরের কাজে প্রেরিত করিবে, তখন হয়ত রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনের প্রয়োজন হইবে না; তখন নীতিপ্রচারক ও ধর্ম্মপ্রচারকের পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না; এবং কারগার ও গির্জ্জাঘরের ভগ্নাবশেষ চিত্র-শালিকায় একত্র রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের অতীত ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-বিশেষের সাক্ষ্য দিবে। মনুষ্যের ইতিহাসে এমন দিন আসিবে কিনা জানি না; কিন্তু মনুষ্যের এই পরম ধর্ম্মের কল্পনা অন্ততঃ একটা দেশের মানব-মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যে দেশের সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্যের নায়ক ভগবান্ রামচন্দ্র, এই নিষ্কাম ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় আপনার প্রাণসমা ধর্ম্মপত্নীকে কর্ত্তব্যবোধে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, যে দেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মপ্রচারক ভগবান্ সিদ্ধার্থ সংসারের দুঃখ-যাতনা হইতে মানবমণ্ডলীর পরিত্রাণার্থ রাজ্যসম্পত্তি পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই; যে দেশের উপাস্য মানবদেব শ্রীকৃষ্ণ এই নিষ্কামধর্ম্মের প্রচারকর্ত্তা বলিয়া ইতিহাসে কীর্ত্তিত, সেই দেশে এই ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত প্রবৃত্তির ঐতিহাসিক উদাহরণও নিতান্ত বিরল হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই স্থলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসন্তানগণের অধিক সাদৃশ্য না থাকিতে পারে; কিন্তু সেই চরিত্র আমরা যে আদৌ দেখিতে পাই না, তাহা অসম্ভব নহে। কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত

মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। ভারতবর্ষীয় মহাকবির কল্পনায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল; যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধৃষ্য এবং অভিগম্য।

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত-গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগর এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোন বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম; বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না কিন্তু প্রাচ্য দেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেন; কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময় ঘেঁষিতে পারিত না। বায়ুপ্রবাহে দ্রুম-সানুমানের মধ্যে দ্রুমেরই চাঞ্চল্য জন্মে, সানুমান্ চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি দ্রুমের সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য। কিন্তু আবার সানুমানেই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্ব্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমান্ই বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃতপক্ষে তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ ব্যাপিয়া সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃতপ্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসার-তাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কিরূপ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার চরিতলেখকেরা সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা বলেন না। তবে সংসার হইতে দুঃখের অস্তিত্ব এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিয়া সুখের এবং মঙ্গলের রাজ্য কল্পনার বলে প্রতিষ্ঠা করা বোধ করি দয়ার সাগরের পক্ষে অসাধ্য ছিল। সমুদ্রতলে সার্ জন্ লরেন্স্ * ডুবাইয়া দিয়া দুনিয়ার মালিক কিরূপ করুণা-প্রকাশ ও মঙ্গল-সাধন করিলেন, এক নিশ্বাসে তিনি তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। বস্তুতঃই দুঃখ-দাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি সেইজন্যই ঈশ্বর ও পরকালসম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্ত্তব্যপথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না। এমন দিন কবে

---

* এই নামে একখানা জাহাজ ৭০০ যাত্রিসহ কলিকাতা হইতে পুরী যাইবার সময়ে বাতাবর্ত্তে পড়িয়া সমুদ্রে মগ্ন হয়।

আসিবে, যে দিন মনুষ্যসমাজ সাম্প্রদায়িক কোলাহলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; যে দিন আপামরসাধারণ বিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগরের অনুবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যনির্ণয়ে মন দিতে অবকাশ লাভ করিবে।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। সমাজ-সংস্কারের কথাটা উত্থাপন করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে যদি নিতান্ত আতঙ্ক জন্মে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের নিকট মার্জ্জনার ভিখারী হইতেছি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া কথাটা একেবারে না তুলিলেও চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহে পথ-প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। বস্তুতঃই এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্ত্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা, উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানব-নির্য্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত; দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের ত আর অভাব নাই; তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝায় ভার চাপায়? ইহা তিনি বুঝিতেন না এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বালবিধবার দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণা-মন্দাকিনীর ধারা বহিল। সুরধুনী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করেন, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে। বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটীভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই, সেই মেরুদণ্ড নমিত করেন।

কিন্তু এই সমাজসংস্কার-ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের একটু অসাধারণত্ব দেখা যায়। প্রথমতঃ, বিধবাবিবাহে হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে তিনি পিতামাতার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই দুইটাই আমাদের পক্ষে চিন্তনীয় বিষয়। সম্প্রতি আমরা নীতিশাস্ত্র হইতে 'মরাল কারেজ' নামক একটা সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছি। কর্ত্তব্যবুদ্ধির * প্ররোচনায় স্বার্থবিসর্জ্জন ব্যাপারটা যে কোন দেশের একচেটিয়া নহে, তাহা সদা সর্ব্বদা আমরা ভুলিয়া যাই। আমাদের প্রাচীনা ভারতভূমিতেও এই কর্ত্তব্যের জন্য স্বার্থবিসর্জ্জনের উদাহরণ ভূরি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। তবে দুঃখের বিষয় যে, অন্যত্র যে সব ঘটনায় ঢক্কানিনাদ হইয়া থাকে, এ দেশে তাহার অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই মরাল কারেজটা এ দেশে নূতন আমদানি এক অপূর্ব জিনিষ। আর দুঃখের বিষয় যে, একালের শিক্ষার সহিত এই মরাল কারেজের কি একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লোকের বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সংসারের হাইড্রলিক প্রেসের চাপে পড়িয়া, ইহা অনেকটা সঙ্কুচিত ও শীর্ণ হইয়া পড়ে; কিন্তু শিক্ষানবিশ বালকগণের নৈতিক সাহসের আক্রমণটা নিরীহ পিতামাতার উপর দিয়া, নিরীহতর প্রতিবেশীর উপর দিয়া ও নিরীহতম মাষ্টার মহাশয়ের উপর দিয়াই নিক্ষিপ্ত হয়।

* Moral courage.

বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর এই মরাল কারেজের প্রতি বিশেষ রাজি ছিলেন না। স্বাধীন আত্মাকে কোন কোন স্থানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। নিজের বুদ্ধি এবং নিজের প্রবৃত্তির মুখে বল্গা লাগাইয়া কোথায় তাহাদিগকে নিয়মিত রাখিতে হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন। স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল জানি না; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান্ জীবন্তদেবের তুষ্টির জন্য সময়বিশেষে আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিকে পর্য্যন্ত বলিদান দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। তাঁহার ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ বঙ্গদেশে তখন ছিল না। কিন্তু মানবজীবনে এমন সময় আসিতে পারে, তখন সেই মুক্তবায়ুমার্গে বিহারপ্রয়াসী স্বাতন্ত্র্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; ইহা তিনি মানিতেন। সেই শৃঙ্খলকে কপটাচারের আয়স নিগড় মনে করিবার প্রয়োজন নাই। উহা প্রেমের শৃঙ্খল ও ভক্তির শৃঙ্খল;—মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের যে প্রেমের বন্ধন প্রকৃতি আপন হাতে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, যে ভক্তির বন্ধন ব্যক্তিনিহিত ক্ষুদ্র জীবনকে সমাজরূপী বিরাটপুরুষের ঐতিহাসিক জীবনের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই প্রেমের শিকল ও ভক্তির শিকল গলায় পরিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়; "মণি-মুক্তার মোহন মালা" ইহার নিকট স্থান পায় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় লইয়া আমরা সকলেই কিছু ধরাতলে অবতীর্ণ হই নাই। বালবিধবার অশ্রুজলে আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না; তাই আমরা ভণ্ড ব্রহ্মচর্য্যার মলিন পাংশুবিক্ষেপে সেই অশ্রুজল মুছিতে যাই। ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখমোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের জয়লাভ ঘটিয়াছে সত্য কথা; কিন্তু ইহাই বিধিলিপি, ইহাই প্রকৃতির নির্ব্বন্ধ। স্বাভাবিক, সরল, ছদ্মবেশহীন মনুষ্যত্ব ইহাতে ম্রিয়মাণ হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখপ্রকাশ নিষ্ফল; কেন না, ইহা বিধিলিপি।

এই দেশাচারগুলির সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীনকালে এক দিন জন কয়েক ব্রাহ্মণ পরামর্শ করিয়া লাভের প্রত্যাশায় এই জঘন্য দেশাচারসমূহের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং জনসমাজ ভয়ে হউক বা নির্ব্বুদ্ধিতায় হউক, সেই সকল ব্যবস্থা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের সহিত আমি একমত নহি। ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের চেষ্টায় সমাজের ধারাবাহিক জীবন যে এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আজকাল সমাজ-শরীরের সহিত জীব-শরীরের তুলনা করা এবং সমাজের অন্তর্গত দেশাচারকে জীবশরীরোদ্গত ব্যাধিজনক বিস্ফোটকের সহিত তুলনা করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীববিদ্যার অন্তর্গত আধুনিক নিদানশাস্ত্রে বিস্ফোটকের উৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করে, তাহাতে এই তুলনা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বাহির হইতে রোগের বীজ শরীরমধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া বিস্ফোটকের সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজ-শরীরের অন্তর্ভূত পুরুষপরম্পরাগত প্রথাগুলিকে সকল সময়ে বাহির হইতে আগত বলিতে পারা যায় না; সমাজ-শরীরের বয়ঃক্রমানুসারে তাহারা জৈবিক নিয়ম মতেই আপনা হইতে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয় পায়। সমাজ-শরীরকেও ঠিক জীব-শরীরের মত দুরন্ত প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া সহস্র প্রতিকূল শক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয় এবং সেই আত্মরক্ষার প্রয়াস-ফলে তাহাতে বিবিধ অঙ্গ, বিবিধ অবয়ব ও বিবিধ যন্ত্রের বিকাশ হয়। জীব-শরীরের মধ্যে কতকগুলা অবয়বের চিহ্ন দেখা যায়। শারীরবিজ্ঞানে তাহাদিগকে vestigial organ আখ্যা দেয়। জীবন-ধারণে ও জীবন-রক্ষণে এই ক্ষুদ্র অবয়বগুলার কোনরূপ উপযোগিতা দেখা যায় না; বরং সময়ে সময়ে তাহারা জীবনের সংহারক হইয়া

উঠে। সাধারণতঃ তাহারা তাহাদের নিরর্থক ও অনাবশ্যক অস্তিত্বরক্ষার জন্য সমগ্র দেহের নিকট হইতে পুষ্টির ভাগ ও শক্তির ভাগ গ্রহণ করিয়া, জীবনের প্রতিকূলতাই সাধন করে। ইহারা জীবনযাত্রার প্রতিকূল হইলেও আধুনিক জীববিদ্যার মতে বিস্ফোটকের বা ব্যাধির স্থানীয় নহে। জীবের ইতিহাসে এমন সময় ছিল, যখন তাহারা জীবনের পক্ষে আবশ্যক ছিল, যখন তাহারাও জীবনের আনুকূল্যসাধনে নিযুক্ত রহিত। তদানীন্তন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধব্যাপারে জীবদেহকে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদের আপনা হইতে বিকাশ হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তনসহ তাহাদের আবশ্যকতা অন্তর্হিত হইয়াছে এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কাজেই তাহাদের অস্তিত্বও বিলোপের অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সমাজ-শরীরে দেশাচারগুলাও কতকটা যেন সেইরূপ। সমাজের অতীত ইতিহাসে বিশেষ প্রয়োজন-সাধনের উদ্দেশে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল; এখন সেই প্রয়োজনের অভাব হওয়ায়, তাহারা অনাবশ্যক ও জীবনের যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিনা অন্য কোন প্রণালী নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সময়সাপেক্ষ; এবং সেই দিনের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত। সমাজ-শরীরের চিকিৎসক বিস্ফোটক-ভ্রমে যেখানে সেখানে ছুরিকা চালাইলে সর্ব্বত্র সুফল নাও হইতে পারে।

আমার যে সকল বন্ধুবর্গের অনুগ্রহবশে আজি আমি বিদ্যাসাগরের চরণোপান্তে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের অবকাশ পাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহারে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখা প্রচলিত নাই এবং কোন ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার উপকরণ উপযুক্ত-পরিমাণে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত রচনা করিয়া যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের এই কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় এই অভাবের ও অসুবিধার বিশেষ ভুক্তভোগী। এরূপ স্থলে বিদ্যাসাগরের মত মহাশয়ের স্পর্শে যিনি কখন আসিবার সুবিধা পাইয়াছেন, যিনি কোন না কোন সূত্রে তাঁহার চরিত্রে কোন একটা দোষ দেখিতে পাইয়াছেন, তৎসমস্ত সাধারণের নিকট ব্যক্ত করা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, ব্যক্তিগত হইলে তাহা বলিতে সাহসী হইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট-বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোন না কোন প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল,তাহা চিন্তার অগোচর। মহাকবির বাক্যে আছে, "যদধ্যাসিতমর্হদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে।" মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা যে সময়ে বিদ্যাসাগরের কর্ম্মবহুল জীবনের অন্যতম ব্যবসায় ছিল, সেই সময় আমার পিতামহের ক্ষুদ্র কুটীর একদিন বিদ্যাসাগরের পাদস্পর্শে তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছিল। শৈশবকালে সেই গৌরবান্বিত দিবসের প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে নানা কথা অন্তঃপুরবাসিনীগণের মুখেও শুনিতে পাইতাম। পাঠশালায় প্রবেশলাভের পর বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি পুস্তকপরম্পরার শুভ্র মলাটের উপর একই নাম অঙ্কিত দেখিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত পাঠশালা ও লেখাপড়া আর ছাপার বহি ও পণ্ডিতমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের কিরূপ একটা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ কল্পনায় স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। বিদ্যাসাগরের আকৃতি, পরিচ্ছদ এবং কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিতাম, তৎসমুদয় সেই কল্পনার সহিত বিজড়িত করিয়া অন্তঃকরণ একটা বিদ্যাসাগরমূর্ত্তি

গড়িয়া ফেলিয়াছিল। বটতলার পুস্তকের বোঝা মাথায় করিয়া চটিজুতাধারী রুক্ষবেশ পুরুষমূর্ত্তি এক ব্যক্তি আমাদের পল্লীগ্রামে মাঝে মাঝে দেখা দিত। শ্রোতৃগণ মার্জ্জনা করিবেন, সেই লোকটাই যে নিশ্চিত বিদ্যাসাগর, এই ধারণা হইতে অব্যাহতি পাইতে আমাকে উত্তরকালে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। আমার মনস্তত্ত্ববিৎ বন্ধুগণের উপর এই বিষম সমস্যার মীমাংসার ভার থাকিল। ১২৮৮ সালের ২১শে মাঘ তারিখে আমি কলিকাতা সহরে আসি এবং ২৩শে তারিখে তীর্থযাত্রীর আগ্রহের সহিত পিতৃব্যদেবের সমভিব্যাহারে চিরাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাসাগর-দর্শন-লালসা তৃপ্ত করিয়া জীবন ধন্য করি। শৈশবকালের কাল্পনিক বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃত বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্য দেখিয়াছিলাম কি না, সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই দিবস তাঁহার মুখ হইতে যে কয়েকটি বাক্য শুনিতে পাইয়াছিলাম, আজি পর্য্যন্ত তাহা আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইতেছে; আশা করি, সেই উদার প্রশস্ত স্নেহপূর্ণ হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া, সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর বঙ্গের যে সকল পুত্রকন্যার শ্রবণপথে প্রবেশলাভ করিয়া হৃদয়ের ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়াছে, তাঁহারা চিরদিন সেই কণ্ঠস্বরের স্মৃতিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। সেই প্রাচ্য মনুষ্যত্বের আদর্শ তাঁহাদের জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাখিবে। আমাদের এই দুর্দ্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই আদর্শের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীনা পূজনীয়া জননীর দেহে নবজীবনসঞ্চারের আশা কি কখনই ফলিবে না! কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করিয়া দীপবর্ত্তিকা আনয়ন করিবে কে? কে বলিবে, আমাদের পরিণতি কোথায়? মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারত-ভূমিতে নূতন ঘটনা নহে। আশা যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারতের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সে মহাপুরুষ কোথায়? দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃতজাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?

মৃত্যু ও তার পরবর্তী পর্যায়

বিহারীলাল সরকার

শেষ

এইবার শেষ। শূন্য-দেহের শ্মশানসৎকার। নিত্য মৃতগ্রাসী নিমতলা ঘাটে বিদ্যাসাগরের সৎকার হইয়াছিল। দুই দিন পূর্বে এই নিমতলার শ্মশান-শয্যায় বঙ্গের অন্যতম শক্তিশালী পুরুষ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর শেষ শয়ন করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যে সুন্দর সুশোভন খট্টাঙ্গে শয়ন করিতেন, সেই খট্টাঙ্গেই তাঁহার শবদেহ শায়িত হইয়াছিল। পুত্র, ভ্রাতা, দৌহিত্র, আত্মীয়বর্গ এবং ভক্তবৃন্দ খট্টাঙ্গ স্কন্ধে লইয়া রাত্রি প্রায় চারি ঘটিকার সময় নিমতলাভিমুখে যাত্রা করেন। মেট্রপলিটন ইন্‌স্টিটিউসনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, পুত্র নারায়ণ বাষ্পাকুলিতলোচনে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"বাবা, এই তোমার সাধের মেট্রপলিটন। আশীর্বাদ কর, যেন তোমার এই কীর্তি বজায় রাখিতে পারি।" সেই শোকপরীত কাতর ক্রন্দনে উপস্থিত কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

নিশার শেষভাগে অনেকেই এই শোকময় সংবাদ শুনিয়া, শেষ দেখা দেখিবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হইয়াছিল। অনেক ভক্ত খট্টাঙ্গ স্পর্শ করিয়া জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে শব শ্মশানে উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতৃবর্গ সূর্যোদয়ের পূর্বেই সৎকার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দৌহিত্রগণ কিন্তু শবদেহের শেষ ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শরৎচন্দ্র সেন মহাশয়কে ডাকাইয়া আনাইয়া ঠিক সূর্যোদয়ে ফটোগ্রাফ তুলাইয়া লন।

দেখিতে দেখিতে, ক্রমে শ্মশান-ঘাট অসংখ্য জনসমাগমে পূর্ণ হইল। সকলেই বিদ্যাসাগরকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে গিয়াছিল। যাঁহারা প্রত্যহ প্রাতঃস্নানে যাইয়া থাকেন, তাঁহারা সংবাদ পাইবামাত্র সর্বাগ্রে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হন। সেই সময় প্রকৃতি প্রকৃতই একটা বিশ্বব্যাপিনী সৌম্য-গম্ভীর-শোকময়ী মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। ভাগীরথীর কলকলনাদে সমাগত ব্যক্তিবর্গের হাহাকার-আর্তনাদ এবং অশ্রুভারাবনত আত্মীয়বর্গের নীরব দীর্ঘশ্বাস মিশিয়া কি যেন এক অপূর্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হইল।

ফটোগ্রাফ তুলাইতে এবং সমাগত ব্যক্তিবর্গের দর্শনাকাঙ্ক্ষা মিটাইতে সৎকারের বিলম্ব হইয়াছিল। সূর্যোদয়ের পর শবদেহ চিতাশয্যায় শায়িত হয়। চিতার জন্য বড়বাজার প্রভৃতি স্থান হইতে যথাসম্ভব চন্দনকাষ্ঠ সংগৃহীত হইয়াছিল। মুহূর্তে চিতা জ্বলিল! পুত্র নারায়ণ মুখাগ্নি করিলেন।[১] বেলা প্রায় ১১টা পর্যন্ত চিতা জ্বলিয়াছিল। ক্রমে সব ফুরাইল! চিতা নিবিল! অনেক ভক্ত অস্থি ও ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দৌহিত্রদ্বয় দুই কলস ভস্ম সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও দুই দিন পরে জাহ্নবী-জলে মিশাইল। কিছুই রহিল না! রহিল কীর্তি! আর রহিল স্মৃতি! কবি মানকুমারী শ্মশানে স্বচক্ষে

১· বিদ্যাসাগর মহাশয় মুমূর্ষু পত্নীর নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, ফরাসডাঙ্গায় শেষ প্রবাসে তৎপালনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। নারায়ণবাবু পিতৃ-শুশ্রূষার অধিকার পাইয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সৎকার দেখিয়া মর্মস্পর্শিনী ভাষায় লিখিয়াছিলেন,—"অই জাহ্নবী-বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে! ঐ আগুনে বাঙ্গালার সর্বনাশ হইতেছে! বাঙ্গালীর পিরামিড ভস্মসাৎ হইতেছে! ঐ ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে! ঐ আগুনে বাঙ্গালার সম্মান-গৌরব পুড়িয়া ছাই হইতেছে। ঐ জ্বলন্ত আগুনে বাঙ্গালীর প্রধান গর্ব—প্রধান অহঙ্কার পুড়িয়া যাইতেছে। ঐ চিতার আগুনে আজ কত কি ফুরাইল! কত কাঙ্গাল গরীব মাতা-পিতা হারাইল। কত হৃদয় আজি আশা-ভরসা-হারা হইল। শ্রাবণের মেঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইতেছে! ঐ চিহ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে।"

সৎকারান্তে কাঙ্গালী বিদায় করিয়া সকলেই বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় বাড়ি ফিরিয়া আসেন। প্রায় দশ-বার দিন বিদ্যাসাগরের ভক্তবৃন্দ মধ্যে মধ্যে শ্মশানে চিতা-চিহ্নের পার্শ্বে সংকীর্তন করিয়াছিলেন।

শোক

ক্রমে শোকময় সংবাদ শহরময় রাষ্ট্র হইল। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহে এ শোকময় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। যিনি যেভাবে বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব বুঝিতেন, তিনি সেই ভাবে সেই মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এলাহাবাদে পাইওনিওর লিখিয়াছিলেন,—"He was a brilliant educationalist. and well-known for his labours in the promotion of Hindu Widow-remarriage." 29th July, 1891.

ইংলিশম্যান লিখিয়াছিলেন,—"A man of rare gifts and broad sympathies. 30th July, 1891.

ডেলি নিউস্ লিখিয়াছিলেন,—"Death has again this week carried away another of the brightest jewels of India." 30th July, 1891.

স্টেট্‌স্‌ম্যান লিখিয়াছিলেন,—"Another of the foremost men of Bengal has gone over to the majority." 29th July, 1891.

ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ পত্রসমূহে এতৎসম্বন্ধে স্বল্পবিস্তর পরিমাণে লিখিত হইয়াছিল। আমেরিকার কোন পত্র বিদ্যাসাগরকে গ্লাডস্টোনের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ভারতের গ্রাম, পল্লী, নগর, শহর সর্বত্রই এই শোকময় সংবাদ প্রচারিত হইল। শহর মফঃস্বলের বেসরকারী স্কুল-কলেজ বন্ধ হইয়াছিল। কলিকাতায় মেট্রপলিটনের ছাত্রগণ পাদুকা পরিত্যাগ করিয়াছিল। কলিকাতার পুস্তক-বিক্রেতাগণ, কোম্পানির কাগজের দালালগণ ও রাধাবাজারের দোকানদারগণ দোকানপাট ও অফিসাদি বন্ধ করিয়াছিলেন। মেট্রপলিটন, প্রেসিডেন্সি, সংস্কৃত কলেজ, হাবড়া স্কুল প্রভৃতি কলেজ-স্কুলে শোক-প্রকাশের জন্য সভা হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজে নবদ্বীপের খ্যাতনামা পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, মেট্রপলিটনে শ্রীযুক্ত মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে মাননীয় অধ্যাপক টনি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, কত স্থানে কত সভাসমিতি যে আহূত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। মফঃস্বলে বর্ধমান, হুগলী, শ্রীরামপুর, ঢাকা, আসাম-গৌহাটী, বরিশাল, ত্রিপুরা, কুচবিহার প্রভৃতি ছোট বড় শহরে এবং অন্যত্র হায়দারাবাদ পর্যন্ত নানা স্থানে শোকপ্রকাশ এবং স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার উদ্দেশে সভাসমিতি হইয়াছিল। ঢাকার সভায় ভূতপূর্ব বান্ধব-সম্পাদক এবং স্বর্গীয় ভাওয়ালরাজের

প্রধান মন্ত্রী মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাওয়ালাধিপতি রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর বিদ্যাসাগরের স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে ঢাকা কলেজে তিন সহস্র টাকা দিবার প্রস্তাব করেন। বন্দোবস্ত এইরূপ হয়, যদি কোন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি না পায়, অথচ সংস্কৃত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মাসিক ১০ দশ টাকা হিসাবে পাঁচ বৎসর কাল এই টাকার সুদ হইতে বৃত্তি দেওয়া হইবে। কালীগঞ্জের স্কুলে একটি সভা হইয়াছিল। যে ছাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি সুন্দর জীবনী লিখিতে পারিবে, তাহাকে 'বিদ্যাসাগর' নামক একটি পদক পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আরও বহু স্থানে বহুবিধ পুরস্কার-পদকাদি দিবার সঙ্কল্প সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। নানা স্থানে লাইব্রেরি, চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক প্রভৃতি বহু পত্রেই তাঁহার স্মৃতিসম্মানসূচক শোক-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় এবং শ্রীমতী ভূপেন্দ্রবালা দেবীর লিখিত তিনটি কবিতা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। এই তিনটি কবিতাই হিতবাদী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর

ফুরাল বঙ্গের লীলা-মাহাত্ম্য সকলি,—
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী।
হারালে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ!
কি মহা পরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর,
কিবা বিদ্যা, বুদ্ধিপ্রভা, করুণা গভীর:
বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর:
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর;—
তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার!
কাঁদিছে, হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন,
কেবা অন্ন দিবে আর, কে ঘুচাবে দুঃখ,
দরিদ্র কাঙ্গালে দেখে কে চাহিবে মুখ;
কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর—
কাঙ্গালে হেরিয়া কেবা করে সে আদর।
মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্তিমান্,—
প্রাতে স্মরণীয় নিত্য যাঁর গুণগান!

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর বৈকুণ্ঠে

আমার ঈশ্বর প্রভু,
আমার প্রাণের প্রাণ,
আমার গুরুর গুরু, জ্ঞানের জেয়ান;
অপার দয়ার সিন্ধু,
অসংখ্য দীনের বন্ধু,
ভাষার ভাস্কর-ইন্দু, দেবতা মহান্।
বিধবার কাতরতা.
অনাথের প্রাণব্যথা,
ছাত্রের জীবন গুরু ঈশ্বর আমার;
বিদ্যার সাগর ধীর,
সত্যের তেজস্বী বীর,
অন্যায়ের মহাবৈর ন্যায়-অবতার।
গাম্ভীর্যের মহা মূর্তি,
রহস্যের মহাস্ফূর্তি,
শিষ্টের পালন প্রভু দুষ্টের দমন;
অমর ঈশ্বর মোর,
অমরগণের সনে
হৃদয়-বৈকুণ্ঠে মোর বিরাজে কেমন
মোর মত শত শত
লক্ষ লক্ষ হৃদয়েতে
এতদিনে পূর্ণরূপে ঈশ্বর-বিকাশ;
একটি বৈকুণ্ঠ নয়,
লক্ষ লক্ষ—ততোহধিক
হৃদয়-বৈকুণ্ঠ এবে ঈশ্বর-নিবাস।
কেন তবে কাঁদ সবে,
'জয়েশ্বর' উচ্চ রবে
তোল সুর বহু দূর আকাশ ভেদিয়া,
পৃথিবীর যে যেথায়,
শুনুক সে উচ্চ সুর,
কোটি কোটি চক্ষু মেলি দেখুক চাহিয়া,—
বাঙালীর ঘরে ঘরে,
লক্ষ লক্ষ ছয় কোটি
হৃদয়-বৈকুণ্ঠ মাঝে দয়ার সাগর
ঈশ্বর—ঈশ্বর—গুরু অমর ঈশ্বর।

রাজকৃষ্ণ রায়

কে বলে ঈশ্বর নাই

কে বলে ঈশ্বর নাই?
ঈশ্বর জীবনে ঈশ্বরের কার্য
জ্বলিছে দেখিতে পাই।
মৃত লোকে ভরা, স্বার্থপর ধরা
ঈশ্বরে হারায়ে আজ,
মৃত শোক ভরে, কাঁদিতেছে সবে
ধরিয়া শোকের সাজ।
বুঝে না তাহারা, অমর ঈশ্বর—
মরণ তাঁহার নাই;
নিঃস্বার্থ প্রেমের, অমৃতের ছবি
সংসারে রহিল তাই।

এ ছবি দেখিয়া কত মৃত প্রাণ
নূতন জীবন পাবে।
পরবর্তী কত নূতন জীবন
আদর্শে গঠিত হবে।
অমৃতের পুত্র, অমর ঈশ্বর
অমর-ভবন-বাসী,
প্রেম বিলাইয়া, অনন্ত প্রেমেতে
গিয়াছেন শেষে মিশি।

অমৃতের পুত্র, অমর ঈশ্বর
তাঁহার বিরহে আজ—
কাঁদিতেছে লোক, অমৃত ভাষায়
দেখে হৃদে পাই লাজ!
অমর বিরহে, কাঁদিবার তরে
চাই গো অমর ভাষা।
মৃত লোক তোরা, তুলেছিস্ কেন
তোদের এ মৃত ভাষা?
অমৃতের পুত্র অমর যাহারা
এসো অগ্রসর হয়ে—
অমর ভাষায় বিরহ সঙ্গীত
উঠ গো তোমরা গেয়ে।
সে সঙ্গীত গিয়ে প্রতি মৃতপ্রাণে
ঢালুক অমৃতধারা,

মুহূর্তের তরে,   সজীব হইয়া
হউক আপনাহারা।

শ্রীমতী ভূপেন্দ্রবালা দেবী

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগস্ট বা ১২৯৮ সালের ১১ই ভাদ্র টাউনহলে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুজন্য শোক-প্রকাশে এবং তাঁহাদের স্মৃতি-চিহ্ন-সঙ্কল্পে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর স্যর চার্লস্ ইলিয়ট্ সভাপতি হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পেথরামা সাহেব, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, অনারেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে তাঁহার প্রতির্মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালীর কতক সৌভাগ্যের পরিচয় বটে; কিন্তু ইহাও প্রায় ঘটে না। আমরা বুঝি, কীর্তিমানের কীর্তিই অনন্ত অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভ। ধাতু-প্রস্তর-নির্মিত প্রতিমূর্ত্তি বা পটাঙ্কিত প্রতিকৃতি পদে পদে প্রতিকৃতির অধীন। দুই দিনে তাহার লয় সম্ভাবনা; প্রলয়ে কীর্তির বিলোপ নাই। কীর্তি অবিনশ্বর ও অনন্ত-ভাস্বর। যাঁহারা স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের সংকল্প করিয়া, সিদ্ধ করিতে পারেন না, তাঁহাদের জন্য আমাদের বাস্তবিক আন্তরিক কষ্ট হয়। সভা করিয়া বাগাড়ম্বরে শোক প্রকাশ করিবার প্রথা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এ প্রথার পরম গুরু বিলাতী সাহেব সম্প্রদায়। তবে সাহেব সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত পলে পলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে পটু নহেন। বাঙ্গালীর এ গৌরববাদ অধুনা বিশ্ববিসর্পিত। সাহিত্যের রুচির চিত্রপটে ভাষার ললিত বর্ণলাবণ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ, বাঙ্গালী চরিত্রের এই অংশের একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এমারেল্ড থিয়েটারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণজন্য ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে রবীন্দ্রবাবুর পঠিত 'বিদ্যাসাগর-চরিত' প্রবন্ধের একস্থলে এই কথা লেখা ছিল,—"আমরা আরম্ভ করিয়া শেষ করি না। আড়ম্বর করি, কাজ করি না। যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না। যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরি-পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি; তিল-পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না।"

এই সভার সভাপতি মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার অকৃতকার্যতা স্মরণ করিয়া যেন আত্মচিত্তপ্রসাদকল্পে বলিয়াছিলেন,—"কীর্তিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত না হউক, বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত!" এ স্তোকবাণী নিশ্চিতই বিক্ষত বক্ষের স্নিগ্ধ প্রলেপ।

চরিত্রচর্চা

কালস্রোতে বিদ্যাসাগর যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকটিত হইল। বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব এবং কৃতিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বিদ্যাসাগর প্রকৃতপক্ষে বড়লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগর দানে বড়; বিদ্যাসাগর পরদুঃখকাতরতায় বড়; বিদ্যাসাগর বুদ্ধিবলে বড়; তিনি আরও কতশত বিষয়ে সাধারণ লোক হইতে অনেক বড। সাধারণ হইতে তাঁহার এই অসাধারণত্ব—পার্থক্য ছিল বলিয়াই, তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে

পারিয়াছিলেন; কর্মক্ষেত্রে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়াছিলেন। ফল মন্দ বা ভালই হউক, অসাধারণত্ব তাঁহার মধ্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

বিদ্যাসাগরের যে কালে জন্ম, সে কালে কালধর্ম সাধনের নিমিত্ত তাঁহারই মত একজন অসাধারণ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। কালস্রোতের পরিবর্তনের যখন প্রয়োজন হয়, তখন এইরূপ লোকেরই জন্ম হইয়া থাকে। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে।

কালপ্রভাবে হিন্দুধর্ম ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল,—বাঙ্গালার এমনই দুর্দিনে বিদ্যাসাগরের জন্ম হইল। বিদ্যাসাগর আপন অসাধারণ প্রতিভা এবং কার্যক্ষমতা লইয়া সেই ভাব-প্রচারের সহায় হইলেন। আর তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রবলবেগে প্রসারিত হইল। বিদ্যাসাগরের জন্ম একশত বৎসর পূর্বে বা একশত বৎসর পরে হইলে, সমাজে তাঁহার এত সম্মানপ্রতিষ্ঠা হইত কি না সন্দেহ। সমাজে প্রতিষ্ঠা হয়, কালোচিত ধর্ম-প্রতিপালনে। বিদ্যাসাগর তাহাই করিয়াছিলেন। নতুবা বল দেখি, অধ্যাপকের বংশে জন্ম লইয়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া, হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি, হিন্দুর ধর্মকর্মের প্রতি তিনি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিলেন না কেন? দয়াময় কৃপা করিয়া, কালধর্মসিদ্ধির মানসে তাঁহার হৃদয়ে পরদুঃখকাতরতার স্রোত এতই প্রবল করিয়া দিয়াছিলেন যে, বংশপরম্পরাগত ধর্মভাব ও শাস্ত্রজ্ঞান কোথায় ভাসিয়া গেল! বিধবার দুঃখ দেখিয়া বিদ্যাসাগর গলিয়া গেলেন। বহুবিবাহে কুলীনকামিনীর ক্লেশ দেখিয়া তদ্বিমোচনে বিদেশী রাজার আশ্রয় লইলেন। কিন্তু কি হইতে কি হইল? হিন্দুর বিবাহে কি পবিত্র সম্বন্ধ, ব্রহ্মচর্যের চরম উদ্দেশ্য কি, কোথা হইতে কোন্ মুখ্য ধর্মসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, কিরূপে ব্রহ্মচর্যে ব্যাঘাত পড়িল, কিরূপ ব্যাঘাতে সমাজের কি অনিষ্টের সূত্রপাত হইয়াছে, বিদ্যাসাগর তাহা বুঝিলেন না, তাঁহার অপার দয়াপ্রবৃত্তি তাঁহাকে তাহা বুঝিতে অবসর দিল না। তাঁহার সেই দয়াগুণে তাঁহার পৈত্রিক ধর্ম, শাস্ত্রশ্রদ্ধা সবই ভাসিয়া গেল।

এইরূপ বিদ্যাসাগরের চরিত্রে দেখিবে, দয়াগুণেই,—আত্মনির্ভরতাগুণেই তাঁহার নিকট আর কিছুই তিষ্ঠিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর কালের লোক। কালধর্মই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে; হিন্দুধর্মে আঘাত লাগিয়াছে; হিন্দুসমাজ বিশৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অপরাধ কি? যিনি তাঁহার হৃদয়ে এত দয়া—পরদুঃখকাতরতা দিয়াছিলেন, তিনিই জানেন, কেন এমন হইয়াছিল। নতুবা বড় কথা কহিতে চাহি না, বিদ্যাসাগরের যখন জন্ম হয়, সে সময় ব্রাহ্মণের ঘরে নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিক করিত না, এমন লোক প্রায় দেখা যাইত না; কিন্তু নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবনসর্বস্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মভাব কোন্ স্রোতে বহিবে, করুণাময় বাল্যকালেই ইঙ্গিতে তাহার আভাস দিয়াছিলেন।

ইহাই বিদ্যাসাগরের চরিত্রনির্যাস। আন্তরিকতা ও একাগ্রতা সে চরিত্রভিত্তির মূল উপকরণ। হিন্দুসন্তান বিদ্যাসাগরের এই আন্তরিকতা ও একাগ্রতা লইয়া শাস্ত্রনিশ্চিত স্বকার্য-সাধনে তৎপর হয়, ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা। এই প্রার্থনা লইয়াই 'বিদ্যাসাগরে'র প্রকাশ।

প্রথম বৎসরের নবজীবনে কবিবর হেমচন্দ্র যে সরল ও সরস ভাষায় এবং সম্যক্ উপযোগী গ্রাম্য-উপমায়, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া

চরিত্র-চর্চার উপসংহার করিলাম। কবি সংক্ষেপে কয়েকটি কথায় লিখিয়াছেন,—

"আস্‌চে দেখ সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যার সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির।
বঙ্গের সাহিত্য-গুরু শিষ্ট সদালাপী,
দীক্ষা-পথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞানপাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি,
কাঙ্গাল বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে সেঁকুল কাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরেজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত 'ডিস্‌',
টোল স্কুলের অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস্‌।"

নিপুণ চিত্রকর বিশাল চিত্রপটে যেমন বিরাট মনুষ্যের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রদর্শন করেন, ক্ষুদ্র চিত্রপটেও সেইরূপ করিতে পারেন। মহাকবি হেমচন্দ্র ক্ষুদ্র কবিতায় বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সকল তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। ধন্য কবি!

ইংরেজি রচনার নমুনা

To
H.F. Blandford Esqr.
Honry. Secry. to the
Trustees, Indian Museum.
Sir,

Having had occasion to visit the library of the Asiatic Society of Bengal, I called on the 28th January last, and as I wore native shoes, I was not admitted, unless I would leave my shoes behind. I felt so much affronted that I came back without an expostulation.

Whilst I was in the compound, I saw the native visitors, wearing native shoes, were made not only to uncover their feet, but also to carry their shoes with their own hands, though there were some up-country people moving about in the museum room with their shoes on.

* * *

Besides, if persons so wearing shoes of the English pattern though coming on foot, could be admitted with shoes on, I could not make out why persons of the same status in life and under similar circumstances should not be admitted, simply because they happened to wear native shoes, &c.

* * *

I have &c.
(Sd.) I. C. Sarma.
5.2.74.

সংস্কৃত পণ্ডিত ও বাংলার নবজাগরণ

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আমাদের অনেকের মনেই একটি বদ্ধমূল সংস্কার আছে যে, যাঁহারা কেবলমাত্র, অথবা প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা সাধারণতঃ 'সংস্কৃত পণ্ডিত' বলিয়া পরিচিত, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে যে নবযুগ বা নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব ছিল না। অর্থাৎ, এই প্রগতিশীল, যুক্তিমূলক, নবীন যুগের সহিত তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষার এত পার্থক্য ও অসামঞ্জস্য ছিল যে, এই নূতন আদর্শ ও চিন্তাধারা তাঁহাদিগের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। অনেকেই নিঃসংশয়ে এই মতটি প্রচার করিয়াছেন, অথবা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকার করিয়া নিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় চোখ খুলিয়া যায় এবং সংস্কৃত শিক্ষায় চোখ বন্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ, সংস্কৃত পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ জগতের ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং তাঁহাদের দৃষ্টি অতীত ঘটনার স্মৃতি ও মানসিক চিন্তায় সীমাবদ্ধ।

এই ধারণা যে অনেকাংশে সত্য, তাহা স্বীকার করিলেও উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ধারণা যে গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা দেখাইবার জন্যই কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

উনিশ শতকের নবজাগরণের সূত্রপাত প্রথমে বঙ্গদেশেই হইয়াছিল। ইহার মূলে ছিল ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত পরিচয়। এই ইংরেজি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল হিন্দু কলেজ। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের ছাত্রদল, Young Bengal অর্থাৎ 'যুব-বঙ্গ' নামে পরিচিত। অধ্যাপক ডিরোজিও-র আদর্শ, উপদেশ ও দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত এই নব্য ছাত্রদল যে বঙ্গের অনাগত নবজাগরণের ভিত্তিস্থাপনে একটি প্রধান ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং যাঁহারা এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের নব জাগরণের কৃতিত্ব বহুল পরিমাণেই তাঁহারা দাবী করিতে পারেন। এই জন্যই যাঁহারা রাজা রামমোহন রায়কেই বঙ্গদেশের নবজাগরণের একমাত্র অগ্রদূত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বহুদিন যাবৎ ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন যে, রামমোহনই হিন্দু কলেজের আদি কল্পক। কিন্তু এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আমি অন্যত্র তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।[১] এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিল গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়, এবং বহু সংস্কৃত পণ্ডিতও ইহার মধ্যে ছিলেন। ইহা অনেকের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে। সুখের বিষয়, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সমসাময়িক ও বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিব।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড্ ঈষ্ট্ লন্ডন-এর এক বন্ধুর নিকট এই কলেজের প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাই যে এ-বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং এই চিঠির যে-অংশে বর্তমান প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহার সারমর্ম দিতেছি।[২]

"গত মে মাসের প্রথম ভাগে আমার পূর্বপরিচিত কলিকাতাবাসী এক ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন যে, এই সহরবাসী অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুর ইচ্ছা যে, ইউরোপে যে-রকম

উদারপ্রণালীতে যুবকগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে তাঁহাদের সন্তান সন্ততিরা সেইরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারে, সেইরূপ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। আমার বাড়ীতে একটি সভার অধিবেশন করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্য করিবার জন্য ঐ ব্রাহ্মণ আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি স্বীকৃত হইলে ১৪ই মে প্রায় ৫০ জন ধনী মানী ও নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু আমার বাড়ীতে সমবেত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরাও ছিলেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং আরও অনেক টাকা চাঁদা তুলিয়া দিবেন, এরূপ ভরসা দিলেন।

"সভা আরম্ভ হইবার পূর্বে আমি সকলকে সভাস্থলের পার্শ্বস্থ একটি কক্ষে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। আমার অপরিচিত কয়েকজন সংস্কৃত পণ্ডিতকে আমার সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধান, তিনি দুই হাত মুঠা করিয়া আমার দিকে প্রসারিত করিলেন, এবং মুঠার ভিতর হইতে অনেকগুলি সুগন্ধি পুষ্প আমার হাতে দিয়া বলিলেন যে, 'সাহিত্যের প্রতীক স্বরূপ এই ফুলগুলি আমাকে উপহার দান করিলেন, আমি গ্রহণ করিলে তাঁহারা সুখী হইবেন।' তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছি, এমন সময় একজন ধনী, সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন যে, আশা করি রামমোহন রায়ের নিকট হইতে কোন চাঁদা গ্রহণ করা হইবে না। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে, 'রামমোহন আমাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন, এবং আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছেন।' আমি বলিলাম, 'আমি রামমোহনকে চিনি না ; কখনও তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই ; তাঁহার ধর্ম কি, তাহা জানি না।"

এই কথোপকথনটি চিঠিতে উদ্ধৃত করিয়া হাইড্ ঈষ্ট্ একটি মহদুপকার করিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি যে হাইড্ ঈষ্ট্ তাঁহার চিঠির আরম্ভেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার পরিচিত এক ব্রাহ্মণ সর্বপ্রথমে তাঁহার নিকট এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। সুতরাং যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, রামমোহনের প্রচেষ্টায়ই বাংলায় নবযুগ প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রধান সহায়ক হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারা এই চিঠিখানি উদ্ধৃত করিবার সময় টিপ্পনী করিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ অবশ্যই রামমোহন রায়। অন্ধ ভক্তি যে কৃতি পুরুষদিগকেও কিরূপ বিভ্রান্ত করে, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কারণ, ঐ-চিঠিতেই হাইড্ ঈষ্ট্ লিখিয়াছেন যে, রামমোহনের সহিত তাঁহার পরিচয় নাই। সুতরাং চিঠির গোড়াতে উল্লিখিত "পরিচিত ব্রাহ্মণ" যে রামমোহন রায় হইতে পারেন না, এই সহজ কথাটি মেজর বামনদাস বসু ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত পণ্ডিত লোকেরও মনে হয় নাই। তাঁহারা এই ব্রাহ্মণকে রামমোহন রায় বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহনের অন্ধ স্তাবকেরা সে-দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই—এবং আমি যখন প্রথম এই ভুলটির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, তখন 'দেশ' নামক পত্রিকায় আমার প্রতি বহু কটূক্তি ও নিন্দাবাদ-সূচক চিঠি-পত্র, মন্তব্য প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতিবাদস্বরূপ যে সমুদয় চিঠি-পত্র পাঠান হইয়াছিল, তাহা সম্পাদক মহাশয় ছাপান নাই। ধর্মান্ধতা যে পত্রিকা সম্পাদকদিগকেও কিরূপ কর্তব্যভ্রষ্ট করে, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তবে সত্য কখনও চিরকাল চাপা থাকে না। সম্প্রতি প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে ঐ ব্রাহ্মণ রামমোহন রায় নহেন। তবে স্তাবকেরা বলেন যে রামমোহনই ঐ ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া ইহার সপক্ষে কোন যুক্তি নাই।

এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে কলিকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ই হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও এই নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সার্ হাইড্ ঈষ্ট উক্ত পত্রের উপসংহারে তাঁহার বাড়ীতে যে প্রথম সভা হয়, সে-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"এই সভার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, হিন্দুদের মধ্যে যে নানা জাতি আছে, তাঁহাদের প্রতিনিধিরাও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা এক সঙ্গে বসিয়া আহার করা সমাজ ও ধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও নিজ নিজ সন্তানদের একসঙ্গে উপবেশন ও বিদ্যাভ্যাস করার জন্য খুবই আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন।

"দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, কলিকাতার যে কয়জন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুযায়ী যে পাঠ্যসূচী সভায় প্রস্তাব করা হইল, তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। সভাভঙ্গের পর পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রধান, তিনি আমাকে বলিলেন : 'একদিন আমাদের দেশ যে জ্ঞানের গরিমায় উজ্জ্বল ছিল, তাহা আজ আর নাই। কিন্তু আমাদের আশা হইতেছে যে, এই প্রস্তাবিত কলেজের প্রতিষ্ঠার ফলে আবার হিন্দুরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দেশের প্রাচীন গৌরব কেবল পুনরায় উজ্জীবিত করিবে, তাহা নহে, তাহা আরো বৃদ্ধি করিবে। আমরা যে এই দিনের সম্ভাবনা দেখিয়া যাইতে পারিলাম, তাহাতে আমাদের খবই আনন্দ হইয়াছে।"

এই সভার অধিবেশনের চারিদিন পরেই সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ঐ চিঠিখানি লেখেন। সুতরাং তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। রামমোহন রায় বা ডেভিড্ হেয়ার নহে, কলিকাতার হিন্দু সম্প্রদায়ই যে এই কলেজের পরিকল্পনা করেন, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, প্রস্তাবিত কলেজের যে নিয়মপ্রণালী সর্বপ্রথম গৃহীত হয়, তাহাতে স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, এই বিদ্যালয়টি কেবল হিন্দুদের জন্য, অন্য কোন ধর্মসম্প্রদায়ের ছাত্রের এখানে প্রবেশ নিষেধ। যাঁহারা প্রচার করেন যে, রামমোহন রায় এই কলেজের পরিকল্পক, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, হিন্দুধর্মবিরোধী রামমোহনের পক্ষে এই শর্ত প্রস্তাব করা, বা ইহাতে সম্মত হওয়া অসম্ভব, এবং ইহা যে সঙ্কীর্ণতা ও অনুদার মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়, রামমোহনের যে ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ তাঁহারা কল্পনা করেন, তাহার সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হাইড্ ঈষ্ট-এর বাড়ীতে যে সভায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, তাহাতে রামমোহন রায় বা ডেভিড্ হেয়ার কেহই উপস্থিত ছিলেন না, এবং এই কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য যে 'কমিটি' গঠিত হয়, তাহার সভা নির্বাচিত হন নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনে সংস্কৃত পণ্ডিতদের অবদান উল্লেখ করিলাম। উনিশ শতকের নবজাগরণের আর একটি বৈশিষ্ট্য, স্ত্রী-জাতির উন্নতি। এ-সম্বন্ধেও সাধারণের বিশ্বাস যে, রামমোহন রায়ই এই সংস্কারের পথ প্রদর্শক। সতীদাহ নিবারণের জন্য রামমোহন রায় যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এ-বিষয়েও যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অবদান আছে, আমরা তাহা ভুলিয়া যাই। সতীদাহ প্রথা যে হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে, রামমোহন তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ' নামে যে গ্রন্থ লেখেন তাহা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এ-বিষয়ে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বহুশাস্ত্র মন্থন করিয়া যে সুদীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, স্বয়ং রামমোহন তাঁহার একখানি গ্রন্থে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ; এবং বর্তমান যুগের একজন

ঐতিহাসিক, যিনি রামমোহনকেই সতীদাহ এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্কারের পথপ্রদর্শক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, রামমোহন উল্লিখিত তাঁহার গ্রন্থে সতীদাহের বিরুদ্ধে যে সমুদয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ অথবা, (প্রায় সকল) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁহার পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।[৩] পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ যে সতীদাহ প্রথা নিবারণের আন্দোলনে রামমোহন রায়কে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা পরে উল্লিখিত হইবে।

স্ত্রীলোকের উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের একটি বৈশিষ্ট্য। হিন্দুদের মধ্যে একটি কু-সংস্কার প্রচলিত ছিল যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলেই বিধবা হইবে। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথমে স্ত্রী-শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। উনিশ শতকের প্রথমভাগে সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সারা মুর্শিদাবাদ জিলায় মাত্র নয়জন স্ত্রীলোকের অক্ষর পরিচয় ছিল। ধনী বা জমিদারের কন্যারা কেহ কেহ গৃহে সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখিত—তাছাড়া ভদ্র পরিবারের মেয়েরাও প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিল। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা'-র বৈঠকে, এবং হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া মৌলিক আন্দোলন হইত মাত্র। কিন্তু এই গুরুতর সমস্যাটির প্রতি একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই সর্বপ্রথম একখানি বই লিখিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইঁহার নাম গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া, পূর্বোক্ত কু-সংস্কারের অসারতা এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেন। তাঁহার সমসাময়িক রামমোহন রায়, বা অন্য কেহ এইরূপ প্রচারের দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ-রূপ আমার জানা নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পূর্বোক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। ইনি গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য নামে পরিচিত। তিনি 'সংবাদ-ভাস্কর', 'রসরাজ' প্রভৃতি বাংলা পত্রিকার সম্পাদক রূপে স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং সমাজ সংস্কারের সমর্থন করিয়া খুব খ্যাতি লাভ করেন। বর্তমানে 'বেথুন কলেজ' নামে পরিচিত বিদ্যালয়টি যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হিন্দুরা ইহা বিশেষ সমর্থন করেন নাই। কিন্তু গৌরীশঙ্কর ইহার পূর্ণ সমর্থন করিয়া ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে'র 'সংবাদ-ভাস্কর'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন :

"আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কু-প্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগেব বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি।...

সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ-ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেন্ট হৌসের প্রধান, হালে লড বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে আর ভয়ের বিষয় কি।

সহস্র সহস্র কি লক্ষ লক্ষ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব।"

গৌরীশঙ্কর 'সংবাদ-ভাস্কর'-এর সম্পাদন কার্য অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেন। তিনি যে চারিখানি সাময়িক পত্র পরিচালনা করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ 'জ্ঞানান্বেষণ'[৪] তাহার অন্যতম। অনেক সভা সমিতি ও জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। বর্তমান

কালে Public Man বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তাহাই ছিলেন।[৫]

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে কেবল স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থন করিতেন তাহা নহে। বেথুন স্কুল স্থাপিত হইলে প্রথম বৎসরে যে ২১টি বালিকা ভর্তি হয়, তাহাদের মধ্যে দুইজন ছিল মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা। তিনি স্ত্রী-শিক্ষা সমর্থন করিয়া 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।[৬] পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি তাঁহার কন্যাদের বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন।[৬ক]

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা আবশ্যক যে যখন অনেক ইংরাজি শিক্ষিত 'নব্যবঙ্গ' স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, তখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেহ কেহ ইহার সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। *Hindu Intelligencer* পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত নব্যবঙ্গ নেতা যখন তাঁহার পত্রিকায় স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন, তখন পূর্বোক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সংবাদ-ভাস্কর' পত্রিকায় তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন।[৭]

বাংলায় নবজাগরণের আর একটি বিশিষ্ট অবদান, বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি। এ-এক্ষেত্রেও অনেকে রামমোহন রায়কেই বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যের জনক বলিয়া অভিহিত করেন। রামমোহন রায়ের প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'বেদান্তসার' ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সমুদয় গ্রন্থ ১৮০২ হইতে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ইহা সত্ত্বেও বাংলা গদ্য সাহিত্যে রামমোহনের জনকত্ব বজায় রাখিবার জন্য লিখিয়াছেন যে, স্কুল পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডির বাহিরে রামমোহনই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা।[৮] মৃত্যুঞ্জয়ের অনেকগুলি পুস্তক প্রধানতঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ-এর ছাত্রদের জন্য লিখিত হইলেও এগুলির সাহিত্যিক মূল্য তাহাতে হ্রাস পায় না। তাছাড়া শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' পাঠ্যপুস্তক নহে, রামমোহনের গ্রন্থের ন্যায় গুরুতর বিষয়ের আলোচনা, এবং ইহার রচনাকাল ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে রামমোহন অপেক্ষা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের দাবী অনেক বেশী। অবশ্য মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম গদ্যগ্রন্থ প্রকাশের এক বৎসর পূর্বে (১৮০১ খ্রীঃ) রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হয়; সুতরাং তিনিই বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকেই "বাংলা গদ্যের সক্ষম শিল্পী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[৯] তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিছুদিন পূর্বেও এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই প্রথমে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, রামমোহনের পূর্বে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত বাংলা ব্যাকরণের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১০]

এ যাবৎ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে একথা অনস্বীকার্য যে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের চারিটি প্রধান লক্ষণ—ইংরাজী শিক্ষা এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন, সামাজিক সংস্কার ও বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি—এ সমুদয় বিষয়েই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যথেষ্ট অবদান আছে। এই সবগুলিরই পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই প্রাতঃস্মরণীয় স্বনামধন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনে। ইহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই, কারণ এ সকলই সুবিদিত তথ্য এবং বর্তমান প্রবন্ধে ইহা সম্ভব নহে। ডাক্তার ময়েট্-কে লিখিত পত্রে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে লিখিয়াছিলেন :

"আমার বক্তব্য হল, আমাদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতে দিন প্রধানতঃ বাংলা ভাষার উন্নতির

জন্য। তার সঙ্গে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার সুযোগ দিন। এই সুযোগ পেলে আমি নিশ্চিত হয়ে আপনাকে বলতে পারি...আমি কয়েক বছরের মধ্যে এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরি করে দিতে পারব, যারা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিদ্যার প্রসারে আপনাদের প্রাচ্যবিদ্যার অথবা শুধু ইংরাজী বিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে অনেক বেশী সাহায্য করতে পারে।"[১১]

এই কয়েকটি কথায় ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষার যে প্রণালী ও আদর্শ প্রচার করেন, তাহা কেবল উনিশ শতকের নহে, বিংশ শতকেরও শিক্ষার আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইবার যোগ্য।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই বিদ্যাসাগর বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ; তিনি ইহার 'ম্যানেজিং কমিটি'-র অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১২]

সামাজিক সংস্কারের মধ্যে বিধবা-বিবাহ সমর্থক আইন প্রণয়ন বিদ্যাসাগরের অক্ষয় কীর্তি। তিনি কেবল ইহা প্রণয়ন করেন নাই, তাঁহার পুত্রের বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র সামাজিক গোলযোগের, অর্থাৎ এই বিবাহ হইলে আত্মীয় কুটুম্বেরা তাঁহাদের সহিত আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই আশঙ্কার উল্লেখ করিয়া এই বিবাহ নিবারণের জন্য অনুরোধ করিলে, বিদ্যাসাগর লিখিয়াছিলেন :

"বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।... এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।... আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি ; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব।"[১৩]

এই একটি ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের দার্ঢ্যের কথা স্মরণ করিলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয় : "বিধাতা সাত কোটি বাঙ্গালী গড়িতে গড়িতে একটি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

বিদ্যাসাগরের উক্তির মাহাত্ম্য সম্যক বুঝিতে হইলে এ-বিষয়ে তাঁহার পূর্ববর্তী সমাজ সংস্কারকগণের অগ্রণী রাজা রামমোহন রায়ের বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে একটি উক্তি স্মরণ করা প্রয়োজন। তাঁহার মতের জনৈক বিরোধী, 'ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী' নাম গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

"নানা মুনি-বচন সত্ত্বেও বিধবার বিবাহের নিবৃত্তির ব্যবহার এবং মদ্যপানে ও হিংসার প্রাবর্ত্তক প্রমাণ সত্ত্বেও তাহার অকারণে ব্যবহার ইত্যাদি সদ্ব্যবহার হয় ইহার বিপরীত অসদ্ব্যবহার।"

উক্তিটির তাৎপর্য এই যে, বিধবার বিবাহ যদিও শাস্ত্র-সম্মত, তথাপি ইহা না-করাই সদ্ব্যবহার, এবং মদ্যপান ও জীবহিংসা (অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ) শাস্ত্র-সম্মত হইলেও তাহা না-করাই সদ্ব্যবহার। ইহার উত্তরে রামমোহন লিখিয়াছেন :

"বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্য হইয়াছে সুতরাং সদ্ব্যবহার কহাইতে পারে না. কিন্তু বিহিত মদ্যপান ও বৈধ হিংসা সল্লোকেদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার্য অতএব তত্তৎ পক্ষে সে সর্ব্বথা সদাচার ও সদ্ব্যবহারে গণিত হইয়াছে।"[১৪]

অর্থাৎ বিধবার বিবাহ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিষিদ্ধ, সুতরাং ইহাকে কদাচ সদ্ব্যবহার বলা যায় না কিন্তু বিহিত মদ্যপান অনেক সৎ লোকেই করিয়া থাকেন, অতএব ইহা সদাচার ও

সদ্ব্যবহার বলিয়া গণিত হইবার যোগ্য। অর্থাৎ সর্বলোকে যাহাকে মন্দ বলে, তাহাই অসদাচার, কোন কোন সৎলোক বিধিমত যাহা করেন, তাহাই সদাচার। সুতরাং রামমোহনের মতে সামাজিক আচার ভাল কি মন্দ, তাহার বিচারের একমাত্র মাপকাঠি লোকমত—ইহাতে যুক্তিতর্কের কোন স্থান নাই। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পথ্য প্রদান' গ্রন্থে নবযুগের সমাজ-সংস্কারকদের অগ্রণী রামমোহনের মতের কথা, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে মহারাজা রাজবল্লভের ন্যায় বড় বড় হিন্দু নেতাদের এ বিষয়ে নিষ্ফল চেষ্টার কাহিনী স্মরণ করিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ চেষ্টায় বিধবা-বিবাহের সমর্থক আইন প্রণয়নের গুরুত্ব যে কত সে-সম্বন্ধে আমরা সঠিক ধারণা করিতে পারিব। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন পাশ হয়। ইহার পূর্ব বৎসরে আইন করিয়া কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ রহিত করিবার প্রস্তাব হয়। বাংলার ২১,০০০ ব্যক্তি স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্রে এই প্রস্তাব সমর্থিত হয়। গভর্ণমেন্ট ইহা বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির গণ্যমান্য হিন্দু সদস্যগণ, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এইরূপ আইন প্রণয়ন অনাবশ্যক ও অসঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করেন ; কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বিষম কু-প্রথা রহিত করিবার জন্য আইন প্রণয়নের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

বাংলার নবজাগরণের আর একটি প্রধান লক্ষণ, বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব। এ-বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমার কোন মন্তব্য যোগ করা ধৃষ্টতা মাত্র।

যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল তাহা হইতেই উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অবদান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাইবে।

প্রমাণপঞ্জি

১· R. C. Majumdar, *On Rammohan Roy* (Asiatic Society. Calcutta. 1972) *Journal of the Asiatic Society*, vol. XXI (New Series), pp. 39-51.

২· পূর্বোক্ত গ্রন্থে ও প্রবন্ধে মূল চিঠিখানি উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩· Dr. N. S. Bose, *The Indian Awakening and Bengal*, 2nd ed. 1969. p. 171.

৪· ইহা ইংরেজী শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী যুবকগণের মুখপত্র। দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় নামে সম্পাদক হইলেও, ইহার সম্পাদকীয় কার্য সম্পন্ন করিতেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। ('সাহিত্য সাধক চরিতমালা'-৮ ; পৃষ্ঠা-৭)।

৫· গৌরীশঙ্কর সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'-৮।

৬· বিনয় ঘোষ লিখিয়াছেন : "স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধীদের সমস্ত আপত্তি একে একে খণ্ডন করে মদনমোহন যে দীর্ঘ রচনাটি লেখেন, স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে সমসাময়িক রচনার মধ্যে তা একটি উৎকৃষ্ট রচনা।" ('বিদ্যাসাগর', ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৮)।

৬ক· শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবন চরিত', (কলিকাতা, ১৩০০ সাল) পৃষ্ঠা ২০।

৭· 'বিদ্যাসাগর' ৩য় খণ্ড। পৃষ্ঠা ১২৫-২৭।

৮· *History of Bengali Literature*, p. 182.

৯· 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'-৩, পৃষ্ঠা ৫২।

১০· লন্ডনে বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' পুঁথিখানি শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় আবিষ্কার ও সম্পাদনা করিয়াছেন। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহার রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, এবং ১৮০৭-১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি John Leyden-এর নির্দেশে ইহা রচনা করিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য : 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ', তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। (সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৭৭।) পৃষ্ঠা ২১-২২

১১· বিনয় ঘোষ, 'বিদ্যাসাগর', তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৬০।

১২· তদেব। ষষ্ঠ অধ্যায়। ১০৮-৫৯ পৃষ্ঠায় স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যাহা করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

১৩· তদেব। পৃষ্ঠা ১৬১।

১৪· "পথ্য প্রদান"। 'রামমোহন গ্রন্থাবলী', সাহিত্য পরিষৎ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪০।

বিদ্যাসাগরিকা

সুকুমার সেন

বিদ্যাসাগর ছিলেন গম্ভীর মতিমান্, কিন্তু তাঁর চরিত্র গহন ছিল না, লবণাক্ত এবং উত্তালও ছিল না। ছিল স্বচ্ছ এবং শান্ত। তাঁর যে অনেক গুণ ছিল সে কথা বলা আজ বাহুল্য। তাঁর ব্যক্তিত্বে কিছু কিছু এমন বিশিষ্টতা ছিল যা আমাদের চোখে প্রায়ই পড়ে না। তার মধ্যে একটা হল মনে স্পষ্টতা এবং কর্মে স্বাচ্ছন্দ্য। তিনি যা করবেন ঠিক করতেন তাতে আর নড় চড় করতেন না। এই কারণে অল্প বয়সে তাঁকে কেউ কেউ বলত গোঁয়ার আর বেশি বয়সে কেউ কেউ বলত দাম্ভিক। বিদ্যাসাগর পরিপূর্ণ মাত্রায় কেজো লোক ছিলেন। কাজ আর অকাজ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ও দৃঢ় ধারণা ছিল। তিনি কোন রকম আড়ম্বর বা অবান্তরতার প্রশ্রয় দিতেন না এবং কার্য সিদ্ধির জন্য কাউকে তোয়াজ করতেন না। আমাদের দেশের তখন যাঁরা হোমরা-চোমরা ছিলেন, যাঁদের দেশহিত কর্মোদ্যমের দিকে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ও সাধারণ মানুষ চেয়ে থাকত, তাঁদের অনেকেরই চরিত্র তিনি জানতেন। এইজন্যে বিদ্যাসাগর কর্মের ক্ষেত্রে কোন অকর্মণ্য সহযোগীকে কদাপি সহ্য করতেন না, কিন্তু কর্মিষ্ঠ সহযোগীকে সর্বদা বরণ করতেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন, তিনি বিদ্যাসাগবের চরিত্র ভালো করেই জানতেন। তিনি বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছিলেন (হাতের কাছে বই নেই, স্মৃতি থেকে লিখ্ছি, তাই একটা আধটা শব্দে গোলমাল হতে পারে), "Vidyasagar could not bear a brother near the throne" (অর্থাৎ বিদ্যাসাগর তাঁর সিংহাসনের পাশে কোন অংশীদারকে সহ্য করতে পারতেন না)। কথাটা শুনতে খুবই খারাপ, বিদ্যাসাগর যেন সাধারণ বাঙালীর মতোই ঈর্ষালু ছিলেন। মনে হচ্ছে, কৃষ্ণকমলবাবু এমনও ইঙ্গিত করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগর অন্য বাঙালীকে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ কর্তাদের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না, পাছে তাঁদের উপর নিজের প্রভাব খর্ব হয়। এই ধারণা—কৃষ্ণকমলবাবুর মতো "প্রত্যক্ষদর্শী"র হলেও—সম্পূর্ণ ভুল। হেমরা-চোমরা সহকারীরা কাজকে এগোতে যে কিছুমাত্র সহায়তা করে না, তা তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝতেন।

তাই কাজের ক্ষেত্রে স্বার্থপরদের সহকারিতা তিনি কখনো স্বীকার করেননি। এইখানে উক্তি স্মরণ করি। কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পরিকল্পিত "সারস্বত-সমাজ" (বাংলা একাডেমি বা সাহিত্য পরিষদের মতো) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়েছিলেন তাঁকে সভাপতি হবার আবেদন জানাতে। কর্মকর্তাদের নামের তালিকা শুনে বিদ্যাসাগর বললেন, হোমরা-চোমরাদের নিয়ে কোন কাজ হবে না, তোমরা আমাকে বাদ দাও। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বিদ্যাসাগরের কথাই ফলেছিল, হোমরা-চোমরাদেরও নিয়ে কোন কাজই হয়নি (কেবল রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভূগোলের পরিভাষা করে দিয়েছিলেন।) বিদ্যাসাগরের নাম অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু যেখানে তিনি তাঁর নিজের বিবেচনার মতো কাজ করবার অবকাশ পাননি সেখানে তিনি নিষ্ক্রিয় থাকতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি স্থাপনা-সভ্য (Foundation Member of the Senate) ছিলেন এবং সংস্কৃত বোর্ডের সভ্যও ছিলেন। কিন্তু সেখানে পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশি প্রভাব ছিল বলে এবং তাঁর পাঠ্যপুস্তক ছিল বলে সেখানে তিনি উদাসীন থাকতেন।

জানি না কেউ এ ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কিনা,—বিদ্যাসাগর বক্তৃতা করতেন না। বক্তৃতা বলতে যা বোঝায় বিদ্যাসাগর কখনো তা করেছেন বলে আমার জানা নেই। এ একটা বড় বাঙালী অসুলভ প্রবৃত্তি। বিদ্যাসাগরের মতো কোন হোমরা-চোমরা বাঙালী, সেকালে ও একালে, ভাষণ পরাঙ্মুখ, এমনটি আর দেখা যায়নি। শোনা যায় বিদ্যাসাগর তোতলা ছিলেন, কিন্তু তারই জন্যে জনতার সামনে রসনা সংযম নয় বলেই মনে হয়। তিনি কর্মী ছিলেন এবং তাঁর উদ্যমের মূলে দৃঢ়তা ছিল বলেই বৃথা বাক্যব্যয়ে জঞ্জাল বাড়াতে চাননি। যে মেঘ গর্জায় সে মেঘ তত বর্ষায় না—এ প্রাকৃতিক সত্য বিদ্যাসাগরের বেলায় মানবিক সত্য হয়েছে।

চিন্তায় স্বচ্ছতা ও পরিকল্পনায় পরিচ্ছন্নতা বিদ্যাসাগরের চারিত্র্যের বোধ করি উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর সমস্ত কর্মের, তা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, সংসিদ্ধির মূলে আছে এই চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যটি। তাঁর আগে রামমোহন রায় লিখেছিলেন কেজো গদ্য, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লিখেছিলেন পণ্ডিতি গদ্য। দুটি স্টাইলের কোনটিরই সর্বার্থসাধক সর্বকার্য-সমর্থ ভাবভারবাহক উপযোগিতা ছিল না। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার এই নড়বড়ে গদ্য রীতির সংস্কার ক'রে তার স্থায়ী সর্বসাধারণ রূপটি দিয়েছিলেন। (সর্বসাধারণ বলতে এখানে অল্পবিস্তর শিক্ষিত বাঙালীর কথাই বলছি)। একাজ তিনি অনায়াসে করতে পেরেছিলেন তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা ও পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনার গুণে। আজকের দিনের অর্থে বিদ্যাসাগর হয়ত "সাহিত্যিক" ছিলেন না, সাহিত্যসেবীও ছিলেন না, তিনি সাহিত্যের রথের জন্যে পথ করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যের যথার্থ পথিকৃৎ।

বিদ্যাসাগরের গম্ভীর চরিত্রের একটা প্রশস্ত দিক ছিল কারুণ্য। অসহায় মানুষের দুর্দশা তাঁকে পীড়িত করত। সত্যকার মহৎ ব্যক্তির চরিত্র যে বজ্রের চেয়েও কঠিন হয়ে ফুলের চেয়েও কোমল হতে পারে, এই কবিসূক্তির প্রমাণ পাই বিদ্যাসাগরের আচরণে। পীড়া ও পীড়নের প্রতিকারে তাঁর সর্বসামর্থ্য প্রয়োগের উদাহরণ প্রচুর আছে। এই সব উদাহরণ বিচার করলে আমরা পাই বিদ্যাসাগরের পরিচ্ছন্নতাবোধেরই এক অভিনব প্রকাশ। ব্যক্তির পীড়া সংসারজীবনকে বিপর্যস্ত করে, সংসার অপরিচ্ছন্ন হয়। দুঃস্থের আর্ত ও গভীর বেদনার দৃষ্টিতে দেখলে সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করে, দেশ অপরিচ্ছন্ন হয়। এমন দৃষ্টি বিদ্যাসাগরের ছিল। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। অনেকেই বোধ হয় জানেন, হিতবাদীর সম্পাদক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং তিনি প্রবাসীতে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের প্রসঙ্গে ঘটনাটি লিখেছিলেন।

মৃত্যুর দু তিন বছর আগে বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্যের জন্যে কিছুদিন চন্দননগরে ছিলেন। তিনি প্রত্যহ সকালে বেড়াতে যেতেন, সঙ্গে দু-একজন থাকত, প্রায়ই যোগেন্দ্রবাবু থাকতেন। একদিন বেড়াতে বেড়াতে তিনি একটি সাঁওতাল বুড়ীর বাড়ি ছাড়িয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরলেন। বুড়ীর কুটীরের চালে লাউগাছ উঠেছিল, সে লতার একটি ডগা রাস্তার ধারে পড়ে ধূলায় লুটোচ্ছিল। বিদ্যাসাগর যাবার সময় এটি লক্ষ্য করেননি, কিন্তু তাঁর অবচেতন মনে হয়ত এই অপরিচ্ছন্নতা খোঁচা দিয়েছিল। এই খোঁচা তাঁর জাগ্রত মনে পৌঁছতে তিনি ফিরে এসে সেই লাউডগাটি চালের উপর তুলে দিয়ে গন্তব্য পথে চললেন। এই ঘটনায় দরিদ্রের প্রতি করুণার প্রকাশ নিশ্চয়ই আছে, তবে পরিচ্ছন্নতাবোধের পরিচয়ও কম নেই।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ও বিদ্যাসাগর

আশুতোষ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর যে সাহিত্য সম্পর্কে আমরা সর্বদাই গৌরব প্রকাশ করে থাকি, তার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বিষয় যে প্রবন্ধ ছিল তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। অথচ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে আজ বাংলা সাহিত্যের যে বিষয়কে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বলে মনে করতে পারি তা যে প্রবন্ধ নয়, এ কথাও সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। মাত্র একশ বছরের ব্যবধানেই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এ অবস্থা যে কেন সৃষ্টি হলো, তা গভীরভাবে বিচার করে দেখা আবশ্যক।

ধর্মালোচনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকেরাই এদেশে বাংলা গদ্যভাষার প্রথম প্রবর্তক ; এদেশে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁরা সর্বপ্রথম গদ্যভাষা অবলম্বন করেছিলেন এবং সেই সূত্রে খ্রীষ্টান ধর্মের মাহাত্ম্য ও হিন্দুধর্মের নিন্দা প্রচার করে গদ্য রচনা প্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিদ্বেষমূলক যে মনোভাবই প্রকাশ পাক না কেন, বাংলা সাহিত্যে আধুনিক প্রবন্ধের প্রথম উন্মেষ দেখা দিল। এ সম্পর্কে আধুনিক প্রবন্ধ কথাটি উল্লেখ করবার বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে। অনেকের বিশ্বাস, গদ্যভাষার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবন্ধের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এ-কথা সত্য নয়। আমাদের দেশে মধ্যযুগেও প্রবন্ধ ছিল, তবে তা সেকালের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পয়ার ছন্দে পদ্যে লেখা হতো। মধ্যযুগের পয়ার ছন্দই মধ্যযুগের গদ্য। এ যুগে গদ্যভাষায় আমরা সাহিত্যের যে-সব বিষয় রচনা করে থাকি তাদের প্রত্যেকটি বিষয়ই মধ্যযুগের পদ্যে পয়ার ছন্দে লেখা হতো। সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করবার মতো যেমন একটি স্বচ্ছন্দ গতি পয়ার ছন্দের ছিল, তেমনই সূক্ষ্মতম দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণেও তার ক্ষমতা ছিল। তাই রামায়ণ মহাভারতের সুদীর্ঘ কাহিনী যেমন পয়ার ছন্দেই সেদিন বর্ণিত হয়েছে, তেমনই চৈতন্য-চরিতামৃতের মতো দার্শনিক তত্ত্বমূলক প্রবন্ধধর্মী রচনাও পয়ার ছন্দেই রচিত হয়েছে। আজকের গদ্যভাষার সকল দায়িত্বই সেদিন একমাত্র পয়ার ছন্দে রচিত পদ্যভাষা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে। সেইজন্য আমরা মধ্যযুগে পদ্যে রচিত জীবনী, দার্শনিক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, ভ্রমণ বিবরণ, অলংকার শাস্ত্র ইত্যাদি সব কিছুই লাভ করেছি। গদ্যের অভাব সেদিন কোন দিক থেকেই সমাজ অনুভব করেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে এই বিষয় প্রকাশ করবার দায়িত্ব নব প্রবর্তিত গদ্যভাষাই গ্রহণ করেছে এবং গদ্যভাষার সন্ধান পাবার পর থেকেই পয়ারের ব্যবহার লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে, তবে এ কথা সত্য, সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে চিন্তাধারারও যে ক্রমবিকাশ হচ্ছে সেই অনুযায়ী আধুনিক যুগে প্রবন্ধের নূতন নূতন বিষয়বস্তুরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে ধারা রচিত হয়েছে, তাকেই আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ বলে নির্দেশ করা যায়।

এবার যে কথার সূত্র ধরে আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম, তাতে ফিরে আসা যাক। ধর্মালোচনার ভিতর দিয়েই বাংলা গদ্যভাষার পথ তৈরি হয়েছিল, এবং গদ্যভাষার ভিতর দিয়েই প্রবন্ধ রচনায় নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রবন্ধই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের

প্রথম সন্তান। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ গদ্যভাষা ও ধর্মপ্রচার বিষয়ক আলোচনার যে একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা অনুসরণ করে এ দেশের লেখকগণও সেদিন অগ্রসর হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা তার মধ্যেই নিজস্ব একটি আদর্শের সন্ধান পেলেন এবং তারই বিকাশ করে ক্রমে আদর্শ সাহিত্যিক গদ্যভাষার প্রতিষ্ঠা করলেন।

খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম বিষয়ক আলোচনার যে সূচনা হয়েছিল তার ধারা বহুদূর পর্যন্ত বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়ে এসে বিগত শতাব্দীর ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ শাখাটিকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল। প্রথমত এই বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় সাহিত্যিক গুণ কিছুই ছিল না, একথা সত্য। কারণ খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক কিংবা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় এবং তাঁর সমসাময়িক লেখকগণ প্রধানত ধর্মীয় বাগবিতণ্ডার মধ্যেই তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তবে রামমোহনের রচনার মধ্যে সাহিত্যগুণের যে অভাবই থাক না কেন, প্রবন্ধের আরও যে কয়েকটি গুণ অর্থাৎ চিন্তার সুশৃঙ্খল বিশ্লেষণ এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনার কৌশল, তাদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। সেইজন্য রামমোহন রায়ই আধুনিক প্রবন্ধের সর্বপ্রথম স্রষ্টা বলে মনে করা যেতে পারে। রামমোহনের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ ছিল এই যে, তিনি যুক্তি দ্বারা বিপক্ষকে পরাজিত করতেন ; যুক্তি উপস্থাপনা বিষয়ে কেবলমাত্র তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধিই সজাগ থাকতো তা নয়, তিনি শাস্ত্রীয় তথ্য দ্বারাও তাঁর যুক্তিকে অকাট্য করে তুলতেন। ভাষার সংযম রামমোহনের রচনার আর একটি প্রধান গুণ ছিল ; তাও তাঁর প্রবন্ধকে বহুলাংশে পাশ্চাত্য প্রবন্ধের গুণান্বিত করেছে। একদিকে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ আর একদিকে রক্ষণশীল দেশীয় পণ্ডিতসমাজ যখন তাঁকে অসংযত কটু বাক্য দ্বারা সকল তথ্য এবং তত্ত্ব নির্বিচারে অবহেলা করে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে চলেছিলেন, তখনও রামমোহন নিজের সংযত ভাষা এবং যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার আশ্রয় নিয়েই উভয়পক্ষেরই সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাতে তাঁর নিজের যেমন একটি চরিত্রগুণ প্রকাশ পেয়েছিল তেমনই বাংলা প্রবন্ধেরও একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল। প্রবন্ধের একটি প্রধান ধর্ম লেখকের আত্মপ্রত্যয়। বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত কেউ প্রবন্ধ রচনায় সার্থকতা লাভ করতে পারে না। বাংলা প্রবন্ধের পক্ষে একটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তার জন্মমুহূর্তেই বাঙালী চরিত্রের মধ্যে বলিষ্ঠতম আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল— তিনি রামমোহন। তার ফলেই বাংলা প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে সেদিন থেকেই একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল। রামমোহনের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ উপলব্ধির সঙ্গে যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ মননশীলতা সংযুক্ত হয়ে তাঁকে প্রবন্ধ রচনার যে অধিকার দিয়েছিল, তা সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী-ব্যাপী ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার ধারা নিয়ন্ত্রিত করেছিল। বাঙালী চরিত্রে ভাব-প্রবণতা যত গভীরই থাক না কেন তার মধ্যে আরও একটি গুণ কখনও কখনও দেখা যায় ; তা তার নৈয়ায়িক বুদ্ধি। সকল ভাব-প্রবণতাকে জয় করে নৈয়ায়িক বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়েই রামমোহন তাঁর ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেজন্য বাংলা গদ্যভাষায় প্রাথমিক অবস্থায় যে ত্রুটিই তাঁর রচনায় দেখা যাক না কেন, তার গঠনকৌশলের মধ্যে প্রায় কোন ত্রুটিই ছিল না। যে সাময়িক সাহিত্য প্রবন্ধ রচনার প্রধান সহায়ক, রামমোহন খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অনুকরণে বাংলাদেশে ভারতীয়দের মধ্যে তারও প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, সুতরাং একদিকে আদর্শ প্রবন্ধ রচনার এবং অন্যদিকে তা প্রকাশ ও প্রচার করবার প্রণালী নির্দেশ করে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভবিষ্যতের পথ তিনি বেঁধে দিয়ে গেলেন।

কিন্তু রামমোহনের বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম ও সমাজ। সাহিত্য তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল না। তাঁর রচনা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত,—প্রথমত ধর্ম ও তত্ত্বমূলক এবং দ্বিতীয়ত সামাজিক আচারমূলক। তাঁর নির্দেশিত বাংলা প্রবন্ধ রচনার এই দুইটি ধারাই সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধ লেখকগণ আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ধর্মীয় ধারাটিকে সর্বপ্রথম যিনি সাহিত্যগুণান্বিত করেছিলেন, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং সামাজিক আচারমূলক ধারাটিকে যিনি সাহিত্যগুণান্বিত করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন রায়ের প্রবন্ধের মধ্যে যেসব গুণের অভাব ছিল, এই দুজনের রচনায় সে অভাব পূর্ণ হয়ে গেল। কেবলমাত্র তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং তথ্য উপস্থাপনাতেই যে প্রবন্ধের গুণ সীমাবদ্ধ নয়, তাতে সাহিত্যরসের স্পর্শদানও যে একান্ত আবশ্যক, দেবেন্দ্রনাথ এবং ঈশ্বরচন্দ্র উভয়েই তা উপলব্ধি করে তাঁদের রচনাকে যথার্থই প্রবন্ধরূপে প্রথম সার্থকতা দান করলেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা রূপেই দেবেন্দ্রনাথকে প্রথম গদ্য রচনার সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' কেবল যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে ধর্ম এবং তত্ত্ববিষয়ক আলোচনায় নিয়োজিত ছিল তাই নয়, তার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর সর্ববিষয়ক সাহিত্যিক মনীষারই বিকাশ দেখা দিয়েছিল। তার সঙ্গে প্রায় প্রথম থেকেই বাংলা সাহিত্যের দু-একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার এসে যুক্ত হলেন ; তাঁরা অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রামমোহন রায় ধর্মীয় তত্ত্ব ও সামাজিক আচারমূলক প্রবন্ধ রচনার যে-ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যস্থতায় এক সম্পূর্ণরূপে নূতন ধারা এসে যুক্ত হলো। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এই যে, বাংলা প্রবন্ধের সাহিত্য-ধর্ম রক্ষা করেও তিনি তার মধ্যে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আলোচনা করেছেন। সেইদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, তিনি বাঙালীর বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসাধনার অগ্রদূত। সেই সূত্রেই সে যুগে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের তিনি ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক। রামমোহন ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে সেদিন যে-প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা উনবিংশ শতাব্দীর সীমা উত্তীর্ণ হয়ে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের তপস্যা কেবলমাত্র উনবিংশতি শতাব্দীর ধ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অনাগত যুগের মধ্যেও তার সম্ভাবনা রেখে গিয়েছিল। অক্ষয়কুমারের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত কেবলমাত্র ধর্ম ও সমাজসংস্কার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্র যে কত বিস্তৃত, তার বিষয়ের মধ্যে যে অন্তহীন বৈচিত্র্য আছে, তা আমরা তাঁর মধ্যেই প্রথম দেখতে পেলাম। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়ও যে সেই যুগের বাংলা গদ্যভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবার যোগ্য ছিল, তা অক্ষয়কুমারই প্রথম প্রত্যক্ষ করালেন।

বাংলা সাহিত্যে রামমোহন ধর্মমূলক প্রবন্ধ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র যুগেই সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর এই বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ বাংলা সাহিত্য বিষয়ক না হলেও বাংলা সাহিত্য যার মধ্য থেকে প্রাণরস আহরণ করেছিল, সেই সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করেই রচিত হয়েছিল। কারণ, তখনও তৎকালীন বাংলা সাহিত্য অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করবার মতো কোন উপকরণের সৃষ্টিই হয়নি।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ-গ্রন্থের নাম 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত

সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'। বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে সাহিত্যের বিষয় অবলম্বন করে কোন প্রবন্ধ রচিত হয়নি। সুতরাং বিদ্যাসাগরের সামনে এই বিষয়ে কোন আদর্শই বর্তমান ছিল না; সে আদর্শ তিনি নিজেই স্থাপন করেছিলেন। তাঁর উক্ত গ্রন্থখানি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার ভিতর দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্য ও তার লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও সাহিত্য সমালোচনার যে পদ্ধতিটি তিনি তার মধ্যে প্রয়োগ করেছিলেন, তা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি নূতন দিক উন্মোচন করে দিয়ে গেল। রামমোহন কিংবা অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্য দিয়ে এই ধারাটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এই প্রবন্ধটির আরও একটি দিক ছিল। এ যাবৎ সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে রসসঙ্গত আলোচনা কেবলমাত্র বিদেশী পণ্ডিতগণই করে আসছিলেন; দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে গতানুগতিক প্রথায় টীকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য রচনারই কেবলমাত্র প্রচলন ছিল। কিন্তু এই দেশীয় ধারার ব্যতিক্রম করে ইংরাজ পণ্ডিতদিগের রস-সাহিত্য সমালোচনার ধারা অনুসরণ করে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই বিষয়ে তিনি একসঙ্গে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান এবং রস বিশ্লেষণের যে-প্রতিভা দেখিয়েছেন, তা বিদ্যাসাগর প্রতিভার একটি নূতন দিক দেখিয়ে দিয়েছে। এই গ্রন্থখানি ব্যতীতও বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' এবং 'আত্মচরিত' তাঁর সাহিত্যগুণান্বিত মৌলিক রচনা।

বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারমূলক যে-প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে সাহিত্যগুণের স্পর্শ নেই, একথা বলা যেতে পারে না। বস্তুত দেখা যায়, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র যুগেই সামগ্রিকভাবে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নীরস বিতর্কমূলক প্রবন্ধ রচনার পরিবর্তে সাহিত্যিক প্রবন্ধ রচনার সূচনা হয়েছে। এমনকি অক্ষয়কুমাব দত্তের বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও সাহিত্যরসসিক্ত হয়ে উঠেছিল—কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক তথ্যে নীরস হয়ে উঠেনি। বিশেষত যে-বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়েই তাঁর অন্তর্নিহিত রসানুভূতির দুর্লভ পরিচয় ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁর সংস্কৃত কাব্য নাটক কথাসাহিত্যের বাংলা অনুবাদের ভিতর দিয়েই তাঁর রচনাকে রসোজ্জ্বল করে নিয়েছিলেন, তাঁর সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধ রচনাও যে সাহিত্যরসের স্পর্শহীন হবে, তা কখনও সম্ভব ছিল না। বিশেষত বিদ্যাসাগর হৃদয়ের শাসনকে যতদূর স্বীকার করেছেন, মস্তিষ্কের শাসনকে তত স্বীকার করে নিতে পারেননি। তিনি রামমোহনের মতো সুতীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী কিংবা নৈয়ায়িক ছিলেন না—তাঁর হৃদয় তাঁকে যে পথে নিয়ে যেত, সেই পথেই তিনি অগ্রসর হতেন এবং সেইপথে চলতে গিয়েই তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তিরও সন্ধান পেয়েছেন। সুতরাং তাঁর চরিত্রের মধ্যেই সাহিত্যিক গুণ অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছিল। সেইজন্য তাঁর হাতেই বাংলা প্রবন্ধ সর্বপ্রথম সাহিত্যের বারিবর্ষণে সুস্নিগ্ধ হয়েছিল—তা কেবলমাত্র তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তার পরিবর্তে তাঁর রচিত প্রবন্ধের সকল বিভাগকেই স্পর্শ করেছিল। বিশেষত সামাজিক সমস্যামূলক যে প্রবন্ধগুলো বিদ্যাসাগর রচনা করেছেন, তাদের প্রত্যেকটির উৎস তাঁর হৃদয়ের মধ্যেই নিহিত ছিল। তাঁর প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধ তিনি হৃদয়ের দিক থেকেই বিচার করেছেন। হৃদয়ই রসের উৎস; সেইজন্য তাঁর প্রত্যেকটি প্রবন্ধই তাঁর হৃদয়ের স্পর্শে সরস এবং সাহিত্য-গুণান্বিত হয়ে উঠেছে। কতকগুলো বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ছাড়া বিদ্যাসাগর সামাজিক সমস্যামূলক নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলো রচনা করেন: ১) 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), ২) 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত

কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব' (১৮৫৫), ৩) 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১), ৪) 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার, দ্বিতীয় পুস্তক' (১৮৭৩)।

রামমোহনের ধর্মমূলক প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধের প্রধান পার্থক্য এই যে, রামমোহনের বিচার সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক ধারায় মস্তিষ্কের পথে স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিচার আবেগের পথে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে। রামমোহনের লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক ও ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ, বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কাছে যুক্তি-তর্ক ও বিচারের কোন মূল্য ছিল না। বিদ্যাসাগরের আবেগমূলক প্রবন্ধগুলোও সেদিন যে তাঁর কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, তাও মনে করবার কোনও কারণ নেই। তবু বিদ্যাসাগরের পথ যে স্বতন্ত্র ছিল, তাই এখানে বক্তব্য।

বিদ্যাসাগরের স্বরচিত জীবন-চরিত বাংলা সাহিত্যে 'আত্মচরিত' রচনার পথ প্রদর্শক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, গ্রন্থটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। তবে 'আত্মচরিত' গ্রন্থটিকে প্রবন্ধ-গ্রন্থ বলা যায় না, কিংবা এর ভিতরে প্রবন্ধের কোন লক্ষণও নেই। প্রকৃতপক্ষে এই রচনা বিবৃতিমূলক (narrative) ; কিন্তু এই বিবরণ যে কেবলমাত্র নীরস তথ্য পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, বরং তাঁর পরিবর্তে প্রত্যক্ষ জীবনের অনুভূতিতে সরল হয়ে উঠেছে, তা সহজেই অনুভব করা যায়। বাংলা গদ্য রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ জীবনের স্পর্শ ইতিপূর্বে আর অনুভব করা যায়নি।

বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' তাঁর শেষ বয়সের একটি শোকোচ্ছ্বাসমূলক রচনা। রচনাটি বেদনারসের অভিব্যক্তিতে করুণ এবং অনুভূতির গভীরতায় সার্থক। এই রচনাটিও বিদ্যাসাগরের 'আত্মচরিত'-এর অংশ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর রচিত প্রবন্ধমালার মধ্যে তাঁর যে-প্রবন্ধটির কথা প্রথম উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', তা বাংলা প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার পথিকৃৎ, এবং এই ধারা অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থ রচনা করেছেন। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, তা সর্বপ্রথম কালিদাস প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর তাঁর উক্ত রচনায় উদ্ধৃত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ধারা অনুসরণ করেই করুণ রসের সার্থক নাট্যকার 'উত্তর-রামচরিত' রচয়িতা ভবভূতির আলোচনা করেছেন। সাহিত্য বিচারে বিদ্যাসাগরের যে একটি যুক্তিবাদী অথচ সরস মন সক্রিয় ছিল, তা সংস্কৃত কবি-নাট্যকারদের নিরপেক্ষ আলোচনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নিকট সংস্কৃত ভাষার মূল্য নিতান্ত সীমিত ; কেবলমাত্র সনাতন বাঁধা-ধরা পথেই তার রসাস্বাদন হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু চরিত্রের যে-শক্তিতে তিনি সংস্কারের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই শক্তি নিয়েই সংস্কৃত সাহিত্যেরও সর্বসংস্কার-মুক্ত মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ আমাদের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যখন উপেক্ষা এবং অবহেলার বিষয় হয়েছে, তখন সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিদ্যাসাগর তার কি মূল্যায়ন করেছিলেন, তা আমাদের জানতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

বিদ্যাসাগর উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনের ভিতর দিয়ে

ভাষাতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ে পৃথিবীর লোক জ্ঞানলাভ করেছে। সংস্কৃত ভাষার যে এই বিষয়ে একটি বিশেষ মূল্য আছে, বিদ্যাসাগরের পূর্বে একথা স্বদেশে কিংবা বিদেশে তখন পর্যন্ত কেউ বলেননি। কারণ, পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক অনুশীলনের ভিতর দিয়ে তখন পর্যন্তও একথা কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। ইউরোপে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সবেমাত্র যে-অনুশীলন আরম্ভ হয়েছিল, বিদ্যাসাগর যে তার সংবাদ রাখতেন, বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তা একটি পরম বিস্ময়। বিদ্যাসাগরের এই প্রবন্ধ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় ; জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ তার আট বছর পর প্রকাশিত হয়।* তবে একথা সত্য, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় সঙ্কলনের জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত যখন দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে রত্নরাজি আহরণ করছিলেন, তাঁর সহকর্মী বিদ্যাসাগরও তখন এই বিষয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলেন না। তবে অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন তাঁর সংগৃহীত বিশ্ববিদ্যার উপকরণসমূহ বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালীকে উপহার দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন, বিদ্যাসাগর জাতীয়জীবনে তাদের মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনেরও যে কি প্রয়োজন, তা যত গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনভাবে সেদিন আর তা কেউ করেননি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ অনুশীলনের কল্যাণেই আমাদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা অবশ্যক। কারণ, তিনি যথার্থই মনে করেছেন, 'সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরেজী শিখিয়া আমরা এই মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, ইহা কোন মতে সম্ভাবিত নহে।' সেইজন্য বিদ্যাসাগর স্বয়ং সহজে সংস্কৃত শিক্ষার বিধান নিজেই রচনা করে দিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর সমসাময়িক কালে সংস্কৃত শিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তা যেমন প্রাচীন তেমনই অনাবশ্যক হয়ে পড়েছিল ; তিনি তার একটি নূতন পদ্ধতি রচনা করে দিয়ে সংস্কৃত শিক্ষার পথ সেদিন সুগম করে দিয়েছিলেন। সেইজন্য সংস্কৃত শিক্ষা আরও একশত বছরের অধিক কাল ধরে অগ্রসর হয়ে এসেছে। রামমোহন প্রবন্ধ রচনার যে ধারার সূত্রপাত করেছিলেন, তা প্রধানত উনবিংশতি শতাব্দী অতিক্রম করে বিংশতি শতাব্দীর সিংহদ্বার অতিক্রম করে যেতে পারেনি। বিংশতি শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যে ধর্মতত্ত্ব ও সামাজিক আচারমূলক প্রবন্ধ রচনার ধারাটি লুপ্ত হয়ে যায়। তার একটি প্রধান কারণ এই যে, সে-যুগে স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বাঙালী জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ধর্ম ও সমাজের পরিবর্তে দেশমাতৃকার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। তখন থেকেই দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ রচনার একটি নূতন ধারার সৃষ্টি হয়। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতি দেশের অতীত ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক উপকরণের পুনরুদ্ধার সাধনে ব্রতী হয়েছিল। তারই প্রেরণা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্যে একটি নূতন শক্তি সঞ্চার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যতদিন পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ততদিন স্বরচিত সঙ্গীতে ও প্রবন্ধে এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ রচনার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সেদিন বাংলা প্রবন্ধ রচনার ধারাকে যাঁরা পরিপুষ্ট করতে অগ্রসর হয়ে এলেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি

---

*Friedrich Maxmueller (1823-1900) : *The Science of Language-2 vols, London, 1861 and 1863*:সম্পাদক।

কেবলমাত্র দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ রচনার ধারাটি অনুসরণ করলেন না ; পূর্ববর্তী যুগে অক্ষয়কুমার দত্ত যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার প্রবর্তন করেছিলেন, তার ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুললেন। বিংশতি শতাব্দীর প্রধান বিষয় বিজ্ঞান ; ধর্ম এবং সমাজ এ যুগের প্রথম থেকেই গৌণ হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার ধারাটি স্থাপন করে বাংলা প্রবন্ধ রচনায় যুগের দাবিকে স্বীকার করে নিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটির সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রধানত ছিল আবেগমূলক। সুতরাং তা দীর্ঘকাল স্থায়িত্বলাভ করতে পারল না। আন্দোলনের বেগ স্তিমিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধারাটির গতিও স্তিমিত হয়ে পড়ল। বিংশতি শতাব্দীর প্রথম থেকেই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটি স্থাপন করেছিলেন, বিংশতি শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে সেই ধারাটি বিকাশ লাভ করবে, তাই আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তর্দৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার কৌশল নিয়ে সেদিন কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। সেইজন্য তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গেই বিংশতি শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটির সৃষ্টি হয়েছিল, তা লুপ্ত হয়ে গেল। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে আমাদের দেশের যাঁরা কৃতি বৈজ্ঞানিক, তাঁরা বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ইংরাজিতেই তাঁদের গ্রন্থাদি রচনা করে এসেছিলেন। তার ফলে রামেন্দ্রসুন্দরের পরবর্তীকালে খ্যাতনামা কোন বাঙালী বৈজ্ঞানিকের রচিত বাংলা প্রবন্ধ লিখিত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মতত্ত্ব ও সামাজিক আচার আলোচনায় বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য যেভাবে পুষ্টিলাভ করেছিল, বিংশতি শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দ্বারা বাংলা সাহিত্যে সে ভাবে সমৃদ্ধিলাভ করতে পারেনি। অথচ বিংশতি শতাব্দীতে বিজ্ঞানচর্চা যদি বাংলা ভাষার মাধ্যমে না হয়, তাহলে এ যুগে প্রবন্ধ-সাহিত্যের পুষ্টিলাভ সম্ভব হবে না। কারণ এ যুগের বিষয়ই বিজ্ঞান, ধর্ম কিংবা সমাজ নয়। উনবিংশতি শতাব্দীর তুলনায় বিংশতি শতাব্দীতে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের অবনতির এটি বিশেষ কারণ বলে মনে হতে পারে। বিজ্ঞানচর্চা যদি আমাদের দেশে বাংলা ভাষার মাধ্যমে এখনও শুরু না হয়, তবে বিজ্ঞান শিক্ষা কেবলমাত্র যেমন মুষ্টিমেয় ইংরাজি শিক্ষিতের অধিকারভুক্ত হয়ে থাকবে, তেমনই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যেরও কোন পুষ্টি হতে পারবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর প্রবন্ধ রচনার ধারাকে যিনি সর্বাধিক পুষ্ট করেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। চৌদ্দ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলীর মধ্যে পাঁচটি সুবৃহৎ খণ্ডই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-জীবনের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিককাল প্রবন্ধ রচনাতেই ব্যয় করেছেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আজ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার উত্তরসাধক কেউ নেই। একদিক দিয়ে ভাবপ্রবণতা, অন্যদিকে মননশীলতা, উভয়ের সঙ্গে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সংযোগে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ হয়ে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায়, কথাসাহিত্য ও কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্র অনুসারীর অস্তিত্ব আছে, প্রবন্ধ সাহিত্যে তা নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার একমাত্র উত্তরসাধক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অকালে প্রাণত্যাগ করার ফলে তাঁর ধারা অধিকদূর অগ্রসর হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ রচনার যে একটি সুস্পষ্ট ধারা নির্দেশ করেছিলেন, সে পথে বহু অভ্যাগতের পদরেখা পড়বার অবকাশ ছিল। কেবলমাত্র যুগ পরিবর্তনের ফলে এবং তজ্জাতীয় প্রতিভার অভাবে সে পথচিহ্ন ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তার পুনরুদ্ধারের আর কোন আশা নেই। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ রচনার যে একটি নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন তাও কেবলমাত্র তাঁর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরসাধকহীন তাঁরও ধারাটি লুপ্ত হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও বাংলা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে কোনো উত্তরসাধক রেখে যেতে পারেননি। কিন্তু আমরা দেখেছি, রামমোহন প্রবন্ধ রচনার যে ধারা স্থাপন করেছিলেন, তা উনবিংশ শতাব্দীর সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেনি। কারণ বাংলা প্রবন্ধ ক্রমেই আত্ম-অনুভূতিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রধানত তথ্য এবং তত্ত্বনির্ভর প্রবন্ধ রচনা করেছেন বলে তাঁরা যেমন উত্তরসাধক রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ক্রমাগত একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি-কেন্দ্রিক হবার ফলে তা উত্তরসাধক না রেখেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রবন্ধের ভিতর ব্যক্তির বিশিষ্ট সত্তাটি যত মূর্ত হয়ে ওঠে, গোষ্ঠীর সত্তা তত প্রকাশ পায় না। সেইজন্য ব্যক্তির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ভাবধারারও অবলুপ্তি ঘটে। সার্থক ক্ষেত্রে উত্তরসাধক আশা করা যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথের যেমন কোন উত্তরসাধক নেই, বিদ্যাসাগরেরও নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জানি না সম্প্রতিকালে এটা বলা চলে কিনা। কিন্তু আমরা জেনেছি ছেলেবেলা থেকে যে কোনো একজন মানুষ যদি সর্বস্তরের বাঙালির হৃদয়ের পূজা পেয়ে এসেছেন তো তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

একশো বছর আগে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু আজও প্রাতঃস্মরণীয় বলে যদি কাউকে আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা জানাতে হয় তো নিঃসংশয়ে তিনি হলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়।

এই বাঙালিঘরে জন্মানো প্রায় "অসম্ভব" মানুষ সম্বন্ধে আমাদের মনের কথা সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সূর্যের মতো যেন ছিল বিদ্যাসাগরের চারিত্র্য। একে ধরে রাখার শক্তি আর ব্যাপ্তি সমসাময়িক বাংলার সীমিত আকাশে ছিল না, আজও বুঝি তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানাবার যোগ্যতাই আমাদের নেই।

বিদ্যার সাগর তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে দয়ার সাগর রূপে তিনি বাঙালির মনপ্রাণ অধিকার করে আছেন। অমন অসাধারণ তেজস্বী মানুষের মধ্যে লুকিয়ে ছিল "বাঙালি মায়ের হৃদয়"। অনেক লেখালেখি তাঁর সম্বন্ধে হয়েছে, কিন্তু কোথায় সেই লেখক যিনি এমন এক সরল গভীর মহাকাব্যের নায়কোচিত চরিত্রের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে লিখতে পারবেন ?

সংস্কৃতে যাঁর পাণ্ডিত্য অতুলন, তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন বাংলাভাষার সেবায়। সংস্কৃতের দুহিতারূপে বাংলার যে ঐশ্বর্য তা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেননি। বরঞ্চ সেদিক থেকেই এক অসাধ্যসাধন করলেন, বাংলাগদ্যের গঠন ও বিকাশে অচিন্তনীয় অবদান রেখে গেলেন, 'বর্ণপরিচয়' লিখলেন অনবদ্য সহজ সুললিত ছন্দে। ধর্ম নিয়ে সতত ব্যাকুল পরিবেশে বাঙালি শিশুকে অক্ষর পরিচয় করাতে গিয়ে কোথাও দেবদেবীর নাম আনতে দিলেন না। শব্দগঠনের মধ্যে সহজ সরল মানবিক চিন্তার উন্মেষ ঘটালেন। ব্যাকরণ নিয়ে প্রভূত চিন্তার ফলে লিখলেন 'উপক্রমণিকা'—বাংলা ব্যাকরণেরও প্রকৃত গোড়াপত্তন করলেন। অনুবাদ করলেন শুধু সংস্কৃত নয়, ইংরেজি থেকেও। শিক্ষাবিস্তারে জ্ঞানচর্চায় আজীবন লিপ্ত থেকে মুহূর্তের জন্যও দেশের সর্বসাধারণের মঙ্গলচিন্তা থেকে বিরত রইলেন না। বিদেশী শাসকরা অবাক হয়ে দেখল এমন একজন বাঙালিকে, যাঁর দেশাভিমান আর আত্মমর্যাদাবোধ এমনই প্রখর যে অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতে তারা যেন তাঁর সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল।

নিজের দেশের ঐতিহ্য এবং বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্যের পরম্পরা নিয়ে গর্বের অবধি ছিল না। কিন্তু ১৮৫৩ সালে, যখন তেত্রিশ বৎসর তাঁর বয়স, তখন সবাইকে আশ্চর্য করলেন ঘোষণা করে যে বেদান্তদর্শন হল "ভ্রান্ত"। সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য প্রায় ছ'শো বছর আগে যাকে ভারতীয় দর্শনের চরম প্রকর্ষ বলে প্রচার করেন, যে-বেদান্তকে বিদ্যাসাগরের সমসাময়িকেরা একেবারে মাথায় তুলে ভারতবর্ষের অহংকার ভেবে অতি পরিতুষ্ট ছিলেন, সেই বেদান্ত-কে ভ্রান্ত বললেন সেদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ! নানাদিক থেকে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম, একেবারে অনন্য। এদেশের সুপ্রাচীন পরম্পরায় লোকায়ত দর্শন (চার্বাক-বাদ কিংবা যে কোনো নামেই হোক না কেন) ধিকৃত হয়েছে। জোর করে,

উপহাসের ঠেলায়, তাকে ঠেলে ফেলা হয়েছে। স্বীকৃত চিন্তানায়ক যাঁরা (যেমন রামমোহন) তাঁরা সবাই ঈশ্বরবিশ্বাসী। কিন্তু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে ঈশ্বরচন্দ্র প্রস্তুত ছিলেন না। এনিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। কিন্তু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-এর মতো সমকালীন মনীষীর বিবরণ অনুসরণ করে ভাবা অনুচিত হবে না যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশ্বরতত্ত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন। কেউ কেউ হয়তো 'নাস্তিক' কথাটা যেন বড্ড কঠোর ভেবে তাঁকে 'দুর্জ্ঞেয়বাদী' (agnostic) বলতে চেয়েছেন।

আলোচনা এখানে সম্ভব নয়—শুধু মনে রাখা দরকার যে, উনিশশতক শুধু কেন, আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মনীষী জগতের হিতসাধনে ব্রতী হওয়াকে সর্বগরিষ্ঠ ব্রত মনে করতেন, ঈশ্বরবিশ্বাস আর সেই বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত সামাজিক প্রথা-রীতি ইত্যাদিকে যুক্তি বিচার বিনা গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। আর এজন্যই অমন এক মহানুভব বাঙালি সারাজীবন ছিলেন একক। সহায়ক যে পাননি তা নয়। বন্ধুও অল্প কয়েকজন ছিলেন। কিন্তু মূলত তিনি একাকিত্বের বোঝা বহন করলেন আজীবন। বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিবারণ, সর্বজনের মঙ্গলপ্রয়াসে ব্যাপৃতি—বিদ্যাবিতরণের সঙ্গে সঙ্গে আজীবন এই সব কর্মে তিনি লিপ্ত ছিলেন। বহু আঘাত পেতে হয়েছে তাঁকে। সাধে কি প্রচলিত হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প : কে যেন ওঁর নামে নিন্দা রটনা করছে শুনে বিদ্যাসাগর বুঝি বলেন : 'আরে, অবাক কাণ্ড, আমি তো ওর কোনো উপকার করিনি।'

এ জন্যই পালিয়ে যেতেন সাঁওতাল পরগনার কার্মাটারে—যেখানে সত্যই সহজ সরল স্বাধীনতাপ্রিয় নির্বিরোধী অথচ তেজস্বী স্যাঁওতালরা ছিল তাঁর বন্ধু। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা বিদ্যাসাগর জানতেন, সঙ্গে সঙ্গে জানতেন ইংরেজ-এর হুকুম বরদার হয়ে বাঙালি, বিহারী, ব্যবসায়ী, কর্মচারী ইত্যাদির দল সাঁওতালদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সর্বজনমান্য বিদ্যাসাগর শহরজীবনের কৃত্রিমতা শুধু নয়, তৎকালীন বাঙালি চরিত্রের ক্ষুদ্রতা আর নীচতা থেকে যেন এভাবে পালিয়ে যেতেন।

এমনই ছিল বিদ্যাসাগরের চরিত্র মহিমা যে বিদেশী শাসক সম্মান না জানিয়ে পারত না। দেশ পরাধীন, তাই সম্যক মর্যাদা বিদ্যাসাগরও পাননি। কিন্তু সেদিনের ইংরেজ শাসনের কতকগুলি নিয়মকানুন ওঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। একমাত্র তিনিই ধুতি-চাদর এবং পায়ে নিজস্ব ধরনের 'তালতলার চটি' পরে লাটবাড়িতে স্বচ্ছন্দে প্রবেশের অধিকারী ছিলেন। উনিশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে সরকারি নিয়ম ছিল যে 'দেশীয়' (native) ভদ্রলোকরা লাটবাড়িতে ঢুকতে হলে পরিচ্ছদ এবং পাদুকা বিষয়ে কয়েকটি নিয়ম মানবেন। উনিশশতকের শেষদিকে বড়লাট কর্জন কলকাতায় যখন আসেন তখন ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল তাঁকে দেখতে এবং দরখাস্ত জানাবার জন্য যান। দলে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো দেশনায়ক। কিন্তু দলভুক্ত হয়েও তাঁর জামাতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ('জে চৌধুরী' বলে বিখ্যাত) ধুতি, পাঞ্জাবি এবং নাগরা পরিহিত বলে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হন!

বিদ্যাসাগর মহাশয় জানতেন দেশের দুর্দশা। যথাসাধ্য প্রয়াসে নেমেছিলেন সেই দুর্দশা দূরীকরণে। শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার, সাহিত্য বিকাশ, পরোপকার প্রভৃতি নিয়ে সর্বতোভাবে নিজের সর্বস্ব দান তিনি করে গেছেন। কিন্তু জানতেন পরাধীনতা হল সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ যা থেকে মুক্ত না হলে মনুষ্যত্বের বিকাশ এদেশে সম্ভব নয়। জানা

যায় যে, কংগ্রেসে যোগদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেন : "যোগ দেব যদি কংগ্রেস সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে পারে।"

এমন বলার পিছনে আছে মনের নিদারুণ যন্ত্রণা। তিনি জানতেন সময় তখনও সুপরিণত নয়। জানতেন দেশবাসীর চরিত্রে অজস্র গলদ পরাধীনতার আবহাওয়াতে আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠছে। জানতেন তাঁর একক প্রয়াসে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তৎকালীন পরিবেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো অকুতোভয় মনস্বীকে মানতে হয়েছিল সেযুগেরই 'নিষেধ'—মনে পড়ে কার্ল মার্কস-এর কথা : "Men make history, but not as they please"। ইতিহাস গড়ে মানুষ, কিন্তু যথেচ্ছভাবে তা করা যায় না। বিদ্যাসাগরের যুগে মানুষ এবং সমকাল প্রস্তুত ছিল না বৈপ্লবিক উদ্যোগের জন্য। এটাই হল বিদ্যাসাগর-জীবনের (এবং অন্যান্য বহু ভারতীয় মহামতির জীবনের) 'ট্রাজেডি'।

এ বিষয়ে সার্থক আলোচনার গুরুত্ব আজও প্রখর। জানি না সেদিকে আমাদের মন ঝুঁকবে কিনা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরোধানের পর থেকে শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। নানাদিক থেকে তাঁর অনন্য চরিত্রের চিত্রন হোক, শিক্ষা আর অনুপ্রেরণা আসুক তা থেকে জনগণ মনে, দুই বাংলায় হয়তো আজও বিদ্যাসাগরের স্মৃতি অপরিম্লান। সেজন্যই আশা করব যে এই অলোকসামান্য মানুষটিকে স্মরণ করে আরম্ভ হবে সত্যিকারের কিছু কাজ। বিদ্যার সাগর সঙ্গে সঙ্গে দয়ার সাগর। আর শিক্ষাবিস্তার শুধু নয়, সর্ববিধ জনহিতকর্মে সদাব্রতী, এই যে মানুষের মধ্যে মানবমমতা ও কর্মব্যাপৃতির অতুলন সমাবেশ আমাদের গর্ব, তা যেন অন্তত কিছু পরিমাণে এ যুগের ব্যর্থতা থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি উপলক্ষে

শিক্ষা

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ

রামমোহন, বিদ্যাসাগর. প্রমুখের শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীও আজকের এই স্মৃতিদিবস পালন উপলক্ষে স্মরণ করা প্রয়োজন। দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গী পর পর উদ্ধৃত হ'তে দেখলে আপাতদৃষ্টীতে অর্থের দিক থেকে সমব্যাপী মনে নাও হতে পারে। কিন্তু মূলতঃ তার ওরিয়েন্টেশান (দিকস্থিতি) একই একথা সহজেই বোঝা যায়।

পূর্বে দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত এক প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম কেমন করে জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের ফলে বাংলা দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। রায়তওয়ারী এলাকা মাদ্রাজ প্রভৃতিরও দুর্ভাগ্য এই প্রায় মহাশূন্যতার পর্যায়ে পড়েনি। সে-সব এখানে আর বিস্তৃত আলোচনা করতে চাচ্ছি না। যেমন চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতরা তেমনি গ্রামের মস্তব্য,পাঠশালার শিক্ষকরা জীবিকার উপায়ে হয় শহরে কিংবা অন্যত্র যেখানে রুজি জুটছিল সেখানে ছুটছিল। আমরা রাজনারায়ণ বসুর লেখায় জানি যে তিনি যে-শিক্ষকের কাছে বাংলা প্রাথমিক পাঠ পড়েছিলেন তিনি বর্ধমান জেলার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে একজনের কথা উল্লেখ করেছেন। "যদিও ছোট ছেলেদের চাকর বলিয়া ভৃত্য-সমাজে পদ-মর্যাদায় সে অনেকের চেয়ে হীন ছিল, তবু কুরু সভায় ভীষ্ম পিতামহের মতো সে আপনার কনিষ্ঠদের চেয়ে নিম্ন আসনে বসিয়াও আপন গুরু গৌরব অবিচলিত রাখিয়াছিল। ...তাহার নাম ঈশ্বর। সে পূর্বে গ্রামে গুরুমশাইগিরি করিত।" গ্রামের গুরু, কলকাতায় জমিদার-বাড়ির চাকর! অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ইতিমধ্যে খৃষ্টান ভক্তদের মনে ভারতে শিক্ষার ব্যাপারে ইংলণ্ডে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা হয়। কিন্তু রাজব্যবস্থায় তার সাড়া পাওয়া গেল তখনই যখন ইংরাজ বুঝলো তার নিজ দেশে প্রসারমান শিল্পব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ভারতে শাসন ব্যবস্থার জন্য বিলাত থেকে লোক পাঠানোর চেয়ে ভারতে সস্তায় কর্মচারী তৈরী করা যায়। ১৮১৩ সালে শিক্ষা ব্যবস্থায় এক লক্ষ টাকা গ্র্যান্ট করা হয়। ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসের কিছু পুরাতন শিক্ষাবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যত্র এই অর্থনৈতিক কথাটা উল্লেখ করা হয় না ইংরাজের সদাশয়তা প্রচারের জন্য। মেকলের একটি উক্তি অবশ্য উদ্ধৃত হয় যাতে তিনি বলেছিলেন, এই শিক্ষা মাধ্যমে একদল মানুষ তৈরী করা হবে যারা চেহারায় ভারতবাসী হলেও মনে প্রাণে হবে ইউরোপীয়। কিন্তু উপরোক্ত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যটি অনুক্ত রেখে শুধু মেকলের উক্তি বলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা উদ্দেশ্যও অনেক সময় সাধিত হয়েছে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্ত প্রমুখের শিক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীকে বিনিন্দিত করা এবং দেশীয় লোকসমাজে খাটো করা। এইভাবে মেকলের ঐ উক্তিকে হিন্দু-মুসলমান রিভাইভেলিজম্ ও অন্ধ জাতিদম্ভের সেবায় লাগানো হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে রাজনীতি যখন ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো তখনই অবশ্য এই জিনিসটি বেশী সুস্পষ্ট হয়েছে। আমি অবশ্য উপরে যা বলেছি ১৮১৩ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সমগ্র কালটার বিষয় সংক্ষেপে বলেছি। ঘটনাসমূহ অন্যত্র এবং আমার

"শিক্ষা ও শ্রেণীসম্পর্ক" পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে বলে এখানে আর পুনর্বিবৃত করলাম না।

রামমোহনের জীবনীকার লিখেছেন : [১] "তাঁহার সময়ে রাজপুরুষদের মধ্যে একটা বিচার চলিতেছিল। একপক্ষের মত এই ছিল যে এতদ্দেশীয় লোককে ইংরাজী শিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষাই দেওয়া বিধেয়, অপরপক্ষ ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ...এই বিচারের সময় রামমোহন তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে উক্ত বিষয়ে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে কেবল সংস্কৃত ও পারসী শিক্ষায় এ দেশীয় লোকের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই। ইংরাজী শিক্ষা ব্যতীত লোকের দৃঢ় নিবদ্ধ কুসংস্কার কখনই নির্মূল হইবে না···কুসংস্কার বিনাশ ও সামাজিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞান যার পর নাই আবশ্যক।" এই পত্রে তিনি বেকনের আবির্ভাবের পূর্বে ও বেকনের আবির্ভাবের পর পাশ্চাত্য শিক্ষার যে পার্থক্য হয় তাও পরিষ্কার করে স্মরণ করিয়ে দেন। দেশী কুসংস্কারের পরিবর্তে বিদেশী কুসংস্কারের আমদানী তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। পাশ্চাত্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের অবলম্বন করে সংখ্যা ১৩টিকে অশুভ মনে করেন এদেশের গোঁড়া রক্ষণশীল মানুষ অনেকে। ঠিক এটিই না হোক কমবেশী অনেক প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা এমনকি কুসংস্কার পাশ্চাত্য থেকেও আমদানী করা হয়েছে। যাঁরা যুক্তিবাদী তাঁরা তা করেননি। তাঁরা তেমন নয়। বেকনের যারা অনুগামী তারাও নয়। বেকন সম্বন্ধে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ বলেছেন : "ইংরাজী বস্তুবাদের আসল প্রবর্তক হলেন বেকন। তাঁর কাছে প্রাকৃতিক দর্শনই হলো একমাত্র সত্য দর্শন এবং ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা পদার্থবিদ্যা হল প্রাকৃতিক দর্শনের প্রধান ভাগ।" (কল্পস্বর্গ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র পুস্তকের ভূমিকায় এঙ্গেল্‌স্ কর্তৃক উদ্ধৃত) রামমোহনের উপরিউক্ত পত্রের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।[২]

"When this seminary of learning was proposed, we understood that the Government in England had ordered a considerable sum of money to be annually devoted to the instruction of its Indian subjects. We were filled with sanguine hopes that this sum would be laid out in employing European gentlemen of talent and education to instruct the natives of India in Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful sciences, which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above the inhabitants of other parts of the world. ...We find that the Government are establishing a Sanskrit School under Hindoo Pundits to impart such knowledge as is already current in India."

এরপর রামমোহন সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতদের মাথামুণ্ডহীন তর্কাতর্কির কিছু দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে দেখান এরূপ বিদ্যার্জন নিতান্তই নিরর্থক হবে। বলা বাহুল্য আরবী ফারসী ধর্মসাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ডক্টর খুদাবখ্‌স্ এঁদের বিষয় আলোচনা করে রক্ষণশীলদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ফিরোজ তুগলকের সময় একজন সত্যই পণ্ডিত লোক শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদী (মৃত্যু ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দ) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলানা সেখ আবুল ফাতা জৌনপুরীর সঙ্গে তিক্ততার সঙ্গে এই তর্কবিচারে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন যে বিড়ালের মুখের লালা পাক কিংবা নাপাক। যাইহোক পণ্ডিতদের এইসব নিরর্থক

তর্কালোচনা শিখিয়ে কিছু লাভ হবে না, এই সব বলে রামমোহন লিখছেন ঃ—

"Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta:—in what manner is the soul absorbed in the deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother etc. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better. Again, no essential benefit can be derived by the sutdent of the Mimansa from knowing what it is that makes the killer of a goat sinless by pronouncing certain passages of the Vedanta, and what is the real nature and operative influence of passages of the Vedas, etc.

The student of the Nyaya Shastra cannot be said to have improved his mind after he has learned from it into how many ideal classes the objects in the universe are divided and what speculative relation the soul bears to the body, the body to the soul, the eye to the ear, etc.

In order to enable Your Lordship to appreciate the utility of encouraging such imaginary learning as characterzed, I beg Your lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote.

If it had been intended to Keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus.

In representing this subject to Your Lordship, I conceive myself discharging a solemn duty which I owe to my countrymen..."

এর অর্থ অবশ্যই এ হতে পারে না যে রামমোহন সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ভাষাগুলি

দেশের লোকের শেখার বিরুদ্ধে। তাঁর মূল বক্তব্য হচ্ছে সরকার যে অর্থ মঞ্জুর করছেন তা "টু ইমপার্ট সাচ নলেজ অ্যাজ ইজ অলরেডি কারেন্ট ইন ইনডিয়া" (যা ভারতে এখন চালু আছে এমন জ্ঞানদানে) ব্যয়িত না হয়। বেকনের অনুসরণ করে পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখা শেখানোর ব্যবস্থা যেন তাতে হয়।

যাই হোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ১৮৫৩ সালে জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ঐমত ভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিমত রাখার এক সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। ইতিপূর্বে ১৮৫২ সালে সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচী এবং পাঠব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিকল্পনা দিয়ে একটি নোট তিনি কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য দেন। (এই নোট বর্তমান প্রবন্ধে পরে উল্লেখ করার প্রয়োজন হবে।) এই পরিকল্পনা বিবেচনার এক স্তরে বেনারস সংস্কৃত কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ ব্যালেনটাইনের উপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শনের ভার দেওয়া হল। ব্যালেনটাইন সংস্কৃত কলেজ ও তার অধ্যক্ষের পরিচালনা সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য দিলেও, পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে এমন কতকগুলি জিনিস উপস্থিত করেন যার প্রতিবাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে করতে হয়। ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের পুস্তক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যালেনটাইন অনুমোদন করেন। লেনিন ভাববাদী দর্শনের নবতম অবদানগুলির সমালোচনা করার জন্য এবং তারা যে রূপগ্রহণ করেই দেখা দিক প্রকৃতপক্ষে তারা যে ভাববাদী এই সত্যটি বোঝবার জন্য তাঁর "মেটিরিয়ালিজ্‌ম এণ্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজ্‌ম" পুস্তকে প্রথমে "পুরাতন ভাববাদী বার্কলের তত্ত্ব" ব্যাখ্যা করেন। বার্কলের সূত্র হচ্ছে "অনুভূত হওয়ার মধ্যেই বস্তুর অস্তিত্ব।" অনুভবকারীর মনের বাইরে তার কোনও অস্তিত্ব নাই। এই সূত্র ধরে বার্কলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে বৈজ্ঞানিকের কাজ হচ্ছে "প্রকৃতির স্রষ্টার ভাষা বুঝার জন্য সাধনা করা এবং বাস্তব কারণের দ্বারা প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা করার ভণিতা না করা।" এ হলো বেকনের প্রদর্শিত পথের বিপরীত। বেকনের মত হল মনে পূর্ব হতে যে সব ধারণা ও সংস্কার আছে (যা নানান উপায়ে মনে এসে থাকতে পারে) তাকে বাদ দিয়ে মনকে পরিষ্কার করে নিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার যাচাইয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। বিস্তৃত দার্শনিক আলোচনার প্রস্তাব এখানে নেই। শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বক্তব্য বোঝার জন্য যেটুকু উল্লেখ করা দরকার তারই চেষ্টা করলাম। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি রামমোহন বেকনের দর্শনকেই অভিনন্দন দিয়েছেন! উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে বিদ্যাসাগরও তখনকার কালের পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শনেরই সমর্থক। বিদ্যাসাগর ব্যালেনটাইনের রিপোর্টের বিষয়ে তাঁর পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে বললেন [৩]: "বিশপ বার্কলের 'ইনকোয়েরি' বই সম্বন্ধে আমার মত এই যে পাঠ্যপুস্তক রূপে এই বই পড়ালে সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনা বেশী।

"কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয়। কি কারণে পড়াতে হয় তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্তদর্শন (ফলস্ সিসটেম্‌স্ অফ ফিলজফি), সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। সংস্কৃতে যখন এইগুলি পড়াতেই হবে তখন তার প্রতিষেধক হিসাবে ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরাজী দর্শন শাস্ত্রের বই পড়ানোর দরকার। বার্কলের বই পড়ালে সে উদ্দেশ্য সাধিত হ'বে বলে মনে হয় না। কারণ সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের মত বার্কলে একই শ্রেণীর ভ্রান্তদর্শন রচনা করেছেন। ইউরোপেও এখন আর বার্কলের দর্শন খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না, কাজেই তা পড়িয়ে এখন লাভ

হবে না। তা ছাড়া হিন্দু ছাত্ররা যখন দেখবে যে বেদান্ত ও সাংখ্যের মতামত একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের অনুরূপ তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরও বাড়তে থাকবে। এই অবস্থায় বিশপ বার্কলের বই পাঠ্য হিসাবে প্রচলন করতে আমি ব্যালেনটাইনের সঙ্গে একমত নই। .....ব্যালেনটাইন আরও বলেছেন,—এমন এক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ গড়ে তোলার দরকার, যাঁরা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দুই দেশের শাস্ত্রেই পণ্ডিত হয়ে উঠবেন এবং কতকটা দ্বিভাষী টীকাকারের মত কাজ করে উভয়ের মধ্যে যেখানে বাহ্য অনৈক্য আছে সেখানে সত্যকার অন্তর্নিহিত মিল কোথায় তা দেখিয়ে দিয়ে অনাবশ্যক কুসংস্কার দূর করবেন। হিন্দুদের দার্শনিক আলোচনা যে সব মৌলিক সত্যে পৌঁছাবে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাদের পূর্ণতর বিকাশ দেখিয়ে উভয়ের সমন্বয়ের পথ খুলে দেবে।

"দুঃখের বিষয় আমি এ বিষয়ে ব্যালেনটাইনের সঙ্গে একমত নই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে সব জায়গায় মিল দেখানো সম্ভব নয়। সম্প্রতি আমাদের দেশের বিশেষ ক'রে কলকাতায় ও তার আশপাশে পণ্ডিতদের মধ্যে একটা অদ্ভুত মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শাস্ত্রে যার বীজ আছে এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শুনলে, সেই সত্য সম্বন্ধে তাঁদের শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগা দূরে থাক, তার ফল হয় বিপরীত। অর্থাৎ সেই শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের বিশ্বাস আরও গভীর হয় এবং শাস্ত্রীয় কুসংস্কার আরও বাড়তে থাকে। তারা মনে করেন যেন শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রেরই জয় হয়েছে, বিজ্ঞানের জয় হয় নি।..."

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি আলোচনা করে শ্রীবিনয় ঘোষ বলেছেন ঃ—".......একটি সুরই ধ্বনিত হয়েছে। সেই সুরটি হল পাশ্চাত্য বিদ্যার সঙ্গে ভারতবিদ্যার সমন্বয়।" উপরে যা' উদ্ধৃত করলাম তা হতে সহজে যে-সিদ্ধান্ত হয় সেটা হচ্ছে এর বিপরীত। (অবশ্য 'ভারতবিদ্যা' শব্দটিতে তিনি কি বলতে চান তার উপরও অর্থটা নির্ভরশীল।) উপরে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যে ভারতের পুরাতন শাস্ত্রাদি পড়াবার সময় ইংরাজী দর্শন পড়ানো যেখানে অনুবাদকের ভাষায় "প্রতিষেধক" হিসাবে বলা হয়েছে সেখানে, বিদ্যাসাগরের মূল ইংরাজীতে এইরূপ আছে ঃ—While teaching these in the Sanskrit course we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence.—যাকে 'অপোজ' করতে হবে, যার বিরোধিতা করতে হবে, যার "ইনফ্লুয়েন্স"কে কাটাতে হবে, তার সঙ্গে সমন্বয়ের প্রশ্ন কি করে আসে ? সমন্বয়ের কথা কনসিলিয়েশান এবং এগ্রিমেন্টের কথা তো ব্যালেনটাইনই তুলেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মূল খসড়া প্রস্তাব ১৮৫২ সালের ৪ঠা এপ্রিল যা রচিত তার মধ্যেও বিদ্যাসাগরের দৃঢ় মত পরিষ্কার বেরিয়ে আসছে। তাতেও সমন্বয়ের কোনও চিহ্ন নাই। তাঁর প্রথম বক্তব্য হচ্ছে 'উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।' দ্বিতীয় বক্তব্যে তিনি পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন যে 'ইউরোপীয় আকর থেকে যাঁরা জ্ঞান বিদ্যার উপকরণ আহরণ করতে সমর্থ নন...তাঁরা এই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।' আর তাঁর কছে ইউরোপীয় জ্ঞান বিদ্যা বলতে কি বুঝায় তা উপরেই পরিষ্কার করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে সেই বিদ্যা যার সঙ্গে ভাববাদ প্রভাবিত ধ্যান ধারণার কোনও সম্পর্ক নাই। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যে তৃতীয় পয়েন্ট—যদিচ তার গুরুত্ব কম নয়। এ বিষয়ে তিনি সমভাবেই পরিষ্কার। "যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নন, তাঁরা সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচনা সৃষ্টি করতে পারবেন না।" যেখানে তিনি বলছেন প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হিন্দু দর্শন জানা উচিত সেখানেও তিনি উল্লেখ করতে ভুলছেন না যে তাদের "মতামত আধুনিক যুগের প্রগতিশীল

ভাবধারার সঙ্গে খাপ খায় না।" তাঁর পূর্ণ বাক্যটি হচ্ছে এইরূপ ঃ—"একথা ঠিক যে হিন্দুদর্শনের অনেক মতামত আধুনিক অনেক মতামতের সঙ্গে খাপ খায় না কিন্তু তা হ'লেও প্রত্যেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এই দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা উচিত।" এ তো অত্যন্ত সঠিক কথা। শুধু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কেন, সকলেরই তো যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করা উচিত।......

গান্ধীজী তো চিরকাল আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এবং তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কারের ভিত্তিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচেষ্টা করে গেছেন। পাশ্চাত্যের শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর বিরুদ্ধে কলম ধরতে বাধ্য করেছিল।

মৌলানা আজাদের ক্ষেত্রেও দেখি তাঁর শেষকালের লেখাতেও যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাঁর ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তারের পর বন্দী অবস্থায় লেখা "গুবারেখাতের" নামের পুস্তকে যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে একস্থানে তিনি লিখেছেন ঃ

"দর্শন চর্চায় স্বভাবে একটা স্টোয়িকাল এবং বেপরোয়া ভাব জন্মে যার ফলে জীবনের যত দুঃখ দুর্বিপাক একটু অনন্য দৃষ্টিতে অবলোকন করা যায়। কিন্তু তাতে তো চরিত্রের স্বাভাবিক দুর্বলতা ঢাকা পড়ে না।

"দর্শন অবশ্য আমাদের এক প্রকার সান্ত্বনা দেয় কিন্তু সে সান্ত্বনা আগাগোড়া নেতিমূলক। প্রকৃত শান্তির সন্ধান এতে পাওয়া যায় না।

"বস্তু জগতের প্রত্যক্ষ ও প্রমাণনির্ভর তথ্য নিয়ে বিজ্ঞানের কারবার। বিজ্ঞান বলে ঃ জড় জগতের প্রতিটি বস্তু এক অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। (প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও অপরিবর্তনীয় নিয়মের রাজ্যেও আজ ফাটল ধরেছে। যে পরম তত্ত্বের সন্ধানে বৈজ্ঞানিকরা পথে বেরিয়েছিল সে সম্পর্কেও দ্বিধা জন্মেছে তাঁদের মনে।) তাহলে দেখা যাচ্ছে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু'—এ হেন কোন কিছুও বাজারে বিকোয় না। বিজ্ঞান বিশ্বাস ও আশার আলো গুলিয়েই দেয় কিন্তু নতুন কোন আশার আলো সে দেখতে পারে না। তাহলে দুঃখ দুর্দৈব ভরা জীবনে মানুষ সান্ত্বনা লাভের আশায় মুখ ফেরাবে কার পানে? ...বাধ্য হয়ে ধর্মের পানেই দৃষ্টি ফেরাতে হয়!"[৪]

ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইংরাজকে আঘাত যেমনই দেওয়া হোক সংগ্রামের আহ্বানে ধর্মাচ্ছন্নতা সমস্ত শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষকে সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহায়কদের বিরুদ্ধে এক হতে বাধা দিয়েছে এবং দেশের জনসাধারণকে এই বাধার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। এখনও তার ঐতিহ্য শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধিতায় নিযুক্ত হচ্ছে।

কাজেই আজকের অভিজ্ঞতার নিরিখেও দেশের জনসাধারণ রামমোহন বিদ্যাসাগরের ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে চর্চা করা বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়াসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখবে।

(সংক্ষেপিত)

সূত্র

১। নগেন্দ্রনাথ—পৃ: ৩১০

২। নগেন্দ্রনাথ-অক্ষয় দত্ত ভারতের উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা

৩। বিনয় ঘোষ কৃত অনুবাদ মূল ইংরাজীর জন্য ইন্দ্র মিত্র দ্রষ্টব্য

৪। ঢাকায় প্রকাশিত অনুবাদ পৃ: ১৫-১৭ মূল উর্দু-৩৬-৩৮

কর্মবৈচিত্র্য

বিনয় ঘোষ

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। থাকতেও পারে না। সারাজীবন যাঁরা একটা বড় আদর্শ অনুসরণ ক'রে চলেন, সাধারণত তাঁদের কর্মক্ষেত্র তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আদর্শ বড় বলে তাঁদের কর্মক্ষেত্রও বড় মনে হয়। একই আদর্শ চূর্ণরশ্মির মতো কর্মজীবনের বহু শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের কাছে তা কর্মবৈচিত্র্য বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে তা একই কর্মের বিচিত্র প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। বিশেষ ক'রে বিদ্যাসাগরের কর্মবৈচিত্র্যকে এ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়বার পর বিদ্যাসাগর দীর্ঘকাল বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান ও বহুবিবাহের আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অন্যান্য স্বাধীন কাজকর্মের মধ্যে এই দু'টি কাজ থেকে তিনি শেষজীবন পর্যন্ত মুক্তি পাননি। তাছাড়া আরও একটি কাজ তাঁর জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িয়ে ছিল। সেটি বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষাসংস্কারের কাজ। বাকি সময়টুকু তিনি নানাবিষয়ে গ্রন্থরচনার কাজে নিয়োগ করেছেন। তাঁর অবশিষ্ট কাজের মধ্যে উল্লেখ্য হল, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রতিষ্ঠা, ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন, হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফন্ড এবং সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরি স্থাপন। সংস্কৃতপ্রেস প্রতিষ্ঠা ও পুস্তক-প্রকাশের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবল আমরা তাঁর বাকি তিনটি কাজের কথা বলব।

মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি বড় কীর্তি। সংস্কারক্ষেত্রে তাঁর অন্যান্য কীর্তির সঙ্গে তুলনীয় না হলেও, এটি কোনদিক থেকেই নগণ্য বা উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগরচরিতে' বলেছেন :

সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটান ইনস্টিটুশ্যন। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন ; যিনি লোকাচার-রক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃতবিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃত-প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।...

মেট্রোপলিটন-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন, ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধা-বিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না ; এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে, সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া, মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল

আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল।

মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা কেন যে বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি বড় কীর্তি, তা রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়। 'সবল কর্মবুদ্ধি', যা বাঙালির মধ্যে সত্যই বিরল, তারই সাক্ষী হল এই ইনস্টিটিউশন। ১৮৫৯ সালে উত্তর-কলকাতায় শঙ্কর ঘোষ লেনে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী ছিলেন ঠাকুরদাস চক্রবর্তী. মাধবচন্দ্র ধাড়া, পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, যাদবচন্দ্র পালিত ও বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। এঁরাই সকলে মিলে স্কুল-প্রতিষ্ঠার খরচপত্র বহন করেন। অন্যান্য হিন্দু ভদ্রলোকেরাও টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্যামাচরণ মল্লিক অন্যতম। ওয়েলিংটন স্কয়ারের দত্তরা স্কুলের পাঠাগারের জন্য অনেক বইপত্র দান করেন। সরকারী ইংরেজি-স্কুলে শিক্ষার খরচ বেশি, সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে তা বহন করা সম্ভব নয়। সেইজন্য এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য ছিল, এমন একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলা, যেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত-পরিবারের বাঙালি ছেলেরা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প খরচে ইংরেজি-শিক্ষার ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারে। প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠাতারাই স্কুল পরিচালনা করতেন, কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁরা বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ অনেক বেশি কার্যকর হবে মনে ক'রে তাঁকে ও তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুল পরিচালনার কাজে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত হন, এবং তাঁদের দু'জনকে নিয়ে নতুন ম্যানেজিং-কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ১৮৬১, মার্চ মাস পর্যন্ত স্কুল পরিচালনা করেন।

এই সময় ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ও মাধবচন্দ্র ধাড়া, এই দু'জন প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে কমিটির মতবিরোধ হয়, এবং তাঁরা সদস্যপদ ত্যাগ করেন। 'ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি' নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুলও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতারা বিদ্যাসাগরের উপর স্কুল-পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে দিলেন, এবং পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, হীরালাল শীল, রামগোপাল ঘোষ ও হরচন্দ্র ঘোষ, এই ক'জনকে নিয়ে একটি নতুন কমিটি গঠিত হল। প্রেসিডেন্ট হলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, এবং 'সেক্রেটারি' হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৬৪ স্যালে স্কুলের নাম পরিবর্তন ক'রে 'হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন' নাম রাখা হল। ঐ বছরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বি· এ পর্যন্ত পাঠের অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হল। সিন্ডিকেট আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৬৬ সালে প্রতাপচন্দ্র সিংহের এবং ১৮৬৮ সালে হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ের সমস্ত দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের একার উপর পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না পাওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে। ১৮৭২, জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণদাস পাল ও দ্বারকনাথ মিত্রকে নিয়ে বিদ্যাসাগর নতুন একটি কমিটি গঠন করেন। এই সময় আবার তিনি এফ· এ পর্যন্ত পাঠ অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেন। আবেদন নামঞ্জুর হতে পারে এবং সিন্ডিকেটের ব্রিটিশ সভ্যেরা আপত্তি করতে পারেন ভেবে, বিদ্যাসাগর বেলি সাহেবের (E. C. Bayley) কাছে একখানি ব্যক্তিগত পত্রে (২৭ জানুয়ারি, ১৮৭২) তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানান। বেলি তখন সিন্ডিকেটের সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। সেইজন্য বিদ্যাসাগর তাঁকে সকল বিষয় জানিয়ে তাঁর সমর্থন লাভের আশায় লেখেন :

If it should be urged at the Syndicate that the character of the

instruction to be imparted in the Institution would be inferior inasmuch as the instructive staff would enlist exclusively of natives. I would take the liberty to remind you that the Sanskrit College, which teaches up to the B.A. standard, has an exclusively native staff, and that our Professors would be drawn from the same class of men. We feel confident, that native Professors, if selected with care and judgement, would be found quite competent, but should we from experience feel the necessity of entertaining an English Professor for instruction in the English language in which alone English aid might be necessary, we would certainly employ one—our object, it is needless for me to mention, is the good of the Institution and we spare no means to accomplish it. I believe there is a desire in certain quarters to know the scale of pay we will allow to our Professor, that is a matter I submit between the employer and the employee, and the affiliation rules, so far as I can understand them, do not require such details. It will be our aim to combine efficiency with economy, and as I have spent, I may say, my whole life in managing Schools, I hope you will allow me to exercise my own discretion in selecting Professors and regulating their pay..The high rate of schooling charged at the Presidency College is prohibitory to many middle-class youths, while their parents being opposed to their boys being sent to Missionary Colleges, they are obliged to give up academic education after matriculation. This Institution would be a great boon to them.

উনিশ শতকের সত্তরেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ইংরেজ সদস্যদের ধারণা ছিল না যে এদেশীয় ইংরেজিশিক্ষিত লোকেরা কোনো কলেজের পরিচালনার বা অধ্যাপনার দায়িত্ব নিতে পারেন। বিশেষ ক'রে ইংরেজ শিক্ষক ছাড়া যে ইংরেজিসাহিত্য শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, একথা তাঁরা কল্পনাও করতে পারতেন না। সিন্ডিকেটের সাহেব সদস্যরা এবং শিক্ষা-বিভাগের কর্তারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলেছিলেন যে ইংরেজি কলেজ চালাবার মতো যোগ্যতা বাঙালীরা এখনও অর্জন করেননি, অতএব তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হবে। তাঁর অনুজ শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন :[২] 'অগ্রজ, তাঁহাদের এই সাহঙ্কার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, তর্ক-বিতর্ক দ্বারা নানাপ্রকার বাধা অতিক্রমপূর্বক, নিজ কলেজে সমস্ত দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করতঃ ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম কলেজ ক্লাস খুলিলেন। এই কলেজ লইয়া ই· সি· বেলির সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্তা হয়। ই· সি· বেলি বলেন, 'বিদ্যাসাগর ! কিরূপে তুমি নিজ কলেজ চালাইবে ? ইংরাজ-সাহায্য ব্যতীত ইংরাজী-কলেজ কিছুতেই চলিতে পারে না।'

বেলি ও অন্যান্য সাহেবদের কথার উত্তর বিদ্যাসাগর মুখে তো দিয়েছিলেনই, কাজেও দিয়েছিলেন। ১৮৭৯ সালে মেট্রোপলিটন ফার্স্ট-গ্রেড কলেজে পরিণত হয়, ১৮৮১ সালে বি· এ পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম ছাত্র পাঠানো হয়, ১৬ জন ছাত্র বি· এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বাঙালীর অধ্যাপনায় ও পরিচালনায় ইংরেজি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কি না, এবং

ইংরেজ-চালিত কলেজের মতো শিক্ষা বিষয়েও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারে কি না, বিদ্যাসাগর তা ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল দিয়ে প্রমাণ ক'রে দিয়েছিলেন। ১৮৮২ সালে মেট্রোপলিটনে 'ল' ক্লাস খোলা হয় এবং তার পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে ৫১৩ জন বি· এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ১৮৮৩, ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ সালের পরীক্ষায় মেট্রোপলিটনের ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমস্থান অধিকার করে। এফ· এ, বি· এ পরীক্ষার ফলও ক্রমে ভাল হতে থাকে। কলেজের শিক্ষার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং ছাত্রসংখ্যাও ক্রমে বাড়তে থাকে। বিহারীলাল লিখেছেন :[৩] 'বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইংরেজী বিদ্যাপ্রসারণের প্রশস্ততর পথ আবিষ্কার করিয়া যে এ যুগে যশস্বী হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি ? তিনি যে আপন বিদ্যালয়ে ইংরেজ শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত না করিয়া এ দেশীয় শিক্ষক বা অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেন, তাহাই তাঁহার স্বদেশিপোষকতা-প্রবৃত্তির পরিচয়। এদেশী শিক্ষক লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিগ্বিজয়ী।'

পিতা যেমন পুত্রকে সস্নেহে লালনপালন করেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি এই মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনকে শেষজীবনে তাঁর সমস্ত শক্তিসামর্থ্য ও স্নেহ-যত্ন দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। তখন তাঁর দেহমন দুইই অবসন্ন হয়ে এসেছিল, এবং কর্মক্ষমতাও বিশেষ ছিল না। তা হলেও, সমাজের ও শিক্ষার কল্যাণকর্মে তিনি রোগশয্যাতেও যেন নব-জীবনের প্রেরণা লাভ করতেন, এবং তাঁর উৎসাহ ও মানসিক শক্তিও ফিরে পেতেন। মেট্রোপলিটনের কাজে তাই তাঁর উৎসাহ ও শক্তির অভাব হয়নি। কাজকর্মের ব্যাপারে জীবনে কোনদিনই তিনি পরনির্ভর ছিলেন না। স্কুল-পরিদর্শনের কাজ তিনি রুগ্নদেহ নিয়েও নিজে করতেন, এবং অধিকাংশ সময় কাউকে না জানিয়েই করতেন। ক্লাসের শিক্ষক-অধ্যাপকরা যখন পড়াতেন, তখন চুপিসাড়ে প্রায়ই তিনি তাঁদের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তাঁকে দেখে ছাত্র বা শিক্ষক কারও বিচলিত হওয়া নিষেধ ছিল। সসম্ভ্রমে সকলে দাঁড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করলে তিনি বাধা দিয়ে বলতেন : 'পড়াতে-পড়াতে বা পড়তে-পড়তে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠা ঠিক নয়, যে যা করছ মন দিয়ে তাই কর।' শিক্ষক, ছাত্র, অন্যান্য কর্মচারী ও ভৃত্যদের পর্যন্ত তিনি সমান সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখতেন। ছাত্রদের প্রতি কটূ ব্যবহার করা বা অপমানসূচক শাস্তি দেওয়া শিক্ষকদের নিষেধ ছিল। যত দুষ্টপ্রকৃতির ছেলেই হোক, অন্য সকলের সামনে অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিয়ে তাকে অপমান করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। একবার এই কারণে তিনি মেট্রোপলিটন স্কুলের শ্যামপুকুর শাখার এক শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। যদি সত্যই কোনো ছাত্র অমার্জনীয় অপরাধ করত তা হলে তাকে আর বিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হতো না। সাধারণত ছাত্ররা আদর-আবদার ক'রে তাঁর কাছে যা চাইত, তা তিনি মঞ্জুর করতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের দু'একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি।[৪]

একবার স্কুলের ছাত্ররা তাঁর কছে পৌষ-পার্বণের ছুটি চায়। ছুটি মঞ্জুর ক'রে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাদের হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা তো দেশ-ঘর ছেড়ে বিদেশে আছ ; কলকাতা শহরের বাসায় পিঠে পাবে কোথায় ?' ছেলেরাও হেসে উত্তর দেয়, 'আপনার বাড়িতে পাব।' বিদ্যাসাগর বলেন, 'তাই নাকি ? বেশ তাই হবে।' ছেলেদের জন্য বাড়িতে তিনি প্রচুর পিঠের আয়োজন করেন। এ ছাড়া স্কুলের শিক্ষক বা ছাত্র কেউ কোনো কাজের জন্য তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি তাকে না খাইয়ে ছাড়তেন না। এমনকি নিজের হাতে ফলমূল পর্যন্ত কেটে দিতেন। যে-কোনো রকমে হোক, মানুষকে সেবাযত্ন ক'রে তিনি পরম

তৃপ্তিলাভ করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে মানুষে-মানুষে কোনো ভেদ ছিল না। শিক্ষক ছাত্র, এমনকি স্কুলের চাকর-বাকরদেরও অসুখ-বিসুখ হলে তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা তো করতেনই, অনেক সময় নিজে তাদের সেবা-শুশ্রূষাও করতেন। স্কুলের বেতন ছিল মাসিক ৩ টাকা, তাও অধিকাংশ ছাত্রই দিত না, বিনা বেতনে পড়ত। দারিদ্র্যের কথা শুনলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাত্রদের 'ফ্রি' ক'রে দেওয়া ছাড়াও, বইপত্রাদি দিয়ে সাহায্য করতেন। তার উপর, অসহায় ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে খোরাকপোশাক বাবদও মাসিক সাহায্য পেত। ১৮৭৪ সালের এফ এ পরীক্ষায় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু নামে মেট্রোপলিটনের একটি ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার ফল দেখে, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সাটক্লিফ সাহেব বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন : 'The Pundit has done wonders. । বিদ্যাসাগর তখন কার্মাটারে ছিলেন। পরীক্ষার ফল গেজেটে প্রকাশিত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ কলকাতায় চলে আসেন এবং যোগেন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর কথায় যোগেন্দ্র একদিন তাঁর বাড়িতে আসে, এবং বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের পাঠাগার থেকে সুন্দররূপে বাঁধানো স্কটের ওয়েভারলি নভেলের একটি সেট নিজে হাতে লিখে তাকে উপহার দেন :

Awarded

To Jogindra Chandra Bose at the close of his brilliant career as a student in the Metropolitan Institution.

(Sd) Iswar Chandra Sharma
8th. January, 1875

এরকম বইপত্র তিনি ভাল ছাত্রছাত্রীদের প্রায়ই উপহার দিতেন। মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম যখন চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ এম· এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে একখণ্ড শেক্সপিয়রের গ্রন্থাবলী উপহার দেন, এই কথা লিখে :

SRIMATI
KUMARI CHANDRAMUKHI BASU.
The first Bengali Lady.
Who has obtained the Degree of Master of Arts,
OF THE CALCUTTA UNIVERSITY
From her sincere well-wisher
ISWARA CHANDRA SHARMA

কেবল উপহার দিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হননি, সেই সঙ্গে চন্দ্রমুখীকে·একখানি সুন্দর চিঠিও লিখেছিলেন। চিঠিখানি এই :

বৎসে চন্দ্রমুখি—

সে দিন তোমায় দেখিয়া ও তোমার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবিনী হইয়া সুখে কালহরণ কর, এবং স্বজনবর্গের আনন্দদায়িনী ও সজ্জনসমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হও, এই আমার আন্তরিক অভিলাষ ও ঐকান্তিক প্রার্থনা।

এই সমভিব্যাহারে যৎকিঞ্চিৎ উপহার (Shakespear's Works) প্রেরিত হইতেছে, পরিগৃহীত হইলে নিরতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইব।

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর এই রকম ব্যবহার করতেন। লেখাপড়ায় একটু ভাল হলে যে-কোন ছাত্র তাঁর কাছ থেকে যা-খুশি আদায় ক'রে নিতে পারত। শিক্ষার জন্য তাঁর কাছে কেউ কিছু সাহায্য চাইলে তিনি কখনই তা না করতে পারতেন না। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চতুর লোকেরা তাঁকে প্রতারণাও করত। একবার কলকাতা শহরে কোনো লক্ষপতি, দারিদ্র্যের ভান ক'রে, তাঁর শ্যালককে বিনা বেতনে মেট্রোপলিটনে ভর্তি ক'রে দিয়ে যান। কিছুদিন পরে, এই শ্যালকটির পোশাক-পরিচ্ছদ ও টিফিন খাওয়ার বহর দেখে বিদ্যাসাগরের মনে সন্দেহ জাগে। তিনি খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন যে ছাত্রটির ভগ্নিপতি একজন লক্ষপতি। তখন একদিন তিনি তাঁকে ডাকিয়া আনেন এবং প্রতারক বলে মুখের উপর অভিযোগ ক'রে প্রচণ্ড ধমক দেন। তারপর ভগ্নিপতির সঙ্গে তখনই শ্যালকটিকেও স্কুল থেকে বিদায় ক'রে দেওয়া হয়।

মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র ছিলেন গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।* ১৮৭০ সালে নদীয়া-শান্তিপুরে গোপালচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, এবং শান্তিপুর স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস ক'রে, ১৮৮৬ সালে ১৬ বছর বয়সে মেট্রোপলিটন কলেজে এফ এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই সময়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্বচক্ষে দেখেন। তখন কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সংস্কৃত পড়াতেন নবীন পণ্ডিত এবং দর্শন পড়াতেন ক্ষুদিরাম বসু। গ্রামের ছাত্রদের বইপত্রের অসুবিধা হলে, কলেজের লাইব্রেরি থেকে বই দিয়ে তাদের সাহায্য করা হতো। বইপত্রের সুবিধা পাবার জন্য গোপালবাবু প্রিন্সিপালের কাছ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে লাইব্রেরিয়ানকে দেন। লাইব্রেরিয়ান গোপালবাবুকে সাধারণ গ্রাম্য ছাত্র মনে ক'রে, চিঠিখানা ভাল ক'রে না দেখেই ছিঁড়ে ফেলে দেন এবং গোপালবাবুর অনুরোধে কর্ণপাত করেন না। যথাকালে কথাটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে পৌঁছয়। বিদ্যাসাগর একদিন কলেজে এসে ক্লাস থেকে গোপালবাবুকে ডেকে পাঠান। ঘটনাটি গোপালবাবু বর্ণনা করতে করতে বললেন : 'আমরা গ্রামের ছেলে, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম শুনলেই ভয়ে আমাদের বুক দুর্‌দুর্‌ করত। কলকাতায় এসে দূর থেকেই তাঁকে দেখেছি। তিনি পাল্কি ক'রে কলেজে যাতায়াত করতেন, আমরা দূর থেকে তাঁকে দেখতাম, এবং যতক্ষণ তিনি কলেজে থাকতেন, ততক্ষণ ছাত্র বা শিক্ষক কেউ ফিস্‌ফিস্‌ করেও কথা বলতে সাহস করত না। যেদিন প্রথম তাঁর কাছে আমার ডাক পড়ল, সেদিন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ভেবেই আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। কিছুতেই আমার পা চলে না, শেষে শিক্ষক ও ছাত্ররা আমায় ঠেলতে ঠেলতে একরকম চ্যাংদোলা করেই তাঁর কাছে নিয়ে হাজির করলেন। এত কাছাকাছি বিদ্যাসাগরকে দেখার সৌভাগ্য জীবনে আর কোনোদিন হয়নি। শীর্ণদেহ ছোটখাটো একটি মানুষ পিঠ সোজা ক'রে চেয়ারে বসে আছেন দেখলাম। কিন্তু দেখলে কি হবে? চোখের দিকে চাইতেই মুহূর্তের মধ্যে মনে হল যেন বাইরের প্রকৃতির সমস্ত 'তেজ' ঐ হাড় ক'খানার মধ্যে জমাট বেঁধে রয়েছে, এবং চোখের দীপ্তিতে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি লাইব্রেরিয়ানকে কোনো চিঠি দিয়েছিলে?' আমি জানতাম বিদ্যাসাগর মশায় ভয়ানক কড়া লোক, সত্যি কথা বললে হয়ত লাইব্রেরিয়ানের চাকরি যাবে। তাই বোধ হয় চার-পাঁচ

---

* *এই বিবরণ আমি নিজে গোপালচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সংগ্রহ করেছি। সম্প্রতি ১৯৫৮ সালে প্রায় ৮৮ বছর বয়সে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদের মধ্যে (বিদ্যাসাগর যুগের) আর কেউ তাঁর মতো দীর্ঘজীবী ছিলেন বলে জানা নেই।* —গ্রন্থকার

সেকেন্ড উত্তর দিতে আম্‌তা-আম্‌তা করেছিলাম। এর মধ্যে হঠাৎ যেন ঘরের মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মশায় প্রচণ্ড জোরে ধমক দিয়ে বললেন, 'মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করছ ? একেবারে দূর ক'রে দেব কলেজ থেকে।' এরকম একটা শুকনো হাড়ের খোলের ভিতর থেকে যে এত জোরে গলার আওয়াজ বেরুতে পারে, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আওয়াজের রেশ কাটতে না কাটতেই আমার মুখ দিয়ে অনর্গল সত্যি কথা বেরিয়ে এল। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি চিঠি দিয়েছিলাম, তিনি আমার চিঠি না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।' 'হুঁ' বলে শব্দ ক'রে তিনি বললেন 'যাও'। পরদিন শুনলাম লাইব্রেরিয়ান পদচ্যুত হয়েছেন।

কিছুক্ষণ থেমে গোপালবাবু বললেন 'এত কঠিন মানুষটি ভিতরে ভিতরে কত কোমল ও রসিক ছিলেন, তা ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়। শিক্ষকদের অসুখ করলে তিনি তাঁদের আলাদা অ্যালাউন্স দিতেন, এবং মাইনে থেকে তা কাটতেন না। তাঁর পরিহাসের একটি ঘটনা আমার মনে আছে। নবীন পণ্ডিত মশায় খুব চমৎকার সংস্কৃত পড়াতেন। একদিন ছেলেরা তাঁর ক্লাসে গন্ডগোল করছিল। বিদ্যাসাগর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে তিনি মন্তব্য করেন, 'কেবল ভাল পড়ালেই হয় না, ছেলেদেরও ভাল ক'রে দেখতে হয়।' নবীন পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, 'তা জানি, কিন্তু শকুন্তলা পড়াবার সময় নয়।' বিদ্যাসাগর মশায় হেসে চলে যান। এরকম অনেক কথা তাঁর সম্বন্ধে জানতাম, এখন সব মনে নেই, আর একদিনে বা একসঙ্গে মনেও পড়ে না। তবে এইটুকু বেশ মনে আছে যে আমরা বিদ্যাসাগর মশায়ের নিজের মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র ছিলাম বলে মনে মনে যথেষ্ট গর্ববোধ করতাম এবং তখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সামনে মাথা উঁচু করেই চলতাম।'

গোপালবাবু ১৮৯১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম· এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছাত্রজীবনের যে স্মৃতি তাঁর মনে জাগরূক ছিল, তা মেট্রোপলিটন কলেজের দিনগুলির স্মৃতি। তার কারণ তিনি বললেন, 'যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি বা তোমরা পাচ্ছ, তার ভিত্‌ যিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন, মেট্রোপলিটন কলেজের সৌধ তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায়, তাঁরই কাছাকাছি থেকে, সেই কলেজের ছাত্র হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা ?' সত্যিই সৌভাগ্যের কথা। বিদ্যাসাগর মশায়ের মৃত্যুর কথাও তাঁর মনে ছিল। জিজ্ঞাসা করতে দেখলাম. তাঁর চোখে জল ছল্‌ছল্‌ করছে। তিনি বললেন, 'মনে আছে বৈ কি ! খুব মনে আছে। এখনও মনে হয় গতকালের ঘটনা। সেদিন কলকাতার ছাত্ররা সারাদিন উপবাস করেছিল, এবং খালি পায়ে চলেছিল। আর পিতৃবিয়োগ হলে যা হয়, আমাদের ছাত্রদের অবস্থা হয়েছিল ঠিক তাই। তারপর দীর্ঘকাল আমি বেঁচে থাকলাম, অনেক দেশনেতার ও সমাজনেতার মৃত্যু আমি দেখেছি, বেদনাও বোধ করেছি, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে অসহায়ের·মতো যে শূন্যতা বোধ করেছিলাম সেদিন, সেরকম আর কখনো করিনি।'

মেট্রোপলিটন কলেজের একজন স্বনামধন্য ছাত্রের এই উক্তির মধ্যেই সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, এবং যে-রূপকার সেটি নিজের হাতে নিখুঁতভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তিনিও আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত মূর্তিতে ভেসে উঠেছেন। এই চিত্রাঙ্কনের উপর আর কোনো আঁচড় না টানলেও চলে।

হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফন্ড। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় কীর্তি 'হিন্দু ফ্যামিলি

অ্যানুইটি ফন্ড'। বাঙালীর হিন্দু-পরিবার সাধারণত একজন উপার্জনক্ষম পুরুষনির্ভর। কোনো কারণে তাঁর মৃত্যু হলে পরিবারের স্ত্রীপুত্র ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সকলে অসহায় অনাথের মতো বিপন্ন বোধ করেন। এই পারিবারিক জীবনের খানিকটা নিরাপত্তার জন্য বিদ্যাসাগর 'অ্যানুইটি ফন্ড' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। যিনি মাসে মাসে ফান্ডে কিছু টাকা দেবেন, তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী, পুত্র বা অন্য কোন আত্মীয় সেই টাকার দ্বিগুণের কিছু বেশি যাবজ্জীবন মাসিক সাহায্য পাবেন। যেমন, যদি কেউ মনে করেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী যাবজ্জীবন মাসিক ৫৲ টাকা ক'রে সাহায্য পাবেন, তা হলে তাঁকে প্রতিমাসে ২।৹ করে আন্দাজ ফন্ডে জমা দিয়ে যেতে হবে। এইভাবে অ্যানুইটি ফন্ডে মাসিক ৩০৲ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ফন্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭২, ১৫ জুন। ১৮৭২, ২৩ ফেব্রুয়ারি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে একটি সভা ক'রে ফন্ড প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হয়। প্রথমে ১০ জন 'সাবস্ক্রাইবার' নিয়ে ৩২নং কলেজ স্ট্রিটে ফন্ডের কাজ আরম্ভ হয়। পাইকপাড়ার রাজারা একত্রে ২৫০০৲ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। প্রথম দু'বছর ট্রাস্টি ছিলেন বিদ্যাসাগর ও জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র। তৃতীয় বছর দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রমেশচন্দ্র মিত্র ও বিদ্যাসাগর ট্রাস্টি হন। প্রতিষ্ঠাকালে চেয়ারম্যান ছিলেন শ্যামাচরণ দে, ডেপুটি-চেয়ারম্যান মুরলীধর সেন, এবং ডিরেক্টরবোর্ডের সভ্য ছিলেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র. রাজেন্দ্র মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র ধর, নবীনচন্দ্র সেন (সেক্রেটারি), ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, নন্দলাল মিত্র, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন ও পঞ্চানন রায়চৌধুরী। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সাবস্ক্রাইবারদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষক ছিলেন।

১৮৭৫ সাল পর্যন্ত, মাত্র তিন বছর, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অ্যানুইটি ফন্ডের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। ১৮৭৫, ২৭ ডিসেম্বর তিনি ডিরেক্টরদের কাছে একখানি পত্র লিখে ফন্ডের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৮৭৬, ২ জানুয়ারি হিন্দু স্কুলের একটি সভায় ডিরেক্টররা তাঁর সম্পর্কত্যাগের কারণ জানতে চান। ২১ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর ফুলস্কাপ কাগজের প্রায় কুড়ি-বাইশ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি পত্র এই 'কারণ' লিখে জানান। যে-কারণে আজও বাঙালীদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হয় না, বিদ্যাসাগর সেই কারণগুলিই তাঁর পত্রে বিবৃত করেছেন। ফন্ডের হিসেব-নিকেশের ঠিক নেই, নিয়মকানুনের বালাই নেই, সভার রিপোর্ট ঠিক রাখা হয় না। ডিরেক্টররা প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কথা চিন্তা না ক'রে কর্তৃত্ব ও দলাদলি নিয়েই মত্ত থাকেন—এই ধরনের বহু অভিযোগ ক'রে পত্রের শেষে তিনি দুঃখ ক'রে লেখেন :[৫]

এই ফন্ডের সংস্থাপন ও উন্নতি সম্পাদন বিষয় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। উত্তরকালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা আছে ; আমি সে প্রত্যাশা রাখি না। যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম্ম ও তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম ; কেবল এই বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন এ বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি না জানি না ; কিন্তু না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, এই ফন্ডের উপর, আপনাদিগের সকলকার অপেক্ষা আমার অধিক মায়া। আমায়, সেই মায়া কাটাইয়া, ফন্ডের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে, সেইজন্য আমার অন্তঃকরণে কত কষ্ট হইতেছে, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যাঁহাদের হস্তে

আপনারা কাযভার অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সরল পথে চলেন না। এমনস্থলে, এবিষয়ে লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকালে কলঙ্কভোগী হইতে ও ধর্ম্মদ্বারে অপরাধি হইতে হইবে ; কেবল এই ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত মনে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, আমায় এ সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি ; তথাপি আপনারা আমার উপর এতদূর বিশ্বাস করিয়া গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এজন্য আপনাদের নিকট অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ঐ গুরুতর ভার বহন করিয়া যতদিন এই ফন্ডের সংস্রবে ছিলাম, সেই সময় মধ্যে অবশ্যই আমি অনেক দোষে দোষী হইয়াছি ; দয়া করিয়া, আপনারা আমার সকল দোষের মার্জ্জনা করিবেন। যতদিন আপনাদের ট্রাষ্টি ছিলাম, সাধ্যানুসারে ফন্ডের হিত চেষ্টা করিয়াছি , জ্ঞানপূর্ব্বক বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও সে-বিষয়ে অযত্ন, উপেক্ষা বা অমনোযোগ করি নাই। এক্ষণে আপনারা প্রসন্ন হইয়া বিদায় দেন, প্রস্থান করি।

কলিকাতা ভবদীয়স্য

১০ ফাল্গুন, ১২৮২ সাল শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ডিরেক্টরেরা অনেক চেষ্টা করেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত বদলাতে পারেননি। অ্যানুইটি ফন্ডের সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। কিছুদিন পরে রমেশচন্দ্র মিত্র ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর পদাঙ্ক অনুসররণ করেন। হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফন্ডের পক্ষে এই আঘাত কাটিয়ে ওঠা কঠিন হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের কঠোর সমালোচনায় তাঁদের উপকারই হয়েছিল। নিজেদের দোষত্রুটির সমালোচনা ও সংশোধন ক'রে, পরবর্তীকালে তাঁরা আত্মোন্নতির পথ বেছে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। দোষ যে শুধু তাঁদেরই ছিল তা নয়, বিদ্যাসাগরেরও ছিল। বিদ্যাসাগরচরিত্রের সবচেয়ে বড় দোষ ছিল নিরাপস মনোভাব। একত্রে মিলেমিশে তিনি বড় একটা কাজকর্ম করতে পারতেন না। তাঁর সততা নিষ্ঠা বিশ্বাস অবিশ্বাস পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদির সঙ্গে সায় দিয়ে চলতে না পারলে তিনি কারও সঙ্গে এক-পাও চলতে পারতেন না। সেইজন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বহুলোকের সম্মিলিত কাজকর্মে তিনি খুব বেশিদিন সহযোগিতা করতে পারেননি। অ্যানুইটি ফন্ডের ক্ষেত্রেও কতকটা তাই হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফন্ডে'র পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছিল, এবং এই ফন্ড তাঁর জীবনের একটা বড় কীর্তি।

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন বিদ্যাসাগরের কীর্তি নয়। তিনি তার পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা কিছুই করেননি। এটা সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকারী পরিকল্পনা। 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে'র তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের নাবালক জমিদারদের শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা করার জন্য ১৮৫৪, ১১ নবেম্বর একটি 'অ্যাক্ট' পাশ করা হয়। একজন বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারীর অধীনে, ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সের নাবালক জমিদারদের একটি স্বতন্ত্র বাড়িতে রেখে ভালভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করাই এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৬, মার্চ মাসে কলকাতায় ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন স্থাপিত হয়। প্রথমে প্রতিষ্ঠানটি ছিল চিৎপুরে রাজা নরসিংহের বাগানে, পরে ১৮৬৩, অক্টোবর মাসে মানিকতলায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানে স্থানান্তরিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর বা পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়। ১৮৬৩, ১৮ ফেব্রুয়ারি 'বোর্ড অফ রেভিনিউ'

বিদ্যাসাগরকে এই ইনস্টিটিউশনের ভিজিটর বা পরিদর্শক হতে অনুরোধ করেন। নবেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৮৬৫, মার্চ পর্যন্ত তিনি পরিদর্শকরূপে কাজ ক'রে, বোধ হয় ডিরেক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য পদত্যাগ করেন। এই দু'বছর পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত হয়ে তিনি ইনস্টিটিউশনের শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।[৬]

পরিদর্শক নিযুক্ত হবার পর 'বোর্ড অফ রেভিনিউ'-এর সেক্রেটারি আর· বি· চ্যাপম্যান বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তার মর্ম এই :

১। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন এখন মানিকতলায় অবস্থিত। আপনি প্রতি বছরে মার্চ, জুলাই ও নবেম্বর মাসে একবার ক'রে অন্তত এই ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন করবেন।

২। বছরের অন্যান্য মাসে অন্যান্য পরিদর্শকরা দেখাশুনা করবেন।

৩। আপনার কাছে ইনস্টিটিউশনের নিয়মকানুনের একটি কপি পাঠাচ্ছি। এই নিয়মাবলীর ৪০নং ধারা অনুযায়ী আপনার কর্তব্য হবে, যে-তিনমাসের দায়িত্ব আপনার উপর দেওয়া হয়েছে, সেই তিনমাস মাসে একদিন ক'রে অন্তত পরিদর্শনের কাজে যাওয়া এবং তত্ত্বাবধানে সাহায্য করা। অন্যান্য মাসেও আপনার ইচ্ছা হলে আপনি ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন করতে পারেন।

—ফোর্ট উইলিয়ম, ৩ নভেম্বর ১৮৬৩

কয়েকমাস ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন পরিদর্শন করার পর বিদ্যাসাগর তার উন্নতির জন্য একটি দীর্ঘ স্মারকলিপি পেশ করেন (৪ এপ্রিল, ১৮৬৪)। স্মারকলিপির মর্ম এই :

'ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের ভিতরের ব্যবস্থা দেখে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু একটি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি খুশি হতে পারিনি, এবং তা পরিবর্তন করা প্রয়োজনীয় বোধ করছি। বর্তমান ব্যবস্থানুসারে নাবালক ছেলেরা এক ঘরে একত্র হয়ে এক টেবিলের চারিদিকে পড়তে বসে। প্রথম দিন থেকেই পড়াশুনা করার এই ব্যবস্থা দেখে আমি প্রীত হতে পারিনি। তারপর যতদিন আমি দেখেছি ততদিন আমার মনে হয়েছে, এ-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা দরকার। স্পেলিং-বুক থেকে এন্ট্রান্স কোর্স পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে, এবং তার জন্য ভিন্ন পাঠও নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ক্লাসের ছেলেরা যদি এক টেবিলে বসে একসঙ্গে পড়াশুনা করে, তা হলে কেবল গণ্ডগোলই হতে পারে, পড়াশুনা হতে পারে না। সকালবেলা ডিরেক্টর এই ঘরে এসে বসেন, এবং আমার ধারণা তাতে ছেলেদের পড়াশুনার আরও ক্ষতি হয়। নানারকমের লোক নানা কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, এবং তাতে যথেষ্ট গণ্ডগোল হয়। ছেলেদের পাঠ্য বুঝিয়ে দেবার জন্য একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটা অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে নানা ক্লাসের ছাত্রদের একসঙ্গে পড়ানো অসম্ভব ব্যাপার। কোনো ছেলেরই তাতে কিছুমাত্র উপকার হয় বলে মনে হয় না। তার ফলে, এরকম একটি প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও নাবালক জমিদাররা কিছুই লেখাপড়া শিখতে পারছে না। এইসব দোষত্রুটি সংশোধনের জন্য আমি ভেবেচিন্তে আপনাদের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি। আশা করি আপনারা প্রস্তাবগুলি বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

১। প্রত্যেক ক্লাসের জন্য আলাদা জায়গা এবং আলাদা টেবিল থাকা উচিত ; ২। প্রত্যেক ক্লাসের জন্য আলাদা শিক্ষক থাকা উচিত ; ৩। নিচু ক্লাসের ছেলেদের জন্য যে

শিক্ষক নিযুক্ত হবেন তিনি সকালে ও বিকেলে দুবেলাই হাজির থাকবেন। উচু ক্লাসের শিক্ষক একবেলা হাজির হলেই চলবে।

নাবালকদের ভাল করে শিক্ষা দেবার জন্য আমি একাধিক শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করছি। বর্তমানে স্কুলে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে এইভাবে বিশেষ যত্ন নিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা না করলে ছেলেদের পক্ষে লেখাপড়া শেখাই সম্ভব নয়। যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তা হলে আপনাদের ইনস্টিটিউশনে নাবালকদের শিক্ষাব্যবস্থার যে-সব দোষত্রুটি আছে তা দূর হয়ে যাবে।'

বিদ্যাসাগরের এই স্মারকলিপি পাবার পর রেভিনিউ সেক্রেটারি একখানি চিঠিতে তাঁকে সমস্ত বিষয় তদন্ত ক'রে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে অনুরোধ করেন। চিঠিখানি এই :

To

Pundit Ishur Chandra Vidyasagar

Dated Fort William, the 18th Nov. 1864.

Sir,

The Government of Bengal have requested the Board of Revenue to call upon for a full report respecting the working of the Wards' Institution at Calcutta for the year 1863-64, on the following heads:

2nd. Number of Boys; Progress; Course of Instruction; Physical Education; Health; Food; Expenses; Visitors' Inspection.

3rd. I am directed to beg the favour of your submitting the required report as early as possible and to request that a similar report be submitted for every succeeding year as soon after the end of May as possible.

I have the honour to be,
Sir
Your most obdt. Servt.
(Sd) R. B. Chapman.
Secretary

এই চিঠি অন্যান্য পরিদর্শকদেরও পাঠানো হয়েছিল। চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন পরিদর্শকরা সকলে মিলে একটি রিপোর্ট দেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অন্য পরিদর্শকদের মতভেদ হয়েছিল বলে তিনি ১১ জানুয়ারি, ১৮৬৫ একটি আলাদা রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁর রিপোর্টের মর্ম এই :

'এই রিপোর্ট দেবার আগে আমি জানাতে চাই যে অন্যান্য পরিদর্শকদের রিপোর্টের সঙ্গে আমার এই রিপোর্ট পাঠাবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মতভেদ হওয়াতে আমি আলাদা রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য হচ্ছি। সেজন্য মার্জনা করবেন।

ছাত্রসংখ্যা। গত ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রেজিস্টারে ১২জন ছাত্র ছিল।

শিক্ষা। দু'একটি বিষয় ছাড়া নাবালকদের শিক্ষার উন্নতি বিশেষ হয়নি। পরে সে-বিষয়ে

সবিস্তারে আলোচনা করব।

ব্যায়ামশিক্ষা। ব্যায়ামশিক্ষার প্রণালী উন্নত ও প্রশংসনীয়।

স্বাস্থ্য। সাধারণত ছেলেদের স্বাস্থ্য ভালই।

খাদ্য। যতদূর আমি নিজে দেখেছি, ছেলেদের খাদ্যদ্রব্য খুবই ভাল ও স্বাস্থ্যকর। নাবালকদের নিজেদের লোকরাই আলাদা রান্নাঘরে খাবার তৈরি ক'রে থাকে।

ব্যয়। বৎসরের মোট ব্যয় ৩১,৫২৪৵১০· অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেক বালকের জন্য ২৬২৭ টাকা মাসে ২১৯৲ টাকা। নাবালকরা ধনিক জমিদারবংশের ছেলে, এবং কলিকাতায় খাওয়া-দাওয়ার খরচও বেশি। সেইদিক দিয়ে বিচার করলে খরচ অত্যধিক হয়েছে বলা যায় না।

পরিদর্শন। ১৮৬৩, নভেম্বর থেকে গত বছরের শেষ পর্যন্ত আমি ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন পাঁচবার পরিদর্শন করেছি। প্রথম থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল যে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা তেমন ভাল নয়। এই ব্যবস্থার কিভাবে উন্নতি করা যায়, তা আমি আমার ৪ এপ্রিল, ১৮৬৪ তারিখের স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেছি। আমার প্রস্তাবের পর একজন মাত্র অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো ফল হয়নি। গত বছর আমার স্মারকলিপি পাঠাবার পর থেকে এবিষয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে ওয়ার্ডদের শিক্ষাপ্রণালী আমূল সংস্কার না করলে তাদের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই। ইনস্টিটিউশনে তাদের ৪ থেকে ৬ বছর রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে বাইরের স্কুলেও ছেলেরা বিশেষ কিছু লেখাপড়া শেখে না। বর্ণপরিচয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা পেতে প্রায় ৯ বছর সময় লাগে। কিন্তু পরীক্ষা দিলেও ইংরেজিশিক্ষা তাদের বিশেষ কিছু হয় না। অতএব পরীক্ষার উপযুক্ত শিক্ষা পাবার আগেই যদি কেউ লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, তা হলে তার কতদূর শিক্ষা হতে পার, তা সহজেই কল্পনা করা যায়। ওয়ার্ডদের শিক্ষা প্রায় এইরকমই হয়ে থাকে। যতদিন সাধারণ স্কুলে তাদের পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে, ততদিন তাদের এই অবস্থার কোন উন্নতি হবে বলে মনে হয় না। অথচ ইনস্টিটিউশন ছেড়ে যাবার আগে তাদের কতকগুলি বিষয়ে কার্যোপযোগী শিক্ষা পাওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য আমার ধারণা, এইভাবে তাদের স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়:

১। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউশন কেবল ওয়ার্ডদের বাসস্থান হয়ে আছে। একে বোর্ডিং-স্কুলে পরিণত করা প্রয়োজন।

২। ওয়ার্ডদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা উচিত।

৩। শিক্ষা দেবার জন্য সুযোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত।

সাধারণ স্কুলের মতো ওয়ার্ডদের লেখাপড়া শিখিয়ে কোনো লাভ নেই। তাদের কাজে লাগতে পারে এরকম শিক্ষাই অল্পকালের মধ্যে তাদের দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। তাতে ফল ভাল হবে।

ওয়ার্ডদের শাসন করবার জন্য যে নিয়মাবলী আছে, তার একাদশ নিয়মটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। নিয়মের তাৎপর্য এই যে কোনোরকম গুরুতর অপরাধ না করলে ওয়ার্ডদের দৈহিক দণ্ড দেওয়া হবে না। কিন্তু অর্ডারবুক দেখে মনে হয়, প্রতি মাসে বালকদের ৪ থেকে ১২ ঘা পর্যন্ত বেত্রাঘাত সহ্য করতে হয়েছে। যে যে অপরাধে তারা এই দণ্ড পেয়েছে তার মধ্যে একটি ছাড়া আর কোনটাই গুরুতর অপরাধ বলে মনে হয় না। সেটিরও বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, আমার

মতে অপরাধ যে রকমেরই হোক না কেন তার জন্য বালকদের কখনই দৈহিক দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। আমি এই দণ্ডনীতির ঘোর বিরোধী। শিক্ষাক্ষেত্রে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে তা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে বালকদের দৈহিক দণ্ড দিলে, তাদের চরিত্রের উন্নতি হয় না, অবনতি হয়।'

এই রিপোর্ট পাঠাবার পরে বিদ্যাসাগর ১৮৬৫, ২৯ আগস্ট ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের উন্নতির জন্য আর-একটি স্মারকলিপি পাঠান। এই স্মারকলিপিতেও তিনি আগের মতো শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেন। তাঁর প্রস্তাব গবর্নমেন্টের পক্ষে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া শিক্ষা ও শাস্তির ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ডিরেক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতবিরোধও হয়েছিল। অনেকে বলেন, সেই কারণে তিনি পরিদর্শকের কাজ ছেড়ে দেন। তা দেওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়, কারণ কোনো বিষয়ে মতভেদ হলে তিনি কিছুতেই আপস-মীমাংসা ক'রে কাজ করতে পারতেন না। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন থেকে তাঁর পদত্যাগের কারণও তাই।

প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে, অথবা কাজকর্মের দিক থেকে, বিদ্যাসাগর ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের জন্য বিশেষ কিছু করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। এটি তাঁর কোনো কীর্তির মধ্যেই গণ্য হবার মতো নয়। তবু তিনি এই ইনস্টিটিউশনের পরিদর্শকরূপে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে যেটুকু নতুন ক'রে চিন্তা করেছিলেন তার কিছু গুরুত্ব আছে। বিশেষ ক'রে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়া সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত তিনি যত সুস্পষ্টভাবে এই ইনস্টিটিউশন প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন, সে-রকম আর কোনো ক্ষেত্রে করেননি।

পাদটীকা

১· Statement of Facts Relating to the Metropolitan Institution. (ইংরাজী পুস্তিকা) সুবলচন্দ্র মিত্রের ইংরাজী বিদ্যাসাগর জীবনী ২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

২· শম্ভুচন্দ্র—১৪৪

৩· বিহারীলাল—৩৬৪

৪· কাহিনীগুলি বিহারীলাল, চণ্ডীচরণ, সুবলচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্রের বিদ্যাসাগর জীবনী থেকে সংকলিত

৫· বিহারীলাল কর্তৃক উদ্ধৃত—৪৫৪-৫৫

৬· Proceedings of the Board of Revenue 1963-65

এখনও বিদ্যাসাগর

ক্ষুদিরাম দাশ

বিদ্যাসাগর প্রগতিশীল আধুনিক বাংলার সংগঠকদের অন্যতম ছিলেন এবং সেই সঙ্গে সেকাল ও একাল মিলিয়ে মানুষ হিসেবেও ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রগতিমুখী চারিত্র্যের পরিচয় যেমন বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে ও বহুবিবাহ দূর করার প্রয়াসে, তেমনি বেথুন স্কুলের সংগঠনে ও মফস্বলের গ্রামাঞ্চলে বালিকা-শিক্ষার জন্য বঙ্গ বিদ্যালয় প্রবর্তনে। সংস্কৃত কলেজে পড়ার অধিকার কেবল ব্রাহ্মণ সন্তানদের, এই সংকীর্ণ মনোভাব তাঁর অসহনীয় হয়েছিল। অধ্যক্ষ হয়েই তিনি সংস্কৃত কলেজের দ্বার ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্বিশেষে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া ছাত্রদের সংস্কৃত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষারও প্রবর্তন করেন, আর সম্প্রতি ন্যায় প্রভৃতি দর্শন আয়ত্ত করার সঙ্গে পশ্চিমা লজিক, নীতিশাস্ত্র ও অন্যান্য দর্শন ছাত্রেরা আয়ত্ত করুক, এমন নিয়মও তিনি নির্দিষ্ট করে যান।

কর্মক্ষেত্রে তিনি প্রগতিমূলক ও বহুচিন্তিত স্বাধীন মতামতের দ্বারা চালিত হতেন। তখনকার সরকারের শিক্ষাবিভাগ তাঁর এরকম সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে তিনি অধ্যক্ষের পদে সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা দেন। কী সমাজ সংস্কারে, কী শিশু সংস্কারে, কী সাংসারিক বিষয়ে তাঁর মানবিকতাযুক্ত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধতা তিনি সহ্য করেননি। এতে তাঁর আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। পদস্থ সাহেব কর্মচারী টেবিলে জুতাসুদ্ধ পা তুলে রেখে তাঁর অবমাননা করলে কীভাবে তিনি তার প্রতিশোধ নেন, তা সকলেরই জানা। রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ স্মরণীয় লেখকেরা বিদ্যাসাগরের এই তেজস্বিতার বিষয়টি খুব জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন, আর কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর একটি বাক্যে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের এই দিকটিকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

সংস্কৃতের অসামান্য পণ্ডিত হলেও বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল সংস্কৃতকে সহজভাবে পরিবেশনের ওপর এবং এজন্য তিনি উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী লিখে পাঠ্য করেছিলেন। এই দুখানি বই আজও সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অসামান্য অবদান সংস্কৃতের দিকে নয়, মাতৃভাষার দিকে।

বাংলা স্কুল, ভাষাশিক্ষার জন্য বর্ণপরিচয় থেকে বোধোদয় আখ্যান-মঞ্জরী, কথামালা প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন তাঁর মাতৃভাষার প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিষয় চিন্তাভাবনার প্রকৃষ্ট পরিচয় বহন করছে। বিদ্যাসাগর সহজ সরল লৌকিক ভাষার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। লৌকিক স্বচ্ছন্দ বাংলার একটি স্বকীয় স্টাইল আছে। এটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয়নি। অনার্য জনসম্পর্ক থেকে এসেছে। বিদ্যাসাগর, তাঁর উপরিলিখিত বইগুলিতে এবং শকুন্তলা ও সীতার বনবাসে এই স্টাইলকেই মুখ্যভাবে অবলম্বন করেছিলেন। তাই তাঁকে যে আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়ে থাকে, তা অত্যুক্তি নয়। তাঁর প্রগতিমুখী মানসের আর একটা পরিচয় 'সোমপ্রকাশ' নামে একটি আধুনিক পত্রিকা প্রকাশে তাঁর প্রেরণায়।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রগুণ সম্পর্কে কয়েকটি মাত্র কথা বলায় কিছুই বলা হয় না। কী শিক্ষার ক্ষেত্রে, কী উপকার পাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য তিনি করেননি

এবং জাতিবর্ণভেদ বা সম্প্রদায় ভেদকে তিনি মানেননি। প্রচলিত ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে তিনি ছিলেন নিতান্ত উদাসীন। নারীর জন্য, আর্তদুঃখীর জন্য তাঁর মমতা ও করুণার সমান্তরাল দৃষ্টান্ত আজও দেখা যায় না। আর তাঁর দয়া বা করুণা কেবল কথা বা উপদেশেই সীমিত থাকেনি। তা কার্যকরী প্রয়াসে সার্থক হয়েছে। মহাকবি মধুসূদন এ বিষয়ে তাঁর উচ্ছ্বসিত গুণগান করেছেন ইংরেজিতে ও বাংলায়। আর একদিকে, 'বজ্রের থেকেও কঠিন অন্যদিকে কুসুমের থেকেও কোমল'-এ দুই বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ এই দরিদ্র গ্রাম্য ব্যক্তিটির আত্মবিকাশের মধ্যে কীভাবে এসে সংলগ্ন হয়েছিল, তা ভেবে সকলেই বিস্ময়বোধ করেছেন। বস্তুত সবদিক দিয়ে এই আশ্চর্য মানুষটি বাঙালীর চিরনমস্য হয়েই থাকবেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শকুন্তলা : গ্যেটে, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ

দেবীপদ ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্য তথা রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ ১৩১৪) 'শকুন্তলা' রচনাটি রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) পত্রিকায় ১৩০৯ সালে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক সম্পর্কে জর্মান কবিকুলগুরু গ্যেটের (১৭৪৯-১৮৩২) মন্তব্য উৎকলন করেছেন এইভাবে—

য়ুরোপের কবিকুলগুরু গ্যেটে একটিমাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই। তাঁহার শ্লোকটি একটি দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়। তিনি এক কথায় বলিয়াছেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের এই উক্তিকে একটি সাধারণ প্রশস্তি রূপে গ্রহণ করেননি। তিনি এই মন্তব্যের বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন এবং তাঁর মতে—

কবি বিশেষ ভাবেই বলিয়াছেন, শকুন্তলার মধ্যে একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে সে পরিণতি ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি। [শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী (বিশ্বভারতী)]

এরূপ তাৎপর্যবহ ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন সম্ভব হয় না। তিনি তন্ময়পন্থী বা অব্জেক্টিভ সমালোচনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি মূলত মন্ময়পন্থী বা সাব্জেক্টিভ সমালোচনার পক্ষপাতী, যার সমর্থক ছিলেন ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪)। রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের উক্তির অন্তর্নিহিত ভাবটি যে-ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তদনুযায়ী তিনি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম'-এর এক মহত্তর অনবদ্য ভাষ্য রচনা করেছেন।

অধিকাংশ বাঙালী পাঠক এই ধারণা পোষণ করেন যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম শকুন্তলা-সম্পর্কিত গ্যেটের এই উক্তিটিকে ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে স্বীকার করতে হবে, বাঙালীদের মধ্যে এ কৃতিত্বের প্রথম অধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৮৫৩) 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্ন-উদ্ধৃত মন্তব্য করেন—

নানা বিদ্যাবিশারদ, অশেষ দেশ ভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম্ জোন্স শকুন্তলা পাঠ করিয়া এমন প্রীত হইয়াছিলেন যে কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি শেক্সপিয়রের তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন ; এবং জর্মান দেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি গ্যেটে শকুন্তলার সর্ উইলিয়াম জোন্স কৃত ইংরেজী অনুবাদের ফর্ষ্টর্ কৃত জর্মান অনুবাদ পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে,

যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান শকুন্তল ! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি ; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল। ['সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব', ১৮৫৩ মার্চ। প্রবন্ধটি ১৮৫৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে পঠিত। প্রবন্ধটি ইংরেজিতে অনূদিত ও পঠিত হয়েছিল]

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে পঞ্চাশ বছর পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্যেটের এই শকুন্তলা-প্রশস্তি উপস্থাপিত করেন প্রায় আক্ষরিকভাবে। শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয় নন, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ লেখক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৫ সালে বৈশাখ সংখ্যায় 'কালিদাস ও শেক্ষপীয়র' নামে যে তুলনামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন সেখানেও গ্যেটের এই শকুন্তলা-প্রশস্তিটি দেখতে পাই। তিনি লিখেছেন—

সৌন্দর্য বর্ণনা ও যেখানে হৃদয়বৃত্তির জটিলতা, গভীরতা, সেখানে কালিদাস শেক্ষপীয়র হইতে অনেক ন্যূন। যে চরিত্রপাঠে মনের ঔদার্য্য জন্মে, যে চরিত্র অনুসরণ করিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার গল্পও কালিদাসের নাটকে নাই। তবে যেখানে সহজ অবিমিশ্র হৃদয়ভাবের বর্ণনা আবশ্যক সেখানে কালিদাসের বড়ই বাহাদুরী। কালিদাসের নাটক পড়িলে গ্যেটের সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা করে—"যদি কেহ বসন্তের কুসুম, শরতের ফল, স্বর্গ ও পৃথিবী একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলে তোমায় দেখাইয়া দিবে"। ['সাহিত্যসাধক চরিতমালা', সপ্তম খণ্ড, পৃ ৬০-৬১]

এ রচনাটি রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধের চব্বিশ বছর পূর্বে রচিত, যখন রবীন্দ্রনাথ সতের বছর বয়সের তরুণ। কাজেই রবীন্দ্রনাথের পূর্বে গ্যেটের শকুন্তলা-প্রশস্তির উল্লেখ করেছেন অন্তত দুজন বিখ্যাত বাঙালী মনীষী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এই সূত্রে একটি বহুজ্ঞাত তথ্যের পুনরুল্লেখ করা দরকার। ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানত তৎকালীন কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যর উইলিয়াম জোন্‌সের (১৭৪৬-৯৪) প্রযত্নে। তিনি প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী ছিলেন, সেজন্য বিস্মৃতপ্রায় প্রাচ্যবিদ্যার পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষায় অনূদিত তাঁর SACONTALA/or/THE FATAL RING ১৭৮৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। জোন্‌স ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, তিনি সংস্কৃত নাটক (Nàtac) সম্পর্কে একজন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ রাধাকান্ত (Radhacànt)-এর কাছে শোনেন, এবং ঐ ব্যক্তি ('who had long been attentive to English manners') তাঁর সকল সংশয় দূর করেন। রাধাকান্তের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন সংস্কৃত ভাষায় শ্রেষ্ঠ নাটক হল কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'। জোন্‌স সত্বর ঐ নাটকের একখানি পাণ্ডুলিপি-পুথি সংগ্রহ করেন এবং তাঁর সংস্কৃত শিক্ষক রামলোচনের সহায়তায় নাটকটির অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমে প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের ল্যাটিন প্রতিশব্দ বসিয়ে দেন এবং উপলব্ধি করেন সংস্কৃতের সঙ্গে ল্যাটিনের গভীর মিল ('bears so great a resemblance to Sanscrit')। সেই ল্যাটিন অনুবাদের আক্ষরিক ('word for word') ইংরেজি অনুবাদ করে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মনিয়র উইলিয়াম্‌স্-এর (১৮১৯-৯৯) মতে জোন্‌স হলেন 'শকুন্তলা'র প্রথম য়ুরোপীয় আবিষ্কর্তা 'the first European to discover'। জোন্‌স কর্তৃক অনূদিত শকুন্তলা-র জার্মান ভাষার প্রথম অনুবাদ করেন ফর্স্টর (১৭৫৪-৯৪)। তিনি বিখ্যাত পর্যটক ও আবিষ্কারক ক্যাপ্টেন কুক্-এর সহযাত্রী হন (১৭৭২-৭৫) তাঁর পিতার সঙ্গে।

তিনি লন্ডনে ১৭৯০ সালে জোন্স-কৃত অনুবাদ-গ্রন্থটি সংগ্রহ করেন ও জর্মান ভাষায় তার অনুবাদ করেন। প্রকাশক জে· পিটার ফিশার বইটি ১৭৯১ সালে মে মাসে প্রকাশ করেন। ১৭৯১ সালের ১৭ মে তারিখে ফর্স্টর তাঁর বই গ্যেটে, হার্ডার ও তাঁর শ্বশুর মহাশয়কে একই সঙ্গে পাঠান। অবশ্য শীলার, যিনি এই অনুবাদ-গ্রন্থটি চূড়ান্ত প্রকাশের পূর্বেই দেখেছিলেন, তিনি ১৭৯০ সালে তাঁর পত্রিকা *Thalia*-য় অংশবিশেষ প্রকাশ করেন। হার্ডারও শীলারের ন্যায় অভিভূত হন 'শকুন্তলা' পড়ে। তিনি ফর্স্টরকে লেখেন যে শকুন্তলা 'প্রাচ্যের নিজস্ব খাঁটি ফুল ; এবং এই প্রথম, সুন্দরতম প্রকাশ। এ ধরনের সৃষ্টি পৃথিবীতে দুহাজার বছর অন্তর একবার করে ঘটে'।

তিনি উৎসাহিত হয়ে 'শকুন্তলা' সম্পর্কে লিখলেন—

Wo Sakontala lebt mit ihrem entschwundenen Knaben
Wo Duschmanta sie nü, neu von den Göttern empfängt
Sei mir gegrüsst, O heiliges Land und du Führer—der—Toene·
Stimme des Herzens, erheb oft mich in Ather dahin.
(Walter Lifer, *The German Sakuntala Experience, India and the Germans*, Sakuntala Publishing House, 1971)

এর ইংরেজি অনুবাদ—

Where Sakontala lives with her banished boy
Where Dusmanta receives her anew, anew from the Gods,
Hail to thee, O holy land, and thou, leader of Sounds,
Voice of the heart, uplift me often thither through
Celestial Space.

কবি-মনীষী গ্যেটে আগ্রহভরে গ্রন্থটি পাঠ করেন এবং তাঁর হৃদয়ের সেই অলৌকিক আনন্দের ভার নিম্ন উদ্‌ধৃত শ্লোকে উদ্‌বারিত করেন—

Will ich die Blumen des frühen
die Fruchte des späteren jahres,
Will ich, was reizt und entzückt
Will ich was Sättigt und nährt,
Will ich den Himmel, die Erde mit
Einem Namen begreifen,
Nenn ich Sakontala, dich, und
So ist alles gesagt. (Goethe, *Werke*, Sophien—
Ausgabe, 1, 4, 22)

হার্ডারের নির্দেশে পরে গ্যেটে 'ich' স্থলে 'du', অর্থাৎ 'আমি' স্থলে 'তুমি' বসিয়ে·দেন। এই প্রশস্তি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৯১ সালে *Deutsche Monatsschrift* নামক পত্রিকায়। অবশ্য মনিয়র উইলিয়াম্‌স্ তাঁর সম্পাদিত ও অনূদিত 'Sakoontala'-র ভূমিকায় (১৮৫৩) গ্যেটের শকুন্তলা-প্রশস্তির পরবর্তী পাঠ উপস্থাপিত করেছেন—

Willst du die Blüte des frühen,

die Früchte des späteren jahres
Willst du was reizt und entzückt,
Willst du was sättigt und nährt,
Willst du den Himmel, die Erde mit
Einem Namen begreifen—
Nenn ich Sakontala, dich, und
So ist alles gesagt. (Monier Williams, *Sakontala or The Lost Ring*, 1853)

মনিয়র উইলিয়াম্‌স্‌ এইভাবে পঙ্‌ক্তিগুলির ইংরেজিতে অনুবাদ করেন :

Wouldst thou the young year's
blossoms and the fruits of its decline
And all by which the Soul is
Charmed, enraptured, feasted, fed ?
Wouldst thou the earth and heaven
itself in one sole name combine ?
I name thee, O Sakontala ! and
all at once is said.

রবীন্দ্রনাথ এই অনুবাদ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে লেখেন 'তরুণ বৎসরের ফুল' ও 'পরিণত বৎসরের ফল'। কিন্তু বিদ্যাসাগর ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েরা যখন লেখেন 'বসন্তের পুষ্প' 'বসন্তের কুসুম' এবং 'শরদের ফল' 'শরতের ফল' তাঁরা অর্থের অতিব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন, একথা বলা বোধ হয় যাবে না। গ্যেটের ঐ অমর পঙ্‌ক্তিগুলির অনুবাদ সম্পর্কে আমি শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করছি না। প্রথমে বলে রাখি শকুন্তলা-প্রশস্তির সন্ধান মেলে গ্যেটের কাব্য গ্রন্থাবলীতে। সেখানে কবিতাটি ইংরেজি অনুবাদে এইভাবে পেয়েছি—

SAKONTALA

Wouldst thou the blossms of spring
as well as the fruits of autumn,
Wouldst thou what charms and delights,
Wouldst thou what plenteously feeds,
Wouldst thou include both heaven and
earth in one designation
All that is needed is done,
When I Sakontala name.
Yesterday thy head was brown
as are the flowing locks of love ;
In the bright blue sky I watched thee
Towering, giant like above.

Now thy summit, white and hoary,
Glitters all with silver snow,
Which the stormy night hath shaken
From its robes upon thy brow ?
And I know that youth and age
Are bound with such mysterious meaning
As the days linked together,
One short dream but intervening.
(Goethe, *Poetical Works*, Vol. I, John C. Nimmoldt.
MDCCC III).

আমাদের প্রয়োজন অবশ্য প্রথম অংশটিকে নিয়ে। এখানে দেখছি অনুবাদক 'বসন্তের পুষ্প' ও 'শরতের ফল'ই রেখেছেন। নয়াদিল্লীস্থ ম্যাকসমুলর্ ভবনের প্রাক্তন ডিরেকটর Heimo Rau ঐ অংশের অনুরূপ অনুবাদ করেছেন—

Shall I embrace the blossoms of Spring
the fruits of the autumn
All that enchants and that charms,
all that nurtures and fills,
Shall I embrace in a name all heaven
and whole of the earth :
Call ; I ; Sokontala, thee—all is
composed in one name.

কাজেই দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ কৃত তিনটি অনুবাদই গ্রহণযোগ্য।

মনিয়র উইলিয়াম্‌স্ ১৮৫৩ সালে প্রবৃত্ত হন অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের পাণ্ডুলিপি পুথি মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য একটি সংস্করণ প্রস্তুত করতে ('to compile and publish an edition of the text of the Sakoontala from varions Mss')

ফরাসী ভাষায় প্রথম 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের সটীক অনুবাদ করেন আঁতোয়ান লেওনার্ দ্য শেজি (Chèzy, A. L. ১৭৭৩-১৮৩২)। তাঁর অনুবাদ ও টীকা—LA RECONNISSANCE/DE/SACOUNTALA/DRAME SANSCRIT ET PRACRIT/DE CALIDASA/PARIS 1830/(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত) শেজি ও গ্যেটের মৃত্যু একই বৎসরে ঘটে ১৮৩২ সালে। শেজি তাঁর গ্রন্থের আখ্যাপত্রে গ্যেটের 'শকুন্তলা'-প্রশস্তিটি মূল জর্মান ভাষায় উৎকলন করেছেন। ফরাসী ভাষায় কালিদাস-চর্চার সঙ্গে শেজির নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। অন্যান্য য়ুরোপীয় ভাষায় অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের বহু অনুবাদ হয়েছে। সে আলোচনা এখানে করা হল না।

বিদ্যাসাগরের সমাজ-চিন্তা

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

উনিশ শতক বাঙালীর ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড ভাঙা-গড়ার স্মরণীয় কাল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে-সংঘাতে এ দেশে যে আবর্ত সৃষ্টি হয়, তার মধ্য দিয়ে পুরানো বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়ে পুরানো বাংলা ধীরে ধীরে দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়, আবির্ভূত হয় নতুন বাংলা তার নতুন ধ্যান-ধারণা ও প্রত্যয় নিয়ে। এই জাগরণ প্রথম স্তরে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমিত থাকা সত্ত্বেও একে ইতালীয় মাপকাঠিতে যুগান্তকারী রেনেসাঁস বলতে কোনো বাধা দেখি না। প্রাচীনের অনুধাবন ও অনুসরণ (এমনকি অনুকরণ দিয়ে) এদেশে রেনেসাঁস শুরু হলেও এর বৈপ্লবিক সম্ভাবনাও কালক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ১৮১৫ সনে রামমোহন রায় স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাসের ত্রিশ বছর পূর্ব থেকেই (১৭৮৪-১৮১৪) এদেশে রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয় এবং ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরাই ছিলেন এই ভারতীয় রেনেসাঁসের অগ্রদূত[১]। রামমোহনকে এই রেনেসাঁসের প্রবর্তক বলে কেউ কেউ যে বর্ণনা করেছেন, তা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে টেঁকসই নয়। অথচ বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের সর্বতোমুখী প্রতিভার স্পর্শ লেগেছিল বাঙালী জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে। তিনি একাধারে রেনেসাঁসের ফলশ্রুতি, আবার রেনেসাঁসের বিরাট প্রেরণাদাতা ও চালিকা-শক্তিও। গতানুগতিক হিন্দু সমাজের অসার আচার-অনুষ্ঠানকে ভেঙে ফেলে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্মের সংস্কারের জন্য তিনি প্রচণ্ড বিক্রমে যে সংগ্রাম শুরু করেন তার ফল বাংলার ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। বাঙালী নারীজাতির মানবিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে তৎকালে এ দেশে তাঁর সমতুল্য ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। মূলত তাঁরই চেষ্টায় সতীদাহ বা সহমরণ আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছিল (১৮২৯)। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল শক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের দাপটের সামনে পরাভূত হয়। একদিকে খ্রীষ্টান পাদ্রিদের অন্যায় আক্রমণ, অন্যদিকে হিন্দু সনাতনীদের জীর্ণ ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকবার প্রবৃত্তিকে তিনি কঠোরভাবে আঘাত করেছিলেন এবং হিন্দু ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি আধুনিক মেজাজ নিয়ে হিন্দু ধর্মের যে যুগোপযোগী র‍্যাশানেলিস্ট (যুক্তিনিষ্ঠ) গড়ন দাঁড় করালেন তাই ব্রাহ্মধর্ম। এটা হিন্দু ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র ধর্ম কিছু নয়, এটা আসলে হিন্দু ধর্মেরই আধুনিক ও যুক্তিনিষ্ঠ বাঙালী গড়ন মাত্র। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করে (১৮৩০) রামমোহন বাংলায় সমাজ-বিপ্লবের রাজপথ রচনা করেছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা না হলেও এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি যে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন তা ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

---

১ হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার" (কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃ ৬৭-৭৪) পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য। ১৯৩৭ সনে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত *The Legacy of India* গ্রন্থে এ বিষয়ে বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে।

॥ ২ ॥

রামমোহনের মৃত্যুর পর (১৮৩৩) যে দিকপাল মনীষী বাঙালীর চলনে-বলনে-আচরণে-বিশ্বাসে সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন, তিনি হলেন মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ঈশ্বরচন্দ্র কিভাবে উনিশ শতকের বাংলায় শ্রেষ্ঠ সমাজ-বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তা ইতিহাসের এক বিস্ময়। কিশোর বয়সে ও যৌবনের প্রারম্ভে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কলকাতার বুকে কালাপাহাড়ী 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলন। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ঝলসে-যাওয়া চোখ দিয়ে এর সদস্যরা গোড়ার দিকে নির্বিচারে ভারতীয় ঐতিহ্যের সবকিছুকে অস্বীকার করে এক অদম্য আবেগ নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা, দীক্ষা ও কৃষ্টির অন্ধ অনুকরণে মত্ত হলেন। মাতলামির এই ঘোর প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই অল্পদিন পরে অপসারিত হয় এবং পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণপ্রিয় 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীভুক্ত ইংরেজী শিক্ষিত যুবকেরা তাদের হারানো আত্মসংবিৎ ফিরে পায়, অনাত্মের অস্তিত্বের সম্মুখীন হয়ে নিজের স্বরূপকে নতুন করে চিনতে শেখে। বিদ্যাসাগর এসব ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন, কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল' আবর্তের মধ্যে তিনি যৌবনে ঝাঁপ দেননি। তিনি আলাদা ধাতুতে গড়া ছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' থেকে তাঁর মেজাজ ছিল স্বতন্ত্র। রামমোহনের উত্তরসূরী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) ব্যক্তিত্ব থেকেও বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ছিল আলাদা।

॥ ৩ ॥

বিদ্যাসাগর যতটা ছিলেন বিদ্যার সাগর, তার চেয়েও অনেক বেশি ছিলেন দয়ার সাগর। এমন হৃদয়বান মানুষ উনিশ শতকে বাঙালীর ঘরে আর কেউ জন্মেছেন কিনা সন্দেহ, হয়তো এর একমাত্র ব্যতিক্রম পরবর্তীকালের স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। কুসুমের কোমলতা ও বজ্রের কঠোরতা দিয়ে গড়া ছিল তাঁর চরিত্র। নির্ভীক, তেজস্বী, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, উদারচেতা, হৃদয়বান এই মানুষটি তাঁর বিদ্যা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে বিগত শতকে আমাদের সমাজে যে সকল গঠনমূলক কর্মের অবতারণা করেন এবং জীবনের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে তাকে সার্থক করে তুলতে ব্রতবদ্ধ হন, ইতিহাসে তার তুলনা দুর্লভ। নব্য বাংলার যাঁরা শ্রেষ্ঠ রূপকার, তাঁদের মধ্যেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের আসন আজও অবিচলিত। ভাবে, প্রত্যয়ে ও কর্মে বিদ্যাসাগর একটা গোটা মানুষ ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে তিনি নিজের অন্তরে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শুধু হিন্দু শাস্ত্র-বেদ-বেদান্ত-ন্যায় ও সংস্কৃত সাহিত্য গুলে খেয়ে মানুষ হননি, পশ্চিমার সাহিত্য-দর্শন, যুক্তি, বিচার ও বিজ্ঞান তাঁর মাথায় ঢেলেছিল 'জীবনের ধাক্কা',—ব্যর্গসঁ-র "লেলাঁ দ্য লা ভী"। তিনি জন্মসূত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হলেও তাঁর জাগ্রত চেতনা মধ্যবিত্তের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি তৎকালীন বঙ্গ সমাজের যুগ-প্রতিনিধি হয়েও তিনি যুগের চিন্তাধারার গণ্ডিকে বহুদূর অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ডক্টর চিত্তব্রত পালিত বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে লিখেছেন, "It was his singular achievement that he did not run ahead of his people and times." তা তথ্যহীন ও অসার[২]।

---

২ ডক্টর পালিতের লেখা *New View Point on Nineteenth Century Bengal* (কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ ১২০) পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য। "Vidyasagar's greatest contribution to Bengal Renaissance was his personality" কথাটার অর্থ কি? বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগর থেকে কি আলাদা?

॥ ৪ ॥

বিদ্যাসাগরের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। তিনি শিক্ষাকে বৃত্তি হিসাবে নেননি, নিয়েছিলেন ব্রত হিসাবে। স্বনামধন্য স্বামী অভেদানন্দ (১৮৬৬-১৯৩৯) বিদ্যাসাগরের বহু কীর্তির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে লিখেছেন, তিনি ছিলেন "the most distinguished educationist and the greatest Hindu scholar of his time" অর্থাৎ সব থেকে খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু পণ্ডিত,—তা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়[৩]। বিদ্যাসাগর সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত, দুর্দশাগ্রস্ত হীনবীর্য জাতিকে শক্তি ও মনুষ্যত্বের উপর দাঁড় করাতে গেলে শিক্ষা ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) জাতি গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে যে সকল অনুপ্রাণিত উক্তি করেছেন ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন তার পূর্বসূরী হিসাবে বিদ্যাসাগর ইতিহাসে সম্বর্ধনাযোগ্য।

মাত্র আট বছর বয়সে বিদ্যাসাগর তাঁর পিতার সঙ্গে বীরসিংহ গ্রাম থেকে হাঁটাপথে কলকাতায় আসার সময় মাইলস্টোনগুলির ইংরেজী সংখ্যা চিহ্ন (1 থেকে 10) দেখে দেখে ইংরেজী অঙ্ক শিখে ফেলেন। এর কিছুকাল পরে বালক ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন সংস্কৃত শিখবার জন্য। ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত সময়টা হলো তাঁর শিক্ষাজীবনের প্রস্তুতিপর্ব। কলেজীয় শিক্ষান্তে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতার জন্য তিনি পণ্ডিত মশাইদের দ্বারা 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত হলেন। তদবধি তিনি ঐ বিশেষ নামেই জনপ্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে, ন্যায়ে, স্মৃতিতে ও ব্যাকরণে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন না, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকেও তাঁর মানস ছিল উদ্ভাসিত। ১৮৪১ থেকে শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগরের কর্মযজ্ঞের যথার্থ সূচনা। ১৮৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে সরকারি চাকরিতে তিনি প্রথম নিযুক্ত হন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত হিসাবে। এর প্রায় সাড়ে চার বছর পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারি পদে বহাল হন (এপ্রিল, ১৮৪৬) এবং এরও আবার পাঁচ বছর পরে (জানুয়ারি, ১৮৫১) তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অধ্যক্ষ হিসাবে সংস্কৃত কলেজে তাঁর আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র আট বছরের (জানুয়ারি, ১৮৫১—নভেম্বর, ১৯৫৮), কিন্তু এই স্বল্পপরিসর সময়ের মধ্যে তিনি স্বদেশবাসীর শিক্ষার স্বার্থে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেছিলেন। অর্থ নয়, হৃদয় ; রাজানুগ্রহ নয়, আত্মশক্তি ; গোঁড়ামি নয়, মুক্ত মন আর সুতীব্র দেশপ্রেম—এই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় মূলধন। সংস্কৃত কলেজে যোগদানের পর তিনি কলেজটিকে ঢেলে নতুন করে সাজালেন, শিক্ষা-ব্যবস্থায় ও পাঠক্রমে পরিবর্তন আমলেন এমনভাবে ও দ্রুতগতিতে যাতে এই কলেজের ছাত্ররা নতুন যুগের উপযোগী 'বিশ্বদৃষ্টি' লাভ করতে পারে। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র চর্চায় শুধু মশগুল থাকলে চলবে না, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের দস্তুরও তাদের পেটে পড়া দরকার। নতুন ভারতবর্ষ জেগে উঠবে কেবল প্রাচীনকে ভর করে নয়, নবীনকেও সাদরে বরণ করে। এই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনদৃষ্টি। এর একদিকে ছিল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে ছিল

---

৩ অভেদানন্দের *India and Her People* (কলিকাতা, ১৯৪০, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ১৯৭) দ্রষ্টব্য। এই আলোড়নকারী গ্রন্থখানির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল নিউইয়র্ক শহর থেকে ১৯০৬ সনে।

আন্তর্জাতিকতাবাদ। বস্তুত, রামমোহনের সময় থেকেই ভারতের জাগ্রত আত্মা এই দ্বিবিধ ধারায় বিবর্তিত হতে থাকে[৪]। সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমে ইংরেজীকে অবশ্য পঠনীয় বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে, অব্রাহ্মণদের সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং ছাত্রদের পাঠোপযোগী বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ—"উপক্রমণিকা" ও "ব্যাকরণ-কৌমুদী"—রচনা করে বিদ্যাসাগর এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তর সাধন করেছিলেন। এত সহজবোধ্য ভঙ্গিতে এ ধরনের সংস্কৃত ব্যাকরণ তাঁর পূর্বে বা পরে আর কেউ রচনা করতে পারেননি।

॥ ৫ ॥

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা-চিন্তা কলেজের মুষ্টিমেয় ছাত্রদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন বাংলায় গণশিক্ষার প্রথম প্রবর্তক যিনি সাফল্যের সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে বাংলা শিক্ষার প্রচলন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে বহুবিধ উপযুক্ত পুস্তক—"বোধোদয়" (১৮৫১), "বর্ণপরিচয়", ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৫৫), "কথামালা" (১৮৫৬) ইত্যাদি—নিপুণ হস্তে রচনা করেছিলেন। ইতিপূর্বে স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জের উদ্যোগে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় যে শতাধিক পল্লী-পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল বাংলা-শিক্ষা প্রচলনের জন্য, প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তকের ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তা প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন শিক্ষাব্রতী হিসাবে বিদ্যাসাগরের সুনাম সরকারি মহলে এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে বাংলার প্রথম ছোট লাট ফ্রেডারিক জে হ্যালিডে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের মতামতকেই সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিতেন। হ্যালিডে সাহেব ছোট লাটের পদে উন্নীত হবার অল্পদিন পূর্বে বড় লাটের গ্রহণার্থ যে শিক্ষাবিষয়ক মিনিট তৈরি করেন তার সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের লেখা এক সুদীর্ঘ তথ্য-ঠাসা মন্তব্য। বিদ্যাসাগরের ঐ মন্তব্যের বঙ্গানুবাদ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" পুস্তকে (ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৭৭/১৯৭০, পৃ ৪৮-৫১) প্রদত্ত আছে। ঐ মন্তব্য পড়লে পরিষ্কার বুঝা যায়, বঙ্গবিদ্যালয় প্রসঙ্গে ও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টি কত অসাধারণ ছিল। কোনো কোনো ব্যক্তির আপত্তি সত্ত্বেও ছোট লাট হ্যালিডে সাহেব কতকগুলি মডেল বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থান-নির্বাচনের দায়িত্বভার বিদ্যাসাগরের উপর অর্পণ করেন। বিদ্যাসাগর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করে বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বহুসংখ্যক মডেল বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ছোট লাটের সক্রিয় সমর্থনে সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন। বিদ্যালয় স্থাপন, তার পরিচালনা, পরিদর্শন, তার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সকল দিকেই তিনি অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করতে লাগলেন। সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষার স্বার্থে তিনি গত শতকের

৪বিনয় সরকার তাঁর *Creative India* (লাহোর, ১৯৩৭, পৃ ৪৫৯-৬০) গ্রন্থে এই "Double Quest of Modern India"-র পথপ্রদর্শক হিসাবে রামমোহন রায়কে যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা তথ্যনিষ্ঠ ও যুক্তিসঙ্গত। তিনি লিখেছেন, "Altogether, in Rammohun the jurist, economist, statesman and sociologist, we meet two personalities We encounter, on the one hand, the last representative of the *Smritir Niti*... tradition. On the other, the British socio-economic and politico-legal philosophies as embodied in the tradition of Bacon, Hume, Smith, Austin, Recardo and Bentham have found in him an able exponent for the Indian people."

পঞ্চাশের দশকে যে কর্মযজ্ঞ শুরু করেন, তার সঙ্গে তাঁর যে জনদরদ ও দেশপ্রেম মিশ্রিত ছিল তা বাংলার জাগরণের ইতিহাসে তুলনাবিহীন।

॥ ৬ ॥

নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি জানতেন সমাজের অর্ধাংশ নারী। এই অর্ধাংশকে পশ্চাতে রেখে ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আর যাই হোক দেশের প্রকৃত কল্যাণ কখনও সাধিত হতে পারে না। নারীশিক্ষার জন্য তিনি সমাজের প্রচলিত সকল বাধা-বিপত্তিকে ডিঙিয়ে যে সব মহৎ কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন তা তাঁর পক্ষেই ছিল সম্ভব। উনিশ শতকের গোড়ায় খ্রীষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে বাংলায় নারীশিক্ষার কিছু উদ্যোগ গৃহীত হলেও তার প্রধান ত্রুটি ছিল, ঐ শিক্ষা-ব্যবস্থায় মূল ঠাঁই পেয়েছিল খ্রীষ্ট ধর্ম। নিম্নবর্ণের কিছু সংখ্যক মেয়ে মিশনারি প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও এর বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা হিন্দু সমাজকর্তাদের বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। নতুন জাতি গঠনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নতুন শিক্ষা যা ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে হবে মুক্ত, যার প্রাণস্পন্দনে থাকবে ধর্মনিরপেক্ষ উদার (secular liberal) শিক্ষা। এই বিশেষ ক্ষেত্রে কলিকাতার সংলগ্ন বারাসতের বালিকা বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবজনক। সংস্কৃতি-সাধক ও গবেষক ডক্টর অজয়কুমার ঘোষ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর (কালীকৃষ্ণ মিত্রের) নাম বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের নামের সঙ্গে একযোগে উল্লেখযোগ্য। এমন কি বেথুন স্কুল (১৮৪৯) প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি বিদ্যাসাগর ও প্যারীচরণ সরকারের সহায়তায় বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় (১৮৪৭) প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয়"[৫]।

তখনকার দিনে নারীশিক্ষার ব্যাপারে সমাজের বাধা ছিল দুস্তর। পর্দার আবরণ ছিঁড়ে ফেলে নতুন জীবনের কলরবের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের টেনে আনা তৎকালে কি দুঃসাধ্য কাজ ছিল সমসাময়িক দলিল-পত্রে তার অজস্র স্বাক্ষর রয়েছে। বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের কপালে অকাল বৈধব্যযোগ অবধারিত,—এই বদ্ধমূল কুসংস্কারের শৃঙ্খল থেকে রক্ষণশীল সমাজকে মুক্ত করার জন্য বিদ্যাসাগরকে প্রচণ্ড লড়াই করতে হয়েছিল। নারীশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-৫৮ সনের মধ্যে (সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন অবস্থাতেই) বাংলার বিভিন্ন জেলায়—হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়ায়—৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কথিত আছে বালিকা-বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় ব্যাপারে তৎকালীন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনসের সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতবিরোধ উপস্থিত হলে বিদ্যাসাগর অনেকটা এ কারণেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দেন (নভেম্বর, ১৮৫৮)। অধ্যক্ষ পদ থেকে সরে দাঁড়ালেও তৎকালীন সরকারি শিক্ষাধিপতিরা নানা উপলক্ষে বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-গরিমার সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছেন এবং বিদ্যাসাগরও অকৃপণভাবে তাদেরকে নিজ বুদ্ধি, পরামর্শ ও অভিমত দিয়ে সাহায্য করেছেন।

---

৫ "সমকালীন", কার্তিক, ১৩৮৯, পৃ ৬২ দ্রষ্টব্য। সম্পূর্ণ বাঙালীর উদ্যোগে বারাসত বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *British Paramountcy and Indian Renaissance, Part II* গ্রন্থে (বম্বে, ১৯৬৫, পৃ ২৯০) এই প্রসঙ্গে ১৮৪৯ তারিখটি উল্লেখ করেছেন। তবে কলকাতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার (৭ মে, ১৮৪৯) পূর্বেই যে বারাসত বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

॥ ৭ ॥

বাংলায় নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেবের নামও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর প্রচেষ্টায় কলকাতায় যে "হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়" (৭ মে, ১৮৪৯) স্থাপিত হয়—সে বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ—তা এদেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ নারীশিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে বেথুন সাহেব এই বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করেছিলেন। খ্রীষ্ট ধর্মকে এর আওতা থেকে তিনি সজ্ঞানে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। প্রথম দিকে ষাটের বেশি এর ছাত্রী-সংখ্যা ছিল না। বিদ্যাসাগর প্রায় প্রথম থেকেই এই বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বহাল ছিলেন। প্রতিষ্ঠার দু বছরের মধ্যেই বেথুন সাহেবের অকালমৃত্যু ঘটলে (১৮৫১) এর তত্ত্বাবধানের মূল দায়িত্ব বর্তায় বেথুন-বন্ধু বিদ্যাসাগরের উপর। ১৮৬৯ সন অবধি তিনি ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তাঁর চেষ্টা ছিল বিরামহীন। প্রথম দিকে ঐ বিদ্যালয়টি ছিল বেসরকারি, লর্ড ডালহাউসির অবসর গ্রহণের পর এটি পুরোপুরি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। ঐ বিদ্যালয়ের বিবর্তনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কীর্তি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

॥ ৮ ॥

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের দান ছিল অসামান্য। সম্পূর্ণ বাঙালীর চেষ্টায় ও বেসরকারি উদ্যোগে তিনি উত্তর কলকাতার শঙ্কর ঘোষ লেনে যে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন (পরবর্তীকালের বিদ্যাসাগর কলেজ) স্থাপন করেন তা বাংলার উচ্চতর শিক্ষার ইতিহাসে তাঁর এক স্মরণীয় কীর্তি। আই· সি· এস্· চাকুরি থেকে বহিষ্কৃত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর এই প্রতিষ্ঠানেই ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্র ছিল না, এটা কালক্রমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটা বড় পীঠস্থানেও পরিণত হয়েছিল। বিশ শতকের উষালগ্নে বিদ্যাসাগর কলেজের দোতালার একটি ঘরে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে যে "ডন সোসাইটি" স্থাপিত হয় (জুলাই, ১৯০২), তা বহুল পরিমাণে স্বদেশী আন্দোলনের আত্মিক ভিত্তি রচনা করে[৬]। এই আন্দোলনের গুরুত্ব জাতীয় ইতিহাসে অনস্বীকার্য।

॥ ৯ ॥

সমাজ-সংস্কারক হিসাবেও বিদ্যাসাগরের নাম বাংলার রেনেসাঁসের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। নারী জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরও রামমোহনের মতো আপসহীন যোদ্ধা ছিলেন। পুরুষ-শাসিত সমাজের একজন হয়েও তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠেছিল নারীর দুঃখ-দুর্দশায়। যুগ যুগ ধরে ধর্ম ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ যেভাবে নারীর মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করেছে ও মানবিক অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে

---

৬ এই প্রসঙ্গে হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় প্রণীত *The Origins of the National Education Movement* (কলিকাতা, ১৯৫৭) ও "জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" (কলিকাতা, ১৯৬০) গ্রন্থ দুখানি দ্রষ্টব্য। বর্তমান লেখকের "বিনয় সরকারের বৈঠকে" গ্রন্থখানিতে (কলিকাতা, ১৯৪২) এ সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে।

রেখেছে তার প্রতিবিধান না করতে পারলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, এটা ছিল বিদ্যাসাগরের কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট। তাই তিনি নারীশিক্ষা ও নারীর অধিকার রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। রামমোহন সতীদাহ (স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় স্ত্রীর আত্মাহুতি) প্রথার বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং রক্ষণশীল সমাজের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সতীদাহ নিবারণী আইন ইংরেজ সরকারের দ্বারা পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন (১৮২৯)। লর্ড বেন্টিঙ্ক আইনের দ্বারা ঐ অমানবিক ও ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করে দেন।

সতীদাহ নিবারণী আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল-বিধবাদের সুস্থ সামাজিক জীবনে পুনর্বাসনের প্রশ্নও জরুরি হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর এই বিরাট সমাজ-সমস্যার মোকাবিলা করতে চাইলেন হিন্দু সমাজের একজন যুক্তিনিষ্ঠ, প্রগতিবাদী ও দরদশীল প্রতিনিধি হিসাবে। হিন্দু শাস্ত্র তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে তিনি সুস্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, হিন্দু শাস্ত্রকারগণই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহের অনুকূল অভিমত ব্যক্ত করেছেন। "মধু রে বহিবে বায় বেয়ে যাব রঙ্গে" এই নীতিতে এ দেশে নারী স্বাধীনতার আন্দোলন অগ্রসর হয়নি, বিলাতেও নয়। গোটা রক্ষণশীল সমাজের বিদ্রূপ ও আক্রমণের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে দৃঢ়চেতা বিদ্যাসাগর একদিকে শাস্ত্রীয় যুক্তি, অন্যদিকে পশ্চিমা মানবতাবাদের আদর্শ তুলে ধরে নিজ কর্মপন্থায় অবিচলিত থাকলেন। এজন্য কত লাঞ্ছনা ও বিদ্রূপ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। ১৮৫৪ সনে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম সন্দর্ভ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৫৫ সনে তাঁর বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত তথ্য ও যুক্তি-ঠাসা গ্রন্থ। মূলত বিদ্যাসাগরী এই গ্রন্থ এবং তৎকালীন মানবতাবাদ ও যুক্তিনিষ্ঠার আন্দোলনের উপর ভর করেই ইংরেজ সরকার বিধবা-বিবাহের আইন জারি করলেন। বাংলার প্রগতিবাদের এই কীর্তিস্তম্ভের প্রাণপুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। শুধু আইন পাশ করিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকলেন না, বিধবা-বিবাহের প্রচলনের জন্য তিনি নিজে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে চললেন। ১৮৫৬ সনের ৭ ডিসেম্বর উক্ত আইনের সাহায্যে বিদ্যাসাগরের নিজ তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় প্রথম হিন্দু বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল[৭]। হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। শুধু অন্যের বেলায় নয়, নিজের পরিবারের মধ্যেও তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচলন করেছিলেন। তাঁর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র এক বাল-বিধবাকে বিবাহ করে পিতার মুখ উজ্জ্বল করেন। এই পুত্রই যখন ভবিষ্যতে তার বিবাহিত স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাইলেন, ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্যাসাগর তাতে অসম্মতি জানালেন, তাঁর উইলে পুত্রবধূকে তাঁর নিজ সম্পত্তির অধিকার দিলেন, পুত্র হওয়া সত্ত্বেও নারায়ণচন্দ্রকে নয়। এই হচ্ছে বিশালপ্রাণ ও দৃঢ়চেতা বিদ্যাসাগরের সত্যকার রূপ। বিদ্যাসাগরের আর একটি স্মরণীয় কীর্তি ছিল 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ডে'র প্রতিষ্ঠা (১৮৭২)।

---

৭ এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ লিখেছেন, **"At his (Vidyasagar's) initiative and under his supervision the first lawful Hindu widow remarriage of our country was ceremoniously celebrated in Calcutta on 7 December 1856. He had to face the enmity of the entire orthodox Hindu community but he bore that with iron composure."** (অতুল গুপ্ত সম্পাদিত *Studies in the Bengal Renaissance*, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ ৫৪ দ্রষ্টব্য।)

বিদ্যাসাগর কত অজস্র ধারায় যে আমাদের ঐশ্বর্য দান করে গেছেন, তার পরিমাপ করা সহজ নয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যেও তাঁর দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! একটা জাতি যখন জেগে ওঠে সে আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক পথ নিজেই খুঁজে বের করে। বিদ্যাসাগর বাঙালী জাতিকে তার আত্মপ্রকাশের জন্য তার হাতে তুলে দিলেন এক বলিষ্ঠ ও কলানিপুণ বাংলা গদ্য। খ্রীষ্টান পাদ্রিদের ধর্ম-ঘেঁষা ও পাঠ্যপুস্তক-ঘেঁষা বাংলা গদ্যকে বহুদূর পেছনে ফেলে রামমোহন বিতর্কমূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বাংলা গদ্যকে প্রসারিত করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রামমোহনকে "বাংলা গদ্যের জনক" বলতে রাজি হননি বাংলা গদ্য সাহিত্যের গবেষক ডক্টর শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন "গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত সাধারণ লোকে রামমোহনকে 'বাংলা গদ্যের জনক' আখ্যায় অভিহিত হতে শুনে শুনে এখন ধরে নিয়েছে যে, তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যের নির্দিষ্ট একটা কাঠামো তৈরি করে দেন। ··· ভাষাগত উৎকর্ষের বিচারে আমরা বিদ্যাসাগরকে 'বাংলা গদ্যের জনক' বলতে পারি, রামমোহনকে নয়। মনীষী হিসাবে পূর্ববর্তী সব লেখকের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের হলেও তাঁদের তুলনায় রামমোহনের ভাষা তেমন ভালো ছিল না। তাঁর রচনায় প্রধান যে গুণ প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা এই যে, তিনিই বাংলা গদ্যকে যুক্তিতর্ক রূপায়ণের কাজে প্রথম সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করেন"[৮]। গত শতকে বাংলা গদ্যের 'সুঠাম দেহটি' তৈরির কাজে বিদ্যাসাগরের অবদান সবচেয়ে বেশি। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় দত্তের গদ্য রীতির তুলনামূলক আলোচনা করে শ্যামলবাবু তাঁর গবেষণা গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

"১৮৬৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক ও গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টা শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের অন্যতম বিদ্যাসাগর গদ্যভাষার অতুলনীয় কল্যাণ সাধন করেন। সাধু গদ্যের দেহ-সংস্থান পূর্ণাবয়ব করে তোলার ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে এটুকু বলা দরকার যে, তিনি সাধু গদ্য ভাষার শ্রেষ্ঠ রূপকার ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চেয়ে বড় স্রষ্টা সাহিত্যিক হলেও কেবল ভাষা-গঠনের কাজে সাধু গদ্য ভাষার ক্ষেত্রে কেউ তাঁকে আজ পর্যন্ত ছাড়াতে পারেন নি"[৯]।

অজস্র উদাহরণ, তথ্য ও যুক্তি দিয়ে শ্যামলবাবু তাঁর গ্রন্থে সাধু বাংলা গদ্যরচয়িতা হিসাবে বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্ব পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতামত নিশ্চয়ই তর্কাতীত নয়, তবু একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে সাধু বাংলা গদ্যের দৃঢ় কাঠামো তৈরি করতে বিদ্যাসাগরের একটা অনন্য ভূমিকা ছিল। তাঁর "বেতাল পঞ্চবিংশতি", "শকুন্তলা", "সীতার বনবাস" "ভ্রান্তিবিলাস" শতবর্ষেরও বহু পূর্বে রচিত হলেও এতে ব্যবহৃত তাঁর ভাষা-নৈপুণ্য আজও আমাদের মুগ্ধ করে। বহু কীর্তির অধিকারী বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন, "তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা।··· বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি

৮"বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ" (কলকাতা, চৈত্র, ১৩৬৬, পৃ ৯৮-৯৯) দ্রষ্টব্য।

৯"বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ", পৃ ১৩০ দ্রষ্টব্য।

দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।"[১০]

॥ ১১ ॥

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আজও যথার্থভাবে নিরূপিত হয়নি[১১]। তাঁর বিদ্যার যেমন পরিমাপ করা যায় না, তেমন তাঁর হৃদয়বত্তার। দুর্দশাগ্রস্ত সকল মানুষের তিনি ছিলেন শেষ সহায়। শুধু মাইকেল মধুসূদন দত্ত নহেন, তৎকালীন বঙ্গসমাজে এমন ব্যক্তি খুব অল্পই ছিলেন যিনি বিদ্যাসাগরের আর্থিক সহায়তায় বিপদমুক্ত হননি। তাঁর দয়া ও দাক্ষিণ্যের অন্ত ছিল না। গোটা জাতিকে তিনি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে প্রগতির রাজপথ ধরে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন[১২], কিন্তু যতটা চেয়েছিলেন ততটা পারেননি। সর্বস্ব দিয়ে যাদের তিনি উপকার করতে চেয়েছেন তারা অনেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু দমেন-নি। দুর্যোগের রাতে কাঁটার পথে চলার মতো তাঁর দুর্জয় সাহস ছিল। একাকিত্বের দুঃখবরণ আর একদিন জাতির জীবনে যে রক্তিম শতদল হয়ে ফুটবে এ বিশ্বাস তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে প্রচলিত হিন্দুধর্মের দেবদেবীকে এবং আচার-অনুষ্ঠানকে কখনও স্বীকার করেননি। তাঁর পিতামাতাই ছিলেন তাঁর কাছে জীবন্ত বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা। বেনারসে গিয়ে পাণ্ডাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করেননি। ধর্মচিন্তায়—যতদূর মনে হয়—তিনি ছিলেন "পজিটিভিস্ট" বা নিরীশ্বরবাদী। লোকহিত ও মানবসেবাই ছিল তাঁর জীবনের ধর্ম। লোকহিত সাধন করতে গিয়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উজাড় করে দিয়েছিলেন। স্বর্গত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মুখে শুনেছি, একবার এক ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি ভগবান মানেন?" উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "উনি যখন আমাকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি করছেন না, তখন আমারই বা কি দরকার ওনাকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি করা।" এই উক্তির মধ্যে বিদ্যাসাগরের ধর্মচিন্তা ও রসিকতাবোধ একই সঙ্গে পরিস্ফুট।

॥ ১২ ॥

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর শতবর্ষ অতিক্রান্ত। বহু ভাঙা-গড়া ও ওলট-পালটের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ গমন করেছে ও করছে। আমরা ঘটা করে বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-পূজা করেছি,

---

১০ রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, একাদশ খণ্ড, পৃ ৩৩১। শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৪ সনে বম্বের "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক ষষ্ঠ প্রবন্ধে যে লিখেছিলেন, "But Vidyasagar, though he had much in him of the scholar and critic, was nothing of an artist."—সেখানে লেখক বিদ্যাসাগরের গদ্য সাহিত্যের উপর সুবিচার করেননি।

১১ বদরুদ্দীন উমর "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ" (কলিকাতা, ১৯৮৮) গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের মূল্যায়নের একটি মহৎ প্রচেষ্টা করেছেন বলে আমাদের ধন্যবাদার্হ। বিদ্যাসাগরকে যাঁরা "Elusive Milestone" বলে বর্ণনা করেন তাঁরা ইতিহাসকেই বিকৃত করছেন।

১২ বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ ১৮৯৪ সনে "বঙ্কিমচন্দ্র" বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধে অত্যন্ত যথাযথভাবে মন্তব্য করেছিলেন, "Vidyasagar, scholar, sage and intellectual dictator, laboured hugely like the Titan he was, to create a new Bengali language and a new Bengali society. এত সংক্ষেপে বিদ্যাসাগরের এত সঠিক মূল্যায়ন আর কোথায়ও পাইনি।

কিন্তু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বাণীকে বাস্তবে রূপায়ণের তেমন কোনো চেষ্টা করিনি। তাঁর কাছে আমাদের জাতির ঋণ অপরিশোধ্য, কিন্তু আমরা সেই পিতৃঋণ কতটুকু শোধ করেছি? তাঁর রুচি, তাঁর শালীনতাবোধ, তাঁর দৃঢ়চিত্ততা, তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও হৃদয়বত্তা. তাঁর আদর্শবাদ ও যুক্তিনিষ্ঠ আচরণ নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই, কিন্তু নিজেদের আচরণে ও কর্মে এদের প্রতিফলনের ব্যাপারে আমরা বড়ই উদাসীন। বহুদিন পূর্বে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চরিত্র সম্পর্কে দুঃখ করে লিখেছিলেন, "আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না, আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনেব প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়বান, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন"[১৩]। আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কবিগুরুর যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক সত্য ভাষণ, আজও তার পরিবর্তনের বিশেষ কোনো হেতু দেখি না। বিদ্যাসাগরের প্রয়াণশতবর্ষে আমাদের নতুন করে সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে যে, বিদ্যাসাগরের স্তুতি কীর্তন করেই যেন আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন হলো বলে মনে না করি, আমরা যেন তাঁর দেশ-গড়ার আরব্ধ কাজকে কিছুটা অন্তত এগিয়ে দিতে পারি। 'বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি' বিদ্যাসাগর-বাঞ্ছিত নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সম্প্রতি যে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন তাই বিদ্যাসাগরের স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য। সেই সঙ্গে আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের স্বার্থে নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিঃসন্দেহে প্রয়োজন, কিন্তু তার থেকেও বেশি প্রয়োজন (সমাজের ভাঙন ও পচনের গতিকে রোধ করার জন্য) বিদ্যাসাগর-প্রদর্শিত বলিষ্ঠ জীবনবাদ ও সদাচারের অনুসরণ। এই প্রাথমিক অথচ শক্ত কর্তব্যটিকে অবহেলা করে আমরা দেশ-পুনর্গঠনের কথা যতই বলি না কেন সবই হবে নিষ্ফল আয়োজন। বিদ্যাসাগরের জীবনের সার শিক্ষাই হলো,আমাদের ভাগ্যকে আমাদেরই গড়তে হবে মহৎ আদর্শকে সম্বল করে নিজেদের জ্ঞানের দ্বারা, শক্তির দ্বারা ও কর্মের দ্বারা। জাতীয় আত্মশক্তির উদ্বোধনই রেনেসাঁসের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। বিদ্যাসাগর ছিলেন সেই আত্মশক্তি, যুক্তিযোগ, মানবতাবাদ ও কর্মনিষ্ঠার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। একালের মানদণ্ড দিয়ে আমরা যেন তাঁর বিচারের প্রহসন না করি। সে যুগের প্রগতিশীল চিন্তাধারার মাপকাঠিতেই তাঁকে বিচার করতে হবে এবং ইতিহাসের আলোকে দেখা যাবে তিনি উনিশ শতকের বাংলার শ্রেষ্ঠ রূপকার ও গঠনকর্তা ছিলেন।

১৩ রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, একাদশ খণ্ড, পৃ ৩৪৮

বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন?

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগরের তিরোধানের প্রায় আশী বৎসর পরে তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জল্পনার হেতু ও তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন। মানবপ্রেমে আকণ্ঠমগ্ন দেশহিতব্রতী বিদ্যাসাগর আজ দেবমূর্তিতে পরিণত হয়েছেন। একাধিক স্থলে তাঁর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর আসল অধিষ্ঠান মানুষের চিত্তলোকে। জ্ঞান, কর্ম, প্রেম পৌরুষের এমন সমন্বয় একব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, গ্রামীণ সংস্কারবিজড়িত পটভূমিকায় লালিত হয়ে এবং সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ঐতিহ্যানুসারী শিক্ষাদীক্ষার অনুশীলন করে তিনি যে কীভাবে বিশুদ্ধ মানবপ্রেম, লোকহিতৈষণা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় মানবতাবাদের অনুরূপ মানুষের কল্যাণচিন্তা নিজের অন্তর্লোকে স্থাপন করলেন, সে এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

সে যুগে বিদ্যাসাগরকে কী দৃষ্টিতে দেখা হত, তার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। তাঁর জীবিতকালেই তাঁর ছবি ছাপিয়ে বিক্রয় করা হত, এবং তা বাঙালীর ঘরে ঘরে স্থানলাভ করেছিল—সে-যুগে আর কোনও বাঙালী জননায়কের এ সৌভাগ্য ঘটেনি। তাঁর অসাধারণ কর্মনৈপুণ্য, করুণাঘন মানবকল্যাণব্রত এবং অনমনীয় পৌরুষ সে যুগেই তাঁকে বাঙালী ও শ্বেতাঙ্গ সমাজে বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল। তাঁর সম্বন্ধে কত গল্পকাহিনী কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও অনুরাগীরা তাঁর সম্বন্ধে পরবর্তীকালে অনেক ছোট-বড় স্মৃতিকথা লিখে গেছেন। তা থেকে তাঁর একটি দিক সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক নতুন দৃষ্টিলাভ করতে পারেন। সেটি হল তাঁর ধর্মমত, ঈশ্বরসত্তা ও পারমার্থিক চেতনা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান-বিশ্বাস।

তাঁর জীবিতকালে যেমন তাঁর ভক্তসংখ্যার সীমা ছিল না, তেমনি আবার কেউ কেউ অন্তরালে তাঁর সমাজসংস্কার-সংক্রান্ত মতামত নিয়ে কিছু কিছু সমালোচনাও করতেন। হিন্দুর অনেকগুলি সযত্নলালিত সামাজিক আচার-আচরণকে বিদ্যাসাগর মানবপ্রেম ও করুণার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং বিধবাবিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহের বিরোধিতা দ্বারা নিজ অন্তরশায়ী অগ্নিগর্ভ পৌরুষের দিব্যালোকে অর্থহীন, মূঢ় ও নির্মম সমাজ-প্রকরণকে অযৌক্তিক, ঘৃণার্হ ও বিনাশযোগ্য প্রমাণ করেছেন। সংস্কার এমন গভীরভাবে যুগযুগান্ত ধরে আমাদের সত্তাকে আচ্ছন্ন করে থাকে যে, প্রাজ্ঞজনও সেই সমস্ত অভ্যস্ত আচার-আচরণের নাগপাশে জড়িত হয়ে কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হন। বিদ্যাসাগর তারই বিরুদ্ধে যে-অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, তা শুধু 'ইয়ং বেঙ্গল' বা নব্য শিক্ষিতজনের পশ্চিমঘেঁষা 'রিফর্মেশন' নয়। তিনি যুক্তির চেয়ে মানবপ্রেমের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়ে এবং নারীর অশ্রুমোচনের সংকল্পে অটল থেকে মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো বীরবিক্রমে অগ্রসর হয়েছেন। প্রেম ও করুণাই তাঁর সমগ্র চেতনাকে অধিকার করেছিল বলে তিনি অতি সহজেই সংস্কার ত্যাগ করে নিরঞ্জন সত্যকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন—যেরকম অনুরাগ ও মমতার সঙ্গে জননী তাঁর সন্তানকে অঙ্কে ধারণ করেন।

তবু প্রশ্ন উঠেছে, সে-যুগেও উঠেছিল—বিদ্যাসাগর কি প্রচলিত হিন্দু-মতাদর্শানুসারে ঈশ্বরবিশ্বাসী আস্তিক্যবাদী পুরুষ ছিলেন? বাহ্যতঃ তিনি রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের কোন কোন

আচার-আচরণ সম্বন্ধে কিছু উদাসীন ছিলেন; উপরন্তু যে-সমস্ত পুরাতন সংস্কারের উপর আঘাত হেনেছিলেন সেগুলি ছিল সনাতনপন্থী হিন্দু-সমাজের প্রাণের সামগ্রী। সুতরাং তাঁর জীবিতকালেই তাঁর ধর্মমত নিয়ে আড়ালে-আবডালে অনেক আলোচনা হত। ছদ্মনামে লেখা তাঁর 'ব্রজবিলাস'-এ তিনি বলেছেন যে, সেযুগের সমাজপতিরা তাঁকে গোপনে খ্রীষ্টান অপনাম দিয়ে নিন্দা করতেন। কারণ তিনি হিন্দুর সামাজিক সংস্কারগুলিকে সর্বদা শিরোধার্য করতেন না।[১]

বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলে প্রথম প্রচার করেন তাঁর শিষ্য ও অনুরাগী আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। বিদ্যাসাগরের তিরোধানের বহুকাল পরে কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন :

"বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারাও কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না।... পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাব বন্যায় এদেশের ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল, চিরকাল পোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?"[২]

বিদ্যাসাগর জীবনীকার বিহারীলাল সরকার ('বিদ্যাসাগর') এবং সুবলচন্দ্র মিত্র (Iswar Chandra Vidyasagar—Story of his life and works) রক্ষণশীল মনোবৃত্তিবশতঃ তাঁদের গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের কোন কোন সমাজসংস্কারেচ্ছার প্রশংসা করতে পারেননি। তাঁদের ধারণা, বিদ্যাসাগর প্রবৃত্তিমুখী পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে হিন্দুর নিবৃত্তিমুখী সনাতন সংস্কারে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। বিহারীলাল তো মুক্ত-কণ্ঠেই বলেছেন, "অধ্যাপকের বংশে জন্ম লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অসাধারণ দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি, হিন্দুধর্মের প্রতি তিনি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিলেন না কেন?... বিদ্যাসাগর কালের লোক।[৩] কালধর্মই তিনি পালন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে; হিন্দুধর্মে আঘাত লাগিয়াছে। ...নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর, উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবনসর্বস্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন।"[৪] বিদ্যাসাগর দয়া ও করুণার বশে হিন্দুর সনাতন ধর্মের অন্যথাচরণ করেছিলেন, এমনকি উপনয়নের পর সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্রও ভুলে গিয়েছিলেন।[৫] এর থেকে বিহারীলাল অনুমান করেছেন যে, বাল্যকাল থেকেই হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস কিছু শিথিল হয়ে গিয়েছিল। উত্তরকালে শ্বেতাঙ্গ-সান্নিধ্যে এসে তিনি হিন্দুর নিত্যকর্মের প্রতি কিছু উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন, এবং সেজন্য বিহারীলাল অনুযোগ করেছিলেন।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতে ('বিদ্যাসাগর' ১৮৯৫) এ-বিষয়ে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরের অতিশয় স্নেহভাজন ছিলেন। সুতরাং তাঁর মতামত তথ্যসঙ্গত বলে গৃহীত হতে পারে। তাঁর মতে—

"তাঁহার (বিদ্যাসাগর) আচার-আচরণ হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এইরূপ বোধ হয় যে, তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক ছিলেন। তবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস, সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোন-এক পদ্ধতির অধীন ছিল না। সূক্ষ্মতররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহার নিত্য-জীবনের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না অপর দিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের লক্ষণের পরিচয়ও কখনও পাওয়া যায় নাই।" ('বিদ্যাসাগর', পৃ ৫২০)

অর্থাৎ চণ্ডীচরণের মতে, বিদ্যাসাগর ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বোধ হয় সম্প্রদায় চিহ্নহীন

মধ্যপথ ধরেছিলেন। নৈষ্ঠিক হিন্দুর আচার-বিচারের প্রতি তাঁর যেমন খুব একটা আস্থা ছিল না, তেমনি অন্যদিকে 'রিফর্মড হিন্দু' অথবা প্রগতিশীল ব্রাহ্মমতের প্রতিও তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না।[৬]

স্বল্পকথায় বলতে গেলে বলতে হয়, হিন্দুধর্মের লোকাচারের প্রতি তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না, এমন কি স্মার্ত আচারের প্রতি প্রত্যক্ষতঃ প্রতিকূলতা না করলেও এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁর পুরো বিশ্বাস ছিল না। মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের ধর্মীয় কৃত্যের প্রতি আত্যন্তিক আকর্ষণ না থাকাই স্বাভাবিক। একবার তিনি কৌতুকের বশে ভাটপাড়া-নিবাসী তাঁর কায়স্থ-বন্ধু অমৃতলাল মিত্রের অন্নের থালা থেকে কাড়াকাড়ি করে মাছের মুড়ো খেয়েছিলেন; এজন্য ভট্টপল্লীর ভট্টাচার্যগণ তাঁর উপর বিরূপ হয়েছিলেন বলে শোনা যায়।[৭] এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও স্মৃতিসংহিতার আলোচনার মধ্যে ডুবে থাকলেও দৈনন্দিন আচার-বিচারে ঠিক স্মার্ত পণ্ডিত বা শাস্ত্রযাজী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না। ধর্মকর্ম সংস্কার প্রভৃতিকে তিনি মানব কল্যাণের বাতায়ন থেকে দর্শন করতেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাই বলে তিনি ডিরোজিওর মন্ত্রশিষ্যগণের মতো হিন্দুধর্ম্ম ও আচারের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াননি। ব্রাহ্মণ সন্তানের যে সমস্ত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান মানা কর্তব্য, তিনি মনে মনে তার পোষকতা করুন আর নাই করুন, বাইরের দিকে তার অন্যথাচরণ করেননি—জনম-মরণাদি স্মার্ত ক্রিয়াকর্মেরও তিনি যথাবিধি অনুষ্ঠান করতেন; আজীবন উপবীতধারী ব্রাহ্মণই ছিলেন। চিঠিপত্রাদির শিরোদেশে শ্রীহরির নাম স্মরণ করতেন, জনকজননীর দেহান্ত হলে বিদ্যাসাগর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসন্তানের মতোই ঔর্ধ্বদৈহিক অনুষ্ঠান ও কৃচ্ছ্র-শৌচকর্মাদি নির্বাহ করেছিলেন। সুতরাং তিনি যে তৎকালীন ধর্মসংস্কারকদের মতো হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তা মনে হয় না। অভ্যাস ও সংস্কারের বশে তিনি বাহ্যতঃ হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান মানতেন, কিন্তু লোকাচার দেশাচারের সঙ্গে মানবধর্ম ও হৃদয়ধর্মের বিরোধ বাধলে মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর স্বচ্ছন্দে-লোকাচারকে নস্যাৎ করতে পারতেন।

তাঁর জীবনীকার ও অনুরাগী অন্তরঙ্গেরা তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে এমন দু-একটি মন্তব্য করেছেন যে, বাহ্যতঃ তাঁকে পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী বলতে দ্বিধা হয়। তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, তাঁকে নাস্তিক বলা না গেলেও সংশয়বাদী বললে সত্যের অপলাপ হবে না। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্টতঃ কোন মতামত প্রকাশ করে যাননি। তাঁর আত্মচরিত অসম্পূর্ণ রচনা। এটি সম্পূর্ণ হলে তাঁর অন্তর্জীবনের ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হতে পারত। শোনা যায়, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, ধর্ম, পরলোক, ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গূঢ় অভিমত তিনি প্রকাশ করতে আগ্রহী নন। একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। সেই সময়ে এ-বিষয়ে দুজনের মধ্যে কিছু আলাপ ও মতবিনিময় হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্মযোগী ও করুণাময় বিদ্যাসাগরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। উভয়ের সাক্ষাৎকার ও আলাপের কিছু নমুনা 'শ্রীম' "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" (৩য়) লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে নানা তত্ত্বকথার আলোচনা করে সর্বশেষে একটি গূঢ় প্রশ্ন করলেন :
(বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—"আচ্ছা তোমার কি ভাব? বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

বলিতেছেন, "আচ্ছা সেকথা আপনাকে একলা একদিন বলব।" (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য়, পৃ ১২, ১৩৭৪ সালের সং)
এই উক্তি থেকে মনে হচ্ছে, সকলের সম্মুখে বিদ্যাসাগর নিজের মনোগত গূঢ় কথা খুলে বলত চাননি। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্নটি অতি সহজ, সরল। তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যাখ্যা করছিলেন :
"তুমি যেসব কর্ম করছো এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।" (ঐ, পৃ ১৫)

তারপর তিনি বিদ্যাসাগরকে উপদেশ দিলেন :
"অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। আরো এগিয়ে যাও।" (ঐ, পৃ ১৫)
একথা বলার তাৎপর্য, নিষ্কাম কর্মযোগী বিদ্যাসাগর যেন উপায়কে লক্ষ্য ভেবে থেমে না যান। নিষ্কাম কর্ম হল উপায়, ঈশ্বরলাভই জীবের লক্ষ্য। আধারকে আধেয় ভাবলে সত্যদৃষ্টি স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য বিদ্যাসাগরকে বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য চিন্তিত করে তুলেছিল। বোধ হয় তিনি নিজের মানসসাগরতলে ক্ষণিকের জন্য ডুব দিয়েছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটি ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাই সকলের সামনে নিজের চিত্তপট মেলে ধরতে চাননি।

আর একবার নিজের গভীর প্রত্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন এইভাবেই এড়িয়ে গিয়েছিলেন। একদা কাশীধামে উপস্থিত হলে কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে এসে বলেন, "ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল।" তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, "আমার মত কাহাকে কখনও বলি নাই, তবে এই কথা বলি, গঙ্গাজলে যদি আপনার দেহ পবিত্র মনে করেন, শিবপূজায় যদি হৃদয়ের পবিত্রতা লাভ করেন তাহা হইলে তাহাই আপনার ধর্ম।"[৮] এখানে লক্ষণীয় যে, বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মানিসকতার উপর জোর দিয়েছেন এবং ব্যক্তিগত প্রবণতার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ যে যে-ভাবে খুশি আচার-আচরণ গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক প্রতীকতা বা ঈশ্বর-সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় নয়—তার উক্ত উপদেশের এই হল তাৎপর্য। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর-সংক্রান্ত তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা ও নিজস্ব বিশ্বাস প্রকাশে তিনি বিরত হয়েছেন। বিশুদ্ধভাবে নাস্তিক্যবাদী হলে বা ঈশ্বরচেতনায় তাঁর পুরোপুরি অনীহা থাকলে নিজস্ব ধারণা ও সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হবার পাত্র তিনি ছিলেন না। বস্তুতঃ ঈশ্বরচেতনা ও পারমার্থিকতা সম্বন্ধে তাঁর লেখনী-নিঃসৃত কোন ব্যক্তিগত অভিমত পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে তিনি অন্তরঙ্গদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যে সমস্ত আলোচনা করতেন এবং এখানে-সেখানে সে-সম্পর্কে যা বলতেন, তা থেকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটু আভাস পাওয়া যেতে পারে।

তাঁর 'বোধোদয়' সম্পর্কে একটা গল্প প্রচলিত আছে। জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তা প্রচার করেছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মচরিতের পরিশিষ্টে উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক তা স্বীকারও করেছেন। 'বোধোদয়'-এর প্রথম সংস্করণে নানা পার্থিব জ্ঞানের পরিচয় থাকলেও ঈশ্বর-সংক্রান্ত কোন কথাই নেই। থাকবার কথাও নয়; এখন যিনি পদার্থবিজ্ঞানে

বা অন্য কোন বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ লেখেন, তাতে কি তিনি পরম কারুণিক শ্রীভগবানের জয়ধ্বনি করেন? কিন্তু 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরের উল্লেখ নেই দেখে বিদ্যাসাগরের অনুরাগী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রশ্ন তুললেন, "মহাশয় ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোন কথা নাই কেন?"[৯] তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, "যাঁহারা তোমার কাছে ঐরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে বলিও, এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে, তাহাতে ঈশ্বরের কথা থাকিবেক।"[১০]

পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরবিষয়ক ক্ষুদ্র নিবন্ধ যোগ করে দেন।[১১] হয়তো তিনি বিজয়কৃষ্ণের কথায় মনে করেছিলেন, ঈশ্বর-বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত যাই হোক না কেন, পাঠ্যপুস্তক যথাসম্ভব নিঃস্পৃহভাবে রচনা করা উচিত। সাধারণ বালক-বালিকারা যেমন পদার্থজগৎ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করবে, তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধেও তারা কিছু কিছু জানবে, পাঠ্যপুস্তকের সেই রকম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই ভেবেই বোধ হয় তিনি বিজয়কৃষ্ণের মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কোন অনমনীয় প্রতিকূল ধারণা থাকলে তিনি বিজয়কৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করে ঈশ্বর-প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন না। কারণ যুক্তিবিরোধী বা তাঁর অভিমতের বিরুদ্ধ কোন কথা তিনি কিছুতেই মানতে পারতেন না, অন্তরঙ্গ জনের জন্যও না।

ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সম্পর্কে অনেকে অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু এককথায় এর মীমাংসা করা দুরূহ। নির্মম দেশাচারের তিনি ঘোর শত্রু ছিলেন। মানুষের দুঃখ দূরীকরণের জন্য তিনি অযৌক্তিক শাস্ত্রবচনকে তুচ্ছ করতে পারতেন, সেরকম দৃঢ় মনোবলের তিনি ছিলেন অমিত অধিকারী। মানবপ্রেম তাঁকে চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি উদাসীন করে তুললে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকবে না। নিজের উইলে বিদ্যাসাগর নানা হিতকর কর্মে অর্থ বরাদ্দ করে গেছেন বটে, কিন্তু দেবসেবা, মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্মে এক কপর্দকও ব্যয়ের নির্দেশ দেননি।[১২] পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী হলে এবং এতৎ-সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ পথের অনুবর্তন করলে, এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত বা নির্দেশ দিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে তিনি ভক্ত ও অনুচরদের সঙ্গে এ বিষয়ে যা দু'চার কথা আলোচনা করতেন এখানে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা যাচ্ছে :

"এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে না চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। লোককে বুঝিয়ে শেষটা কি ফ্যাঁসাদে পড়ে যাব? একতো নিজে কতশত অন্যায় কাজ করিয়া নিজের পাপের বোঝা ভারী করিয়া রাখিতেছি, আবার অন্যকে পথ দেখাতে গিয়া, তাহাকে বিপাকে চালাইয়া কি শেষটা পরের জন্য বেত খাইয়া মরিব? নিজের জন্য যাই হোক পরের জন্য বেত খেতে পারবো না বাপু। একার্য আমাকে দিয়ে হবে না। নিজে যেমন বুঝি, সেই পথে চলতে চেষ্টা করি, পীড়াপীড়ি দেখিলে বলিব এর বেশী বুঝিতে পারি নাই।"[১৩]

এই মন্তব্য থেকে বিদ্যাসাগরের পারমার্থিক তত্ত্ব সম্পর্কে মতামত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাতে তাঁর বিশেষ আস্থা নেই। ঈশ্বর-অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ক সাম্প্রদায়িক রীতিনীতিতে তাঁর বিশ্বাস নেই। এ বিষয়ে গুরু সেজে ধর্মপ্রচারের বা অপর কাউকে উপদেশ দানের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। এদিক থেকে মনে হচ্ছে, কীভাবে ঈশ্বর

লাভ করা যায়, অথবা আদৌ লাভ করা যায় কি না, সে বিষয়ে তিনি কোনদিনই সংশয়াতীত হতে পারেননি। তিনি যে ধর্ম-সংক্রান্ত প্রচারকর্মের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভক্তি পথে গিয়ে ধর্ম প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করলে বিদ্যাসাগর পরিহাস করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি নাকি কী একটা হয়েছ?"[১৪] কিন্তু এ সব উক্তি থেকে তাঁকে কোনমতেই নাস্তিক বলা যাবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরবিষয়ক তত্ত্বকথা এমনভাবে সংগুপ্ত যে, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যাবে না। অতএব অপরকে উপদেশ দেওয়াও অযৌক্তিক। তিনি যুক্তির আনুগত্যকে সার বলে মেনেছিলেন, তদতিরিক্ত পারমার্থিক চিন্তায় তাঁর আসক্তি ছিল না। বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম প্রচারণাকে তিনি পরিহাস করেছিলেন। তার কারণ, তাঁর মতে ঈশ্বর সাধনা একান্তভাবে ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার বস্তু—প্রচার বা বিতর্কের বিষয় নয়। হিন্দুদর্শনের তাত্ত্বিক দিকটি তাঁর নখদর্পণে ছিল, কিন্তু তার সাধনার দিক তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। অর্থাৎ ধর্ম ও দর্শনে তিনি নিঃস্পৃহ, বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন তাত্ত্বিক মাত্র ছিলেন, উক্ত বিষয়কে বুদ্ধির খোলামাঠ থেকে তুলে নিয়ে রহস্যানুগ সাধ্যসাধনার সুড়ঙ্গপথে প্রেরণে বিশেষ উৎসাহী হননি। এ বিষয়ে একবার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ("শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত"-এর সঙ্কলক 'শ্রীম') তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার হিন্দুদর্শন কেমন লাগে?" উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, "আমার ত বোধ হয়, ওরা যা বুঝাতে গেছে বুঝাতে পারে নাই।"[১৫] পরে মহেন্দ্রনাথ তাঁকে ঈশ্বর বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন, "তাঁকে ত জানবার জো নেই। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত, যাতে জগতের মঙ্গল হয়।" এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর খুব গভীর চিন্তার কথা স্বল্পাক্ষরে বলেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর বাক্‌পথাতীত, বাক্য ও মনের অগোচর। সুতরাং দর্শন গ্রন্থে ও তত্ত্বালোচনায় তাঁকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? তিনি যদি বাক্য-মনের অগোচর হন, তা হলে জীবের করণীয় কি? তার উত্তরে বিদ্যাসাগর বলবেন, জীবকেই ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করতে হবে, জীবহিতব্রতই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাই বিদ্যাসাগর নরসেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য নরের মধ্য দিয়ে নরোত্তমে যাওয়া যায় কিনা, অথবা তার প্রয়োজন আছে কিনা এ বিষয়ে তিনি অতিশয় মিতবাক্।

ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথের কাছে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে, তিনি হিন্দুদর্শনের সীমা সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন ছিলেন।[১৬] দর্শন মূলতঃ বুদ্ধি-আশ্রয়ী। সুতরাং ঈশ্বরানুভূতি বলে যদি কিছু থাকে, তবে সে বিষয়ে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা ও তত্ত্বদর্শন কতটুকু সাহায্য করতে পারে? এই বুদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তিনি বেদান্ত ও সাংখ্যকে ভ্রান্তদর্শন বলতেও কুণ্ঠিত হননি।[১৭]

একবার পুরীর সমুদ্রে ষ্টীমার ডুবির ফলে প্রায় সাত-আটশ' নরনারী বাল-বৃদ্ধ মারা যায়। এ সংবাদে মুহ্যমান হয়ে তিনি সক্ষোভে মন্তব্য করেছিলেন : "দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর যে, নানা দেশের নানা স্থানের অসংখ্য লোককে একত্রে ডুবাইলেন! আমি যাহা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হইয়া কেমন করিয়া ৭০০-৮০০ লোককে একত্রে ডুবাইয়া ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বালিয়া দেন। দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ? এই সকল দেখিলে কেহ মালিক আছেন বলিয়া সহসা বোধ হয় না।"[১৮] এখানে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর হৃদয় মানবপ্রেমে এতই পূর্ণ ছিল যে, করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে ঐ জাতীয় নির্মম ঘটনার কার্যকারণতত্ত্ব খুঁজে পেতেন না। প্রত্যক্ষ জীবনবাদী বিদ্যাসাগরের পক্ষে এরকম অভিমত প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। তবে মাঝে মাঝে ঈশ্বর বিষয়ে নানা প্রসঙ্গে তাঁর মনে সংশয়

জাগলেও[১৯] জনক-জননীকে তিনি দেবতা বলে গ্রহণ করেছিলেন, অন্ততঃ কাশীধামে পাণ্ডা-পুরোহিতের সঙ্গে বাগবিতণ্ডার সময়ে সেই অভিমতই ব্যক্ত করেছিলেন।[২০] তাঁর অভিমত থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ধর্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা সাধারণের নিকট প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন না, অর্থাৎ তাঁর ধারণা আর সাধারণের প্রচলিত ধারণা সম্ভবতঃ এক ছিল না বলেই তিনি নিজস্ব মতামত সম্বন্ধে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করেছিলেন। তবে কি তিনি পারমার্থিকতা সম্পর্কে সংশয়বাদী ছিলেন? এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন উত্তর পাওয়া কঠিন। ধর্মসাধনাকে তিনি নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রবণতার ব্যাপার বলে দেখেছিলেন, এবং চিত্ত প্রণালীর বাইরে পারমার্থিকতার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, এ বিষয়ে তিনি দৃঢ় নিশ্চয় ছিলেন। গঙ্গাস্নান, শিবপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কেউ যদি মনে করেন, এই-ই তাঁর ধর্ম সাধনা, তা হলে তাতেও বিদ্যাসাগরের আপত্তি নেই। ধর্মের 'সাধারণীকরণ' নয়, 'বিশেষীকরণে' তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

বিদ্যাসাগর পরলোক ও জন্মান্তর ব্যাপারেও সন্দিহান ছিলেন। ঈশ্বরতত্ত্বের সম্পর্কে তাঁর মনে মাঝে মাঝে সংশয় দেখা দিত. তিনি পরলোকতত্ত্বে যে ঘোর সংশয়ী হবেন তাতে আর সন্দেহ কি? একবার রাধাপ্রসাদ রায়ের (রামপ্রসাদের পুত্র) দৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর কিছু পরিহাস মিশ্রিত আলোচনা হয়েছিল। ললিতমোহন পরলোকতত্ত্বে বিশেষ আসক্ত ছিলেন তাই নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে কৌতুক পরিহাস করতেন। ললিতমোহন যোগমার্গেও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। একদা বিদ্যাসাগর ললিতমোহনকে স-পরিহাসে জিজ্ঞাসা করেন, "হাঁরে ললিত, আমারও পরকাল আছে নাকি?" ললিতমোহন বললেন, "আছে বৈকি, আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না ত' থাকিবে কার?"[২১] এই আলাপ থেকে মনে হচ্ছে, লোকান্তর সম্পর্কে তিনি কখনও গভীরভাবে চিন্তাই করেননি, উক্ত ব্যাপার তাঁর কাছে হাসির ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। বাস্তব জীবনের দুঃখবেদনা নিয়ে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন যে, পরলোকের আশ্বাস তাঁর কাছে কোনও সান্ত্বনার বাণী বহন করে আনেনি।

বিধবাবিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাঁকে পরবর্তীকালে অনেক মানসিক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। এমন কি এই ব্যাপারে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনও তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। ফলে শেষজীবনে মানসিক আঘাতে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। দেহে-মনে ক্লান্ত হয়ে তিনি মাঝে মাঝে কার্মাটারে গিয়ে সরলপ্রাণ সাঁওতালদের সাহচর্যে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করতেন। কারণ শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী শহুরে বাঙালীর অকৃতজ্ঞতা এবং নিকট আত্মীয়ের নষ্টামির ফলে তিনি অতিশয় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এমনকি, একসময়ে তিনি সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বনেও প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং সেকথা পিতা, মাতা, ভ্রাতৃগণ ও সহধর্মিণীকে জানিয়ে পত্রযোগে লিখেছিলেন : "নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। এ-জন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব।" (পিতার নিকট লিখিত পত্র)[২২] এখানে লক্ষণীয়—মানসিক বিপর্যয়ের সময়েও ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি কোন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেননি। এই রকম মনের অবস্থায় অনেকে গীতার 'যথা নিযুক্তোঽস্মি' বাণী অথবা রবীন্দ্রনাথের "সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি

লভিলে শুধু বঞ্চনা, নিজের মনে না জানি মানি ক্ষয়"—উক্তি অবলম্বনে জীবন রণাঙ্গনে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে শান্তি প্রলেপ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাধারণ ধাতুপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন না; তাই সে সান্ত্বনাও তাঁর ছিল না। তাঁর এই সময়ের চিঠিপত্রাদি থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁর দেহ ও মন ভেঙে পড়েছিল; পুত্র ও ভ্রাতাদের সঙ্গে মনোমালিন্য তাঁর মনঃকষ্টকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। কিন্তু পত্রাদির কোথাও তিনি ঈশ্বর-করুণার উল্লেখ করে মানসিক প্রদাহ নিবৃত্ত করতে চাননি।

সর্বশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। এইরূপ মানসিক যন্ত্রণার সময়ে তিনি অখিল-উদ্দীন নামে এক অন্ধ বাউলের দেহতত্ত্ববিষয়ক গান শুনতে ভালবাসতেন। এখানে তার দু'একটি উল্লেখ করি :

১। কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন করবে রে কে,
তুমি কোন্খানে খাও কোথায় থাকো রে মন অটল হয়ে,
কোথায় ভুলে রয়েছে।

২। তুমি আপ্নি নৌকা, আপ্নি নদী, আপ্নি দাঁড়ি,
আপ্নি মাঝি,
আপ্নি হও যে করণধারজী, আপ্নি হও যে নায়ের কাছি,
আপ্নি হও রে হাইল-বৈঠা।

৩। তুমি আপ্নি মাতা, আপ্নি পিতা,
আপ্নার নামটি রাখবো কোথা, সে নাম হৃদয়ে গাঁথা
আমার গোঁসাইচাঁদ বাউলে বলে, সে নাম ভুলবো না রে
প্রাণ গেলে।

৪। তুমি আপ্নি অসার, আপ্নি হও সার,
আপ্নি হও সে নদীর দু'ধার, আপ্নি হও নদীর কিনার,
আমি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই, সে নাম ভুলবো
নারে প্রাণ গেলে।

৫। আপ্নি তরো, আপ্নি আরা, আপ্নি জরা, আপ্নি মরা,
আপ্নি হও যে নদীর পাড়া, আবার আপ্নি হও সে
শ্মশানকর্তা গো,
আপ্নি হও সে জলের মীন, ও নিরঞ্জন, তোর
কোথায় সাকিম গো,
আমি ভেবে চিন্তে হলেম ক্ষীণ।[২৩]

শেষজীবনে বিদ্যাসাগর সত্যই কি পারের কাণ্ডারী নিরঞ্জনের ডাক শুনতে পেয়েছিলেন? গোঁসাইচাঁদ বাউলের মতো তিনিও কি আকুল আর্তনাদে জীবনের সায়াহ্ন-আকাশতলে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, "ও নিরঞ্জন, তোর কোথায় গো সাকিম!" রামেন্দ্রসুন্দরের কথা উল্লেখ করে বলতে পারি, এ-বিষয়ে চূড়ান্ত "মীমাংসা হইল না" ('জিজ্ঞাসা')। বিদ্যাসাগরের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে তাঁর চিত্তধাতুর গূঢ় রহস্য সন্ধান করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে, তাঁর হৃদয় মানবপ্রেমে কানায় কানায় ভরে উঠলে তিনি জীবের দুঃখ দেখে ভাবাবেগের বশে পরম কারুণিক ঈশ্বরের অস্তিত্বে ক্ষণিকের জন্য সন্দিহান হয়ে পড়তেন, হৃদয়ই তখন তাঁর সমস্ত চিত্তপ্রবৃত্তি ও কর্মপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করত। কিন্তু পরে ভাবাবেগ প্রশমিত হলে তিনি শান্তচিত্তে যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে এ বিষয়ের যাথার্থ্য অনুসন্ধানের

চেষ্টা করতেন। কিন্তু অগুয়েস্ত্ কঁতের মতো তিনি নিছক তত্ত্ববাদী ছিলেন না, রামমোহনের মতো তাঁকে বলা চলবে না—"His cardinal principle was that service of man is the service of God."[২৪] মানবসেবাই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল কিন্তু তাকেই সোপান করে ঈশ্বর-সান্নিধ্য পৌঁছাবার সূক্ষ্মতম পন্থা আবিষ্কারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহনকে 'Theo-philanthropist' বলেছিলেন।[২৫] কিন্তু বিদ্যাসাগরের Philanthropy-তে কোন theos-এর সম্পর্ক ছিল না। মানুষের দুঃখ দূর করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তদতিরিক্ত কোন পুণ্যফল তিনি কামনা করতেন না। মানবপ্রেমই ঈশ্বরপ্রেমে উদ্বর্তিত হয়, একথা ভক্তিশাস্ত্র বলে। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহী বা কৌতূহলী ছিলেন না। তাঁর মতাদর্শ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন : "বিদ্যাসাগর সেই শাক্যমুনি-প্রদর্শিত বৈরাগ্য মার্গের ও কর্ম মার্গের পথিক ছিলেন।... তিনি যে মার্গে চলিতেন, তাহা আর্যশাস্ত্রসম্মত, মানবশাস্ত্রসম্মত সনাতন ধর্মমার্গ।" ('ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর') বিদ্যাসাগরের পন্থা বিশেষ কোন শাস্ত্রসম্মত অথবা বৈরাগ্য ধর্মাবলম্বী কিনা তাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম, মানববেদনার প্রতি অগাধ সহানুভূতি এবং মানবদুঃখ দূর করবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ তাঁকে বৈরাগ্যধর্মী করেনি, বরং তাঁর মানসশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি নাস্তিক ছিলেন কিনা তার যথার্থ উত্তর দেওয়া দুরূহ। কিন্তু তাঁকে নিশ্চয় বলা চলবে, "হে নাস্তিক, আস্তিকের গুরু।" মানুষই তাঁর ধর্ম, মানুষই তাঁর সাধনা, মানুষ তাঁর আধার এবং আধেয়। পাশ্চাত্য positivist দার্শনিকের মতো মানবতত্ত্বের নির্যাস নয়, মানুষের দুঃখদুর্দশাপূর্ণ কবোষ্ণ স্পর্শই তাঁর কাম্য ছিল। নরের মধ্যে নরোত্তম ও নারায়ণকে তিনি দর্শন করেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু নরদেহই তাঁর কাছে দেবমন্দির; নরদুঃখ লাঘবের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ তাঁর যজ্ঞহবিঃ। বিদ্যাসাগর পরম আস্তিক্যবাদী, কারণ তিনি মানববাদী। মানুষের চেয়ে অধিকতর অস্তিত্ববান্ আর কে?

পাদটীকা

১। "এমন কি পবিত্র সাধুসমাজের প্রাতঃস্মরণীয়, বহুদর্শী, বিচক্ষণ চাঁই মহোদয়েরা তাঁহাকে (অর্থাৎ বিদ্যাসাগরকে) খৃষ্টান বলিয়া থাকেন।"—ব্রজবিলাস (দেবকুমার বসু সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৫৯৩)

২। বিপিনবিহারী গুপ্ত সংকলিত 'পুরাতন প্রসঙ্গ', পৃ ১৩১-৩২, (বিদ্যাভারতী প্রকাশিত নতুন সংস্করণ)

৩। সুবলচন্দ্র মিত্রও এই মতের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, "Vidyasagar was a man of the age; he followed the course indicated by it. No doubt this course has brought on a greater mischief to the real Hindu,has materially injured Hindu Religion, has propelled the Hindu Society with great force in the direction of disorganisation; but Vidyasagar ought not to be blassed for it. God alone, who made him with such materials, knows why he did so.";Iswar Chandra Vidyasagar—Story of his life and works, p. 275

৪। এই প্রসঙ্গ তিনি আর একবার উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ৭৪ পৃ দ্রষ্টব্য।

৫। চণ্ডীচরণ ('বিদ্যাসাগর', ১ম সং, পৃ ৪৮) এবং শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন

('বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত', বুকল্যাণ্ড প্রকাশিত নতুন সংস্করণ, পৃ ৩০) এ বিষয়ে একই কথা বলেছেন।

৬। চণ্ডীচরণের মতে প্রথমদিকে বিদ্যাসাগর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, "কিন্তু নানাপ্রকার মতভেদনিবন্ধন যখন অপ্রিয় সঙ্ঘটন হইতে লাগিল, তখন আর সেই সকল গোলযোগের মধ্যে থাকিয়া অশান্তি বৃদ্ধি করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। ব্যক্তিগত মতবিভিন্নতার অত্যধিক প্রবলতা দেখিয়া আস্তে আস্তে বিদায় হইলাম" (বিদ্যাসাগরের উক্তি)—বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৫২০

৭। দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা, পৃ ১৯

৮। বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর। ৪র্থ সংস্করণ, পৃ ৪৮৬

৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৫২১

১০। ঐ, পৃ ৫২১

১১। বিদ্যাসাগর উক্ত অনুচ্ছেদে "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ" এই মন্তব্য যোগ করেন। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর সম্পাদকের মতে, ১৮৪১ সালের এক বক্তৃতায় মহর্ষি ঈশ্বরবিষয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁর 'বোধোদয়ে' সেটি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর 'বোধোদয়'-এর নানা সংস্করণে ঠিক এই ধরনের মন্তব্য নেই। মনে হয়, গ্রন্থ সম্পাদনা কালে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র কিছু কিছু পাঠ সংস্কার করেন। অবশ্য ঐটি ছাড়াও 'বোধোদয়' ও 'আখ্যান মঞ্জরী'-র (৪র্থ) একাধিক স্থলে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে। সুতরাং নাস্তিকের মতো ঈশ্বরের নাম শুনলেই তিনি 'উদ্যত মুষল' হতেন না এ একপ্রকার সুনিশ্চিত।

১২। চণ্ডীচরণের ঐ গ্রন্থ, পৃ ৪৩৫-৩৭

১৩। ঐ, পৃ ৫২০-২১

১৪। চণ্ডীচরণ, ঐ, পৃঃ ৫২৩

১৫। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয়

১৬। ১৮৫০ সালে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক থাকাকালীন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন সম্পর্কে শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক মেইয়াট সাহেবকে যে রিপোর্ট পাঠান, তাতে স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছিলেন, "True it is that the most part of the Hindu system in philosophy do not tally with the advanced idea of modern times," তাঁর মতে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা ইংরেজী শিখলে হিন্দুদর্শনের ভুলত্রুটিগুলি লক্ষ্য করতে পারবে, "Young men thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy." পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনায় প্রাচীন হিন্দুদর্শন যে আধুনিক ভাবধারার ততটা উপযোগী নয় এবং এতে অনেক ভুলত্রুটি আছে এ বিষয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ করতে বিদ্যাসাগর কুণ্ঠিত হননি।

১৭। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে ব্যালান্টাইনের সংস্কৃত কলেজের পাঠসংস্কার সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর লেখেন যে, কতকগুলি বিশেষ কারণে তিনি সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন পড়াচ্ছেন বটে, কিন্তু এই দুই দর্শন-প্রস্থান সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোন আস্থা নেই—"For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College. That the Vedanta and Sankhya are false system of philosophy is

no more a matter of dispute."

১৮। **চণ্ডীচরণের ঐ, পৃ ৫২২**

১৯। **এ-বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন্তব্য স্মরণীয় : "স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কিরূপ আস্থা ছিল জানি না; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান জীবন্ত দেবের তুষ্টির জন্য আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পর্যন্ত বলিদান দেওয়া সময়বিশেষে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন।" —'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', পৃ ১৮-১৯**

২০। **একবার বিদ্যাসাগর কাশীধামে গিয়ে মন্দিরের পুরোহিত-পাণ্ডাদের মুক্তকণ্ঠে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের কাশী বা বিশ্বেশ্বর মানি না।" ব্রাহ্মণেরা সক্রোধে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি মানেন?" তার উত্তরে তিনি সম্মুখে উপবিষ্ট জনকজননীকে দেখিয়ে বলেন, "আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।"—বিহারীলাল সরকার—বিদ্যাসাগর, পৃ ৪৮৬**

২১। **পুরাতন প্রসঙ্গ (বিপিনবিহারী গুপ্ত সঙ্কলিত, কৃষ্ণলালের উক্তি), বিদ্যাভারতী প্রকাশিত নতুন সংস্করণ, পৃ ১৩১**

২২। **চণ্ডীচরণের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫২৪**

২৩। **চণ্ডীচরণের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ৫২৪**

২৪। Sibnath Sastri—History of Brahmo Samaj, Vol. 1. P. 79

২৫। Calcutta Review, 1845

শুধু সমকালের নয়, সর্বকালের

অরবিন্দ পোদ্দার

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একদা বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায়' দাঁড়িয়ে আছে ; পারিপার্শ্বিকের ক্ষুদ্রতার কোনও সাধ্য নেই যে তাকে স্পর্শ করে। এই উক্তির মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগর মূল্যায়নের একটি চিত্র পাওয়া যায় ; এই চিত্রকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে আমাদের কাল অবশ্যই কুণ্ঠিত। আমাদের কালে, বিশেষ করে, সত্তরের দশকে, আমরা তাঁর মূর্তিকে খণ্ড বিখণ্ড হতে দেখেছি, বিক্ষুব্ধ হয়েছি তাঁর মুণ্ডচ্ছেদনের বিসদৃশ কার্যকলাপে।

তবুও, ওই মূর্তি ভাঙার অশোভনতার মধ্যেও সম্ভবত কিছুটা তাত্ত্বিক বিচার ছিল। সে বিচারের এক দিক—সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ঔপনিবেশিক মনোভঙ্গিকে অস্বীকার ; অপর দিক, সমাজপ্রগতির সংগ্রামে ঐতিহ্যকে বিলকুল খারিজ করা। এ প্রসঙ্গের অবতারণার পক্ষে যুক্তি এই যে, ঐতিহ্যের প্রশ্নটিকে সম্মুখে রেখে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যায়। কারণ, প্রচলিত সংস্কার ও ঐতিহ্য আশ্রিত দরিদ্র এক পরিবারের সন্তান হয়ে, পিতৃকুল ও মাতৃকুলের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে, যাঁর কথা ছিল গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করার, তিনিই সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে ঐতিহ্য ও প্রথাবিরোধী বিপুল এক সামাজিক আলোড়নের নায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেন। বারো বছরের সংস্কৃত পাঠ তাঁর জীবনে 'মূল্যহীন' তো হলই, হিন্দু শাস্ত্রাদিতে নির্ধারিত ধর্মকর্ম, দার্শনিক প্রত্যয়, আত্মসংস্কার ও সাধনা কোনও কিছুই তাঁর মানসপটে স্থান পেল না। বরং দেখা গেল, ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ইংরেজের সামাজিক ন্যায়শাস্ত্রাদির মর্মবাণী ও কুসংস্কারবিরোধী মনোভঙ্গি প্রচারে তিনিও সরব। সমকালীন হিন্দু কলেজের ডিরোজিও শিষ্যদের মতো তিনিও বেপরোয়া।

পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের এই প্রশ্নহীন স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে তাঁর চিন্তা-মনন-কর্মের সীমা সহজেই চিহ্নিত করা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবীর দল এবং নব ধনিক সম্প্রদায় ও তাদের অন্নপুষ্ট পরিবারগুলো ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ গণ্য করে নিজেদের সেই শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে, অপর দিকে, যে চিরস্থায়ী দাসত্বেরও স্বীকৃতি, প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের লগ্নে বিশেষ কেউ তা উপলব্ধি করেনি। না করার প্রেরণা জুগিয়েছিল নতুন ভূমিব্যবস্থা ও বাণিজ্যসঞ্জাত বৈষয়িক স্বার্থপরতা। বিদ্যাসাগরের যদিচ এই আকর্ষণ ছিল না, তথাপি দেশ কাল জীবন সম্পর্কে তাঁর বোধও পশ্চিমী ভাবাপন্ন াদের মনোভঙ্গি থেকে পৃথক ছিল না। বরং, এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয় যে রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় যে তিনি কখনও সাড়া দেননি তার কারণ ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ সৃষ্টিশীলতায় তাঁর মন ছিল আবিষ্ট। এর মধ্যে দাসত্ব কতটুকু, দাসত্বের বিনিময়ে লব্ধ কল্যাণের পরিমাণই বা কতটুকু, এবং ইংরেজ কর্তৃক দেশের সম্পদ লুণ্ঠন সামাজিক উন্নতির অনুকূল কি প্রতিকূল, এ বিচারও তাঁর রচনায় একান্তই অনুপস্থিত।

এই সচেতন অভাব তাঁর চিন্তা ও মননের সীমা ; এবং এর জন্যই তিনি বর্তমান কালে

নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু ওই সমালোচনা সত্ত্বেও এ কথা কোনও কালেই অস্বীকার করা যায় না যে, সেই সীমার মধ্যে বাংলার সাংস্কৃতিক প্রস্ফুরণে বিদ্যাসাগরের অবদান বিস্ময়কর। তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, মনের সঙ্কল্প ও গতিশীলতার নিকট স্থান কাল ও সংস্কারের বাধা কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁর সংবেদনশীল চিত্ত এবং প্রত্যক্ষের বোধ এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, ভারতবর্ষকে যদি আত্মমর্যাদা অর্জন এবং পুনরায় প্রগতি এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে হয় তা হলে এই নিথর সমাজে পাশ্চাত্যের অনুরূপ গতি সঞ্চার করতেই হবে। তা-ই সব প্রগতির পূর্ব-শর্ত। সে জন্যই তিনি প্রবল ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, "এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশের ভাল হয়।"

বিদ্যাসাগর চরিত্রের অন্যান্য সীমা চিহ্নিত করার আগে তিনি কীভাবে নতুন এক প্রজাতির মানুষের চাষ করতে চেয়েছিলেন তার আলোচনা করা যাক। সংস্কৃত কলেজে তিনি মাত্র কয়েক বছর চাকরি করেছিলেন, কিন্তু ওই স্বল্প কালের মধ্যেই তিনি কলেজের পঠনপাঠনে এমন সব সংস্কার সাধন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন যাতে, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, ওই নতুন মানুষের আবির্ভাব সম্ভব হত। ১৮৫২ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। খসড়ার মূল বক্তব্য ছিল এই প্রকার—শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য হওয়া উচিত সমৃদ্ধ উন্নত মানের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি ; ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে অপরিচিত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সাহিত্য সৃজনে অক্ষম ; তেমনই অক্ষম শুধু ইংরেজিতে কৃতবিদ্য কিন্তু সংস্কৃতে অপটু ব্যক্তিরা। সে জন্য, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাক্রমে সংস্কৃত ও ইংরেজি, উভয় ভাষাকেই সমান গুরুত্বে অঙ্গীভূত করতে হবে। যদিও প্রাচীন হিন্দু দর্শনের অনেক সিদ্ধান্ত বর্তমান কালের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিহীন তথাপি তা পাঠ্যক্রমের অঙ্গীভূত থাকবে, যেমন থাকবে পাশ্চাত্য দর্শন। ভারতীয় দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা উপলব্ধি করার জন্যই এইরূপ পাশাপাশি ও তুলনামূলক পঠনপাঠন ও বিচার। এই সুসংহত পাঠ্যক্রমের সফলতার জন্য নিম্ন শ্রেণীগুলোতে মোট শিক্ষা সময়ের তিন ভাগের এক ভাগ এবং উচ্চ শ্রেণীগুলোতে তিন ভাগের দুভাগ সময় ইংরেজি শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে, বাকিটা সংস্কৃতের জন্য।

পরের বছর ১৮৫৩ সালে তিনি কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যালেন্টাইনের রিপোর্টের উপর যে মন্তব্য পেশ করেন তাতে ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের উপর আক্রমণ আরও অধিক আবেগতপ্ত। এতে সাংখ্য ও বেদান্তের প্রভাব থেকে শিক্ষার্থীদের মানস-পরিমণ্ডল মুক্ত রাখার জন্য এবং তাদের মনকে পরিশুদ্ধ, যুক্তিবাদী, সত্যনিষ্ঠ ও দেশীয় কুসংস্কারমুক্ত রাখার জন্য তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থাদির পঠনপাঠন অপরিহার্য বলে গণ্য করেছেন, এবং ভাববাদী দার্শনিক বিশপ বার্কলির গ্রন্থাদি বর্জন করার সুপারিশ করেছেন। নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন, সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে কোনও মতদ্বৈধ নেই। নানা কারণে এই দুই দর্শন পড়াতে বাধ্য হলেও এঁদের প্রতিষেধক রূপে তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের উপযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্যের ন্যায়শাস্ত্রাদিকে বিদ্যাসাগর বিশুদ্ধ সত্যের আধার এবং ইংরেজি চর্চাকে সত্যোপলব্ধির অপরিহার্য উপায় বলে মনে করেছিলেন। নতুন মানুষের চাষ এবং সমাজমানসে গতি সঞ্চালনে এই মনোভঙ্গি তৎকালীন পরিবেশে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল

সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, শিক্ষাক্রমের এই সংস্কারের মধ্য দিয়ে তিনি স্মৃতি-শ্রুতি-বিশ্বাসের জগৎকে, সনাতনপন্থী দৃষ্টিকোণ ও গোঁড়ামিকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন, এবং সার্থকতাও যে কিছুটা অর্জন করেছিলেন তাও তর্কাতীত।

প্রসঙ্গত একটি সামান্য বিষয়ের উল্লেখ করা যায়, যা তাঁর পূর্বোক্ত মানুষ চাষ-এরই অঙ্গ। সেটা হল, সংস্কৃত কলেজকে কালে সংস্থাপন ও নিয়মানুবর্তিতার অধীন করা। পূর্ব নিয়ম অনুযায়ী সংস্কৃত কলেজ প্রতিপদ ও অষ্টমী তিথিতে বন্ধ থাকত। বিদ্যাসাগর তা রদ করে ইংরেজি স্কুলের মতো রবিবার বন্ধ রাখার নিয়ম চালু করেন। সে আমলের পণ্ডিতবর্গ যেন ছিলেন কালের উর্ধ্বে, যখন খুশি আসতেন যখন খুশি চলে যেতেন। তিনি যুগধর্ম অনুসরণ করে অধ্যাপকদের নির্ধারিত সময়ে কলেজে আসা অর্থাৎ কাল-সচেতন হতে বাধ্য করলেন।

এভাবে তাঁর নেতৃত্বে সংস্কৃত কলেজ অতীত থেকে বর্তমানে, মধ্যযুগীয় চিন্তার আবেশ থেকে আধুনিকতায় সংস্থাপিত হয়। অবশ্য স্বীকার্য, প্রবল সামাজিক প্রতিরোধ, অধ্যাপকদের বিরূপতা, কলেজের অস্তিত্বের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমস্ত বর্ণের শিক্ষার্থীদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার খুলে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থেকেও যতটা সামাজিক উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পেরেছিলেন, তার মূল্যও অপরিসীম। পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী মনন ও মূল্যবোধের বাহন হবে, এই আশায় গ্রামে গ্রামে বাংলা স্কুল স্থাপন এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিপুল উদ্যমও এই বৃহৎ পরিকল্পনার অঙ্গীভূত।

সম্প্রতিকালে বিদ্যাসাগর এই অভিযোগে নিন্দিত হয়েছেন যে তিনি জনশিক্ষার বিরোধী ছিলেন, এবং তাঁর শিক্ষাগত ভাবনা ও উদ্যোগ শ্রেণীস্বার্থের কাঠামোর উপর নির্মিত। শ্রেণীসচেতনতার বিষয়টি নিশ্চয়ই বিতর্কমূলক, তবে জনশিক্ষার বিরোধিতার প্রশ্নটি ভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে অবশ্যই বিচার করা চলে। ১৮৫৯ সালে স্বল্প খরচে বঙ্গদেশে জনশিক্ষা প্রসারের বাস্তব সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর অভিমত চাওয়া হয়েছিল। বাংলা সরকারের সহকারী সচিব রিভার্স টমসনকে লেখা এক দীর্ঘ পত্রে বিদ্যাসাগর বলেন, নামমাত্র বেতনে কোনও শিক্ষিত যুবকই স্বগ্রামে শিক্ষকতা করতে সম্মত হবে না। আর জনসমষ্টি বলতে যদি শ্রমজীবী জনগণ বোঝায় তা হলে তাদের মধ্যে ওই নগণ্য শিক্ষাও বিস্তৃত হবে না। কারণ, তাদের দারিদ্র্য। তাদের শিশুসন্তান কায়িক শ্রম বিক্রয়ের উপযুক্ত হলেই পারিবারিক আয় বৃদ্ধির জন্য তাদের কর্মে নিয়োগ করা হয়। নিছক জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষা—এই মনোভঙ্গি উচ্চকোটির মানুষের মধ্যেই অনুপস্থিত, নিম্ন শ্রেণীর তো কথাই নেই। সেজন্য, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। একশো শিশুকে নামমাত্র লিখন পঠন ও অঙ্ক শেখানোর চেয়ে একটিমাত্র বালককে উত্তমরূপে শিক্ষিত করে তোলাই শিক্ষা প্রসারের প্রকৃষ্ট উপায়।

নিঃসন্দেহ যে, বিদ্যাসাগরের অভিমত এবং সমকালীন ইংরেজি-দুরস্ত নব্য সম্প্রদায়ের 'ফিল্‌টর্‌ ডৌন' তত্ত্ব অভিন্ন, যে মনোভঙ্গিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন'-এর পত্রসূচনায় বিপুল ব্যঙ্গবিদ্রূপে, ন্যায়সঙ্গতভাবে বিদ্ধ করেছিলেন। আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলা যেতে পারে, তাত্ত্বিক বিচারে জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নিলেও ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর এর বিরোধিতাই করেছেন। যুক্তি হিসাবে তিনি বাস্তব অসুবিধা, প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা, জনসমষ্টির সীমাহীন দারিদ্র্য ইত্যাদির উল্লেখ

করেছেন। এই বক্তব্য সারবত্তাহীন নয়, অযৌক্তিকও নয়। কিন্তু প্রতিকূলতাকে জয় করার মধ্যেই যে তাঁর স্বীকৃত পৌরুষ, সংগ্রামের একনিষ্ঠ অভিযান।

অনুরূপ আরেকটি প্রসঙ্গ মহিলা নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চাওয়া হলে, তিনি সংযত অথচ অনমনীয়ভাবে এর বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি বলেন, তাঁর দেশবাসীর সামাজিক কুসংস্কার 'অলঙ্ঘনীয়' ; তারা দশ-এগারো বছরের বালিকাবধূদেরও অন্তঃপুরের বাইরে পদক্ষেপ করতে দেয় না, সুতরাং শিক্ষয়িত্রীর কাজের জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা এগিয়ে আসবে না। শুধুমাত্র নিঃসম্বল বিধবারাই একাজে অগ্রণী হতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা চাকরিব উদ্দেশ্যে বাড়ির সীমানা পার হবে সেই লগ্ন থেকেই তারা হবে নানাবিধ কুৎসা ও সন্দেহের শিকার। এই পরিস্থিতিতে মহিলা নর্মাল স্কুলের সাফল্যের কোনও নিশ্চয়তা নেই।

বিদ্যাসাগরের এই বিশ্লেষণ, মনে হয় তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আন্দোলনের সময় রক্ষণশীল সমাজ প্রচণ্ড বিরোধিতায় প্রমত্ত হয়েছিল। আইন পাশ হওয়ার পরেও বিধবাবিবাহ সম্পর্কে সমাজ ছিল বীতশ্রদ্ধ এবং উদাসীন। তিনি স্বয়ং হয়েছেন প্রতারিত। বহুবিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথা বিলোপ করার জন্য তাঁর আবেদন কোনও অনুকূল সাড়া জাগায়নি, এ সব কারণে তাঁর নৈরাশ্য এবং বিক্ষোভ স্বাভাবিক। সেজন্যই কি মহিলা নর্মাল স্কুল সম্পর্কে অনীহা ? কিন্তু, বিদ্যাসাগরের সংগ্রামী একাগ্রতা ও অকুতোভয় নিষ্ঠার পটভূমিতে এ প্রশ্ন অপরিহার্য—তিনি কি সেই মুহূর্তে মানুষ চাষের অভিপ্রায় বর্জন করেছিলেন ? ঠিক এই প্রশ্নেই সোমপ্রকাশ পত্রে তাঁর সহমরমী বন্ধুগণ তাঁর সমালোচনা করেছিলেন, ব্রাহ্ম মহিলাদের অবাধ মেলামেশার উল্লেখ করে বলেছিলেন, মহিলা শিক্ষয়িত্রী তৈরির সামাজিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়নি, এই যুক্তি ঠিক নয়। সমাজ ও সময় ছিল প্রস্তুত। যাই হোক, জনশিক্ষা ও মহিলা নর্মাল স্কুল বিষয়ে তাঁর বিরূপতা তাঁর চিন্তা ও কর্মের সীমানা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করছে বলেই ধরে নিতে হয়।

বিদ্যাসাগর ব্যক্তিত্বের অন্যবিধ সীমাবদ্ধতার প্রতি এবার দৃষ্টিপাত করা যায়। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা অপরিহার্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলতে যে দুর্ধর্ষ বুদ্ধিজীবীর চিত্র উদ্‌ভাসিত হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যপ্ত যাঁর জ্ঞানের পরিধি, মানবিক ভুবনের যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে যিনি ছিলেন সতত উদ্বিগ্ন ও চিন্তামগ্ন, সেই ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগরের ছিল না। হিন্দু শাস্ত্রাদি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্বরাট, এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, নিজস্ব অবস্থানের কাছাকাছি অন্য কারও উপস্থিতি তিনি বরদাস্ত করতেন না, তথাপি ইউরোপীয় বিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর আগ্রহের তেমন স্বাক্ষর নেই। পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার আকুতি বঙ্কিমচন্দ্রকে আত্মধিক্কার ও ক্রন্দনে এবং মধুসূদনকে অশ্রুবেদনায় যেভাবে জর্জরিত করেছিল, বিদ্যাসাগর সেভাবে কখনও জর্জরিত হননি। ভাবিকালের ভারতের কোনও মহিমময় বিচিত্র সমারোহ উজ্জ্বল চিত্র তাঁর কল্পনাকে কখনও উদ্দীপ্ত করেনি। এতসব সীমাবদ্ধতার পটভূমিতে যে প্রশ্ন অপ্রতিরোধ্য তা হল—এতদসত্ত্বেও তিনি সমকালীন মানুষদের নিকট 'ধবল পর্বতের ন্যায়' বিরাজিত ছিলেন কী ভাবে, এবং কোন্ শক্তির জোরে ?

বিদ্যাসাগর দেশীয় সমাজের মানসিক প্রস্ফুরণের জন্য যা যা করেছেন তার বেশি কেন করতে পারেননি, এ নিয়ে আধুনিক কালের বিক্ষোভ ও অভিযোগ নিষ্ফল। কারণ, প্রত্যেক

মানুষই তার আন্তর প্রকৃতি, বুদ্ধিমার্গীয় প্রস্তুতি, সমাজ-সম্পর্ক উপলব্ধি করার সংবেদনা, এবং আত্মশক্তির সচেতনতা অনুযায়ী আপন আপন কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করে। তার চিন্তা-কর্মের চৌহদ্দি এভাবেই নিরূপিত হয়। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ছত্রচ্ছায়ায় ভারতীয় সমাজ সংগঠনকে কতটা যুগোপযোগী, সমাজমানসকে গতিচঞ্চল ও মানবিক গুণসমৃদ্ধ করা সম্ভবপর, সেটাই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট।

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, ইংরেজ কণ্ঠকে আশ্রয় করে প্রাগ্রসর ইউরোপীয় চিন্তা ও আদর্শ তৎকালীন ভারতবর্ষে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই আদর্শ প্রকৃতিতে বুদ্ধিবাদী, ব্যবহারে মানবতাবাদী। মূল সুরে পারত্রিক কল্যাণচিন্তা যেমন অনুপস্থিত, এই ইন্দ্রিয়গোচর পৃথিবীকে সত্য বলে গ্রহণ করে ভোগে ও ঐশ্বর্যে সর্বতোভাবে জীবনকে চরিতার্থ করার অভিলাষও তেমনই বলিষ্ঠ। অধ্যয়ন, অধ্যাপনায় ততটা না হোক, প্রত্যক্ষ সংযোগ, সংবেদনশীল চিত্ত এবং কালপ্রবাহকে আত্মস্থ করার চৈতন্য দ্বারা বিদ্যাসাগর স্বীয় জীবনে সেই আদর্শ প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। সে জন্য অধ্যাত্মচিন্তা, ধর্মীয় আচার অথবা জিজ্ঞাসা, মোক্ষলাভের বাসনা ইত্যাদি সমস্যা তাঁকে কখনও আলোড়িত অথবা বিচলিত করেনি। মর্ত্যে পৃথিবীর বাইরে মানবসম্পর্ক অস্বীকার করে তিনি কখনও দৃষ্টিকে প্রসারিত করেননি। প্রয়োজন অনুভব করেননি বলে। এমন কি, নিজস্ব কর্মের ও মানসভঙ্গির গভীর সামাজিক তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন কি না, তা নিরুপণ করাও কঠিন। তবে, সংগ্রামের দিনগুলোতে তাঁর কণ্ঠ ছিল যেমন নিঃসঙ্কোচ, নির্বাধ এবং পৌরুষদৃপ্ত, তাতে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, মানবিক ভুবনে, জাগতিক সম্পর্কের মধ্যে, ব্যপ্ত হওয়াই ছিল তাঁর নিকট মনুষ্যত্বে উত্তরণ।

এই প্রসঙ্গটি পরিস্ফুট হয় যদি তাঁর মনুষ্যত্বে উত্তরণের কয়েকটি চিত্র আমরা পুনরায় স্মরণ করি। ১৮৬৭ সাল, দেশজোড়া দুর্ভিক্ষ। সেই দুঃসময়ে নিজ গ্রামে অন্নসত্র খোলা, অহোরাত্র রন্ধন ও খাদ্যপরিবেশনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বড় কথা নয়, বড় কথা হল একজন সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় বিদ্যাসাগরকে দেখতে পাওয়া। তেমনিই ১৮৬৮-৬৯ সালে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বিধ্বস্তপ্রায় বর্ধমানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে নিঃসম্বল ঘরে ঘরে জাতিবর্ণনির্বিশেষে তিনি ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণ করেন স্বেচ্ছাসেবকের ঐকান্তিকতায়। আর, শেষ বয়সে কার্মাটাড়ে সাঁওতাল বন্ধুদের সঙ্গে কী নিবিড় আত্মিক সম্পর্কে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন তা জানা যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মৃতিকথা থেকে। এ ছাড়াও যে সব বিচিত্র কাহিনী তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত, তার সব কয়টির বাস্তব ভিত্তি না থাকলেও, সেগুলো তাঁর সহজ মানবিকতার দ্যোতক।

সে যুগের সমপর্যায়ের খ্যাতিমান, বিদগ্ধ অথবা নতুন সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ অন্য কোনও নায়ককে অবলম্বন করে অনুরূপ চিত্র নির্মাণ করা যায় না। যায় শুধুই বিদ্যাসাগরকে নিয়ে। কারণ, দেশের জনসমষ্টির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তাঁর কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। যেমন হয়েছিল মধুসূদনের ক্ষেত্রে, বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে, যার জন্য নিজস্ব বাবু-সত্তাকে বঙ্কিমচন্দ্র আঘাতে আঘাতে বিদীর্ণ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের চটিজুতা রবীন্দ্রনাথের কথায়, চিরকালই ছিল তাঁর নিজেরই চটিজুতা। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর আচরণে ক্রুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ হলেও বিচ্ছিন্নতার বিপন্ন বিষাদে তিনি কখনও দগ্ধ হননি। অথচ তাঁর উজ্জ্বল মানবিকতার সম্পদ অবহেলিত হয়ে আসছে ; কার্যত তাঁকে করুণাসাগর বলে চিহ্নিত করে তাঁর অবদানকে খাটো করা হয়েছে। ন্যায়নীতিনির্ভর যৌক্তিকতা ও মানসভঙ্গি এবং

মানবস্বীকৃতির ঐশ্বর্য দিয়ে তিনি বাংলার সাংস্কৃতিক বিকাশকে উদভাসিত রাখায় ব্রতী ছিলেন আজীবন।

পরিশেষে, ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা আলোচনার সময় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সীমা চিহ্নিত করতে পারাটাই আসল কথা নয়। সীমার মধ্যে বিচরণশীল থেকেও কোন্ কর্ম ও ব্যক্তিত্ব সীমাকে লঙ্ঘন করে এবং কালান্তরের পথ দেখায়, তা সুনির্দিষ্টরূপে জানাই ইতিহাসকে তার প্রবহমানতা ও সৃষ্টিশীলতার মধ্যে আবিষ্কার করা, ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা সুচিহ্নিত করা। সেই বিচারে বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলার অন্যতম মহান স্থপতি, যিনি বাংলার সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কৃতিকে মধ্যযুগ থেকে বর্তমানে এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের পথে প্রসারিত করেছেন।

বিদ্যাসাগরের গোপাল আর ভুবনের কথা

বিজিতকুমার দত্ত

'বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল ; পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকবালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশায় অতি সরল ভাষায়, লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি ; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না।' কোনো পাঠ্যগ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' গ্রন্থপরিচয় এবং গ্রন্থরচনার কারণ বর্ণনা করার এই রীতি বাংলাভাষার ক্ষেত্রে একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এখনও সেই অভ্যাসের পরিবর্তন হয়নি। বিদ্যাসাগর স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের ভূমিকারচনারও পথিকৃৎ।

আপাতত বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের কথা স্থগিত রেখে আমরা বিদ্যাসাগরের বক্তব্যকে বোঝবার চেষ্টা করি। বিদ্যাসাগর যখন অনুবাদদক্ষ লেখক। 'পুস্তকবিশেষেব' অনুবাদ তিনি করেছেন। আবার নানা গ্রন্থ থেকে নানা রচনার অনুবাদ করে যখন তিনি একটি বই তৈরি করেন তখন দেখতে পাই সব মিলিয়ে একটা প্যাটার্ন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিসের প্যাটার্ন ? জ্ঞান আহরণের শর্ত হিসেবে যে শৃঙ্খলার কথা বলি তার প্যাটার্ন নিশ্চয়ই। জ্ঞানের বিষয় অনন্ত। এই অনন্তকে এলোমেলোভাবে আমরা ছুঁতে পারি না। প্রয়োজন হয়ে পড়ে শ্রেণীবিভাগের, জরুরি হয়ে ওঠে বিন্যাসকলার নৈপুণ্য।

ইংরেজি বইয়ের প্রতি সে সময়ে শিক্ষিত বাঙালির মনোযোগ। ইংরেজি সুধানিধি আহরণে উৎসাহ তখন প্রচণ্ড। প্রাণের ধর্ম প্রসারিত হওয়া। সে সময়ে এই প্রাণ জেগে উঠেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী তো বিদ্যাসাগরপ্রশস্তি আরম্ভ করেছেন এই প্রাণের কথা বলেই। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন এই প্রাণের প্রতিষ্ঠা করতে। যত ইংরেজি পড়ছেন ততই যেন মুক্তির দিশা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন। আর আমাদের অভাব সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর সচেতন হচ্ছেন। ঐ বিদ্যাকে বাংলায় রূপান্তরিত না করা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েই তিনি বাংলাভাষার শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে চাকরি করার সময়েই ইংরেজিভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। এই সূত্রেই তাঁর মনে হতে পারে 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার'। সুতরাং স্কুলপাঠ্য বই লেখার সময়ে তাঁর সর্বাগ্রে মনে পড়ে যায় অধীত ইংরেজিবিদ্যার সদ্ব্যবহারের কথা।

বিদ্যাসাগরই যে এভাবে প্রথম ভেবেছিলেন তা নয়। তত্ত্ববোধিনীগোষ্ঠীর আরও কেউ কেউ এরকমই চিন্তা করেছিলেন। শিশুপাঠ্য এবং কিশোরপাঠ্য বইয়ের প্রয়োজন যখনই মনে হয়েছে তখন এভাবেই এগিয়েছিলেন বুদ্ধিজীবীরা। বিদ্যাসাগরের বইগুলি যখন প্রকাশিত হচ্ছিল তখন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (ইনিও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিছুদিন) সম্পাদনায় বিবিধার্থ সংগ্রহ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল। এ পত্রিকার

আদর্শ বিলেতের পেনি ম্যাগাজিন। পত্রিকাটি সরকারিভাবে পাঠ্যগ্রন্থ নয় অবশ্য। কিন্তু রাজেন্দ্রলালও চেয়েছিলেন পত্রিকাটির পাঠক হবে একেবারে সাধারণ মানুষ। এর মধ্যে অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকবালিকা থেকে স্ত্রীলোক ও সাক্ষর বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই আছে এবং আছেন। শিশুকে এই গোষ্ঠীর মধ্যে ধরছি না। তবে বর্ণপরিচয়ের গোপালকে সঙ্গে নিতে পারি। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের উদ্যোগে এবং রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় এই পত্রিকা বালক রবীন্দ্রনাথকে কিরকম মুগ্ধ করেছিল সেকথা জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। রাজেন্দ্রলালও বিভিন্ন ইংরেজি বই থেকে প্রাণী বৃত্তান্ত, ইতিবৃত্ত, শিল্পপ্রসঙ্গ উদ্ধার করে এনেছেন তাঁর পত্রিকায়। সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন সাহিত্য।

বিদ্যাসাগরের এবং সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের মননের প্রবণতা আমরা বুঝতে পারি এই সময়ের রচনাগুলি থেকে। আসলে জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ তখন প্রবল। এই জ্ঞানের অংশীদার করতে চাইছেন তাঁরা সকলকে। সেজন্যে বিদ্যাসাগরের বইয়ের নাম বোধোদয়।

॥ ২ ॥

'ইংলণ্ডীয় লোকের অর্থাৎ ইংরেজদিগের ভাষা ইঙ্গরেজী। ইঙ্গরেজেরা এক্ষণে আমাদের দেশের রাজা সুতরাং ইঙ্গরেজী আমাদের রাজভাষা। এ নিমিত্ত সকলে আগ্রহপূর্বক ইঙ্গরেজী শিখে ; কিন্তু অগ্রে জাতিভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিক্ষা কোনও মতে উচিত নহে।' বর্তমানকালে ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষাশিক্ষার এই ফরমুলা আমাদের দিগ্‌দর্শনী হতে পারে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃতভাষার প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু এও জানেন 'এ ভাষা এখন আর চলিত ভাষা নহে।' সংস্কৃতভাষা যে বাংলাভাষা শিক্ষার পক্ষে একেবারে অপরিহার্য এমন কথা না বললেও তিনি জানতেন সংস্কৃতভাষা না শিখলে বাংলা 'ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।' উত্তম ব্যুৎপত্তির জন্য বিদ্যাসাগর অক্লান্ত। প্রয়োজন হয়েছিল 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র। শিক্ষার আধুনিকীকরণ ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান। সেজন্য 'ব্যাকরণ কৌমুদী'তে দেখা দিতে থাকে সরলীকরণের নানা প্রচেষ্টা। যে ভাষা চলিত নহে সে ভাষার অন্তঃপুরে প্রবেশ করবেন তাঁরাই যাঁরা বিশেষজ্ঞ হতে চান কিংবা তার রস আহরণ করতে উৎসাহী। কিন্তু ভাষাশিক্ষার জন্য প্রথম সোপান তৈরিতে সংস্কৃতভাষার সূক্ষ্ম বিধিবিধানের প্রতি মনোযোগী হবার প্রয়োজন নেই। ত্রিভাষা সূত্রকে বিদ্যাসাগর অগ্রাহ্য করেননি কিন্তু 'অগ্রে' 'জাতিভাষা' শিখতে হবে। বিদ্যাসাগরের এই লক্ষ্যকে আমাদের মনে রাখতে হবে।

বস্তুত বিদ্যাসাগরের সমকালীন প্রত্যেক বাঙালি বুদ্ধিজীবীই এইভাবেই চিন্তা করেছিলেন। কথা না বাড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের 'পত্র সূচনা'য় বাংলাভাষার প্রতি মমত্ববোধ এবং এই ভাষাকে প্রচার করবার আন্তরিক আগ্রহের কথা স্মরণ করতে পারি। বাংলাভাষার প্রতি করুণার ভাব দেখিয়েছেন বরং দেশীয় পণ্ডিতবর্গ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহের প্রথম প্রবন্ধেই সেই পণ্ডিতবর্গের কথা বলেছেন।

বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ের আগেই পাঠ্যগ্রন্থ কিছু লিখেছিলেন। জীবনচরিত (১৮৪৯), সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১), ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম ভাগ-৪র্থ ভাগ ; ১৮৫৩-১৮৬২)। বোধোদয় (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ;১৮৫১), ঋজুপাঠ (১ম ভাগ-৩য় ভাগ ; ১৮৫১)। এ দুটি পাঠ্যগ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতশিক্ষার বনেদ তৈরি করে দিয়েছিলেন ঋজুপাঠ আর ব্যাকরণ কৌমুদীর তিনটি ভাগ লিখে ১৮৫৪-র মধ্যেই। কিন্তু তখন পর্যন্ত বাংলাভাষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়নি। অবশ্যই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের

'শিশুশিক্ষা'র কথা আমরা মনে রাখব। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মদনমোহনের শিশুশিক্ষার দুটি ভাগ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫০-এ। মদনমোহন নারীশিক্ষা প্রবর্তনের অগ্রদূত। 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থটিতে তিনি ভূমিকায় বলেছেন 'বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশায়ে' এই বই তিনি লিখছেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ (পরবর্তীকালের কথা এখানে তুলছি না) মদনমোহন বিদ্যাসাগরের চিত্তে নারীমুক্তির প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। মদনমোহন বুঝেছিলেন, ভালো শিশুপাঠ্য বই না থাকাতে ভাষাশিক্ষা এগোচ্ছে না। সুতরাং প্রাথমিক গ্রন্থরচনার প্রয়োজন তীব্রভাবে তখন অনুভূত হচ্ছিল। মদনমোহন বাংলাভাষাকে 'স্বদেশ ভাষা' বলেছেন। এইভাবে বাংলাভাষার গোত্রনির্ধারণ আকস্মিক ব্যাপার বলে মনে হয় না। ভাষাকে দেশচর্চার অন্যতম উপাদানরূপেই তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর কি মদনমোহনের বই থাকার জন্যই বর্ণপরিচয় কিঞ্চিৎ বিলম্বে লিখতে শুরু করেন ? মনান্তর এবং মতান্তর এই দুয়েরই অবকাশ আছে এক্ষেত্রে। কিন্তু যেখানে এসব কিছুই নেই তা হল স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে।

বর্ণপরিচয় 'পাঠ' নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। বিদ্যাসাগরকৌতূহলী পাঠকমাত্রই তা জানেন। মদনমোহনের কবিতা 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল' বিদ্যাসাগরের মনকে নাড়া দিয়েছিল। এই কবিতার 'প্রকৃতি বর্ণনা' বিদ্যাসাগরকে মুগ্ধ করেছিল নিশ্চয়ই। কেননা বিদ্যাসাগর তাঁর 'পাঠে' (৮) তারই একটু নমুনা সংগ্রহ করেছেন। মদনমোহন মালতী ফুল ফোটা, তার গন্ধ, গন্ধে আকৃষ্ট কীটপতঙ্গ, লাল রঙ-এর সূর্য, শীতল বাতাস, গাছের পাতায় শিশির ইত্যাদি চমৎকার লক্ষ করেছেন। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের কথাও তিনি ভোলেননি। যেমন সূর্যের আলোকে মানুষের চিত্তে আনন্দ এবং শীতল বাতাসে শরীরের ক্লান্তি দূর তার নজর এড়ায়নি। বিদ্যাসাগর ৮ম পাঠে লিখছেন 'কাক ডাকিতেছে, পাখী উড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে, গরু চরিতেছে, জল পড়িতেছে, ফল ঝুলিতেছে।' পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন মানুষটি হঠাৎ একবার প্রকৃতির দিকে নয়ন মেলে তাকালেন। মদনমোহন ভোলেননি শিশুর প্রকৃত কর্তব্যের কথা—'উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ। /আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।' বিদ্যাসাগরও ভোলেননি। সেজন্যে ৯ম 'পাঠ' থেকে শুরু হল বই, পড়া, স্কুল। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বেথুনের উদ্যোগে হিন্দু বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর বেথুনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। বেথুন বিদ্যাসাগরকে পুরোপুরিভাবে চেয়েছিলেন স্কুলের কাজে। এক সময়ে বিদ্যাসাগর কমিটির সম্পাদক পদে বৃত হন। বিদ্যাসাগর বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হলেন। বিদ্যালয়ের বিস্তার পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজনীয়তা আরও অনুভূত হল।

এখানেই বর্ণপরিচয়কে একটু তলিয়ে দেখতে হবে। সমাজে নারীর মূল্য স্বীকৃত হতে যাচ্ছে। এ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। আন্দোলনও দেখা দিচ্ছে। নারীশিক্ষার বিরোধিতা যাঁরা করছেন তাঁদের যুক্তিগুলি পরীক্ষা করা যাক। তাঁদের বক্তব্য : 'শিক্ষা কর্মের উপযোগী মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি নারীদের নেই (১), নারীশিক্ষার প্রচলন এদেশে ছিল না—এ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, লোকাচারবিরুদ্ধ (২), নারীর বিদ্যাশিক্ষা দুঃখ, দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। বিশেষত পতিবিয়োগে অপরের দুঃখভাজন হয়ে থাকতে হবে (৩), স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হবে, বিদ্যার অহঙ্কারে কুল নষ্ট করবে (৪), বিদ্যা শিখে নারী কি চাকরি করতে পারবে ? হাটেবাজারে বসে ব্যবসা করতে পারবে ? দূর দেশান্তরে যেতে পারবে (৫)? এই প্রশ্নগুলি জরুরি। নারীর ভাগ্যকে পরাজিত করবার এই কৌশল

পুরুষশাসিত সমাজে বরাবরই চলে আসছে। অনেক পরে নারীর বিদ্যাচর্চা নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন রচনা হয়েছে। কিন্তু ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে মদনমোহন এই পাঁচটি প্রশ্নেরই প্রতিবাদ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও এই কুসংস্কার দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। সেজন্যে আপন পাঠেতে মন দেবার এত টানাটানি। বিদ্যাচর্চা মানুষের মুক্তির লক্ষণ। এই মুক্তি আসে অনেকটাই জানার মধ্য দিয়ে।

বর্ণপরিচয়ে (১ম ভাগ) ১ম থেকে ৩য় পাঠ পর্যন্ত একটু খোলামেলা। বড় গাছ, ভাল জল, লাল ফুল, ছোট পাতা, পথ ছাড়, জল খাও, বাড়ী যাও, কথা কয়, জল পড়ে, মেঘ ডাকে, হাত নাড়ে, খেলা করে। কোনো জ্যাকেট তিনি পরাননি। কিন্তু তারপরই কেবল পড়া এবং পড়াসংক্রান্ত ব্যাপার। পড়তে না যাওয়া, অন্য ছেলেদের বকিয়ে দেওয়া (এরকম দৃষ্টান্ত কয়েকটি আছে), বই চুরি যাওয়া, বই হারানো, বই না থাকা, পড়া করতে নাপারা, তার জন্য লজ্জা। তড়িঘড়ি মদনমোহনের মতোই বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয়ে লিখছেন, 'আর রাতি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিও না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি। ভাল করিয়া না পড়িলে পড়া বলিতে পারিব না। পড়া বলিতে না পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন, নূতন পড়া দিবেন না।' এসব ভাবনার উৎস কি ? অক্ষয়কুমার দত্ত'র মতো বলব না ঘুম থেকে উঠেই শিশু পড়ার থেকে খাবারের জন্য চেঁচাতে থাকে, পড়ার কথা একবারও মুখে আনে না। বিদ্যাসাগর এখনও এদের খাবারের কথা বলেননি। বোধ করি স্কুলে যাবার আগে no meal। কিন্তু আমার কাছে যেটা অবাক লাগে মদনমোহন এবং বিদ্যাসাগর দুজনেই মুখ ধোয়া এবং কাপড় পরার উপর জোর দিচ্ছেন। মুখ ধোয়া স্বাস্থ্য পালনবিধি পর্যায়ের আর কাপড় পরা লজ্জানিবারণ এবং পরিচ্ছন্নতার লক্ষণ। আমরা কি এখানে আমাদের বাঙালি পারিবারিক জীবনের একটা আদর্শ খুঁজে পাই না ? পড়ার সঙ্গে জীবনযাপনের নির্দেশও কেমন ঢুকে পড়ছে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ে। মধ্যবিত্ত মানুষ বিদ্যাসাগর, মধ্যবিত্তের রুচিবোধ তাঁকে প্ররোচিত করেছিল শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যজ্ঞান এবং পরিচ্ছন্নতা বোধের প্রতি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনায় পৌঁছবার আগে বর্ণপরিচয়ের স্থান নির্দেশ করার প্রয়োজন আছে। ভাষাতাত্ত্বিকবৃন্দ এ আলোচনা করেছেন। আমরা মধ্যবিত্ত মানসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখি। আলালের ঘরের দুলাল সমকালীন সামাজিক জীবনের দর্পণ। মতিলালের লেখাপড়ার কৌতুকাবহ চিত্র এই উপন্যাসে চিত্রিত। ঘরে বাপ মতিলালকে যেভাবে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল তা প্রাচীন পদ্ধতির, অতএব জীর্ণ। ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়ে সে বেলেল্লাপনা করেছে ঠিকই কিন্তু তাঁর ইংরেজি শিক্ষা তামিস ডিমিস পর্যন্ত এগিয়েছিল। শিক্ষার এই শোচনীয় ব্যর্থতা বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিলেন। বাবু কালচারের বিকৃতিও তার সময়েরই ঘটনা। মতিলালদের কাণ্ডকারখানা তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছে। অতএব প্রকৃত পড়ার উপর তিনি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। সেজন্য তাঁর 'পাঠে'র উদাহরণে কেবল পড়ার কথা। এটাই ভেবেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু একথা জোর দিয়েই বলব যে, জ্ঞানচর্চার দিগন্তকে তিনি স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। আর এই জ্ঞানকে অভিজ্ঞতার পরিধিভুক্ত করতে হলে পঠনপাঠনই একমাত্র পথ। সে পথ তিনি তৈরি করেছিলেন। বিদ্যাসাগর কুসংস্কার, দীর্ঘদিনের সংস্কার দূর করতে চাইছেন। মানুষের মুক্তির দিশা মিলবে জ্ঞানচর্চায়। প্রশ্ন উঠতে পারে শিশুপাঠ্য বইতে জ্ঞানচর্চার গুরুভার চাপানো হবে কেন ? সব কিছু ফেলে দিয়ে কেবল গ্রন্থকীট হওয়ার মধ্যে সার্থকতা কোথায় ? এর উত্তরে বলা যায়

খেলার সময়ে খেলা করার কথা বিদ্যাসাগর বললেও পড়ার উপরই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ কালের লিখন পড়তে পেরেছিলেন। শিশুর কাছে পড়া কিছুটা কঠোর হলেও প্রথম পর্বে এর প্রয়োজন সমাজ সংস্কারের দিক থেকেই। সামন্ততান্ত্রিক বেড়া ভাঙার অন্যতম শর্ত জ্ঞানের বিকাশ। অন্তত বিদ্যাসাগর তাই বুঝেছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এই ক্ষেত্রে কাজে লেগেছিল। তামিস ডিমিস না শিখিয়ে তিনি কঠোর পরিশ্রমে বিদ্যার ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিলেন। অস্বীকার করি না এইভাবে জীবনযাপন মানুষকে সঙ্কীর্ণ করে দিতে পারে। শিশুর উপর বোঝা চাপানো মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে। তোতা কাহিনীর পাখিটার মতোও দুর্দশা হতে পারে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দায়িত্ব ছিল অপরিসীম। সেজন্যে তাঁকে লিখতে হয় 'কখনও মিছা কথা কহিও না।' এখানে উপদেশবাক্যটিকেই দেখতে বলছি না, অযুক্ত ব্যঞ্জন শব্দের উদাহরণে 'মিছা' শব্দটির ব্যবহারও আমাদের চমকে দেয়। সেকালের 'মিথ্যা'র পরিবর্তে 'মিছা' বসানো নিঃসন্দেহে সাহসের পরিচয়। 'কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।' এখানেও 'ঝগড়া' একই মানসিকতার ফসল। রাধাকান্ত দেব লিখতেন সম্ভবত 'কলহ'। 'কাহাকেও গালি দিও না'। 'গালি' একেবারে মর্মভেদী। তিরস্কার বিদ্যাসাগর ব্যবহার করতেই পারতেন। কিন্তু সুকুমারমতি বালকদের তিনি পেছিয়ে গিয়ে ভারি শব্দ ব্যবহার করে 'গালি'র ভাগী হতে চাননি। এইভাবেই উপদেশে-নির্দেশে বিদ্যাসাগর বাঙালি মধ্যবিত্তের ঘর গড়ে তুলতে সাহায্য করেন আর সঙ্গে সঙ্গে ভাষাব্যবহারে মধ্যবিত্তকে কাছে টেনে নেন। বর্ণপরিচয় রচনার পরিকল্পনায় সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ এমনি করেই ফুটে উঠতে থাকে।

॥ ৩ ॥

বিদ্যাসাগরের আগে রাধাকান্ত দেব বর্ণপরিচয় লিখেছিলেন। তাঁর বই 'বাঙ্গলা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১) স্কুল বুক সোসাইটির আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। এখানে বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রসঙ্গ আনছি না। ব্যাকরণও ভাষাশিক্ষার গ্রন্থ। কিন্তু শিশুপাঠ্য গ্রন্থে দৃষ্টান্তই মুখ্য। এবং ভাষার সঙ্গে পরিচয়ই এর লক্ষ্য। রাধাকান্ত দেব ভূমিকায় বলেছেন (আমি যে বইটি দেখেছি তার ভূমিকা অনেকটাই কীটদষ্ট) 'শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে।

এবং লোকে কহে যে সাধু ভাষা সে সংস্কৃতানুযায়িনী। এবং সংস্কৃত শব্দ ব্যতিরেকে শুদ্ধ লেখন পঠন ও কথন (কয়া) যায় না এ কারণ এই গ্রন্থ ভাষা সংস্কৃত ও মিশ্রিত রচিত হইয়াছে।'

সংক্ষেপে রাধাকান্ত দেবের বইটির পরিচয় দিই। বইটি ইংরেজিতে লেখা কিন্তু বাংলা মিশ্রিত। কখনও বাংলা এবং ইংরেজি একই ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য রাধাকান্ত বই লেখার সময় সাহেবসুবোদের কথাও ভেবে থাকতে পারেন। ইংরেজি 'রীত্যনুসারে' যে বেশ কয়েকক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। স্বরবর্ণমালায় রাধাকান্ত দীর্ঘ ৠএবং দীর্ঘ ৡ সযত্নে যোগ করেছেন। 'ক্ষ'-কে ব্যঞ্জনবর্ণে স্থান দিয়েছেন। স্বরবর্ণে অং এবং অঃ (ong-oh-uh) এইভাবে রেখেছেন। ইংরেজিতে উচ্চারণ দেখিয়ে দিয়েছেন রাধাকান্ত। আমি এখানে বৈয়াকরণের বিশ্লেষণ করব না। কিন্তু বিদ্যাসাগর ক্ষ-কে মানেননি। ৠ-ঌ'র কথা ছেড়েই দিলাম। বিদ্যাসাগর স্বাভাবিক হতে চাইছেন। প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধির মানুষ তিনি। সুতরাং ধর্মে-কর্মে বাধা হতে পারে এমন জিনিসকে বাদ দেবেনই। রাধাকান্ত বিরামচিহ্ন ব্যবহার করেননি। এক দাঁড়ি দুই দাঁড়িই ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি

'রীত্যনুসারে' তিনি সেমিকোলন, কমা, ড্যাশ ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু করেননি। চলে আসা রীতিকে তিনি অমান্য করতে পারেননি।

তিনি যখন পাঠের শিরোনাম লেখেন তখনও আমরা অবাক হই তাঁর সংস্কৃতানুযায়িনী হয়ে চলার চেষ্টা। যেমন উকার—'মধ্যদ্ব্যক্ষরং শব্দাঃ'। একটি বাক্য তুল দিই। 'যে কালে তোমরা অব্রুবান ছিলা তোমাদিগের মনস্থ অনুমান করিয়া আহারাদি প্রদান দ্বারা পরিতোষ করিয়াছেন।' সুকুমারমতি বালকবালিকারা এই বাক্যে অব্রুবানই থেকে যাবে। রাধাকান্ত স্বরিত, উদাত্ত, অনুদাত্তের স্বরের উদাহরণ দেন। বিবৃত ধ্বনির অবতারণা করেন। প্লুত স্বরও আলোচিত হয়েছে।

রাধাকান্ত লেসন বা 'পড়িবার পাঠ' উদ্ধার করেছেন। একাট উদাহরণ 'বিদ্যা দীপ তুল্যা ইহাতে তুমি অন্য প্রদীপ উজ্জল (ভুল ?) করিতে পার তথাপি ইহার তেজো হ্রাস না হইয়া প্রদীপ্ত থাকে তদ্রূপ যে.ব্যক্তি বিদ্যা দান করে সে অন্যের প্রতি অমূল্য ফল প্রদান করে এবং তাহার আপন সঞ্চয় হানি হয় না।' বাক্যে উপমা ব্যবহারে সংস্কৃত অনুসরণ সুস্পষ্ট। তেজের পরিবর্তে 'তেজো'। কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্। কবিতা আছে। এখানে রাধাকান্তকে পয়ারের ঐতিহ্য সামলে দিয়েছে। 'মাতার সমান নাই শরীর পোষিকা /কান্তার সমান নাই শরীর তোষিকা /চিন্তার সমান নাই শরীর শোষিকা /বিদ্যার সমান নাই শরীর ভূষিকা।' এই উদাহরণ ঈশ্বরচন্দ্রের চিন্তার কাছাকাছি। কিন্তু রচনারকম উদ্ভট শ্লোকের মতো। চাণক্যের শ্লোকের কথা অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দেয়। এখনও চাণক্য রাজত্ব করছেন বাংলাবিদ্যার ক্ষেত্রে। বিশদ করবার জন্য আর একটি উদাহরণ : 'কোকিলদিগের শোভা স্বর নারীর দিগের শোভা পাতিব্রত্য তপস্বির দিগের শোভা ক্ষমা।' প্রবাদপ্রবচন ঘেঁষা এসব উক্তিতে বয়সের সীমা মানা হয়নি। তবে পাতিব্রত্যের গুণগান তো গোটা ঊনবিংশ শতাব্দ জুড়েই চলেছিল। মধ্যবিত্তের সুখী জীবনের নানা অলঙ্কারের মধ্যে পাতিব্রত্য একটি।

রাধাকান্ত বাঙ্গলা শিক্ষাগ্রন্থটিকে অমনিবাস করে তুলতে চেয়েছেন। এরকম একটি অমনিবাস প্রবোধচন্দ্রিকা। যাই হোক তিনি অক্ষরযোগের উদাহরণ দিয়েছেন প্রচুর। এটা তাঁর কৃতিত্ব। তৎসম উদাহরণ ছাড়া অন্য উদাহরণ প্রায়ই কম। রাধাকান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের প্যাটার্ন খুঁজছিলেন প্রাচীনবাংলার জীবনযাত্রায়ও। তিনি একটা অ্যারিস্টোক্র্যাসি গড়ে তুলতে চাইছিলেন জীবনে এবং লেখাতেও। উদাহরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে। পাঁচ অক্ষরের শব্দ। অনেক ক্ষেত্রে শব্দগুলি সমাসবদ্ধ। যেমন মৃতশরীর, ভোজনপাত্র, নেতব্যদ্রব্য। ছয় অক্ষরের—কৃমিযোনিপ্রাপ্ত, কৌশলকরণ। উইলিয়ম কেরির আমল থেকেই বাংলাভাষাকে সংস্কৃতঘেঁষা করে তোলবার প্রচেষ্টা রাধাকান্তর লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মিছা, ঝগড়া, গোল, গালি এদের স্থান পেতে দেরি হচ্ছিল! কেননা রাধাকান্তর সমাজের আভিজাত্য সাহেবসুবো পেরিয়ে বাঙালির একটা বাবু (বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর) সম্প্রদায়ের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল। রাধাকান্তর বইর কৌতূহলোদ্দীপক দিক হল ব্রাহ্মণ সমাজের বিচিত্র উপাধিগুলির তালিকা (পারিয়াল, কেশরকোনী, কুলভী, দীর্ঘাটি, গুড়, দিণ্ডিসাঁয়ী, পিপ্পলী)। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি (রুদ্রবাক্‌চি, চম্পটি, ঝম্পটি)। ক্ষত্রিয়ের—কপুর, শেঠ, বর্মা। আর বৈশ্যের গুপ্ত, দত্ত। রাধাকান্ত কিছু স্থানের নাম সঙ্কলন করেছেন—ম্লেচ্ছবাস, রাঢ়, মদ্র, মরু, আন্ধ্র। জেলার নাম ভাগলপুর, ত্রিপুরা। নগর অবশ্যই অন্যান্যদের মধ্যে কলকাতা। গ্রাম—টালিগঞ্জ (হায়! রিজেন্ট পার্ক), ঠনঠনিয়া (হায় বীণা সিনেমা)।

রাধাকান্ত পঞ্চতন্ত্রের গল্পের উদাহরণ দেন মিত্রলাভঃ, সুহৃদ্ভেদঃ। সন্ধির প্রকরণও গৃহীত হয়েছে এই বইতে। এমন কি সঙ্কেতকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেমন, আ—আসামী। 'সঙ্খ্যা' শব্দ আছে, পূরণবাচক শব্দেরও দৃষ্টান্ত মিলবে। ভূগোলের অল্পস্বল্প বিবরণ এবং ইতিহাসকথা স্থান পেয়েছে। ১৬৯০ থেকে কলকাতাকে না ধরে তিনি ফারুখশিয়রের সময় থেকে সনদ পাওয়া ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দকেই কলকাতার রমরমার আরম্ভ মনে করেছেন। অন্ধকূপ হত্যার কাহিনীকে তিনি বাদ দেননি।

ছাপাখানার খরচ কিংবা অপ্রতুলতার জন্যই রাধাকান্ত এরকম ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা জানি না। রামমোহনের লেখার স্যাম্পল সার্ভে করলে সমাসবদ্ধ পদের ন্যূনতা দেখা যাবে। অন্তত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাসাগরের তুলনায়। বিদ্যাসাগরের সমাসবদ্ধ পদ প্রয়োগের কারণ ভিন্ন। সেখানেও ভাষাতত্ত্বে ভিন্ন নিয়ম কাজ করেছে। সে আলোচনার অবকাশ নেই এখানে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কথা আগে বলেছি। মদনমোহনের বইর প্রকাশক বিদ্যাসাগর। ১৮৭৪-এর সংস্করণে বিদ্যাসাগরের নামই পাই শিশুশিক্ষার প্রকাশক হিসাবে। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল এই বই। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শ নিশ্চয়ই ছিল। আমরা তিরিশ বছরের মধ্যেই ভিন্ন ছকে এসে পৌঁছই। মদনমোহন দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত বর্ণের বিন্যাস করেছেন। কিন্তু 'যে সকল সংযুক্ত বর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় এক বারে অপ্রচলিত এবং সংস্কৃত ভাষাতেও বিরলপ্রচার তৎসমুদয় শিশুগণের অনাবশ্যক অভ্যাস পরিশ্রম পরিহারার্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যেমন, ঙ্য, ঞ্য, থ্র, ড্র ইত্যাদি। সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের কেবল সংযুক্ত অক্ষরের পরিচয় ও অভ্যাস করিতে অত্যন্ত অসুখ ও বিরাগ জন্মে, এ জন্য প্রত্যেক সংযুক্ত অক্ষরের উদাহরণ স্বরূপ এক এক উপদেশ বাক্যে বিন্যস্ত করা গিয়াছে। যেমন ক্য—কটু বাক্য কহা অনুচিত, প্য—অসৎলোক কদাচ আলাপ্য নহে, ম্য—সৎকথা সকলরই মনোরম্য, ষ্য—কটুভাষী হওয়া বড় দূষ্য। ন্ধ—অন্ধজনে দয়া কর। এইখানে একটু ভাববার অবকাশ আছে। ওই বাক্যগুলি সরল কিন্তু দৃঢ়। এই মজ্জাযুক্ত শব্দপ্রয়োগ বাংলাভাষার পরবর্তীকালে (বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ব্যতিক্রম) বিরলদৃষ্ট। মদনমোহন শিশুশিক্ষার প্যাটার্ন পালটে দিলেন। বিদ্যাসাগর এই রীতি গ্রহণ করেননি। কেন ? তার উত্তর তিনি দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর অর্থের দিকে লক্ষ করতে বলেননি। তিনি আরও গোড়ায় যেতে চেয়েছিলেন। আগে বর্ণবিভাগ। একসঙ্গে দুটি শিখতে গেলে উভয়েরই সর্বনাশ। বিদ্যাসাগর সুকুমারমতি বালকবালিকাদের মানসিকতা বুঝেই সংযুক্ত বর্ণের নীরসতাকে ভেঙে দিয়েছেন '*পাঠ*'-এর অবতারণা করে। যতই ক্রুড ফর্মের হোক না কেন এগুলি গল্প। এই গল্পগুলিতে ছেলেদের যুক্তবর্ণের শ্রম অনেকটাই লঘু হয়ে যেত। মদনমোহনের মতো বিদ্যাসাগর সংযুক্ত ব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত দেননি কেন এখন আমরা বুঝতে পারি। ডিরেক্ট মেথডের শিক্ষাপ্রকরণ অনেকটা এই জাতীয়। আমাদের কাছে এখন অবশ্য গল্পগুলি একঘেয়ে মনে হয়। কিন্তু দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করেছেন তাঁকে ভাবতে হয় অন্যভাবে। সেজন্য দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় পাঠে তিনি লেখেন (১) শ্রম না করিলে, লেখা পড়া হয় না···। (২) পরের দ্রব্যে হাত দিও না। (৩) যে মন দিয়া লেখাপড়া শিখে, সে সকলের প্রিয় হয়। (৪) কখনও কাহারও সহিত কলহ করিও না। (৫) যখন পড়িতে বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে না। (৬) যে চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, ঝগড়া করে, গালাগালি দেয়, মারামারি করে, তাহাকে অভদ্র বলে। ভদ্রলোক হবার কিছু আদর্শ এই

পর্যায়েই বিদ্যাসাগর ধরে দিয়েছেন। শিক্ষিত ভদ্রলোক তখন মনে প্রাণে ভদ্রলোক হতে চেয়েছিল। শিশুর চিত্তে শূন্য স্লেটে এই দাগগুলি পড়ছিল। সংসারে সে কি দেখছিল। অনেক ব্যতিক্রম তার নজরে এসেছিল। মিথ্যা বলা, চুরি করা, ঝগড়া করা ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশ শতকে উনবিংশ শতাব্দীর ভদ্রলোকের কিছু বিপদ হয়ত হয়েছিল এই কারণে। পিতামাতার প্রতি ভক্তি, সকলের প্রতি সমভাব এসব নীতিসুধা রাধাকান্ত থেকে বিদ্যাসাগর সকলেই সংগ্রহ করেছেন শিশুদের জন্য। এমনকি প্যারীচাঁদ মিত্র যখন আলালের ঘরের দুলাল লেখেন তখন তৈরি করতে হয় বরদাচরণ এবং রামলালের মতো চরিত্র। ভ্রমণের উপকারিতা তীর্থে পর্যটন, পরের সেবা, গুরুজনকে ভক্তি করা, পরিবারের দায়িত্ব পালন করাকে ভালোভাবেই স্পষ্ট করেছেন এ দুটি চরিত্র। এর উপর আবার পড়েছিল ব্রাহ্মভদ্রতা। এই প্রলেপে চলনেবলনে, আচারআচরণে আরও সংযমের বাঁধ দেওয়া হল। বিশ শতকে কেউ কেউ এসব মানতে চায়নি। তাঁদের কারও কারও মনে হয়েছে আমরা মুখোশ পরে আছি। মুখোশের আড়ালে মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বিদ্যাসাগর ভুবনের মাসীর কথা জানতেন। তার কান কামড়ে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর ইভিল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না এমন নয়। আর সে ইভিল দূর করবার জন্য তিনি অন্য ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন—বিধবাবিবাহের ক্ষেত্র, বহুবিবাহ নিবারণের ক্ষেত্র।

সংস্কৃত কলেজে ঢুকেই বিদ্যাচর্চার অভাবগুলির দিকে বিদ্যাসাগর সচেতন হয়েছিলেন। সেজন্যেই তাঁকে লিখতে হচ্ছে বোধোদয় বা বর্ণপরিচয়ের মতো বই। স্বদেশচর্চার ভিত্তি এইভাবেই তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। একেবারে সমস্যার গোড়ায় যেতে হবে। একেই বলব সাক্ষরতার অভিযান, সাক্ষরতার মূল্য। মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত লোক আছে, থাকুক। উচ্চশিক্ষার সঙ্কোচও তিনি চাননি। কিন্তু গোড়ার কথা ভাববার কাউকে তিনি পাচ্ছেন না। রাজেন্দ্রলালের প্রয়াসকেও তিনি সম্পূর্ণ মনে করলেন না। সেজন্য পরিচ্ছন্ন, স্বাভাবিক বিদ্যাচর্চার স্বরূপরহস্য তিনি উদ্ঘাটন করলেন বর্ণপরিচয়ে। ঘরের থেকেই শুরু হোক তার কর্মজীবন। নেমে এলেন শিশুরাজ্যে। এই শিশু ভোলানাথদের তিনি সাক্ষরযুক্ত করে তুলতে চাইলেন। কারণ এরাই দেশের ভবিষ্যৎ। ফিল্টার ডাউন পদ্ধতিতে তিনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন অন্তত এ-ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিতের কাছ থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়া বিদ্যাগ্রহণকে তিনি মানতে পারেননি। আর যা ভেবেছিলেন কাজে তাই পরিণত করেছেন।

কিন্তু ভাবলেই চলবে না। মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং তাঁর আগে যাঁরা লিখেছিলেন বর্ণপরিচয় জাতীয় গ্রন্থ তাঁদের রচনাকে তিনি খতিয়ে দেখলেন। বিশেষত মদনমোহনের বইয়ের উদ্ভাবিত শব্দরাজির ধ্বনির দিক থেকে বিন্যাস সেকালের শিশুকে কতটা তৃপ্তি দিয়েছিল সেকথা তাঁকে ভাবতে হয়েছিল। বস্তুত আমরা ছেলেবেলার পাঠ শুরু করেছিলাম বর্ণপরিচয় দিয়ে নয়—বাল্যশিক্ষা (সীতানাথ বসাক) দিয়ে। সেখানেও দেখতে পাব উদাহরণে কিছুটা অনুপ্রাসের প্রতি প্রীতি পক্ষপাত। যেমন কালো কেশ ভাল বেশ। আষাঢ় মাস চাষার আশ। অথবা মাত্র কয়েকটি ছত্রে রামায়ণ কাহিনী : দুষ্টমতি লঙ্কাপতি হরে নিল সীতাসতী /রামচন্দ্র গুণধর ত্বরা গিয়ে সিন্ধুপার ইত্যাদি কবিতা মদনমোহনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিদ্যাসাগর কিন্তু অনুপ্রাসের প্রতি আকৃষ্ট হলেন না। না, কবিতার প্রতিও না। তার উদাহরণ হল কাক, গান, ঘটা, লতা অথবা কৃশ, গৃহ, ঘৃত, তৃণ (অ-কারান্ত উচ্চারণ তারকাচিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে)। জীবনে কবিতার প্রয়োজন আছে। বিষয়ীর ক্ষেত্রে কবিতা পরে আগে জ্ঞান। এমনকি সচিত্র গ্রন্থও এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই। এই

চিন্তার সঙ্গে আমরা একমত না হতে পারি কিন্তু বিদ্যাসাগর জীবনে যেমন ডিসিপ্লিন মানেন, পড়ার ক্ষেত্রেও সেই ডিসিপ্লিন চাইছেন। এক্ষেত্রে ধ্বনির মাধুর্য তাঁকে টানছে না। ধ্বনিকে তিনি অগ্রাহ্য করেন না। শকুন্তলা, সীতার বনবাসে তার বহুল পরিচয় আছে। আবার বাক্যরচনায়ও প্রয়োজনের দিকটি উপেক্ষিত নয়। আমরা রোজ যা করি সেসবের অভিজ্ঞতা উঠে আসছে এখানে। কখনও উপদেশ, কখনও ভর্ৎসনা, কখনও জিজ্ঞাসা সব মিলিয়ে অ্যাভারেজ মধ্যবিত্ত বাঙালির চিত্র। লক্ষ্য পড়ার দিক হলেও আনুষঙ্গিক বিষয়কে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন। ১৯ আর ২০ এই জোড়া পাঠে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের পরিচয় বহন করছে। আদর্শ ছাত্র ও মন্দ ছাত্রের দুটি উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের আগে শিশুশিক্ষার এই যে প্যাটার্ন এবং মূল্যবোধ তা বহুদিন চলেছে। বোধ করি, এখনও সেই অতীত গোপনে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্ণপরিচয় রচনার সামান্য একটু ইতিহাস আছে। 'প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিন্নহৃদয় সুহৃদ প্যারীচরণ সরকারের চোরবাগানস্থিত বাটীতে একদিন নির্ধারিত হয় যে প্যারীবাবু ইংরেজী শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ্যসমূহ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা পাঠ্যসমূহ প্রণয়ন করিবেন। প্রকৃতপক্ষে দুইজনেই এই ভার লইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মফঃস্বলে স্কুল পরিদর্শনে যাইবার সময় পাল্কিতে বসিয়া বর্ণপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।' (বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগর, পৃঃ ২০৬)। এ যোগাযোগ আকস্মিক নয়। তাঁরা দুজনে মিলেই বইগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন। ইংরেজী শিশুপাঠ্য গ্রন্থের আদর্শও বিদ্যাসাগরকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। সংস্কৃত কলেজের ছেলেদের আবশ্যিক ইংরেজীপাঠে প্যারীচরণের বই কতটা সমাদৃত হয়েছিল আমাদের জানা নেই। বোধোদয় দিয়ে এই প্রবন্ধের শুরু করেছিলাম। বোধোদয় শিশুশিক্ষার ৪র্থ ভাগ। বর্ণপরিচয়েরও তৃতীয়ভাগ বলতে পারি। এই বইটি নবসাক্ষরদের জন্য। বিদ্যাসাগর প্রথম দ্বিতীয় ভাগ দিয়ে ঘর গড়েছেন। মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘর। কিন্তু চলমানতাই তার জীবনের ধর্ম। সংস্কৃত কলেজের উন্নতির জন্য তিনি যে পাঠ্যক্রম নির্বাচিত করতে চেয়েছিলেন তার একটি পরিচয় দিই। (১) ব্যাকরণের চতুর্থ শ্রেণীর জন্য—পশুসংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। (২) তৃতীয় শ্রেণীর জন্য রুডিমেন্টস্ অব নলেজ ও চেম্বার্স সাহেবকৃত গ্রন্থাবলী। (৩) দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য—চেম্বার্স সাহেবকৃত মরাল ক্লাশ বুক। (৪) প্রথম শ্রেণীর জন্য বিবিধ বিষয়, যথা—মুদ্রাঙ্কন, চুম্বকাকর্ষণ, নৌ-বিদ্যা, ভূমিকম্প, পিরামিড, চীনদেশীয় প্রাচীর, মধুমক্ষিকা ইত্যাদি। (৫) সাহিত্য শ্রেণীর জন্য—চেম্বার্স সাহেবকৃত জীবনচরিত ও অন্যান্য মনোহর ও প্রয়োজনীয় বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধ। যথা—টেলিমেক্স, রাসেলাস, মহাভারত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনুবাদসহ। (৬) অলঙ্কার শ্রেণীর জন্য—নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যবিষয়ক পত্রাবলী ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকাদি।

সংস্কৃত গণিতবিদ্যা তুলে দিলেন পরিবর্তে এল ইংরেজী ভাষায় রচিত গণিতবিদ্যার্চর্চা। কথা হল এসবের ভার নেবে কে? এখানে জোয়াল কাঁধে নিচ্ছেন বিদ্যাসাগর। তিনিই উদ্যোগী হলেন এসব বইয়ের বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করবার। দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা কেবল ইংরেজীই পড়ছে না, তার সঙ্গে সঙ্গে বহির্বিশ্বের জ্ঞানও আহরণ করছে। বিদ্যাসাগর টুলো পণ্ডিতদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। নস্যি নেওয়া আর নিদ্রাগমন পণ্ডিতদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ঢেলে সাজাতে চাইলেন বিদ্যালয়কে। বিদ্যাসাগর

কলেজ চালানোর অবসরে (ছিল কি ? করে নিতে হয়েছিল) অনুবাদ, ভাবানুবাদ, পাঠানুবাদ কর্মে মনোনিবেশ করলেন। বোধোদয় আগেই লেখা হয়েছিল। জীবনচরিত লেখা ছিল। এখন এই বোধোদয় বই'র বিষয় বস্তুর দিকে তাকানো যাক। পশুপাখির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প বলতে তিনি কথামালার গল্পের কথাই বলেছেন। মদনমোহন এটা পছন্দ করেননি। অথচ মদনমোহন যখন কবিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন কিন্তু ধ্বনি শিক্ষার অন্যতম বাহন মনে করেছিলেন। বিদ্যাসাগর এইসকল ঈশপের গল্পের সাহায্যে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন ধ্বনির মোড়কে নয় গল্পের মোড়কে। তাঁর প্রতিটি শিক্ষার প্রণালী শিশুশিক্ষাতেই শেষ নয় যদিও তা মুখ্য। তিনি প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগের পর এবারে নিয়মবন্ধনের মধ্য দিয়ে পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে শিশুকে পিতৃত্ব দানে নিয়ে যাচ্ছেন। সিঁড়িগুলি ঠিক করে দিয়েছেন। ঐ Dichotomy তাকে মানতে হবে। সেজন্যেই প্রথম ভাগে ঝগড়া আছে দ্বিতীয় ভাগে কলহকে বাদ দেননি। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালা ভাষা প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে। তিনিও মার্জার এবং বিড়াল, মা এবং মাতা দুইই প্রসঙ্গ অনুযায়ী ব্যবহারের কথা বলেছিলেন। একই সঙ্গে হাতবাড়ানো এবং রাশ টেনে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই এই পথ দেখিয়েছিলেন।

বর্ণপরিচয়ের তৃতীয় ভাগ নেই, শিশুশিক্ষার আছে। মদনমোহন চতুর্থভাগ লেখেননি। বিদ্যাসাগর লিখলেন চতুর্থ ভাগ বোধোদয়। বোধোদয় মধ্যবিত্তের জানার পরিধিকে বাড়িয়ে দিলেন। উপন্যাস আলোচনায় কেটল(Kettle) বলেছিলেন,বাস্তবতার বোধের সঙ্গে ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষণীয়। আমরা যেসব জ্ঞানবিজ্ঞানকে আয়ত্ত করেছি তাকে ধরে রাখতে হবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানেই ভাষার অগ্রগতি। বিদ্যাসাগর বস্তুনিষ্ঠ। তাঁর ভাষাও বস্তুনিষ্ঠ। বোধোদয়ের বিষয় আজকের দিনে খুবই প্রাথমিক মনে হতে পারে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সময় তা ছিল না। তিনি সযত্নে জ্ঞানের বিষয়কে বাংলাগদ্যের পরিধির মধ্যে নিয়ে এলেন। বোধোদয়ের বিষয়-বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে। সমাজ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের আইডিয়া খুবই স্বচ্ছ। এই সমাজের গঠন এবং তার উন্নতি তিনি চেয়েছিলেন। বোধোদয়ের শেষ প্রবন্ধটি 'শিল্প-বাণিজ্য-সমাজ'। বাণিজ্য সম্বন্ধে মধ্যবিত্তের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবকে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। বাণিজ্যের গুণে লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যে কত বেড়ে গেছে বিদ্যাসাগর তা লক্ষ করেছেন। এবং কিশোরদের চিত্তে বাণিজ্যের ইতিবাচক দিকটিকে স্পষ্ট করে তুলছেন। কর্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায় সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় অপরিহার্য। অচল সমাজকে সচল করে তুলছে বাণিজ্য। এইবারে সমাজ বলতে বিদ্যাসাগর কি বুঝছেন তা তাঁর কথাতেই বলি, 'কৃষক, শিল্পী ও বণিক এই তিন শ্রেণীর লোকের সাহায্য আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাদিগের দ্বারা কখনই আমাদের সমুদয় অভাবের মোচন হয় না। জ্ঞান ও ধর্মের উপার্জন, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে অন্যবিধ লোকের সাহায্য লইতে হয়। এইরূপে নানা শ্রেণীর লোক, পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সমাবেশ দ্বারা সমাজ সংগঠিত হয়। সমাজ না থাকিলে, মনুষ্য কোনও বিষয়ে, বিশেষতঃ জ্ঞান ও ধর্মের এতদৃশ উন্নতি করিতে পারিত না।' সমগ্র বিদ্যাসাগর রচনাবলীতে এই সমাজের কথা। তত্ত্ব আলোচনা বিদ্যাসাগর খুব বেশি করেননি। বামনাখ্যানম্ রচনা করেছিলেন। জানি না, নিজে কিছু বেঁটে ছিলেন বলে এই দেবতার আখ্যান শুনিয়েছিলেন কিনা। কিন্তু এটা আমাদের মানতেই হবে বিদ্যাসাগর আজীবন কাজ করেছেন, কাজের কথা বলেছেন, কাজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রেও একই অভিপ্রায় বিস্তৃত হয়েছে।

বোধোদয়ে সমাজের যে সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন তাতে লক্ষ করি মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। বোধোদয় নামটি এদিক থেকেও সার্থক। বোধোদয়ের শুরুই হয়েছে পদার্থের কথা দিয়ে। এই বস্তুমুখিতা এবং ইহলোকমুখিতা বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অন্যতম দিক। যদিও ঈশ্বর উঠে এসেছেন। নিরাকার ঈশ্বরের কথা তিনি বলেছেন। ঈশ্বর আহারদাতা ও আমাদের রক্ষাকর্তা এ কথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু তারপরেই বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন সৃষ্টিরহস্য ভেদ করতে এবং মানবজাতির ঘনিষ্ঠ হতে। সমাজের বাইরে বিরলদৃষ্ট সন্ন্যাসীদের ব্যাপার নিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েননি। গ্রামে শহরে যে মানুষ বাস করে তাদের সুখদুঃখ আশা আনন্দের সংবাদ নিতেই তিনি মনোযোগী। যে মানুষ খেটে খায়, যে মানুষ ধর্ম উপার্জন করে, যে মানুষ লেখাপড়া করে, যে মানুষ ভালোবাসা মমতায় উদ্‌বেলিত হয় বিদ্যাসাগরের ধ্যান তাঁদেরই নিয়ে। নিজেকে জানো—এই তো পরমার্থ। নিজেকে জানো মানেই নিজের অস্তিত্বকে জানো। সুতরাং জন্তুর প্রসঙ্গ দিয়ে বোধোদয়ের যথার্থ সূচনা। জন্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। কেন শ্রেষ্ঠ কিশোরদের কাছে তা তিনি স্পষ্ট করে তোলেন। আসে কালের কথা, বিস্তৃত হয় নানা খনিজ দ্রব্যের প্রসঙ্গ, ঋতুচক্রের আবর্তনের মোটা দাগের ইতিহাস।-আর মানুষকে মান দিতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর। শ্রমকে উন্নতির সোপান বলে বারবার উল্লেখ করতে হয় তাঁকে। এই কারণেই তাঁকে বলতে হয় 'ইদানীং অনেকেই কৃষিকর্মকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন ; কিন্তু বাস্তবিক উহা অতি সম্মানের কার্য। পূর্বকালে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাও চাষ করতে লজ্জিত হইত না।** আমাদের দেশে ভূমিকে লক্ষ্মী বলে। সুনিয়মে চাষ করিতে পারিলে, অল্প দিনের মধ্যেই লোকে ধনবান হইতে পারে। একে কি বলব না 'অমানিনা মানদেন' বিদ্যাসাগরের কীর্তি। অস্পৃশ্য দুঃস্থ মেয়েদের রুক্ষ্ম চুল দেখে বিদ্যাসাগর ব্যথিত। সকলেই যখন বিদ্যাসাগরের নির্দেশে আলগোছে তাদের দু পলা তেল দেবার সময়ে জাত বাঁচিয়ে অস্পৃশ্যদের না ছুঁয়ে তেল ঢেলে দিতেন তখন বিদ্যাসাগর এগিয়ে এসে রুক্ষ্ম চুলে তেল মাখিয়ে দিতেন। অস্পৃশ্যরা তেল পেয়ে খুশি হয়েছিল নিশ্চয়ই কিন্তু বিদ্যাসাগরের হাতের স্পর্শ বোধ করি তাদের হৃদয়কে নিষিক্ত করেছিল আরও বেশী। সেজন্যেই কী রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয় 'য়ুরোপীয় কেন, সরল সত্যাশ্রয়ী সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।''এই বোধোদয় ঘটাতে চাইছেন বিদ্যাসাগর এই বলে যে কৃষিকর্ম 'বাস্তবিক উহা অতি সম্মানের কার্য।' এই খানে আর একটি কথা বলি। বিদ্যাসাগর নিজে এবং তাঁর পিতা, পিতামহ কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। বাঙালী মধ্যবিত্ত দারিদ্র্যকে একরকমভাবে মেনে নিয়ে নির্বীর্যের সাধনায় মগ্ন হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের ধুতিচটিই আমাদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিল। নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যেও ব্যক্তিত্বের, প্রতিভার এবং অনন্যতন্ত্রতার (রবীন্দ্রনাথ কথিত) প্রকাশ আছে কিন্তু বিদ্যাসাগর তো দারিদ্র্যকে জয় করেছিলেন। ধনোপার্জন মানুষের ঈপ্সিত বস্তু। জোর করে দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য ঘোষণা করার অর্থ দুর্বলতা। বিদ্যাসাগর পরবর্তী কালে ধনীই ছিলেন। সেজন্যেই তাঁর লেখায় ধনোপার্জনের কথা মাঝে মাঝে উঠে আসে। যথার্থ মধ্যবিত্তের এই সহজ, সরল আকাঙ্ক্ষাকে দ্বার রুদ্ধ করে ফাঁকি দেবার প্রয়োজন নেই। বোধোদয় এই জন্যেই উপার্জনের পথকে চিনিয়ে দেয়। চতুর্থভাগ শিশুশিক্ষার ফল হল এই। সমাজ গঠন এবং সমাজের পরিবর্তন এই দুই দিক দিয়েই বিদ্যাসাগর অনন্য।

প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধির মানুষ বিদ্যাসাগর। মিল বেন্থাম নিয়ে কোনো কথা বিশেষ বলেননি। এই থেকে কোনো কোনো সমাজতত্ত্ববিদ বিদ্যাসাগরের উপরে মিল বেন্থামের প্রভাব ছিল না বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরিতে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত) মিলের বই মজুত আছে। খোঁজ নিলে বাকিদের লেখাও মিলতে পারে। আমাদের আলোচনার বিষয় তা নয়। তবু এঁদের কথা তুলছি এই কারণে যে মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর যেখানেই মনুষ্যত্ব বিকিয়ে উঠেছে দেখতে পেয়েছেন তাকেই নিয়ে আসছেন বাঙালির কাছে। চরিত্রগঠনের প্রসঙ্গ এই সূত্রেই আসে। বর্ণপরিচয় ২য় ভাগে উপদেশের বাহুল্য আছে। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, সর্বজনভক্তি, সহৃদয়তা, সত্যকথা বলা, পরের দ্রব্য না বলে নেওয়া, পড়ার সময় খেলা না করা ইত্যাদি বহু উপদেশ তিনি দিয়েছেন। প্যারীচরণ সরকারের ২৩ নং পাঠে আছে Do not swear. Man must earn his bread by the sweat of his brow. Give to all what you owe them. Hate no one (Lesson 18). To steal is a sin and a crime (Lesson 14). প্যারীচরণ মাঝে মাঝে গুজে দিয়েছেন এরকম সরল বাক্য। বিদ্যাসাগর এক একটি গুচ্ছে তা সাজিয়েছেন।

আমার কাছে যে সংস্করণটি আছে তার সাল তারিখ বলতে পারি না। ম্যাকমিলান কোম্পানির ছাপা। ছবি আছে বেশ কিছু। আর আছে প্যারীচরণ সরকার ও বিদ্যাসাগরের ছবি। বিদ্যাসাগরের ছবিটি কেন যে এখানে ঢুকে পড়ল বুঝতে পারছি না। বন্ধুত্বের নিদর্শন ? গ্রন্থসহযোগিতার নিদর্শন ? কে জানে ? বইটি অবশ্য রিভাইজ করেছিলেন Sir Rofer Lelhbridge, K. C. I. E. এই বইটিতে মূল্যবান উডকাট ছবি গৃহীত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর কিন্তু ছবি ছাড়াই ছেপেছিলেন। বর্ণপরিচয়ের পর একালের শিশুরা শিশুতীর্থে চলে আসুক সহজপাঠে। কিন্তু আগে প্রথম ভাগ তারপর সহজপাঠ। সেখানে ছড়ায় ছবিতে নূতন ধ্বনি জেগে উঠবে।

চরিত্র গঠনের নির্দেশ বর্ণপরিচয় থেকে বিস্তৃত হল আখ্যানমঞ্জরীতে (১ম, ২য়, ৩য়)। বিদ্যাসাগরের কাছে যে চরিত্রগুলি ভাল লেগেছে তাঁদেরই তিনি গ্রহণ করেছেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার চরিত্রগুলির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। বিদেশী চরিত্রে তিনি সনাতন ঐতিহ্যের বিপরীত কিছু দেখেছিলেন। সম্প্রতি একটি আলোচনায় দেখেছি, বিদ্যাসাগর প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে মেলাতে পারেননি এমন মন্তব্য। সে বিবাদে যাওয়ার ক্ষেত্র এটা নয়। আমাদের বক্তব্য শুধু এই, বিদ্যাসাগর এখানে পাশ্চাত্য চরিত্রের উদাহরণ সংগ্রহ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চরিত্রে তাঁকে মেলাতে বলছেন এইটিই লক্ষণীয়। লক্ষ করবার বিষয়, বিবরণগুলি চরিত্রের নামে নামাঙ্কিত নয়। প্রত্যুপকার, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, লোভসংবরণ, গুরুভক্তি, ধর্মভীরুতা, অপত্যস্নেহ, ধর্মপরায়তা, নিঃস্বার্থ পরোপকার, আতিথেয়তা, প্রভুভক্তি ও দয়াশীলতা, সাধুতার পুরস্কার। পরের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণদান, প্রভুভক্তি, নিঃস্পৃহতা, রাজকীয় বদান্যতা, মাতৃবৎসলতা, বর্বরজাতির সৌজন্য (সাঁওতালদের কথা মনে পড়বে আমাদের), ভ্রাতৃবিরোধ, ন্যায়পরায়ণতা। প্রথম ভাগের বিষয়গুলি দেখলেই বোঝা যাবে বিদ্যাসাগর চরিত্রগঠনে কি চেয়েছিলেন। প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে তত্ত্বগ্রন্থের অবতারণা করা যেতে পারত কিন্তু বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তকে বেছে নিলেন। আসলে বিদ্যাসাগর কি কেবল পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন তিনি নিজেও তো দৃষ্টান্তগুলির

দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। নচেৎ ভাষা এত সাবলীল এবং আবেগ থরথর হয়ে ওঠে কেন ? 'বালক অতিশয় ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হইল, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে বলিল, মহাশয়, আমায় ক্ষমা করুন, আমি ইচ্ছাপূর্বক বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন বা আপনার উপদেশ অবহেলা করি নাই। যে কারণে উপাদেয় বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকি, তাহা আপনার গোচর করিতেছি, আমার পিতা যারপরনাই নিঃস্ব ; অতিকষ্টে আমাদের দিনপাত হয়। যখন বাটীতে ছিলাম, জঘন্য পোড়া রুটি মাত্র খাইতে পাইতাম, তাহাও পর্যাপ্ত পরিমাণে নহে, একদিনও আহার করিয়া পেট ভরিত না। এখানে আমি প্রতিদিন, উত্তম সূপ ও উত্তম রুটি পেট ভরিয়া খাইতেছি। এখানে আসিবার পূর্বে, আমি কখনও এরূপ উত্তম ও প্রচুর খাই নাই। আমার পিতামাতা প্রায় প্রতিদিন, একপ্রকার উপবাসী থাকেন। আহার করিতে বসিলেই তাঁহাদিগকে মনে পড়ে ; তাঁহাদের আহারের কষ্ট মনে করিয়া, উপাদেয় বস্তুর ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি হয় না।' আমরা কি বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়ছি নাকি য়ুরোপীয় কোন সৈনিক বালকের আর্ত রূপ প্রত্যক্ষ করছি। এখানেই দেখি আখ্যানমঞ্জরীর ভাষায় বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে হৃদয়বত্তা যুক্ত হচ্ছে। আর বিষয় এবং বিষয়ীর ঐক্যই বিষয়ের মর্মকে উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছে অনায়াসে বাংলাগদ্যের সক্ষমতায়। মধ্যবিত্ত চরিত্রগঠনে বিদ্যাসাগর অক্লান্ত। জীবন সংগ্রামের। এই সংগ্রামের কাহিনীগুলি তিনি তুলে আনলেন নানা ইংরেজী গ্রন্থ থেকে। বালকবালিকা চিত্তে সংস্কাররূপে এমত দৃষ্টান্ত স্থায়ী হয়ে যায়। এখানেই বিদ্যাসাগরের পাঠ্য পুস্তকের সার্থকতা। পাঠ্যগ্রন্থের প্যাটার্ন মানুষের জীবনযাপনের প্যাটার্নের মধ্যে। সমাজের সঙ্গে পাঠ্যগ্রন্থ অন্বিত। সমাজ-উন্নয়নে বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান আর কর্মের সঙ্গে পরিচিত হবে। প্রয়োজনে ইউরোপেরও দ্বারস্থ হতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছিলেন, 'যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যা কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেননি। তিনি জানতেন বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বিরোধ নেই।'

বর্ণমালা : বিদ্যাসাগর : নতুন প্রস্তাব

পবিত্র সরকার

বাংলা বর্ণমালা আসলে সংস্কৃত বর্ণমালার আদলে তৈরি। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে ভারতে লিপি এসে পৌঁছেছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এই লিপি এসেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে, হয়তো আদিতে সেই মিশর থেকে, কিংবা মিশর থেকে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা থেকে। এসেছিল দুটো পথে : একটা ইরান আফগানিস্তান হয়ে স্থলপথে, আরেকটা ইরাক থেকেই আরব-সমুদ্র হয়ে জলপথে। জলপথে যেটি এসেছিল সেটি ব্রাহ্মী নাম নিয়ে প্রায় সর্ব-ভারতে গৃহীত হয়। এর সবচেয়ে প্রাচীন লিখিত নিদর্শন আমরা পাই অশোকের অনুশাসনগুলিতে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই ব্রাহ্মীলিপির সর্বাঙ্গীণ ছাঁচটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল, এমন অনুমান করা হয়েছে। ব্রাহ্মীলিপি লেখা হত এখনকার বাংলা দেবনাগরী ইত্যাদি লিপির মতো বাঁদিক থেকে ডান দিকে।

স্থলপথে যেটি এসেছিল[১] সেটির নাম খরোষ্ঠী বা খরোষ্ঠী লিপি। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে ভারতবর্ষের বাইরে খোটান (চিনা তুর্কিস্থান) ইত্যাদি অঞ্চলে এ লিপি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এটি লেখা হত ডানদিক থেকে বাঁদিকে—এখনকার আরবি-ফারসি-উর্দু (-সিন্ধি-কাশ্মীরি) লেখার ধরনে।

ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী দুটি লিপিই মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছে, না শুধু খরোষ্ঠী এসেছে, ব্রাহ্মী উদ্ভূত হয়েছে ভারতে[২]—এইসব তর্কের মধ্যে যাওয়া এখানে আমাদের পক্ষে অবান্তর। আমরা শুধু এটাই বিশেষভাবে বলতে চাই যে, মধ্যপ্রাচ্যের লিপি যে-ভাবেই ভারতে এসে পৌঁছে থাকুক, ভারতীয় মনীষা অন্তত ব্রাহ্মী বর্ণমালায় তাকে অসাধারণ বিজ্ঞানসম্মত একটি বিন্যাসের আশ্রয়ে এনেছে।

এই বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে দেখি আমরা। মধ্যপ্রাচ্যের বর্ণমালার মূল ছাঁচটি আরবি বর্ণমালায় রক্ষিত এবং ইয়োরোপের বর্ণমালা যে মধ্যপ্রাচ্য থেকেই গেছে, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। ইয়োরোপের বর্ণমালা মধ্যপ্রাচ্যের বর্ণমালার চেয়ে একদিক থেকে একটু উন্নত ও পরিশীলিত[৩], তার কারণ তা যে এখন শুধু বাঁ থেকে ডানদিকে লেখা হয় তা নয়, তার প্রত্যেকটি স্বরধ্বনির জন্য আলাদা-আলাদা প্রতীক আছে। গ্রিকরা যখন ফিনিশীয় সমুদ্র-সওদাগরদের কাছ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের লিপি গ্রহণ করে তখন তার বর্ণমালায় স্বরচিহ্ন ছিল না। কিন্তু কয়েকটি ব্যঞ্জনচিহ্ন ছিল সেগুলি গ্রিক ভাষা লেখার ব্যাপারে কোনো কাজে লাগত না। চমৎকার বুদ্ধি খাটিয়ে গ্রিকরা সেই পাঁচটি নিরর্থক ব্যঞ্জনচিহ্নকে তাদের ভাষার স্বরধ্বনি লেখার কাজে লাগায় এবং তারই ফলে গ্রিক বর্ণমালা হয়ে ওঠে বর্ণলিপি বা alphabet। মধ্যপ্রাচ্যের সব লিপিই থেকে যায় মূলত আক্ষরিক (syllabic) স্তরে। অর্থাৎ গ্রিক লিপিতে—তা থেকে পরবর্তী রোমক ও সিরিলিক ইত্যাদি ইয়োরোপীয় লিপিতে—একটা ধ্বনির জন্য একটি বর্ণ তৈরি হয়ে গেল ; কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের লিপিতে একটি বর্ণে অনেক সময় একটি অক্ষর বা সিলেব্‌ল সূচিত হওয়ার ফলে তা থেকে

পড়া ব্যাপারটা একটু জটিল থেকে গেল ।।তাতে তো স্বরবর্ণের চিহ্ন প্রায়ই লেখা হয় না, অনুমান করে নিতে হয় । বিদেশী শিক্ষার্থীদের শব্দগুলির উচ্চারিত রূপ না জানা থাকলে সে অনুমান কষ্টসাধ্য । এখন নানারকম চিহ্ন, 'জের্' 'জবর্' 'পেশ্' ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে তার জটিলতা কমেছে, তবু তা সম্পূর্ণ 'অ্যালফাবেটিক্যাল' হয়ে উঠতে পারেনি[৭]।

তা না হোক, কিন্তু ইয়োরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের বর্ণমালার বিন্যাস প্রায় একরকম থেকে গেছে । দুটি বর্ণমালারই বর্ণগুলির অবস্থান-বিন্যাসে কোনো যুক্তিসংগত পরিকল্পনা নেই । আমরা পরপর ইয়োরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের বর্ণগুলির কয়েকটিকে এভাবে সাজাই—

A	B	C	D	E	F	G
আ	ব্	প্	ত্	স্	জ্	চ্
[আলিফ্]	[বে]	[পে]	[তে]	[সে]	[জিম্]	[চে]
H	I	J	K	L	M	
হ্	খ্	দ্	জ	র্	জ	
[হে]	[খে]	[দাল্]	[জাল]	[রে]	[জে]	

আপাতত এটুকুই বিচার করা যাক । এখানে দেখতে পাচ্ছি, আরবি বর্ণমালার বর্ণসজ্জায় যেটুকু-বা যুক্তি আছে, রোমক বর্ণমালায় তাও নেই । আরবি বর্ণমালায় জ আর চ, 'হ' ও 'খ'[৮] ইত্যাদি উচ্চারণের দিক থেকে পাশাপাশি, বর্ণমালাতেও পাশাপাশি সাজানো আছে । এ বর্ণমালা পুরো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ ধরনের আরও কিছু কিছু আংশিক ধ্বনিবিজ্ঞানের সংগতি এ বর্ণমালায় আছে । রোমক বর্ণমালায় তা নেই । সেখানে A-র পরে B, B-র পরে C—যার কালক্রমে 'স্' [s] আর 'ক্' দুটো উচ্চারণ তৈরি হয়েছে, তার পরে D, তার পরে আবার E । প্রথমে স্বরধ্বনি, তারপরে তিনটে অসম, উচ্চারণসম্পর্কহীন ব্যঞ্জন, তারপরে আবার একটা স্বরধ্বনি[৯] ।

ভারতীয় বর্ণমালা কিন্তু বিন্যাসের দিক থেকে আরবি ও রোমক—এ দুয়ের চেয়েই অনেক বেশি সুশৃঙ্খল । এর মূল বৈশিষ্ট্য—যা অন্য কোনো বর্ণমালায় পাওয়া যাবে না—তা হল—

১· এতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পূর্ণ আলাদা করা আছে ;

২· এতে অর্ধব্যঞ্জনগুলি (ঋ, ৯, ঋৃ ইত্যাদি) স্বরধ্বনির অন্তর্গত করা হয়েছে, যা ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত, কারণ সেগুলি সংস্কৃতভাষায় স্বরধ্বনির মতোই সিলেব্‌লের কেন্দ্রে বসতে পারে ।

৩· এতে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে আরও নানা অতি সূক্ষ্ম বিন্যাস করে সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে । যেমন—

(i) যেসব ব্যঞ্জনের উচ্চারণে মুখের রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় সে 'স্পর্শ'-বর্ণগুলিকে প্রথমে রাখা হয়েছে । তার সংখ্যা পঁচিশটি—'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত ।

(ii) যে-সব ব্যঞ্জনের উচ্চারণে মুখের রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না সেগুলিকে রাখা হয়েছে তার পরে, দুটি ভাগে । প্রথম ভাগে আছে অন্তঃস্থ বর্ণগুলি, তারপরে

আছে উষ্মবর্ণ শ স ষ হ।

(iii) স্পর্শবর্ণগুলিকেও অঘোষ-ঘোষবৎ-নাসিক্য—এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে, অঘোষ আর ঘোষবৎকে আবার অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ এই দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

এসবের ফলে সংস্কৃত বর্ণমালার যা বিন্যাস দাঁড়িয়েছিল তাতে অন্তত ঋগ্‌বেদের সময় বর্ণ ছিল ৬৪টি[৬]। পরে এই বর্ণের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। পূর্বভারতের কুটিল লিপি হয়ে, দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাচীন বাংলা লিপি যখন উনবিংশ শতাব্দীতে এসে পৌঁছোয়, তখন বর্ণমালায় ছিল মোট ৫০টি বর্ণ : ১৬টি স্বরবর্ণ, ৩৪টি ব্যঞ্জন বর্ণ। রামমোহন তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) বইতে ওই "৩৪ হলে (=ব্যঞ্জনে) এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত" বাংলা বর্ণমালার কথা বলেছিলেন। তাতে ব্যঞ্জনে হ-এর শেষে 'ক্ষ' ছিল শেষতম বর্ণ, আর স্বরে ছিল ৠ (ডবল ঋ), ডবল ৯, এবং 'অং' ও 'অঃ' রূপে অনুস্বার ও বিসর্গ। এ ঐ ও ঔ-এর পরে। রামমোহন বলেছিলেন "ণ য ব ষ ঋ ঋ ৯ ঐ অং অঃ"—এই কয় অক্ষর সংস্কৃত পদ ব্যতিরেকে গৌড়ীয় ভাষায় প্রাপ্ত হয় না।"

আমরা দেখব যে, বাঙালির উচ্চারণে আর কিছু "অক্ষর" উচ্চারিত হয় না সংস্কৃত বর্ণমালার।

বিদ্যাসাগর যখন এই ষোল স্বরবর্ণ এ চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণের বাংলা বর্ণমালা হাতে পেলেন, তখন বাঙালির উচ্চারণের কথা তাঁর খেয়ালে বিশেষভাবেই ছিল। ১৮৫৫-তে ১৩ এপ্রিল বেরোল 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ, তার 'বিজ্ঞাপনে' তিনি বললেন,

..."বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, দীর্ঘ ঋকার ও দীর্ঘ ৯কারের প্রয়োগ নাই, এই নিমিত্ত, ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না ; এজন্য, ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে আর চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণ স্থলে, এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্য অথবা পদের অন্তে থাকিলে ড়, ঢ়, য় হয় , ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহারা স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়া উচিত, এই নিমিত্ত উহারাও স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ : এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

এর বিশ বছর পরে যখন 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের ষষ্টিতম সংস্করণ প্রকাশিত হল, তখন অ-কারান্ত পদের শেষে '*', বসিয়ে উচ্চারণনির্দেশ ছাড়াও খণ্ড ত বর্ণটিকে যোগ করলেন তিনি বর্ণমালার পরীক্ষায়, এই কথা বলে—

"বাঙ্গালা ভাষায় তকারের ত, ৎ, এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে ; দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড তকার। ঈষৎ, জগৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় খণ্ড তকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড তকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষভাগে, তকারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।"

বর্ণমালার মধ্যে বিদ্যাসাগর ঠিক গ্রহণ করেননি খণ্ড তকে; গ্রহণ করেছেন 'বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা'-য় । তবু তারপরে কী করে আলগোছে খণ্ড ত বর্ণমালার মধ্যে আশ্রয় পেয়ে গেল, তা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে ।

আমরা লক্ষ করি, বিদ্যাসাগরই প্রথম সংস্কৃত বর্ণবিন্যাসের অন্ধ অনুসরণ না করে, তার সঙ্গে যোগ, বর্জন এবং পুনঃসংস্থান—এই তিন উপায়েই তার পরিবর্তন সাধন করলেন । নতুন বর্ণ যে তিনি উদ্‌ভাবন করেছেন তা নয় । ড়, ঢ়, য়, ৎ—এ চারটি বর্ণই বাংলা পুথিতে ব্যবহৃত হত, তিনি তাদের বর্ণমালায় স্থান করে দিয়েছেন ; ৎ-এর ক্ষেত্রে তাঁরই ইঙ্গিতে পরবর্তীকালে তা বর্ণমালার বর্ণরূপে স্থান পেয়েছে । এক্ষেত্রে লিপি বর্ণমালাকে প্রভাবিত করেছে বলতে পারি । হ্যালহেডে 'র'-এর তিনটি চেহারাই ছিল—ৰ, র এবং ব । পরবর্তীকালে মুদ্রণে রামমোহনের সময়েই 'র' প্রায় একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা পায় । হ্যালহেডে 'ড়', ँ এবং খণ্ড ত-এরও প্রয়োগ লক্ষ করি আমরা । ফলে ঈশ্বরচন্দ্র নতুন বর্ণ সৃষ্টি করেছিলেন, একথা ঠিক বলা যাবে না । তিনি বর্ণমালার ক্ষেত্রে যা করেছিলেন তা এই :

১· বর্জন : দীর্ঘ ঋকার ও দীর্ঘ ৯কার ।
   যুক্তি · বানানে ('প্রয়োগে') অপ্রচলন ।
   ক্ষ-বর্জন । যুক্তি : উচ্চারণ ও সংগঠন ।
২· স্থানান্তরণ : অনুস্বার ও বিসর্গকে স্বরবর্ণের শেষ থেকে উঠিয়ে এনে ব্যঞ্জন তালিকার শেষে স্থাপন । যুক্তি : উচ্চারণ ।
৩· সংযোজন : চন্দ্রবিন্দুকে, ব্যঞ্জনের সর্বশেষে স্থাপন ; ড়, ঢ়, য়-কে উষ্মধ্বনির পরে । যুক্তি : উচ্চারণ । এগুলির উচ্চারণ ড ঢ য থেকে পৃথক ।

বিদ্যাসাগরের হাতেই বাংলা বর্ণমালা এখনকার চেনা চেহারা লাভ করল । বলা বাহুল্য, এই বর্ণমালাই এখন আমাদের কাছে স্বীকৃত ও গৃহীত । এখনও কোনো কোনো অপ্রামাণিক প্রথম পাঠ্যে ডবল ঋ দেখা যায়, কিন্তু তা কেবল লেখক বা প্রকাশকের অজ্ঞতার জন্যই । বাংলা বর্ণমালার ওই স্বীকৃত সংস্কারটি সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা বা জ্ঞান নেই বলে ।

৩

বলা বাহুল্য, বারে বারেই এই বর্ণমালারও সংস্কারের প্রস্তাব উঠেছে । যেমন প্রস্তাব উঠেছে লিপি সংস্কারের । বর্ণমালা আর লিপি এক নয় । লেখাতে বর্ণমালা ও অন্যান্য লিখিত প্রতীক যেভাবে ব্যবহৃত হয় তার প্রকরণ ও প্রকৌশলই লিপি । এই সব সংস্কারের প্রকল্প এপার ওপার দু বাংলাতেই তৈরি হয়েছে । 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', (ঢাকা) 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা' 'পূর্ব পাকিস্তান ভাষা কমিশনের রিপোর্ট' 'দেশ' থেকে আরম্ভ করে ১৯৮৫-তে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা'তে পর্যন্ত এইসব বিচিত্র প্রস্তাব ছড়িয়ে আছে—তার দীর্ঘ ইতিবৃত্ত ও বিপুল বৈচিত্র্য এ প্রবন্ধে আনা সম্ভব নয় । তবু মূল কথাগুলি বলে নেওয়া যেতে পারে । লিপির ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রস্তাব করা হয়েছে :

ক· উদ্‌ভাবন সংক্রান্ত প্রস্তাব

১· অ বর্ণের একটি 'কার'-চিহ্ন উদ্‌ভাবন করতে হবে । [এখনও গৃহীত হয়নি]
২· 'অ্যা' ধ্বনির একটি নিজস্ব বর্ণচিহ্ন এবং 'কার'-চিহ্ন উদ্‌ভাবন করতে হবে । [গৃহীত হয়নি]

৩· 'া'চিহ্ন দিয়ে 'আই' ধ্বনি বোঝাতে হবে। [গৃহীত হয়নি]

৪· ওকার এবং ঔকারের দুটো দুটো চিহ্নের (ো, ৌ) বদলে একটা চিহ্ন উদ্‌ভাবন করতে হবে। [হয়নি]

৫· অন্তঃস্থ ব-এর জন্য ৱ লেখার প্রস্তাব। [গৃহীত হয়নি]

খ· বিন্যাস সংক্রান্ত প্রস্তাব

১· 'কার' চিহ্নগুলিকে, বিশেষত হ্রস্ব উকার, দীর্ঘ উকার, ঋকার, তলায় না বসিয়ে নিচে ডানপাশে বসাতে হবে। [টাইপ-রাইটার ও লাইনোটাইপে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু হাতের লেখায় ও হাত-কম্পোজে, পিটিএস-এ গৃহীত হয়নি]

২· একারকে ১-এর চেহারা দিয়ে বর্ণের ডানদিকে বসাতে হবে, বাঁদিকে নয়, ফলে 'কে' হবে ক । এইভাবে হ্রস্ব ইকার ঐকার ইত্যাদিকেও ডানদিকে বসাতে হবে। [গৃহীত হয়নি]।

গ· যুক্তব্যঞ্জনের সরলীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব

১· কিছু যুক্তব্যঞ্জন সরল করতে হবে ; হয় ভেঙে লিখতে হবে 'লণ্ডন'-কে 'লমডন' করে, না হয় দুটো ব্যঞ্জনকে স্পষ্ট বোঝা যায় এমন চেহারা দিতে হবে, 'ঙ্গ'-কে ঙ্গা করে। [কিছু কিছু গৃহীত ও চালু হয়েছে]

ঘ· ভিন্ন চেহারা দেওয়ার প্রস্তাব

১· অনুস্বারকে [°] বা মাত্রায় ঊর্ধ্ববিন্দু হিসেবে লেখার প্রস্তাব—পুরোনো কালে যেমন ছিল। [গৃহীত হয়নি]

ঙ· লিপি-পরিবর্তনের প্রস্তাব

১· বাংলা লিপি ছেড়ে দেবনাগরী, রোমক বা আরবি লিপি গ্রহণ করা হোক। [গ্রহণ করা হয়নি]

সব প্রস্তাব এখানে উল্লেখ করাও হল না। কিন্তু এ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, লিপির পরিবর্তনের ব্যাপারে সাধারণভাবেই মানুষ একটু রক্ষণশীল। সহজে তার বড় রকমের পরিবর্তন আমরা চাই না। অল্পে-অল্পে, রইয়ে-সইয়ে, ইতিহাসের স্বাভাবিক বিবর্তনে যে পরিবর্তন হয়, সেটুকু ঠিক আছে। তাতে যন্ত্রের প্রয়োজন, ব্যক্তিগত উদ্‌ভাবন, বড় কাগজের খবরদারি—সবই মেনে নেওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু তারও একটা গতি আছে। সেই গতিভঙ্গ হলেই মুশকিল।

৪

বর্ণমালার ক্ষেত্রেও তাই। বর্ণমালারও হঠাৎ পরিবর্তন আমরা মেনে নিতে চাই না। বর্ণমালার পরিবর্তনের যেসব প্রস্তাব এসেছে সেগুলি মূলত এইরকম :

ক· বর্জনের প্রস্তাব

১· যেসব বর্ণ বাংলায় উচ্চারিত হয় না সেগুলি বর্জন করা হোক, যেমন ঈ, ঊ, ঋ, ঌ, ঞ, ণ, য, অন্তঃস্থ ব, ষ। [সব গৃহীত হয়নি ; ঌ-টি কোথাও কোথাও বর্জিত হয়েছে]। আর ৎ বর্জিত হোক, কারণ শুধু ত দিয়েই কাজ চালানো যায়, দেবনাগরীতেও তাই ঘটে। অনুস্বার বা ঙ-এর যেকোনো একটি বর্জিত হোক। [কোনোটাই গৃহীত হয়নি]

খ· সংযোজনের প্রস্তাব

'অ্যা' ধ্বনিটির নিজস্ব একটি বর্ণ সংযোজনের। [গৃহীত হয়নি]

গ· সরলীকরণের প্রস্তাব

ঐ ঔ যুক্তস্বর। বাংলায় আরও অন্তত পনেরোটি এ ধরনের যুক্তস্বর আছে— আয়, আই্‌, অয়্‌ ইত্যাদি। সেগুলি যদি ভেঙে লেখা যায় ঐ ঔ-কে ওই, ওউ (ফলে বৌ-কে বউ) লেখা যাবে না· কেন? [কেউ কেউ গ্রহণ করেছেন]

ঘ· পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব

বর্ণমালায় বর্ণের বিন্যাস ও অবস্থানের একটু-আধটু অদলবদল করা হোক।

৫

এইরকম একটি পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব আমরা সাম্প্রতিককালে[৭] করেছি। এ পুনর্বিন্যাসে বর্ণমালার বর্ণসংস্থানের কোনো বিপর্যয়কারী পরিবর্তনের কথা ভাবা হয়নি। এতে বর্জনের খুব বড় কোনো প্রস্তাব নেই, সংযোজনের কোনোই প্রস্তাব নেই, চেহারা বদলানোরও কোনো প্রস্তাব নেই।

বর্জনের প্রস্তাব যৎসামান্য। শুধু ঌ, আর অন্তঃস্থ ব বর্জিত হবে। ঌ বাদ দেব এই কারণে যে কোনো বাংলা শব্দ লেখায় ঌ-এর ব্যবহার নেই, সংস্কৃতেও একটি শব্দেই তার ব্যবহার বেশিরভাগ সময় দেখতে পাই—সেটি হল 'কঌপ্ত'। আমরা বাংলায় যদি শব্দটি লেখা দরকার মনে করি, তাহলে তার অনেক রাস্তা আছে। 'ক্লৃপ্ত' লিখতে পারি, কিংবা মারাঠি মূর্ধন্য ল-এর চিহ্ন ধার করতে পারি, কিংবা ইংরেজি এল্‌ (l)-এর নিচে ফুটকি লাগিয়ে তা 'ক্‌' আর 'প্ত'-এর মাঝখানে বসিয়ে দিতে পারি। শুধু একটা শব্দ লেখার জন্যে একটি বর্ণ বর্ণমালায় রেখে দিতে হবে—এ বড় অন্যায় জুলুম। আর ব-এর কথায় বলি— এখন যে আছে য র ল ব শ, তার জায়গায় শুধু থাকবে য র ল শ। মাঝখানের ব-টি উধাও হয়ে যাবে। এর একটাই যুক্তি। বাংলা লিখিত বর্ণ ব উচ্চারণে সর্বত্রই স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন—দুই ঠোঁটের দরজা একেবারে সেঁটে তা উচ্চারণ করতে হয়। সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব ছিল 'ওয়্‌' বা ইংরেজি 'w'-এর মতো উচ্চারণে। বাংলায় 'ব' লিখে সে উচ্চারণ আমরা কখনোই করি না। তার সঙ্গে প ফ ব-এর যে ব—তার কোনো তফাতই নেই। তাহলে এই অবান্তর বর্ণটিকে রাখি কেন বর্ণমালায় খামোখা। একটি ব দিয়েই আমাদের দিব্য কাজ চলে যাবে।

তাহলে আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণমালা আপাতত এই দাঁড়াল—

অ	আ	ই	ঈ	
উ	ঊ	ঋ		
এ	ঐ	ও	ঔ	
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	শ	ষ

স হ ড় ঢ় য়

ৎ ং ঃ ঁ

এইবার রাখছি আমাদের বর্ণসংস্থান অদলবদল করে একটু পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব। পুনর্বিন্যাস করব দু জায়গায়—ঋ-কে ধরে স্বরবর্ণের শেষ সারিতে, আর অন্তঃস্থ বর্ণ থেকে বাকি ব্যঞ্জনে।

স্বরবর্ণের শেষ লাইনে আছে চারটি বর্ণ এ ঐ ও ঔ। চোখে দেখার দিক থেকে এ বিন্যাস ঠিকই আছে—এ আর ঐ প্রায় একরকমই দেখতে, যেমন একরকম ও আর ঔ। ফলে শিশুরা সাদৃশ্যের অবলম্বন পায় শেখার সময়। কিন্তু ঐতিহাসিক সম্বন্ধে যুক্ত হলেও এখন এ-র সঙ্গে ঐ-এর উচ্চারণের কোনো সম্পর্ক নেই। এ বলতে মুখ ছড়িয়ে যায়, ঐ বলতে মুখ প্রথমে গোল হয়, তারপর ছড়িয়ে যায়। এ একক স্বর, ঐ যৌগিক স্বর বা দ্বিস্বর। যেমন ও একক স্বর, ঔ দ্বিস্বর।

আমরা দ্বিস্বর দুটিকে পাশাপাশি আনতে চাই। শেষ সারিটা হোক এ ও ঐ ঔ। এতে পাশাপাশি চোখে-দেখা চেহারার মিল না থাকলেও একটিকে ডিঙিয়ে আরেকটির সঙ্গে মিল ঠিকই থাকছে, সে মিল উবে যাচ্ছে না। কিন্তু বর্ণমালার ক্ষেত্রে একটা লজিক এই তৈরি হচ্ছে যে, দ্বিস্বর দুটি থাকছে একেবারে শেষে, তার আগে থাকছে সব একক স্বর। ঋ-কেও আমরা একেবারে শেষ সীমান্তে এনে বসাতে পারি, কারণ আমাদের মতে 'ঋ' মূলত ব্যঞ্জন ছিল—ভাষাতত্ত্বে যাকে আক্ষরিক ব্যঞ্জন [Syllabic consonant] বলে তাই। অর্থাৎ তা সিলেব্‌লের কেন্দ্রে বসতে পারত। আমার মতে তা র্‌-এরই রূপভেদ বা অ্যালোফোন ছিল।

তাহলে আমাদের স্বরবর্ণমালা দাঁড়াল এইরকম—

অ আ ই ঈ

উ ঊ এ ও

ঐ ঔ ঋ।

এ বিন্যাসকে একটু শিথিল ছড়ার ছন্দে ফেলে এভাবে সুর করে নামতার মতো করে শেখানো যাবে—

অ - আ - হ্রস্ব ই | - দী ইর্ ঘো - ঈ -

হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ - এ - ও | - ঐ - ঔ - ঋ।

এবার ব্যঞ্জনের পুনর্বিন্যাস। 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত যা আছে তাই থাকছে। কিন্তু অন্তঃস্থ বর্ণের সারিতে ব বর্জনের পর কী থাকছে তাতে একটু উপরে আবার চোখ বুলিয়ে নিতে বলি। ওইখানে আমাদের প্রস্তাব : এইভাবে নতুন করে বর্ণগুলিকে সাজাব আমরা—

য র ড় ঢ় ল

য় শ ষ স হ

ৎ ং ঃ ঁ

কেন এই নতুন বিন্যাস? 'য' যেখানে আছে সেখানে যদি থাকে—তার পাশের সমস্ত বর্ণ উচ্চারণের দিক থেকে কাছাকাছি। সবই জিভের ডগা দিয়ে উচ্চারিত হয়, কোনোটা ডগা উলটে ছোঁ মেরে (ড়, ঢ়), কোনোটা ডগা কাঁপিয়ে (র), কোনোটা ডগা ঠেকিয়ে (ল)। উপরের সারিতে য আর তলার সারিতে একই জায়গায় য় বসালে শিশু সাদৃশ্যের সুবিধেও পাবে। আর শ ষ স হ—সবই উষ্মধ্বনি, কাজেই পাশাপাশি বসাতেই হবে। খণ্ড ত আর অনুস্বারের আংশিক সাদৃশ্য ও পার্থক্য দুইই আছে— শিশু পাশাপাশি দেখে তা বুঝতে

শিখুক। ং ঃ ঁ—তিনটিতেই উপরে একটি বিন্দু আছে, কেবল তলায় অন্যরকম। তারা এভাবেই ছিল, এখনও থাকবে।[৮]

এইবার প্রস্তাবিত নতুন বর্ণমালা[৯] কি আবার লিখব? লিখে দেখা যাক না—

অ আ ই ঈ
উ ঊ এ ও
ঐ ঔ ঋ

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য র ড় ঢ় ল
য় শ ষ স হ
ৎ ং ঃ

এর সঙ্গে আর একটা কথা যোগ করি। আমার মনে হয়, য়-এর নতুন নাম যদি দিই 'ইয়', খণ্ড ত-এর নতুন নাম 'অৎ' এবং ং ঃ ঁ—এ তিনজনের নতুন নাম যথাক্রমে 'অং', 'অঃ', 'অঁ' দিই, তাহলে শিশুদের উচ্চারণ ধরবার সুবিধে হবে।

আমরা আগে যেমন করেছি, তেমনই করে এইসব প্রস্তাবের পরেও কি লিখে দেব 'গৃহীত হয়নি'? নাকি একটু ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করবার অবসর নেব? ঠাণ্ডা মাথায় বিচার জিনিসটা খুবই দুষ্প্রাপ্য। অনেকেই পরিবর্তনের নাম শুনলেই শাস্ত্রের দোহাই দেন, কেউ বলেন, 'কার কী অসুবিধে হচ্ছিল হে?' কিংবা বলেন, 'বেশ তো চলছিল, খামোখা এ হুজুগ কেন?'

খামোখা কি না, সেটাই স্থির হোক আগে। অসুবিধে হচ্ছিল কি না তা যেমন বিচার করতে হবে, তেমনই দেখতে হবে আর একটু সুবিধে হতে পারে কি না। ভেবে দেখতে দোষ কী?

টীকা

১· Gelb, I.J. ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা প্রায় গ্রহণই করেছেন এ মত যে, পূর্বী আরামীয় লিপি থেকে এ দুটি ভারতীয় লিপির উদভব।

২· এ দুটি ছাড়াও আরও বহু লিপি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল সেই প্রাচীনকালেই। যবনানী বা আয়োনীয় গ্রিক লিপির প্রচলনের সাক্ষ্যও আছে। দ্র· সত্যেন্দ্র, 1989 : 201

৩· অন্য আরেক দিক থেকে তা আর একটু আদিম—কারণ আরবি বর্ণমালায় যেটুকু ধ্বনিতত্ত্বসংগত ভিত্তি আছে—একাধিক বর্ণের ধ্বনিগত ও অবস্থানগত, সেই সঙ্গে আকৃতিগত ঐক্য (ভারতীয় বর্ণমালায় শেষেরটি এত বেশি নেই) আছে, ইয়োরোপীয় বর্ণমালায় তা নেই বললেই চলে। পরে দেখুন।

৪· আরবি বর্ণমালায় এই ধ্বনি ও রূপের দিক থেকে সদৃশ বর্ণের নিকট বা পাশাপাশি বিন্যাসের ক্ষেত্রগুলি এইরকম : ১· বে-পে, জিম-চে, হে-খে., দাল-জ্বাল-যাল, সিন্‌-শিন্‌, কাফ্‌-গাফ ইত্যাদি।

৫· আমার 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (চিরায়ত প্রকাশন,

১৯৯১) এ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা আছে।
৬· ঘোষঠাকুর, ১৯৭৮ ৮৯ পৃ·।
৭· দ্র· সরকার, ১৯৯০।
৮· সরকার, ১৯৯০ প্রবন্ধটি প্রকাশের পর অনেকেই চিঠিপত্রে এ বিষয়ে সংশোধন পরিমার্জনের প্রস্তাব করে লেখককে উৎসাহ দেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীযতীন্দ্রমোহন মজুমদার এবং শ্রীপ্রদ্যোত সরকার (ব্যক্তিগত চিঠিতে) বিশেষ মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন। আমার বর্তমান প্রস্তাবটি 'গণশক্তি'-র প্রস্তাবটি থেকে বেশ কিছুটা সরে এসেছে, তার মূলে এ দুজনের প্রস্তাব কার্যকর।
৯· এ বর্ণমালায় স্বরবর্ণ ১১টি, ব্যঞ্জন ৩৯টি। সব মিলিয়ে ৫০টি বর্ণ।

উৎস ও সূত্রনির্দেশ

কাইয়ুম, মোহাম্মদ আব্দুল, ১৯৭৬, 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা', ঢাকা-রাজশাহী, মখদুনী অ্যান্ড আহ্সানউল্লাহ্ লাইব্রেরি।

গোস্বামী, উপেন্দ্রনাথ, ১৯৮৭, 'অসমীয়া লিপি', গুবাহাটী, অসম প্রকাশন পরিষদ।

ঘোষঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭৮, 'সংস্কৃত বর্ণমালার ইতিহাস', ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, ১৯৮১, 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, 'বর্ণপরিচয়', কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড।

মুখোপাধ্যায়, বরুণকুমার, ১৯৮১, "বাংলা মুদ্রণের চার যুগ", দ্র· বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, ১৯৮১ : ৮৮-১০৩ পৃ·।

রায়, রামমোহন, ১৮৩৩, 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ', দ্র· রামমোহন গ্রন্থাবলী ; ১৩৮০, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

রায়চৌধুরী, সুবীর, ১৯৮১, "বাংলা হরফের তিন দশা", দ্র· বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন, ১৯৮১ : ১০৪-১৪ পৃ·।

সত্যেন্দ্র, ড·, ১৯৮১, 'পাণ্ডুলিপি বিজ্ঞান', জয়পুর, রাজস্থান হিন্দী গ্রন্থ অকাদমী।

সরকার, পবিত্র, ১৯৯০, "আমাদের বর্ণমালার পুনর্বিন্যাস", 'গণশক্তি', ১৬ মার্চ, ১৯৯০।

সরকার, পবিত্র, ১৯৯১, 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা', (২য় সংস্করণ), কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন [প্রকাশের অপেক্ষায়]।

Gelb, I.J., 1968, *A Study of Writing*, Chicago, University of Chicago Press

Halhed, Nathaniel Brassey, 1778 (1980), *A Grammar of the Bengal Language*, Calcutta, Ananda Publishers Pvt. Ltd.

Kannaiyan, V., 1960, *Scripts : In and Around India*, Madras, Government Museum Bulletin.

'নতুন মানুষের চাষ' ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জ্যোতির্ময় ঘোষ

'আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও কতকগুলি নিরুপায় জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতির ভরণপোষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হইয়া আসিতেছে .... এক্ষণে যে সকল ব্যক্তি আমার নিকট মাসিকবৃত্তি পাইয়া থাকেন আমি অবিদ্যমান হইলে তাঁহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে যাঁহারা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যেরূপ মাসিক বৃত্তি পাইবেন তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে।'

বিদ্যাসাগরের 'উইল'-এর ৬ ও ৭ সংখ্যক সূত্র থেকে উপরের অংশটি নির্বাচিত ও উদ্ধৃত হলো। সর্বাধিক পরিমাণ মাসিক বৃত্তি হলো পঞ্চাশ টাকা ও সেই টাকা পাবেন 'পিতৃদেব শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়'। তালিকার নামগুলি 'প্রথম' ও 'দ্বিতীয় শ্রেণী'তে বিভক্ত। সর্বনিম্ন মাসিক বৃত্তির পরিমাণ দু'টাকা। বলা বাহুল্য, দু'টি শ্রেণীতেই জ্ঞাতি-কুটুম্ব ছাড়াও অনাত্মীয় ও বিপন্ন নির্ভরশীল নারী পুরুষের সংখ্যাও কম নয়।

'উইল'-এর ১৪ সংখ্যক সূত্রটির উল্লেখও খুবই জরুরী—

'আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে অনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক তাহা নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে—

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয় : ১০০ একশত টাকা
জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে স্থাপিত চিকিৎসালয় : ৫০ পঞ্চাশ টাকা
জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোক : ৩০ ত্রিশ টাকা
বিধবাবিবাহ : ১০০ একশত টাকা।'

অতঃপর সর্বশেষ ২৫ সংখ্যক সূত্রটির অন্তত আংশিক উল্লেখ অপরিহার্য—

'আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশত আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। সেই হেতু বশত বৃত্তিনির্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে....' ইত্যাদি।

পরে অবশ্য হাইকোর্টের বিচারে নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরাধিকারীরূপে সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

আরো একটি তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন। ভাইয়েরা পৃথক হওয়ার পরে বিদ্যাসাগর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে লেখা চিঠির সঙ্গে ৭০০ (সাত শত) টাকার নোট পাঠিয়েছিলেন। সেই টাকার (মাসিক) বিলি-বন্দোবস্তের যে-নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, তাতে দেখা যায়, অর্ধেকের বেশি টাকাই স্কুল, ডাক্তারখানা, গ্রাম মাসহারা-বাবদ ব্যয়ের জন্যই নির্ধারিত।

সচেতন পাঠক নিশ্চিত অনুভব করবেন, বিদ্যাসাগরের উইলের স্বল্প কিছু অংশ এবং তাঁর একটিমাত্র চিঠির উল্লেখের দ্বারা বিদ্যার সাগরকে আমি করুণা বা দয়ার সাগররূপে চিহ্নিত করতে চাইছি না। পুত্র নারায়ণচন্দ্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের 'উইল' নিশ্চয়ই তাঁকে করুণাসাগররূপে চিহ্নিত করার সহায়ক নয়। এ কি তাঁর নির্মমতাও ? না, আপসহীন জেদী স্বভাবেরই পরিচয় ?

সামগ্রিক বিচারেই তাঁর বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেও উঠেছিল, তাঁর মৃত্যুর পরেও একশো বছর ধরেই চলে আসছে।

'উইল'-এ পুত্র নারায়ণচন্দ্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ঘোষিত অভিপ্রায় যতটা দ্বিধাহীন, তেমনই অকুণ্ঠিত ছিল তাঁর অভিমত, যখন নারায়ণচন্দ্র বিধবা-বিবাহে উদ্যোগী হলে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিবৃত্ত করার জন্য দাদাকে সক্রিয় হতে আবেদন জানিয়েছিলেন। শম্ভুচন্দ্র তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন, নারায়ণচন্দ্র বিধবা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করতে চলেছেন, এই বিবাহ হলে আত্মীয়কুটুম্বরা তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন, সুতরাং বিদ্যাসাগর যেন তাঁর একমাত্র পুত্রকে বিধবা-বিবাহ থেকে নিবৃত্ত করেন। সাতাশে শ্রাবণ ছিল সেই বিবাহের দিন। বিয়ের আগে কিছুই লিখলেন না বিদ্যাসাগর। বিয়ের চারদিন পর একত্রিশে শ্রাবণ (১২৭৭, আগস্ট ১৫, ১৮৭০) শম্ভুচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে পুত্রের বিধবা-বিবাহে সম্পূর্ণ সায় দিয়ে জানিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর—

'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনো সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্তস্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।'

চিঠির পরবর্তী অংশেই ছিল বিদ্যাসাগরের সেই ঘোষণা, যে উচ্চারণের গুণেই তিনি বিদ্যাসাগর—'আমি দেশাচারের দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।'

বিদ্যাসাগরকে তাঁর জীবদ্দশায় এবং পরেও কেউ-কেউ 'জেদী' বা 'দাম্ভিক' বলেছেন। আবার তাঁর 'দয়া' বা 'করুণা'র কথাও প্রবাদপ্রতিম। 'অহমিকাজাত নির্মমতা'র অভিযোগও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উত্থাপিত হয়েছে।

একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র যখন বিধবা-বিবাহ করেন, তখন বিদ্যাসাগর তাঁকে সমর্থন করেন অকুণ্ঠিত আবার 'উইল'-এ তাঁর সম্পর্কেই লেখেন, 'আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যার-পর-নাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী' এবং সেইজন্য তাঁর 'সংস্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি'।

আমরা তো দেখছি, বিদ্যাসাগর রীতিমতো যুক্তিনিষ্ঠ এবং সর্বতোভাবে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। যুক্তিনিষ্ঠ ও আধুনিক মননসমৃদ্ধ মানুষকে প্রয়োজনে কখনো-কখনো কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতেই পারে। যুক্তিনিষ্ঠা ও আধুনিক মনন দুই-ই ছিল বিদ্যাসাগরের। তাঁর সমকালেও অন্যান্য বহু দিক থেকে যেমন, তেমনি এ দিক থেকেও তিনি ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম। এই মানুষটি তাই বলে 'নির্মম'ও ছিলেন না, 'নির্মোহ'ও ছিলেন না। সহৃদয়তার ঐশ্বর্যেও ছিলেন সম্রাটপ্রতিম। বস্তুত, প্রবল পৌরুষ ও তেজস্বিতার সঙ্গে অতলস্পর্শী হৃদয়বত্তার কোনো বিরোধ নেই। মাইকেল মধুসূদনই প্রথম বিদ্যাসাগরের এই প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকটি চমৎকারভাবে নির্ণয় করেন। বিদ্যাসাগরের হৃদয়বত্তার মধ্যেও নিহিত পৌরুষকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন 'manliness of heart' বলে। মধুসূদনের এই নির্ণয়ই রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তরে এইভাবে রূপ নিয়েছিল, 'দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে, প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম।'

১৮৬৪ সালের ২ জুন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরী থেকে বিপন্ন মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে যে দীর্ঘ

চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠিতেই ছিল—

'You are the only friend who can rescue me from the painful position to which I have been brought, and in this you must go to work with that grand energy which is the companion of your genius and manliness of heart. Not a day is to be lost' (যে যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে আমাকে উদ্ধার করার মতো বন্ধু একমাত্র আপনিই আছেন। আপনার প্রতিভা ও হৃদয়বত্তার নিহিত পৌরুষজাত অসামান্য কর্মশক্তি দিয়েই সক্রিয় হতে হবে আপনাকে। একটা দিনও নষ্ট করা চলবে না।)

মধুসূদনের এই চিঠিতেই বিদ্যাসাগরের ১) প্রতিভা তথা মনস্বিতা, ২) অসামান্য কর্মশক্তি এবং ৩) হৃদয়বত্তা ও পৌরুষ : এতগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা একযোগে উচ্চারিত হয়েছে। ৯ জুন ও ১৮ জুন বিদ্যাসাগরকে লিখিত আরো দু'টি চিঠিতে মাইকেল যেমন তাঁর বৈষয়িক বিপন্নতার কথা জানাচ্ছেন, তেমনি জানাচ্ছেন বিপন্ন প্রবাসজীবনে তাঁর নতুন নতুন ভাষাশিক্ষার উদ্‌যোগ ও সাফল্যের কথা, যেন একজন ভক্ত শিষ্য তাঁর গুরুকে এবং বিদ্যাসাগরের বিস্ময়কর গতিশীল কর্মশক্তির 'পরে তাঁর অটুট আস্থার কথাও। বিপন্ন প্রবাসজীবনে বিদ্যাসাগরের অভাবনীয় হৃদয়বত্তা ও কর্মতৎপরতায় সীমাহীন লাঞ্ছনা ও অসম্মানের হাত থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত মধুসূদন কৃতজ্ঞ, অভিভূত ও অননুকরণীয় উচ্চারণে ১৮৬৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরকেই জানাচ্ছেন—

'গত রবিবার ২৮শে আগস্ট সকালে আমি যখন আমার ছোটো পড়ার ঘরে বসেছিলাম, বেচারী বৌটা আমার চোখের জল ফেলতে-ফেলতে এসে বললো, বাচ্ছারা মেলায় যেতে বায়না ধরেছে এদিকে আমার হাতে মাত্র তিনটি ফ্রাঙ্ক! ভারতের ঐ লোকগুলো আমাদের পেয়েছে কী? এমন ব্যবহার করছে কেন? আমি বৌকে বললাম, আজ ডাক আসার দিন। আমি ঠিক জানি, আজ খবর আসবেই। কেননা যে-মানুষটির কাছে আমি আবেদন করেছি, তাঁর মধ্যে আছে প্রাচীন ঋষির প্রতিভা আর প্রজ্ঞা, একজন ইংরেজসুলভ কর্মশক্তি এবং বাঙালি মায়ের মতো হৃদয়। আমি ঠিকই বলেছিলাম, ঘণ্টাখানেক পরেই আপনার প্রেরিত চিঠি ও দেড় হাজার টাকা পেলাম।...'

এই পত্রাংশে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে মাইকেলের প্রবাদপ্রতিম সংহত মূল্যায়নের ভাষান্তরিত রূপটি লক্ষণীয়। এবং ২ সেপ্টেম্বরের চিঠির এই বক্তব্য তিন মাস আগে ২ জুন তারিখে লিখিত চিঠির বক্তব্যেরই আরো সংহত আরো সুবিন্যস্ত রূপমাত্র।

কোনো পাঠকের মনে এই সংশয়ও জাগতে পারে যে, গভীর আর্থিক সঙ্কটে নিমজ্জিত মধুসূদন বিদ্যাসাগরের দাক্ষিণ্যে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন বলেই কৃতজ্ঞ ও অভিভূত উচ্চারণে তাঁর সম্পর্কে যা-কিছু বলে থাকুন না কেন, তাকে অতিশয়োক্তিরূপেই গণ্য করা চলে, সে সব উক্তি বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে সঠিক বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন হতে পারে না।

এই সংশয়ের উত্তরে বিদ্যাসাগর-মাইকেলের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ধারাবাহিক বিবর্তনরেখাটি অনুসন্ধান করার অবকাশ আছে। আপাতত তার বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। যদিও মাইকেল মধুসূদনের মানসদর্পণেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের প্রতিবিম্ব-দর্পণ খুবই জরুরী কাজ বলে আমার বিশ্বাস। কেননা, মাইকেলই বিদ্যাসাগরকে তাঁর সমকালে সঠিক সমগ্রতায় অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। মাইকেল ছিলেন সেকালে বহু বিষয়েই বিদ্যাসাগরের মতোই সংস্কারমুক্ত ও গতানুগতিকতাবর্জিত প্রকৃত আধুনিক

দৃষ্টির মানুষ। আবেগপ্রবণ অথচ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মাইকেল ১৮৬২ সালের ১০ জানুয়ারি বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে জানাচ্ছেন—'আমাদের প্রিয় বন্ধু বিদ্যাসাগরকেই বইটি উৎসর্গ করলাম। বিদ্যাসাগর চমৎকার দীপ্তিমান মানুষ। আমি নিশ্চিতভাবে তোমাকে বলতে পারি, বিভিন্ন দিক থেকেই আমি তাকে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী মানুষ (The first man among us) বলে মনে করি। তুমি জেনে খুশি হবে, নতুন রীতির কবিতা সম্পর্কে তার অভিমত দারুণ উৎসাহোদ্দীপক, যদিও সে এখনও এই কবিতা যথোচিত উদাত্ত স্বরে পড়ে উঠতে পারে না। ওর প্রশংসায় কোনো খাদ থাকে না, কেননা কাউকে তোষামোদ করবে, এমন পাত্রই সে নয়। এ সবের ঊর্ধ্বে সে।'

বিপন্ন প্রবাসজীবনে বিদ্যাসাগরের অভাবনীয় সহৃদয়তা ও কর্মতৎপরতার গুণে মাইকেল রক্ষা পেয়েছিলেন এবং তাই কৃতজ্ঞ ও অভিভূত উচ্চারণে তাঁর প্রাচীন ঋষিসুলভ প্রজ্ঞা ও প্রতিভা, ইংরেজসুলভ কর্মশক্তি এবং বাঙালি জননীসুলভ হৃদয়বত্তার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, ঘটনা শুধু এই নয়, বছর তিনেক আগেই বিদ্যাসাগরকে তিনি সমকালের সেরা মনস্বীদের মধ্যেও 'সবচেয়ে অগ্রণী মানুষ'-রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বহু বছর পরে (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৯) স্মৃতিচারণকালে বিদ্যাসাগরের আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মাইকেলের অনুরূপ বক্তব্য অবলম্বন করেই—'যারা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যায় সারথিস্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সবচেয়ে বড়ো হয়ে লেগেছে।'

এই রচনাংশেরই পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটিও লক্ষণীয়—'এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড়ো যুগে তাঁর জন্ম যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে, বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।'

মাইকেল বিভিন্ন দিক থেকেই বিদ্যাসাগরকে 'The first man among us' রূপে (রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তরে 'সারথিস্বরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন') সেই ১৮৬২ সালের ১০ জানুয়ারিতে লেখা চিঠিতেই চিহ্নিত করেছিলেন। ষাট বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও মাইকেলের বিদ্যাসাগর-মূল্যায়নই কার্যত প্রতিধ্বনিত হলো রবীন্দ্র-রচনায়।

এই প্রেক্ষিতেই বুঝে নিতে হবে, প্রধানত কোন্ কোন্ বিষয়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন সেই নবজাগৃতির যুগেও অসংখ্য মনীষীর মধ্যেও পথিকৃৎ তথা 'মহারথিগণের সারথিস্বরূপ অগ্রগণ্য পুরুষ'।

দৃশ্যত, পোশাক-পরিচ্ছদে আহার-বিহারে মেরুপ্রমাণ ব্যবধান সত্ত্বেও সমগ্রত জীবনদৃষ্টিতে ও ভাবনায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মাইকেলেরই সাযুজ্য ছিল বুঝি সবচেয়ে বেশি। সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাত প্রসঙ্গে দু'জনেই ছিলেন খুবই আধুনিক মনোভঙ্গির মানুষ। বলাই বাহুল্য, গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান বিদ্যাসাগরের এই 'স্বোপার্জিত

দৃষ্টিভঙ্গি একালের তথাকথিত ডিগ্রিধারী শিক্ষিত মানুষজনের বহুলাংশের পক্ষেই অনুশীলনযোগ্য একটি পাঠ বলেই বিবেচিত হতে পারে। এই সূত্রে মাইকেলের প্রহসনদুটির কথা মনে পড়বে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, পাশ্চাত্যের অন্ধ নকলনবিশি তিনি ঘৃণার চোখে দেখলেও আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যা ও বিজ্ঞানের চর্চাকে তিনি এদেশে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন সর্বতোভাবেই। ঠিক তেমনি, প্রাথমিক বিবেচনায় বিস্ময়কর ঠেকলেও রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতসর্বস্ব শিক্ষা-ভাবনাকে তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের বিবিধ ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, জাতের নামে বজ্জাতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর ছিলেন খড়্গহস্ত। মাইকেলের প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রীতি ও সৌহার্দ্য রাতারাতি বিকশিত ও গভীর হয়নি। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র লেখক এবং বিদ্যাসাগর উভয়েই তাঁদের উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য একালের মানুষের কাছেও অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিতে জাতিধর্মনির্বিশেষে শোষক-লম্পটশ্রেণীর প্রতি ধিক্কার ও শোষিত দুর্বলতরশ্রেণীর প্রতি মাইকেলের সহমর্মিতা প্রকাশিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের জীবনেও দেখি, হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, জাতিধর্ম যাইহোক, দুর্বল-বিপন্ন-আর্ত নরনারীই তাঁর পরমাত্মীয়। দু'একটি দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত থেকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, পুনরুদ্ধৃত করছি :

'....কার্মাটাড়ে এক মেথরজাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউটায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটিরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।'

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুশতবর্ষেও এপার ও ওপার বাংলায় 'অতি-প্রগতিশীল' কোনো-কোনো লেখক-গবেষক বিদ্যাসাগরের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে অভিযোগ তুলছেন যে, বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রচেষ্টা অন্ত্যজ ও মুসলিম সমাজের স্তরে কেন প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত হলো না ? এই অভিযোগ প্রথমত বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্তরে উত্থাপন করাই যায় না, দ্বিতীয়ত কালগত ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার দিকটিও বিবেচনায় না রাখলে বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন বস্তুনিষ্ঠ হবে না।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে তথাকথিত অন্ত্যজ ও মুসলমান নরনারীর প্রতিও বিদ্যাসাগরের প্রবল পৌরুষপ্রসূত করুণা মুক্তধারার মতোই বর্ষিত হয়েছে। দারিদ্র দুঃখী দুর্বল ও বিপন্ন সমস্ত মানুষের প্রতিই জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিদ্যাসাগরের এই সহমর্মিতা অতুলনীয় বলেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে, করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে' বিদ্যাসাগর তাঁর একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করেছিলেন।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথই আরো একটি তথ্য আহরণ করে তাঁর প্রখ্যাত প্রবন্ধ 'বিদ্যাসাগর-চরিত'-এ সন্নিবিষ্ট করেছিলেন, 'বর্ধমান-বাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয় নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন'।

বিদ্যাসাগরের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত 'বিদ্যাসাগরজীবনচরিত্র'-এ আছে এবং রবীন্দ্রনাথও উদ্ধৃত করেছেন—'অন্নসত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি

তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজ মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহার তৈল বিতরণ করিত, তাহারা, পাছে মুচি, হাড়ী, ডোম, প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় তথাগত হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মস্তকে তৈল মাখাইয়া দিতেন।'

বিদ্যাসাগর কত বড়ো 'হিউম্যানিস্ট' ছিলেন, নিছক তথাকথিত দয়ার সাগর বা করুণাসাগর প্রভৃতি শব্দ-প্রয়োগের দ্বারা তা স্পষ্ট হয় না, উপরি-বর্ণিত ঘটনার সঠিক মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ও ভাষ্যে নিহিত বলে মনে করি :

'এই ঘটনাশ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে। কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহা দেখিয়া, আমাদের এই নীচ জাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত-ঘৃণা-প্রবণ মনও আপন নিগূঢ়মানবধর্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।'

মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে কাব্য-ব্যাকরণ ও বহু শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে ঈশ্বরচন্দ্র স্ব-নির্বাচিত 'বিদ্যাসাগর' উপাধি অর্জন করেছিলেন। শিক্ষার প্রসারে বিশেষত স্ত্রীশিক্ষার উপরে জোর দিয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট ও আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চায় জাতির চিত্তকে নিয়োজিত করার চেষ্টায় তাঁর অসামান্য আত্মনিবেদন এবং বঙ্গভাষা সাহিত্যের উন্নয়নে একেবারে গোড়ার কাজটা গোড়াতেই সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় তাঁর অতুলনীয় ত্যাগ ও শিল্পবোধ : এ সমস্তই বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান কয়েকটি কীর্তি।

কিন্তু বিদ্যার্জন, শিক্ষা প্রসারের কাজ, বঙ্গভাষার সাধনা : এইসব কাজের জন্য বিদ্যাসাগরকে নিঃসঙ্গতার বেদনা অনুভব করতে হয়নি। বিদ্যাসাগরের জীবন যাঁরাই সমগ্ররূপে অনুধাবন করবেন, তাঁরা সকলেই মানবেন : 'বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই।'

যদি বিদ্যাসাগর বিদ্যার্জন, শিক্ষাপ্রসার ও বঙ্গভাষার সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করতেন এবং সারা জীবন এই সমস্ত কাজেই নিজেকে উৎসর্গ করতেন তা হলে তো বিদ্যাসাগরকে জীবনসংশয়, শত্রুতা, ঘৃণা ও নিন্দার সম্মুখীন হতে হতো না।

কোনো সন্দেহ নেই যে, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের বিবিধ ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর জীবনমুখী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরও রামমোহনের মতোই তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানকেই শাস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্মের তথা হিন্দুত্বের প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের অবস্থান সেকালের মৌলবাদীদের হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। তাই বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলন, নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও জাতপাতের বিরুদ্ধে তাঁর মরণপণ মানসিকতার জন্যই তাঁকে সমকালের কায়েমীস্বার্থবাদীদের কাছে নিন্দিত হতে হয়েছিল। তাদের জন্যই তাঁকে সমাজপরিবর্তনের আন্দোলনের কাজে ব্যর্থতাও মেনে নিতে হয়েছিল। শিক্ষা ও চেতনাক্ষেত্রে স্বভাবতই কিছুটা অগ্রসর বলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের উপরই

বিদ্যাসাগরকে নির্ভর করতে হয়েছিল, তারাই তাঁকে ব্যর্থতাবরণে বাধ্য করেছিল, তাদের প্রতিও তাই বিদ্যাসাগরেরও ঘৃণা ও ধিক্কার পৌঁছেছিল চরমে—

'....এ দেশের উদ্ধার হইতে বহুবিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এ দেশের ভালো হয়।'

'ঈশ্বর' সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অনীহা, ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর ধিক্কার, শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষজন সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ এবং সর্বোপরি জীবনের অন্তিম পর্বে কার্মাটাড়ের অধিবাসী সাঁওতালগণের সান্নিধ্যে গিয়ে মানুষের প্রতি হৃত বিশ্বাস পুনরুদ্ধার এবং 'নতুন মানুষের চাষ' করার অনিবার্য বোধ আজো এ দেশের কায়েমীস্বার্থ ও মৌলবাদীদের সমপরিমাণেই বিদ্যাসাগরের প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন থেকে দূরেই রাখবে।. মনে রাখতে হবে, বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ 'উইল'-এ একটি কানাকড়িও কোনো 'দেবসেবা' বা 'দেবমন্দির' বাবদ বরাদ্দ করা হয়নি। মৌলবাদীরা বিদ্যাসাগরকে ক্ষমা করতে পারে না।

কিন্তু 'নতুন মানুষের চাষ' করার অন্তিম উৎকণ্ঠা ?

এখানেই বিদ্যাসাগর প্রাসঙ্গিক ও কালোত্তীর্ণ, 'মহারথিগণের'ও যোগ্যতম 'সারথি', বন্ধু, উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক।

যুবশক্তির সৌজন্যে
জুলাই. ৮১

প্রথমভাগের নবরূপায়ণ: একটি প্রস্তাব

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা ওরফে বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ প্রথম প্রচারিত হয় ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে। বাঙালি শিশুকে তার মাতৃভাষার বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অসংযুক্তবর্ণের বানান শেখানো ও সেই সঙ্গে গদ্যরচনা পড়তে শেখানোর উদ্দেশ্যে প্রারম্ভিক পুস্তিকা হিসেবেই এই বই পরিকল্পিত। শতাধিক বছর ধরে এই বই বাংলায় শিশুশিক্ষার প্রথম পাঠের দায়িত্ব বহন করে চলেছে। বইটি লোকমুখে 'প্রথমভাগ' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত।

প্রথমভাগ প্রকাশের কুড়ি বছর পরে যে ৬০তম মুদ্রণ হয় সেই পুস্তিকাই সম্ভবত বিদ্যাসাগর কর্তৃক সর্বশেষবার পরিমার্জিত। এই সংস্করণে সংযুক্তবর্ণের বানান শেখাতে উদাহরণরূপে প্রযুক্ত হয়েছিল মোট ৩৯৬টি শব্দ। তারও বছর কুড়ি পরে বিদ্যাসাগরপুত্র পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন বইটির যেখানে যেরকম আবশ্যক বোধ করেছিলেন সেইমতো নানাবিধ পরিবর্তন পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করেন। তখন বর্ণসংযোগের দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্যে সংগৃহীত শব্দের সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৫৩টি। এখন যে রিসিভারের সংস্করণ প্রচলিত তা প্রকৃতপক্ষে ঐ আদ্যোপান্ত সংশোধিত পুস্তিকারই অনুরূপ।

বিদ্যাসাগর মশায়ের আগে মদনমোহন তর্কালংকার ও আরও কেউ কেউ শিশুশিক্ষার্থীদের উপযোগী উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক পুস্তক লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ প্রথমভাগ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে, বিদ্যাসাগরের বই প্রথম প্রকাশের পঁচাত্তর বছর পরে। সহজপাঠের আগেই বেরিয়েছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাসিখুসি এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সচিত্র বর্ণপরিচয়। পরেও অনেক বই বেরিয়েছে। শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর পদ্ধতি নিয়ে ইতিমধ্যে প্রচুর গবেষণা পর্যালোচনা পরীক্ষানিরীক্ষাও হয়েছে। তার ফলে এখন রকমারি বই পাওয়া যায়।

তবু শিশুশিক্ষার্থীর পক্ষে মাতৃভাষা আয়ত্ত করার উপযোগী প্রাথমিক পুস্তক হিসেবে আজও বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগের পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলাকে কেউই অতিক্রম করতে পারেননি; শিশুদরদি ও কবিসুলভ মনের অধিকারী এক মার্জিত ব্যক্তিত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে-দুটি ক্ষুদ্রকায় পুস্তক রচনা করলেন এতকাল পরেও তা আদর্শস্থানীয় এবং সামগ্রিকভাবে অনুসরণযোগ্য। তবে ইতিমধ্যে কালব্যবধান অনেকটা হয়ে যাওয়ায় এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে ভাষাব্যবহারে বানানে ও লিপিতে প্রভূত পরিবর্তন ঘটার ফলে বিদ্যাসাগরের বই কিছুটা কালোপযোগিতা হারিয়েছে। আর তাই পিতৃঋণ স্বীকার করে তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুসারে বর্ণপরিচয় পুস্তকের নবরূপায়ণের আবশ্যক রয়েছে। বর্তমান আলোচনা শুধু বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ।

বিদ্যাসাগরের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্ব ও কবি-প্রতিভার পক্ষেই শিশুশিক্ষার উপযোগী অন্যতর সার্থক পুস্তক রচনা করা সম্ভব হয়েছিল। তবে শিশুকে সহজপাঠ প্রথমভাগ পড়ানোর আগে বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগ পড়িয়ে নেওয়া ভালো।

বানান শেখার ব্যাপারে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার্থীর পক্ষে খুবই কাজের হবে। বর্ণগুলি চেনার পর বানানের ব্যাপারে বোধটুকু তৈরি হয়ে গেলেই সহজপাঠ প্রথমভাগ পঠনীয়। সহজপাঠের চিত্রভূষিত পাঠগুলির, এবং সংলগ্ন কবিতাগুলির ত বটেই, ছন্দোময়তা শিশুশিক্ষার্থীর মনে আশ্চর্য আনন্দের সঞ্চার করে। ফলে মন সহজে আকৃষ্ট হয়, পড়া শিখতে স্বতই আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়।

অবশ্য সহজপাঠ প্রকাশের অনেক আগেই যদিও বিদ্যাসাগর প্রথমভাগকে সংযুক্তবর্ণ মুক্ত করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অনবধানতায় 'ক্ষ' (=ক+ষ) এই যুক্তবর্ণটিকে তাঁর বই-এ ঠাঁই দিয়েছেন। তাছাড়া ঐ বই-এ অষ্টমপাঠের সঙ্গে কবিতার মধ্যে 'স্বপন' শব্দে এবং দশমপাঠের সঙ্গে কবিতার মধ্যে 'প্রজাপতি' ও 'প্রদীপ' এই দুটি শব্দে যুক্তবর্ণ রয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের বই দুখানি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ভাষায় ভঙ্গিতে ও বানানে বাংলাভাষার কেমন পরিবর্তন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাংলা বানানের সংস্কার করা হয়। চলতিভাষা বা প্রাকৃত বাংলার আত্মার স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ মেলে ধরেন তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে। রাজশেখর বসু সংকলন করেন চলতিভাষার অভিধান। গত পঞ্চাশ বছর ধরে সাহিত্যে প্রকাশ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতিভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এখন সাধুভাষার ব্যবহার সংকুচিত হতে হতে প্রায় অন্তর্হিত। সংবাদপত্রেও চলতিভাষার ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমভাগের নবরূপায়ণের প্রস্তাব।

প্রসঙ্গের শুরুতেই বর্ণমালার সামান্য সংস্কারের প্রয়োজন সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। বাংলা স্বরবর্ণে 'ঌ' বর্ণটি অকারণে জায়গা জুড়ে আছে বলে সেটি অবশ্যই পরিত্যক্ত হওয়ার যোগ্য। 'এ' বর্ণের বিকৃতি 'অ্যা'-র জন্যে হয়ত কালক্রমে নতুন স্বরবর্ণলিপি উদ্‌ভাবিত হবে।

ব্যঞ্জনবর্ণমালার বিন্যাসকে আর একটু বৈজ্ঞানিক রূপ দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। বর্গীয় বর্ণ ক থেকে ম উচ্চারণস্থান অনুযায়ী পাঁচটি সারিতে সাজানোর পর চারটি অন্তঃস্থ বর্ণ য র ল ব (যদিও বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব-র জন্যে বাংলায় পৃথক পৃথক লিপির ব্যবস্থা নেই) একটি সারিতে, তারপর চারটি উষ্মবর্ণ শ ষ স হ্ পৃথক্ সারিতে, বাংলায় স্বতন্ত্র বর্ণ বলে স্বীকৃত ড় ঢ় য় ৎ এই চারটিকে পরবর্তী সারিতে এবং সবশেষে অযোগবাহ দুই বর্ণ ং ঃ এবং ঁ -কে স্থান দেওয়া যেতে পারে।

আ-কারাদি যোগের ব্যাপারে এখন যেভাবে যে সমস্ত চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে ভবিষ্যতে সেগুলিকে সংস্কার করে নেওয়ার প্রয়োজন হবে। কেবল আ-কার ঈ-কার উ-কার ঊ-কার ও ঋ-কার যোগের ক্ষেত্রে মূলবর্ণটি লেখার পরই বিশেষ চিহ্নটি প্রযুক্ত হয়। অন্যক্ষেত্রে এই চিহ্ন-প্রয়োগবিধি অবৈজ্ঞানিক। 'কি' বলতে বোঝায় ক্+ই, কিন্তু লেখার বেলায় ক-এর আগেই ই-কার বসে যায়। ই-কারের মতো এ-কার ঐ-কারেও একই ব্যাপার ঘটে। আর ও-কার ঔ-কারে ত দুদিকে চিহ্নযোগের ব্যবস্থা। অনাগতকালে নতুন চিহ্ন নির্দিষ্ট করে সেগুলিকে মূলবর্ণের পাশে বা নিচে বা ওপরে বসানোর বিধান হবে নিশ্চয়। তখন শিক্ষার্থীর—বাঙালি ও অবাঙালি—সুবিধে ত হবেই, মুদ্রণের কাজও হবে সহজতর।

শিশুশিক্ষার্থীকে বানান শেখানোর জন্যে বিদ্যাসাগরের শব্দচয়নে ও বিন্যাসে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল। এমনকি শব্দগুলির স্বরান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণের তফাত বোঝাবার ব্যবস্থাও তিনি দিয়েছিলেন। তবে অনেকেই তাঁর বই-এ বিজ্ঞাপনটুকু পড়ে দেখার শ্রমস্বীকার

করেন না বলে স্বরান্ত 'অজ' শব্দের সাদৃশ্যে সন্নিহিত হলন্ত শব্দ 'আম' 'ইট' প্রভৃতি অ-কারান্তভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। শিশু প্রায়শ বিকৃত উচ্চারণ শিখতে বাধ্য হয় ভুলভাবে শিক্ষা পাওয়ার দরুন।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ বিকৃত এ-কার বা অ্যা-কারের জন্যে আঁকড়িযুক্ত এ-কার ('ে') প্রবর্তন করলেও তা অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার ফলে 'খেলা' 'যেমন' এইসব কথার প্রথম অক্ষর অ্যা-কার হিসেবে উচ্চারিত না হয়ে অনেক সময় অশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তবে লাইনো হরফে সব এ-কারই আঁকড়িযুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের বিধান মানার ব্যাপারে অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষার্থী যাতে বাংলাভাষার উচ্চারণবৈশিষ্ট্য ঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারে তাই স্বরান্ত উচ্চারণের শব্দগুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার যে-পদ্ধতি বিদ্যাসাগরের বই-এ আছে তা অবশ্যই বজায় রাখা উচিত। যেমন, অত বড় বিবিধ কমনীয়—এইসব স্বরান্ত শব্দের উচ্চারণ বোঝাবার জন্যে প্রথমভাগে বিশেষ নির্দেশ অপরিহার্য।

আবার কিছু শব্দ আছে যেগুলির আদিবর্ণের উচ্চারণে ঈষৎ ও-কারের ঝোঁক আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : অতি বই রবি করুণ পরিবেষণ। এ ধরনের শব্দগুলিকে উপযুক্তভাবে চিহ্নিত করতে পারলে ভালো হয়।

আর বিকৃত এ-কার বা অ্যা-কারযুক্ত শব্দগুলিকে যথাস্থানে পৃথক একটি গুচ্ছে সাজানো হলে এগুলি চিনে নিতে শিক্ষার্থীর সুবিধে হবে।

বানানশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর প্রথমভাগে যেসব শব্দ উদ্ধার করেছেন তা প্রায় সবই হয় তৎসম না হয় তদ্‌ভব। খাঁটি বাংলা শব্দ যা মূলত সংস্কৃত নয় কিংবা সংস্কৃতমূল থেকে অনেক দূরে সরে আসায় রূপগত পরিবর্তন হয়ে গেছে এমন শব্দ (অমন আড়ি কাজ চোখ ডুব হইচই হাত) তিনি গ্রহণ করেননি বললেই হয়। 'জানালা' 'ঠিকানা' এইরকম কয়েকটি বিদেশী শব্দ আছে বটে, তবে ইংরেজি থেকে আগত কোনও শব্দ তিনি নেননি। অথচ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এমন ধরনের শব্দ বই-এ থাকলে শিক্ষার্থী তা দেখে যেমন আত্মীয়তা অনুভব করবে তেমনি পড়া শিখতেও তার ভালো লাগবে। অবশ্য সুপ্রচলিত শব্দের পাশাপাশি কিছু অল্প পরিচিত শব্দ যেগুলির বানান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা দুরূহ তাও থাকা চাই। তাহলে একদিকে শিশুর কল্পনাশক্তি অন্যদিকে তার মানসিক পরিণতিতে সহায়তা করা হবে।

যেসব শব্দ বাংলায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় তার বেশিরভাগই দুই বা তিন অক্ষরবিশিষ্ট। স্বভাবতই বানান শেখানোর ব্যাপারে এই দুই ও তিন অক্ষরের শব্দই বেশি আসবে। তাই বিদ্যাসাগরের আদর্শে বানানের বিন্যাসে দুই ও তিন অক্ষরের শব্দগুচ্ছ বজায় রাখা উচিত। তবে চার ও পাঁচ অক্ষরের শব্দের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সেগুলিরও কিছু উদাহরণ সাজানো ভালো। ফলে মাতৃভাষার বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে ধারণাও শিশুর গড়ে উঠতে পারবে।

বিদ্যাসাগরের আদর্শ অনুসরণ করে ক্রমিকভাবে আ-কার ই-কারাদি বানান শেখানোর পদ্ধতিই গ্রহণীয়। তবে আ-কারাদি যোগ শেখানোর সময় প্রতিক্ষেত্রে নির্বাচিত শব্দগুলিকে যদি বর্ণমালার ক্রম রক্ষা করে বিন্যাস করা হয় তাহলে শিশুর মনে বর্ণমালা সম্পর্কে বোধটি আপনা থেকেই সুগ্রথিত হয়ে যাওয়ার সুবিধে হবে। প্রতিবার এটি ফিরে ফিরে আসার ফলে

চোখ ও মন অজানিতে একটি শৃঙ্খলা আয়ত্ত করে ফেলবে।

দুই তিন চার ও পাঁচ অক্ষরের শব্দগুলি আলাদা আলাদা গুচ্ছে বিন্যস্ত করে প্রতিটি গুচ্ছে বর্ণানুক্রম মানা ভালো। তাছাড়া, দু-অক্ষরের শব্দে আ-কারাদি যোগ করার সময় প্রথমে শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে, তারপরে শব্দের প্রথম বর্ণে এবং তারও পরে শব্দের দুটি বর্ণেই আ-কারাদি যুক্ত হলে বানান শেখার সুবিধে হতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বলা চলে, দুই অক্ষরবিশিষ্ট আ-কারযুক্ত শব্দগুলি 'কলা' 'কাল' 'কালা' এইভাবে তিনটি আলাদা আলাদা পর্বে বিন্যাস করা সম্ভব। দু-এর বেশি অক্ষরসমন্বিত শব্দের বেলায়ও এই বিধি প্রযোজ্য হতে পারে।

বাংলায় কিছু সংখ্যক একাক্ষর শব্দের ব্যবহার আছে। সেগুলির জন্যে বিশেষ একটি গুচ্ছ রাখলে মন্দ হয় না।

এখন লাইনো হরফ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে গৃহীত হওয়ায়, উ-কার ঊ-কার ও ঋ-কার যোগে গ র শ হ বর্ণের বিশিষ্ট রূপ শেখাবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলা চলে। তবে আ-কারাদি স্বরবর্ণের চিহ্ন যোগ করার ফলে ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন অক্ষর যে-রূপ পেয়ে থাকে তার একটি পরিপূর্ণ তালিকা বই-এ থাকলে শিশুশিক্ষার্থীর ভালো হবে।

বাংলা বানানের অনেক বিবর্তন রূপান্তর ও সংস্কার হয়েছে। নানা কারণে বেশ কিছু বানানের দ্বৈতরূপ প্রচলিত থাকায় শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর যেখানে 'বাড়ী' বানান করেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে লেখেন 'বাড়ি'। বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগে 'ঊষা', রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠে 'উষা'। তাছাড়া কুমীর/কুমির ছুটী/ছুটি পাখী/পাখি ভীড়/ভিড় এধরনের অনেক উদাহরণ আছে। যেহেতু বাংলায় স্বতই হ্রস্ব উচ্চারণের দিকে প্রবণতা তাই যেসব ক্ষেত্রে দুরকম বানানই সিদ্ধ সেখানে হ্রস্ব বানানকে গ্রহণ করাটাই বিধেয়।

পূজা পূর্ব ধূলা প্রভৃতি শব্দ খাঁটি বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে পুজো পুব ধুলো। এই ধরনের শব্দেরও প্রথমভাগে জায়গা হওয়া চাই।

ঔষধ তৈল তৈয়ারী নূতন এইসব শব্দ চলতিভাষায় উচ্চারিত ও লিখিত হয় ওষুধ তেল তৈরি নতুন। কাজেই শব্দগুলিকে শেষোক্ত রূপেই প্রথমভাগে নেওয়া চলে। তেমনি আল্পনা পেন্সিল পর্দা ভর্তি হাল্কা শব্দগুলি আলপনা পেনসিল পরদা ভরতি হালকা এইভাবে লেখা হয় বলে সেগুলিও অযুক্তবর্ণের বানান হিসেবে প্রবেশাধিকার পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে মূলানুগ বানান (যেমন, ইশারা জিনিস মুশকিল সাদা) শেখানো উচিত।

বর্ণের সঙ্গে অনুস্বার ও বিসর্গ যোগ হলে প্রকৃতপক্ষে সংযুক্তবর্ণের উদ্‌ভব হয় এবং তখন সেই বর্ণের প্রথমভাগে অর্থাৎ অসংযুক্তবর্ণের পুস্তকে বর্জিত হওয়ার কথা। বিদ্যাসাগর যদিও প্রাচীন স্বরবর্ণমালা থেকে অং অঃ উচ্ছেদ করে ব্যঞ্জনবর্ণমালায় যথাস্থানে তাদের আসন নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ং-যোগ বা ঃ-যোগকে প্রথমভাগ থেকে বাদ দেননি। হয়ত এদের ব্যঞ্জনস্বভাবটা বর্ণের রূপে প্রকট নয় বলেই এই ব্যবস্থা এতকাল টিকে আছে। প্রচলিত রীতির দোহাই পেড়ে প্রথমভাগে এদের অধিকার এখনও কায়েম থাকতে পারে, তবে সুযোগমত এগুলিকে স্বজাতীয়দের মধ্যে পুনর্বাসিত করাটা সংগত হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে, ঋ-কার যদিও স্বরবর্ণযোগেরই উদাহরণ, বাঙালির উচ্চারণে তা বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনাত্মক। ম্রিয়মাণ ও মৃত শব্দ দুটির আদ্যক্ষরের উচ্চারণে কোনও তফাত বোঝার উপায় নেই। একারণেই পৈতৃক শব্দটির পৈত্রিক রূপ অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

সম্ভবত এইসব লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজপাঠ প্রথমভাগে অনুস্বার বিসর্গ ও ঋ-কার সংযোগে কোনও শব্দ ব্যবহার করেননি। সহজপাঠ প্রথমভাগের শেষ পাঠটিতে শুধু চন্দ্রবিন্দুযোগের প্রয়োগ আছে। অনুস্বারযোগের উদাহরণ দিয়েই সহজপাঠ দ্বিতীয়ভাগের শুরু।

বাংলায় অনুস্বারের ব্যবহার খুবই গোলমেলে। সংস্কৃতে যদিও পদমধ্যস্থ 'ম্'-এর বিকল্প 'ং', বাংলায় তা হয়ে গেছে 'ঙ'-র বিকল্প। রং/রঙ বাংলা/বাঙলা এই সব শব্দ লেখা হয়। কেউ কেউ আবার ভুল করে 'আশঙ্কা' 'ইঙ্গিত' প্রভৃতি বানানকে ভেঙে 'আশংকা' 'ইংগিত' এভাবে অশুদ্ধরূপে লিখে থাকেন। হিন্দিভাষায় অবশ্য এ ধরনের প্রয়োগ যথেচ্ছ। হিন্দিতে 'মঞ্চ' 'মণ্ডপ' শব্দেরও বানান লেখা হচ্ছে 'মংচ' 'মংডপ'। তবে বাংলায় যেহেতু ং-এর সঙ্গে আ-কার ই-কার প্রভৃতি জুড়তে গেলে ং-কে হটিয়ে ঙ-র শরণ নিতেই হয় (রঙের রঙিন বাঙালি) তাই খাঁটি বাংলায় বরং প্রচলিত শব্দগুলিতে ং-এর জায়গায় 'ঙ' ব্যবহার করাই বিধেয়।

অলংকার সংগীত সংঘ প্রভৃতি শুদ্ধশব্দকে অবশ্য অনুস্বারযোগের উদাহরণস্বরূপে প্রথমভাগে নেওয়া চলতে পারে।

তেমনি, উদ্‌বেগ উদ্‌বোধন এই ধরনের শব্দে আপাতভাবে সংযুক্তবর্ণ অনুপস্থিত বলে এইসব শব্দও প্রথমভাগে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

বর্ণসংযোগের বিবিধ রূপ ও বিন্যাসকৌশল শেখানোর জন্যে শব্দের সংখ্যা যথাসম্ভব সীমিত করে ধ্বনিসৌকর্যের দিকে নজর রেখে শব্দ সাজাতে পারলেই ভালো হয়। তবে বানান ঠিকমত শিখতে গেলে তা আবৃত্তি করার চেয়ে লিখে অনুশীলন করাই উচিত। তবেই স্মৃতি নির্ভুল ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে বর্ণযোজনা পুস্তকের পরিশিষ্টে কিছু অতিরিক্ত সুনির্বাচিত শব্দ সংকলন করে দেওয়া যেতে পারে।

ভাষা ও বানান শেখার ভিত্তি তৈরি হবে যে প্রারম্ভিক পুস্তকে তা রচনা করতে কতটা যত্ন ও চিন্তা লাগে তার পরিচয় বর্ণে বর্ণে রয়ে গেছে বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগে। তাঁর বই-এ সন্নিবেশিত পাঠগুলিও বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য। প্রথমে শুধু বিশেষ্য-বিশেষণ দিয়ে দু-অক্ষরের দুটি করে শব্দের ছোট ছোট বাক্য, তারপর ক্রিয়ার ব্যবহার, পরে আস্তে আস্তে ছোট থেকে বড় বড় বাক্যে বিভিন্ন ক্রিয়ার কালের বাক্যগঠনপ্রণালীর বিন্যাস এবং পরে ক্রমশ মস্ত মস্ত বাক্যের উদাহরণ তিনি সযত্নে সাজিয়ে দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর জীবিতকালে প্রথমভাগের যথোচিত পরিমার্জনা করেছিলেন। আজ বেঁচে থাকলে প্রথমভাগের নবরূপ দিতে তিনি নিশ্চয়ই প্রয়াসী হতেন। সেটা ছিল একান্তভাবে তাঁরই অধিকার।

প্রথমভাগ বিদ্যাসাগরের অনন্য কীর্তি এবং বাঙালি জাতির স্থায়ী সম্পদ। সেখানে হস্তক্ষেপ করার ধৃষ্টতা কারও থাকা উচিত নয়। তবে তাঁর আদর্শের অনুসরণ করে

কালোপযোগী নতুন বই-এর পরিকল্পনা আজ করা যেতে পারে।

এতক্ষণ সেই প্রস্তাবেরই আলোচনা হল। শব্দসংকলন ও বিন্যাসের ব্যাপারে অবলম্বনযোগ্য পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

এই প্রস্তাবের অঙ্গস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শুধু বর্ণমালা শেখানোর জন্যে পৃথক একটি রঙিন ছবিওয়ালা বই থাকলে ভালো হয়। এরপর হবে বর্ণযোজনা শিক্ষা। অপর একটি খণ্ডে কিছু পাঠ, গদ্য পদ্য দুইই, থাকতে পারে। এই অংশে নিতান্ত উপদেশমূলক রচনার বদলে অযুক্তবর্ণের কিছু নির্বাচিত ছড়া এবং কথামালার মতো বই থেকে কয়েকটি গল্প চলতিভাষায় ও অযুক্তবর্ণে উপযুক্তভাবে রূপান্তর করে দেওয়া যেতে পারে। লৌকিক ছড়ার মধ্যে বাঙালির মেজাজ ও খাঁটি বাংলাভাষার স্বাদ পাওয়া যেমন শিশুর পক্ষে সম্ভব হবে তেমনি সহজ ছন্দের দোলা ও চিত্রকল্প তার মানসিক খোরাক জোগাবে। পশুপাখি নিয়ে লেখা নিটোল গল্পও শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শেখানোর অভীষ্টলাভে সহায়ক হবে

প্রস্তাবিত নবরূপ প্রথমভাগের বর্ণসংযোগ অংশের একটি খসড়া এর পরে যোজিত হল

সরল বর্ণযোজনা

অত☆ আজ আর কই জল ঝড় পথ ফল † বই মন বড়☆ হয়
অমন আদর ঈষৎ উদয় কলম খবর গগন জগৎ বয়স মগজ লবণ সহজ
উৎসব কলরব জনগণ হইচই
অনবরত☆ সরগরম
(☆ স্বরান্ত উচ্চারণ, আদিবর্ণের উচ্চারণে ঈষৎ ও কারের ঝোঁক)

আ-কারযোগ

আশা উষা কণা কথা ছড়া পড়া মজা সভা
কাজ গাছ ডাক নাম পাঠ মাঠ রাত হাত
ছাতা ঢাকা পাকা মাথা
উতলা একদা সহসা
আকাশ উদার সবাই † সমান
কাগজ কাপড় নাটক ভাষণ
ইশারা ধারণা
বাগান বানান যাচাই সানাই
জানালা পাহারা
আলপনা আবদার উপহার ঐকতান
আশকারা সাবধান
খাপছাড়া পাঠশালা
ধারাপাত ঝালাপালা
চমৎকার মানানসই

ই-কারযোগ

† অতি আড়ি আমি ইতি ঋষি † গতি † ছবি † মণি, † যদি † রবি

ঠিক দিক ভিড় মিল
চিঠি তিথি
আশিস উচিত + শরিক
কিরণ নিয়ম + সমিতি
জিনিস শিবির
অগণিত☆ পরিচয়
নিরবধি বিকশিত☆
ছিনিমিনি নিরিবিলি
অবিচলিত☆ চিকিৎসক

ঈ-কারযোগ

+ জয়ী + ধনী + নদী
তীর দীপ ধীর নীড় বীণ শীত
অধীর + গভীর + নবীন
জীবন নীরব শীতল
উপনীত☆ কমনীয়☆
আদরণীয়☆

উ-কারযোগ

+ অণু ঋজু + তনু + লঘু
খুব গুণ চুপ ডুব পুব মুখ
গুরু শুরু
অবুঝ আগুন ওষুধ + চতুর + নতুন
মুখর
দুপুর পুতুল মুকুল
উৎসুক করপুট ভরপুর
ঝুমঝুম হুড়মুড়
রুনুঝুনু
অনুরণন

ঊ-কারযোগ

কূল দূর মূঢ়☆ রূঢ়☆
ধূসর ভূষণ
অপরূপ

ঋ-কারযোগ

তৃণ☆ দৃঢ়☆ ধৃত☆
অমৃত☆ আদৃত☆
বৃহৎ হৃদয়
উপকৃত☆

এ-কারযোগ

তবে বটে
খেত জেদ ঢের তেজ তেল বেশ মেঘ শেষ
ছেলে মেয়ে
অনেক আয়েশ কলেজ
কেবল চেতন লেখক
উদ্‌বেগ হেরফের
রঙবেরঙ

বিকৃত এ-কার (অ্যা-কার) যোগ

কেন☆ যেন☆ হেন☆
খেলা ঠেলা বেলা মেলা
কেমন তেমন যেমন

ঐ-কারযোগ

জৈব☆ নৈশ☆ শৈল☆
বৈঠক শৈশব সৈকত

ও-কারযোগ

আলো চোখ জোর ভোর রোদ লোক
অশোক আমোদ কঠোর কোমল গোপন
দোসর মোহন লোচন
আয়োজন মনোরম
তোড়জোড় শোরগোল
উদ্‌বোধন

ঔ-কারযোগ

আদৌ গৌর দৌড় ফৌজ মৌন☆ সৌর☆
কৌশল গৌরব দৌলত যৌবন সৌরভ

ং যোগ

এবং বরং
অংশ☆ বংশ☆ হংস☆
সংকট সংযম
সংকলন

ঃ যোগ

দুঃখ☆ দুঃসহ☆ দুঃসাহস
দুঃশীল নিঃসহায়

ঁ যোগ

চাঁদ বাঁক বাঁশ শাঁখ
আঁচল আঁধার
আঁখি কুঁড়ি ছোঁয়া

এক অক্ষরের শব্দ

গা চা তা না পা বা মা যা
কি ঘি ছি ঝি
কে যে সে হে

মিশ্র

গাড়ি পাখি বাড়ি মাটি হাসি
বাণী শিশু
নীতি রীতি
ছুটি পুজো
দেরি নৌকো
আকৃতি ইংরেজি কাহিনী
কুটির কৌতুক চৌচির নিপুণ পৃথিবী পৈতৃক বাঙালি + মনীষা
+ অনুকূল ইদানীং কৌতূহল খেলাধুলো চিৎকার পূজনীয়☆ বিবেচনা ভারতীয়☆
মাতৃভাষা রূপকথা লেখাপড়া শারীরিক হাতিযাব হিতৈষণা + অনুশীলন নিরুদ্‌বেগ
+ পরিবেষণ সাহসিকতা
পারমাণবিক অনুকরণীয়

বিদ্যাসাগরের শিশুশিক্ষা

বিনয়ভূষণ রায়

কথায় বলে "Morning shows the day"—বিদ্যাসাগরের বেলায় এই উপমাটি যথার্থই প্রযোজ্য। বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসার সময় পথের ধারে 'মাইল স্টোন' দেখতে-দেখতে যে-ছেলে ইংরেজি সংখ্যা শিখতে পারে সে যে ভবিষ্যতে দেশের একজন প্রতিষ্ঠিত কেউ হবে তাতে আশ্চর্যের কি? এ শুধু তাঁর মেধারই নয়, অনুসন্ধিৎসারও পরিচায়ক। কলকাতায় এসে জগদ্দুর্লভবাবুর ইংরেজি বিলে টিক দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশও তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক।

বিদ্যাদানের জন্য গ্রামে টোল খোলার উদ্দেশ্য নিয়েই বাবা ছেলেকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন। কারণ তাঁর কাছে তা ছিল সম্মানের বিষয়। বংশগত অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু যে-ছেলে 'মাইল স্টোন' দেখে ইংরেজি সংখ্যা শিখতে পারে তাকে কি কখনও ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে আটকে রাখা যায়? তা কখনওই সম্ভব নয়। কারণ গ্রামের ক্ষুদ্র সামাজিক গণ্ডি থেকে এসে এক বিরাট সামাজিক গণ্ডিতে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে এসে তিনি যেমন একদিকে দেখেছিলেন পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা এবং অনীহা, অন্যদিকে তেমনিই সতীদাহ ও অন্যান্য হিন্দু কুসংস্কারগুলি নিয়ে সমাজিক আলোড়ন।

পরবর্তীকালে ডিরোজিওর চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত যে-সকল নব্য বাঙালির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়, তাঁদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১] এর সঙ্গে-সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জ্ঞানের আদানপ্রদানের উদ্দেশ্য নিয়ে সেই সময়ে কলকাতায় বিভিন্ন সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সকল সভা-সমিতি এবং পরবর্তীকালে ডেভিড হেয়ার স্মরণসভার আলোচনা তাঁর চিন্তাধারা স্ফুরণের সহায়ক ছিল,[২] সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অপরদিকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত "তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ..."[৩] তাঁকে হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলিকে ছুঁড়ে ফেলতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সুফলগুলি গ্রহণে সাহায্য করেছিল। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংমিশ্রণে নতুন পথের সন্ধানে তিনি ব্রতী হন। কবিগুরুর ভাষায়, "তিনি (বিদ্যাসাগর) পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন... । তিনি যা কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেননি। তিনি জানতেন, বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান ইউরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন... ।"[৪] আলোচনা প্রসঙ্গে এ-ও উল্লেখযোগ্য, ধর্মের প্রতি তাঁর পিতামাতার আস্থা থাকলেও কুসংস্কারের প্রতি তাঁদের কোনও আস্থা ছিল না। তাই তাঁরা উভয়েই বিধবাবিবাহের জন্য ছেলেকে উৎসাহিত করেছিলেন।[৫]

সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশী সরকার কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, এ-সংবাদে রামমোহন রায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই ইংরেজি শিক্ষার জন্য নিজের মতামত প্রকাশ করে ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে

তিনি একখানি পত্র লেখেন। ঠিক সেই সময়ে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা শর্তসাপেক্ষে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। শর্তটি হল হিন্দুসমাজের পরিবর্তনের জন্য সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়-সাধন। বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত কলেজকেই হাতিয়ার করে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হন। তারই অন্যতম অঙ্গ হল শিক্ষাসংস্কার।

ছাত্রজীবনে সংস্কৃতশিক্ষার মাধ্যমে প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তার প্রগতির জন্য চাকরিজীবনে সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারে তিনি মনোযোগ দেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে উক্ত পদক্ষেপ শুরু হয়। সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের গড়ে তোলাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তবে বাস্তবের কথা চিন্তা করে কলেজের ছাত্রদের যে-কোনও কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যই তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে সাজিয়েছিলেন।[৬] সেই সময়ে শিশুশিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্যবই, শিক্ষা-পদ্ধতি এবং শিক্ষকের বড় অভাব ছিল। কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর তা অনুভব করেন এবং সেইসব অভাব দূর করার জন্য নিম্নলিখিত পথ গ্রহণ করেন।

পাঠ্য-বই : পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের আগে হাতে-লেখা পুথির মাধ্যমেই এদেশে শিক্ষা দেওয়া হত। ছাপাখানা স্থাপিত হওয়ার পরেও উক্ত ব্যবহারের কোনও পরিবর্তন হয়নি। তৎকালীন কুসংস্কারই ছিল এর প্রধান অন্তরায়। ছাপা-বই পড়লে জাত যাবে—এমন একটা ধারণা সে-যুগের লোকের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। পাঠশালা ও স্কুলের উপযুক্ত পাঠ্য-বই ছাপানোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথমে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এখান থেকে প্রকাশিত বই সাধারণত কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির অধীনে পাঠশালায় এবং বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারি সোসাইটির দ্বারা স্থাপিত স্কুলগুলিতে পড়ানো হত। শ্রীরামপুর মিশনারিদের পক্ষ থেকেও সেই সময়ে শিশুদের শিক্ষাদানের উপযুক্ত কয়েকখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে হিন্দু কলেজের সঙ্গে স্থাপিত পাঠশালা এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য উক্ত সভায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কয়েকখানি শিশুপাঠ্য বই প্রকাশিত হয়েছিল।

মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পর 'শিশুবোধক' নামে একখানি বই প্রকাশিত হয়। বইটির সূচিপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, অঙ্ক, জমির পরিমাপ, চিঠিপত্র লেখার নিয়মকানুন, গঙ্গার স্তব, চাণক্য শ্লোক, পৌরাণিক গল্প ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

এরপর স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে মিঃ মে সঙ্কলিত গণিত, মিঃ পিয়ারসন সঙ্কলিত বাংলা পাঠ সঙ্কলন প্রকাশিত হয়।

১৮১৬ সালে শ্রীরামপুর মিশন 'লিপিধারা' প্রকাশ করে। চারটি তালিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম তালিকায় প্রাথমিক পাঠ, দ্বিতীয় তালিকায় বিশুদ্ধ বানান পাঠ, তৃতীয় তালিকায় ব্যাকরণ এবং চতুর্থ তালিকায় গণিত প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভূগোল, ইতিহাস, নীতিকথা ও অন্যান্য বিষয়সহ ১৬টি তালিকায় প্রকাশিত হয়।

১৮২০ সালে 'জ্ঞানারুণোদয়' নামে একখানি বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হয়। রাধাকান্ত দেব ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা।[৭]

বর্ধমানের পাঠশালার জন্য ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট 'বর্ণমালা', 'উপদেশ কথা' ও 'তমনাশক' প্রকাশ করেন।[৮] হিন্দু কলেজ পাঠশালার কর্তৃপক্ষ উক্ত পাঠশালার জন্য 'শিশু সেবধি বর্ণমালা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ভূগোল ও

গণিত-সহ আরও কয়েকখানি বই প্রকাশিত হয়।[৯] অক্ষয়কুমার দত্ত সঙ্কলিত ভূগোল, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে কয়েকখানি বই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সেই সময়ে প্রকাশ করে।[১০]

উপরোক্ত বইগুলিকে তৎকালীন বিদেশী সরকার উপযুক্ত বিবেচনা করেনি। তাই বাংলাভাষার মাধ্যমে জনসাধারণকে জ্ঞানদানের জন্য মিঃ ই· রেয়ন (E. Ryan)-কে সভাপতি করে একটি কমিটি হয়। মিঃ এইচ· টি· প্রিন্সেপ (H.T. Princep), এফ· মিলেট (F. Millett), জে· সি· সাদারল্যান্ড (J. C. Sutherland) এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন উক্ত কমিটির সদস্য। বাংলাভাষায় বই প্রকাশের ক্ষেত্রে উক্ত কমিটিকে হিন্দু পাঠশালার ম্যানেজারদের সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত পাঠশালার পাঠ্য-বই তৎকালীন স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক মিঃ ইয়েট্‌সের পছন্দ না হওয়ায় সরকার প্রথমে ইংরেজিতে আদর্শ পাঠ্য-বই রচনা করে পরে তা অন্য ভাষায় প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে উক্ত বই প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বর্ণমালা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ, গণিতাঙ্ক এবং নীতিকথা প্রথম ভাগ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে সহজ ও সরল ভাষায় একখানি ১০০ পৃষ্ঠার ইংরেজি পাঠমালা সঙ্কলনের বঙ্গানুবাদ ১৮৪২ সালের শেষের দিকে মিঃ গ্রান্ট ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর শিক্ষা-বিষয়ক পরিষদের কাছে জমা দেন। পরিষদ তার বাংলা ও উর্দু অনুবাদের জন্য ডঃ ইয়েটসকে অনুরোধ করেন। একই সঙ্গে শিশুপাঠ্য বই, যেমন—বানান শিক্ষা, ব্যাকরণ, অভিধান, গণিত ও আঞ্চলিক ইত্যাদি বিষয়ে লেখার জন্য আগ্রহশীল ও উপযুক্ত ব্যক্তির নাম মনোনীত করে পাঠানোর জন্য পরিষদ বিভিন্ন কলেজ সম্পাদকের কাছে অনুরোধ করে। হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ জে· সাদারল্যান্ড ঈশ্বরচন্দ্র ব্যানার্জির নাম প্রস্তাব করে পাঠান। কিন্তু এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মাতৃভাষায় বই প্রকাশের কাজ বেশিদূর অগ্রসর হয়নি।

হিন্দু কলেজের নিম্ন বিভাগের বাংলা পাঠ্য-বইয়ের অবস্থাও ছিল খুবই খারাপ। উক্ত বিভাগের পণ্ডিতমহাশয়দের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়. যে, সেই সময়ে কোনও-কোনও শ্রেণীতে বর্ণমালা ও পশ্বাবলী পড়ানো হত। উপরের শ্রেণীতে পাঠ্য-বই না থাকায় ছাত্রদের শুধু অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা শেখানো হত।

পরবর্তীকালে হার্ডিঞ্জ পরিকল্পনা অনুসারে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১০১টি পাঠশালা স্থাপিত হয়। উক্ত পাঠশালায় প্রথমে স্কুলের বোর্ডে বড় হরফে অযৌগিক, যৌগিক বর্ণ থেকে শুরু করে ক্রমে-ক্রমে বর্ণমালা পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর কারণ উপযুক্ত পাঠ-বইয়ের অভাব। সরকারি প্রতিবেদনেও মাতৃভাষায় পাঠ্য-বইয়ের অভাব স্বীকৃত হয়।

অপরদিকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পাঠ্য-বইয়ের অভাবে বগুড়ার স্কুলের অনেক ছাত্র স্কুল ছেড়ে দেয়। মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদ স্কুলের পাঠ্য তালিকায় 'অমরকোষ', 'প্রবোধচন্দ্রিকা', 'হিতোপদেশ', 'পাঠকৌমুদী'র উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজসাহীর নাটোরের স্কুলে তখন বর্ণমালা, নীতিকথা এবং মনোরঞ্জন ইতিহাস পড়ানো হত। বেসরকারি প্রতিবেদন থেকে আরও করুণ চিত্র পাওয়া যায়।[১১]

১৮৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যজীবন শেষ করে ২৯ ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যোগ দেন।[১২] তখন উক্ত কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রদের 'অন্নদামঙ্গল' পড়ানো হত। কিন্তু

'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানটি পড়াতে বিদ্যাসাগর সঙ্কোচ বোধ করতেন।[১৩] এর প্রধান কারণ, তাঁর রুচিবোধ। তাই তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের জন্য 'বাসুদেবচরিত' রচনা করেন।[১৪] কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক তা প্রকাশিত না হওয়ায় মার্শাল সাহেবের অনুরোধে তিনি সিবিলিয়ান ছাত্রদের জন্য 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায়, সেই সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে 'হিতোপদেশ' পড়ানো হত। এর কিছু কিছু অংশ এত কঠিন ছিল যে, ছাত্রদের পক্ষে তার অর্থ উদ্ধার করা সহজসাধ্য ছিল না। তাই উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ জি· টি· মার্শালের অনুরোধে তৎকালীন প্রসিদ্ধ হিন্দি বই 'বেতাল পচীসী'র বাংলা অনুবাদ করেন। পরবর্তীকালে তা বাংলা স্কুলসমূহের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয়।[১৫]

ইতিমধ্যে হার্ডিঞ্জের পরিকল্পনা অনুসারে· ১০১টি বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মার্শালের সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিতেন। উপযুক্ত বইয়ের অভাবে 'পুরুষপরীক্ষা', 'জ্ঞান প্রদীপ', 'হিতোপদেশ', 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি বই থেকে তাঁকে পরীক্ষা নিতে হত।[১৬] এর ফলে তাঁর মনে পাঠ্য-বইয়ের চিন্তা স্থান পায়। কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে শুধু সাধারণ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে আটকে না রেখে শিশুপাঠ্য সাহিত্যসৃষ্টির দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে বেথুন সাহেবের অনুরোধে তিনি বেথুন বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন।[১৭] সেই সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কারও উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। শিশুদের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক না থাকায় মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিশুদের উপযোগী 'শিশুশিক্ষা' প্রকাশ করেন। এর প্রথম ভাগ বেথুন সাহেবকে উৎসর্গ করা হয়। ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন,

"অনেকেই অবগত আছেন প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের অসদ্ভাবে আমদেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংশোধন করিবার আকারে যে পুস্তক পরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই কয়েকটি পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।"[১৮] দুই বন্ধুতে পরামর্শ করেই উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কারণ ১৯০৭-১৯০৮ সংবতের মধ্যে শিশুশিক্ষা পাঁচ ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত পাঁচ ভাগের মধ্যে প্রথম তিন ভাগ রচনা করেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। চতুর্থ ভাগ (বোধোদয়) রচনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পঞ্চম ভাগ (নীতিবোধ) রচনা করেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাই হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুতে ঈশ্বরচন্দ্র ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই পিতার নির্দেশে দেশে চলে যান এবং সেইখানে থাকাকালীন শিশুশিক্ষা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ পাঠের পর অল্পবয়স্ক বালিকাদের জন্য পাঠ্য-বই প্রকাশ করা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। 'বোধোদয়' হল তারই ফলশ্রুতি। ১২৫৭ সালে তা প্রকাশিত হয়।[১৯] প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লেখেন,

"বোধোদয় নানা ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল; পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়েকটি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্প পাঠ অপেক্ষা, অনেক উপকার দর্শিতে পারিবেক। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক-বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, এই আশায় সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে অগত্যা যে যে অপ্রচলিত দুরূহ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে পুস্তকের শেষে সেই সকল শব্দের

অর্থ লিখিত হইল। এক্ষণে বোধোদয় সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে, পরিশ্রম সফল বোধ করিব।"[২০]

সময়াভাবের জন্য 'নীতিবোধ' লেখার দায়িত্ব তিনি রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন। বইটির বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেন,

"এতদ্দেশীয় বালকবালিকাগণের প্রথম শিক্ষোপযোগী একখানি নীতি পুস্তক প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যেই এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। প্রবৃত্ত হইয়া সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতে ক্রটি করি নাই।...

"পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এস্থলে ইহাও উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক যে, তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয় এই কয়েকটি প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণস্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের কথাও তাঁহার রচনা। কিন্তু তাঁহার অবকাশ না থাকাতে তিনি আমার প্রতি এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করেন; তদনুসারে আমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হই।"[২১]

বিদ্যাসাগর ছিলেন যথার্থ মানবপ্রেমিক। মানুষকে তিনি যেমন ভালবাসতেন তেমনই তাদের উন্নতির কথাও চিন্তা করতেন। তাঁর মতে উন্নতির মূল সোপান হল পরিশ্রম, উৎসাহ, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও জ্ঞানলাভ। সেইদিকে মানুষকে উৎসাহিত করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যকে পূরণ করার জন্য তিনি জীবনীমূলক পাঠ্য-বইকেই প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এর ফলে মানুষ যেমন একদিকে উৎসাহিত হবে অপরদিকে তেমনই বিভিন্ন দেশের রীতি, নীতি ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি ১৮৪৯ সালে চেম্বারের শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে 'জীবন চরিত' প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তার ভূমিকায় তিনি জানান,

"জীবনচরিত পাঠে দ্বিবিধ মহোপকার লাভ হয়। প্রথমতঃ কোন ২ মহাত্মারা অভিপ্রেতার্থ সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যেরূপ অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ ২ বহুতর দুর্বিষহ নিগ্রহ ও দরিদ্র নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এককালে সহস্র উপদেশের ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

"দ্বিতীয়তঃ, আনুষঙ্গিক তৎদেশের তৎকালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচার পরিজ্ঞান হয়। অতএব যে বিষয়ের অনুশীলনে এতাদৃশ মহার্থলাভ সম্পন্ন হইতে পারে তাহাকে অবশ্যই শিক্ষাকর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক।

"রবর্ট ও উইলিয়াম চেম্বর্স বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভব মহাশয়দিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া ইঙ্গরেজী ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইলে এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থীগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে এই আশ্রয়ে আমি ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু সময়াভাব ও অন্যান্য কতিপয় প্রতিবন্ধকবশতঃ তন্মধ্যে আপাততঃ কেবল কোপর্নিকস্, গালিলিয়, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশস্

লিনিয়স, ডুবাল, জেঙ্কিস ও জোন্স এই কয়েক মহাত্মার চরিত অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইল।"[২২]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, লর্ড হার্ডিঞ্জ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য ১০১টি পাঠশালা স্থাপন করেন। ১৮৪৮ সালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য জেমস টোমাসন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য আরেকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উক্ত পরিকল্পনার সাফল্য লক্ষ করে তৎকালীন শিক্ষা পরিষদের সম্পাদকময়েট বাংলার জন্য বড়লাটের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। ইতিমধ্যে ফ্রেডারিক জে· হ্যালিডে বাংলার ছোটলাট পদে যোগ দেন। উক্ত পদে যোগ দেওয়ার আগে তিনি শিক্ষা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে বিদ্যাসাগর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য একটি পরিকল্পনা দাখিল করেন। তিনি বলেন যে, কেবল লিখন-পঠন ও সামান্য অঙ্কের মাধ্যমে মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু রাখলে হবে না। তা পূর্ণাঙ্গ করতে হলে ইতিহাস, ভূগোল, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিশিক্ষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়া উচিত। এর জন্য নিম্নলিখিত বইগুলিকে পাঠ্য করা যেতে পারে। যেমন,

(ক) 'শিশুশিক্ষা'—পাঁচ ভাগ। প্রথম তিন ভাগ বর্ণমালা, বানান ও পঠন শিক্ষার সহায়ক। চতুর্থ ভাগ 'বোধোদয়', সাধারণ জ্ঞান এবং পঞ্চম ভাগ 'নীতিবোধ' নীতিশিক্ষার সহায়ক।

(খ) পশ্বাবলী অথবা পশুপাখীর প্রাকৃতিক ইতিহাস।

(গ) মার্শম্যানকৃত বাংলার ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ।

(ঘ) চারুপাঠ।

(ঙ) জীবনচরিত।

(চ) পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা ও নীতিশিক্ষা-সংক্রান্ত বই লেখা হচ্ছে। ভূগোল, অর্থনীতি, শারীরতত্ত্ব, ইতিহাস এবং ধারাবাহিকভাবে কিছু জীবনচরিত সম্পর্কে বই লিখতে হবে। তবে বর্তমানে গ্রীস, রোম ও ইংলন্ডের ইতিহাস হলেই চলবে।[২৩]

১৮৫১ সালের ২৮ জুনে ইতিমধ্যে শিক্ষা পরিষদের পক্ষ থেকে ঈশ্বরচন্দ্রকে নতুন পাঠ্য-বই রচনার যেমন দায়িত্ব দেওয়া হয়[২৪] তেমনিই বাংলাভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পাঠ্য-বই অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পাঠানো হতে থাকে। ঐসব বইয়ের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর মনঃপূত ছিল না। লেখার ধরন, ভাষার প্রকাশভঙ্গী ও অন্যান্য দিক থেকে তা ত্রুটিপূর্ণ ছিল।[২৫] এমনকি পাঠশালার গুরুমহাশয়দের ব্যবহৃত চাণক্য শ্লোকও তিনি পছন্দ করতেন না। তৎকালীন দেশীয় ব্যক্তিদের কাছে তা মূল্যবান বলে বিবেচিত হলেও তাঁর মতে তা পাঠ্য-বইয়ের উপযুক্ত নয়। কারণ,

(ক) রাষ্ট্রনীতি ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষাদানেব জন্য রচিত হলেও বয়স্কদের পক্ষে তা উপযুক্ত, তরুণদের পক্ষে নয়।

(খ) কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রবাদগুলি ভ্রান্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা অশ্লীল ও অমার্জিত।[২৬]

পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে শিশুশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পাঠের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন। বর্ণপরিচয় পাঠের পর ছাত্রদের পক্ষে 'বোধোদয়' ও 'নীতিবোধ' পাঠ করতে অসুবিধা হবে এই আশঙ্কায় ১২৬২ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি 'কথামালা' রচনা করেন।[২৭] এর মুখবন্ধে তিনি বলেন,

"রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশে ঈসপ্ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প রচনা করিয়া আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গল্প ইঙ্গরেজী প্রভৃতি নানা ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং ইউরোপের সর্ব্ব প্রদেশেই অদ্যাপি আদরপূর্ব্বক পঠিত হইয়া থাকে। গল্পগুলি অতি মনোহর; পাঠ করিলে বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়। এই নিমিত্ত শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত উইলিয়াম গর্ডন ইয়ঙ মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে আমি ঐ সকল গল্পের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু এতদ্দেশীয় পাঠকবর্গের পক্ষে সকল গল্পগুলি তাদৃশ মনোহর বোধ হইবে না এজন্য ৬৮টি মাত্র আপাততঃ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইল। শ্রীযুক্ত রেবেরেন্ড টমাস জেমস, ঈসপ্ রচিত গল্পের ইঙ্গরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া, যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, অনুবাদিত গল্পগুলি সেই পুস্তক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে।"[২৮]

ভাষা ও নীতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য ১৮৬৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি 'আখ্যানমঞ্জরী' রচনা করেন। কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন—

'আখ্যানমঞ্জরী পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইঙ্গরেজী পুস্তক অবলম্বনপূর্ব্বক সঙ্কলিত হইল। যদি আখ্যানগুলি বালকদিগের ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশে ফলোপধায়ক হয় তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।'[২৯] পরবর্তীকালে তা দুটি ভাগে প্রকাশিত হয়। সরল ভাষায় লিখিত ও ছোট লেখাগুলি নিয়ে প্রথম ভাগ এবং নতুন কয়েকটি লেখাসহ আগের কয়েকটি লেখা নিয়ে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ সালে দ্বিতীয় ভাগ পুনরায় বিভক্ত হয়ে তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।[৩০]

বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পর তিনি শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই সরকারি খরচে শিশুপাঠ্য বই ছাপানো নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাঁর যে পত্রালাপ হয় তাতে বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পর শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগের কথা উল্লেখ করেন।[৩১] সেইদিকে লক্ষ রেখেই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর শিশুশিক্ষারও তিনি সংশোধন করেন। ১৮০৬ শকাব্দে (ইং ১৮৮৪) তৃতীয় ভাগের মুখবন্ধে তিনি বলেন,

"শিশুশিক্ষার তৃতীয় ভাগ, সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে আদ্যোপান্ত সংশোধিত হইল। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের বোধসৌকর্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত, কোনও কোনও অংশ পরিবর্তিত, কোনও কোনও অংশ পরিবর্ধিত, কোনও কোনও অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে বালকবালিকাদিগের পক্ষে অর্থবোধ প্রভৃতি বিষয়ে, পূর্ব অপেক্ষা অনেক অংশে সুবিধা হইবেক, তাহাতে সংশয় নাই।"[৩২]

অক্ষর, ভাষা ও উচ্চারণ—শিশুদের উপযোগী পাঠ্য-বইয়ের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক খুবই নিবিড়। বিদ্যাসাগর সে-সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন, তাঁরই লেখা বিভিন্ন শিশুপাঠ্য বই আলোচনা করলে তা ভালভাবেই প্রমাণিত হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে, শিশুরা টেলিগ্রাফে ব্যবহৃত বাক্যের মত ছোট-ছোট বাক্য দিয়ে কথা বলে।[৩৩] কারণ তাদের পক্ষে বড়-বড় বাক্য দিয়ে কথা বলা ও মনে রাখা সম্ভব নয়। ঐ সব ছেলেদের কথা মনে রেখেই তিনি 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের ১ নং পাঠে—"বড় গাছ। ভাল জল। হাত ধর। বাড়ী যাও"—ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন।

ক্রমে-ক্রমে সহজ ও সরল বাক্য গঠনের মাধ্যমে লেখা ও বলার ক্ষেত্রে শিশু যেমন পরিপূর্ণতা লাভ করে তেমনই তার মানসিক বিকাশও ত্বরান্বিত হয়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই

তিনি তাঁর 'বর্ণপরিচয়' দুই খণ্ডে রচনা করেন। তাই প্রথম ভাগে বিভিন্ন অক্ষর দিয়ে অবিমিশ্র থেকে শুরু করে মিশ্র বর্ণ যোজনার উদাহরণ দেন। তেমনই সহজ ও সরল বাক্যের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই পরবর্তী অংশে বিভিন্ন পাঠের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কেবলমাত্র সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গে পরিচয় করানোর উদ্দেশ্য নিয়েই দ্বিতীয় ভাগের রচনা। তার অর্থের সঙ্গে শিশুদের পরিচিত করানোর কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না। তবে ক্রমাগত সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহারে শিশুদের কাছে তার পাঠ যাতে নীরস বোধ না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি মাঝে-মাঝে শিশুদের বোধগম্য এক-একটি সরল পাঠ যোগ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পাঠগুলিকে নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে সহজেই বোঝা যায়, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে শিশুমনের ক্রমবিকাশের প্রতি তাঁর লক্ষ্য ছিল।

শিশুমনের উপযোগী শব্দচয়নের প্রতিও তিনি লক্ষ্য রাখেন। 'বর্ণপরিচয়' দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে আলোচনা করলে তা ভালভাবেই বোঝা যায়। পঞ্চপঞ্চাশ সংস্করণের সংযুক্তবর্ণ 'য' ফলার ক্ষেত্রে তিনি প্রথম ঐক্য, বাক্য, অনৈক্য শব্দগুলি ব্যবহার করেন। কিন্তু চতুঃসপ্ততিতম সংস্করণে তার পরিবর্তে ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য শব্দের ব্যবহার করেন।

শিশুদের উচ্চারণে নানা অসঙ্গতি দেখা যায়।[৩৪] প্রথম থেকেই দূর করার চেষ্টা না করলে ভবিষ্যতে তা দূর হওয়ার সম্ভাবনা কম। সেই জন্য 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ, ষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলেন,

"প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে বালকেরা অ, আ—এই দুই বর্ণস্থলে স্বরের অ, স্বরের আ বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা সেরূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ এইরূপ বলে, তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

"যে সকল শব্দের অন্তবর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ—এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হলন্ত, কতগুলি অ-কারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা—হলন্ত গুড়, ঘর, হাত, জল, পথ, বন ইত্যাদি; অ-কারান্ত কত, ছোট, ভাল, ঘৃত, দৈব, মৌল ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া, তাদৃশ শব্দমাত্রই অ-কারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। বর্ণযোজনার উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি অ-কারান্ত উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক, সেই সেই শব্দের পার্শ্বদেশে ★ এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল। যে সকল শব্দের পার্শ্বদেশে তদ্রূপ চিহ্ন নাই, উহারা হলন্ত উচ্চারিত হইবেক।

"বাঙ্গালা ভাষায় ত-কারের ত, ৎ, এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ডতকার। ঈষৎ, জগৎ, বৃহৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় খণ্ডতকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ডতকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, 'বর্ণপরিচয়' পরীক্ষার শেষভাগে ত কারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।"

বিরাম চিহ্নের ব্যবহার : ইংরেজি সাহিত্যের মতো প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র দশম সংস্করণ থেকে বিদ্যাসাগর প্রথম এর ব্যবহার শুরু করেন, শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার দেখা যায়। আলোচনা প্রসঙ্গে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগ থেকে উদাহরণ তুলে ধরা হল।

'শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগের প্রথম পাঠটি হল "সুশীল শিশুকে সকলে ভালবাসে।" উক্ত পাঠের প্রথম কয়েকটি লাইন হল, "সুশীল ও সুবোধ বালক সর্ব্বদা লেখাপড়া করে। সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। পাঠের সময় সে যেমন পাঠ বলিতে পারে আর কেহই

তেমন পারে না। এজন্য গুরু মহাশয় তাহার উপর বড় সন্তুষ্ট থাকেন।"[৩৫]

পরবর্তীকালে উক্ত কয়েকটি লাইনে বিদ্যাসাগর নিম্নলিখিত বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করেন,

"সুশীল ও সুবোধ বালক সর্ব্বদা লেখাপড়া করে; সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় না। পাঠের সময়, সে যেমন পাঠ বলিতে পারে, আর কেহই তেমন পারে না। এজন্য, শিক্ষক মহাশয়, তাহার উপর, বড় সন্তুষ্ট থাকেন।"[৩৬]

অক্ষর সমস্যা : ইংরেজি অক্ষরের সঙ্গে বাংলা অক্ষরের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা উনিশ শতকের প্রথমেই শুরু হয়। সেই সময়ে কাজের সুবিধার্থে 'ণ' ও 'ন' এবং 'শ', 'ষ' ও 'স'—একাধিক অক্ষরের পরিবর্তে একটিমাত্র অক্ষর ব্যবহারের সুপারিশ হয়েছিল।[৩৭] বিদ্যাসাগরও বাংলা অক্ষর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু উ঱্ উপায়ে নয়। তাঁর সংস্কারের পরিকল্পনা এখানে তুলে ধরা হল,

(ক) বাংলাভাষায় দীর্ঘ ঋ-কার ও দীর্ঘ ৯-কারের প্রয়োগ না থাকায় তিনি তা স্বরবর্ণ থেকে বাদ দেন।

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে অনুস্বার ও বিসর্গের জন্য নূতন করে স্থান নির্দেশ করেন।

(গ) চন্দ্রবিন্দুকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলে উল্লেখ করেন।

(ঘ) আকার ও উচ্চারণ অনুসারে ড়, ঢ় ও য়-কে ড, ঢ, য থেকে পৃথক বর্ণ বলেন।

(ঙ) 'ক' ও 'ষ' মিলে 'ক্ষ' হওয়ায় ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে তা বাদ দেন।[৩৮]

শিশুমনের কাছে ছবি খুবই চিত্তাকর্ষক। তাই শিশুসাহিত্যে ছবির সংযোজন অনেকদিন থেকেই চালু হয়েছে। বাংলায় 'পশ্বাবলী' পক্ষির বিবরণ, ঠাকুরদার হস্তিবিষয়ক ইতিহাস, বালক, বালকবন্ধু, মুকুল ইত্যাদি শিশুসাহিত্যে ছবির ব্যবহার দেখা যায়। শিশুপ্রেমিক বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও স্বভাবতই এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনার দাবি রাখে। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত চিঠির ভিত্তিতে বলা যায়, সেখানে বিদ্যাসাগরের লিখিত বইগুলিতে ছবি নেই। অথচ তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ দেবের মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে জ্যেষ্ঠপুত্র পঠিত ভাষণ থেকে জানা যায়, ত্রৈলোক্যনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বইয়ের জন্য প্রথম ছবি এঁকেছিলেন।[৩৯] এক্ষেত্রে শেষোক্ত ভাষণটির সত্যতা সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন থেকে যায়। সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা আশু প্রয়োজন।

(ক) বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় তাঁর প্রকাশিত বইগুলির সমস্ত সংস্করণ একত্রে অথবা ভিন্ন ভিন্নভাবে কোথাও পাওয়া যায় না। বিশেষ করে শেষ বছরের সংস্করণগুলি এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন।

(খ) শিশুসাহিত্য নিয়ে তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করতেন। বর্ণপরিচয়ের বিভিন্ন সংস্করণগুলি পরীক্ষা করলে এ-প্রসঙ্গে আভাস পাওয়া যায়।[৪০] অন্যান্য বইয়ের বিজ্ঞাপন থেকেও বিভিন্ন সময়ে তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এর উপর নির্ভর করে আমরা কি বলতে পারি হয়তো বিদ্যাসাগরের মনে কোনও সময়ে শিশুসাহিত্যে ছবির ব্যবহারের চিন্তাভাবনা স্থান পেয়েছিল?

পাঠ্যসূচি : এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'শিশুকেন্দ্রিক' শিক্ষার চিন্তাভাবনা তখনও শুরু হয়নি। শিক্ষা ছিল কেন্দ্রবিন্দু এবং শিশুদের এর দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল শিক্ষাবিদ্রের প্রধান উদ্দেশ্য। তৎকালীন ইংলন্ডের শিক্ষাবিদদের মধ্যে এডগেওয়ার্থ বেন্থাম, জেমস মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এডগেওয়ার্থ অল্পবয়সের শিশুদের

জোর করে পড়াশুনা করানোর বিরোধিতা করেন। কারণ এর ফলে বইয়ের প্রতি শিশুদের বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে।[৪১] তবে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াও তিনি সমর্থন করেননি। কারণ বিনা পরিশ্রমে তাঁর মতে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়।[৪২] লকের মতো তিনিও মনে করতেন সু-অভ্যাস ও চরিত্রগঠনই হল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।[৪৩] সেই সময়ে ইংলন্ডের স্কুলগুলিতে ল্যাটিন ও গ্রিক শিক্ষা দেওয়া হত। এডগেওয়ার্থ এর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে আট অথবা নয় বছরের ছাত্রদের ল্যাটিন ও গ্রিক শিক্ষা দেওয়া অনুচিত।[৪৪] নৈতিক ও বুদ্ধির উন্মেষের জন্য দরিদ্রদের শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা বেন্থাম উল্লেখ করেন।[৪৫] বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তৎকালীন ইংলন্ডে ল্যাঙ্কেস্টার ও বেলের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। বেল ছিলেন চার্চের প্রধান ভক্ত এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত টোরিদের সমর্থনপুষ্ট। অপরদিকে ল্যাঙ্কেস্টার ছিলেন কোয়েকার চিন্তাধারার সমর্থক। তিনি বিদ্যালয়ে বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বভাবতই জেমস মিল উক্ত বিরোধে ল্যাঙ্কেস্টারের পক্ষ অবলম্বন করেন।[৪৬] হার্বার্ট স্পেন্সারও শিশুদের প্রথমে সহজ থেকে কঠিন এবং পরে বাস্তব থেকে দুর্বোধ্য বিষয়ে শিক্ষা দিতে বলেন।[৪৭] মিঃ জে-উইলিয়ামও শিশুদের বোধগম্য হওয়ার জন্য সহজ ও সরল ভাষায় পাঠদানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। শিশুদের কাছে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় এমন সকল বিষয়বস্তু নিয়ে পাঠ্যতালিকা রচনার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।[৪৮]

এডগেওয়ার্থের মতো বিদ্যাসাগরও মনে করতেন বিনা পরিশ্রমে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। তাই বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় পাঠে তিনি উল্লেখ করেন,

"শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখাপড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে।"

সু-অভ্যাস ও চরিত্রগঠনকে বিদ্যাসাগরও শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। সেইজন্যই 'বর্ণপরিচয়ে'র প্রথম ভাগের ১৯ ও ২০ নং পাঠে গোপাল ও রাখাল কাহিনীদুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত কাহিনীদুটির অন্তর্ভুক্তির কারণ নিয়ে অনেকেই, এমনকি স্বয়ং কবিগুরুও প্রশ্ন তুলেছেন। এর একটিমাত্র উত্তর হল, বিদ্যাসাগর নিজের দিব্যদৃষ্টিতে তৎকালীন বাঙালি সন্তানদের ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই গোপালের আদর্শে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে তিনি বুঝেছিলেন, সাধারণের পক্ষে শিক্ষালাভ হল এক দুর্লভ ব্যাপার। তাই 'চরিতাবলী'তে এমন সব চরিত্রের উল্লেখ করেন, যাঁরা অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছিলেন। দরিদ্র বালকদের লেখাপড়ায় উৎসাহদান করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ-সম্পর্কে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বক্তব্য হল,

"সন ১২৬৩ সালের ১লা শ্রাবণ অগ্রজ মহাশয় চরিতাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন, ইহাতে অতি সরল ভাষায় ডুবাল, উইলিয়াম রস্কো, হীল, জিরমষ্টোন প্রভৃতি ইউরোপীয়ান মহানুভবদিগের জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে এতদ্দেশীয় শিশুগণের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিবে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে; যেহেতু উপরোক্ত মহাত্মারা প্রায় সকলেই দরিদ্র সন্তান।... অগ্রজ মহাশয় এতদ্দেশীয় দরিদ্র বালকগণকে লেখাপড়া শিখিতে উৎসাহান্বিত করিয়া দিবার মানসে অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিশ্রম সহকারে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।"[৪৯]

শিশুদের জন্য সহজ ও সরল ভাষায় বই লেখা ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তাই 'আখ্যানমঞ্জরী' প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেন,

"কিছু দিন পূর্ব্বে, কলিকাতাস্থ কোনও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, আখ্যানমঞ্জরী যেরূপ ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তদপেক্ষা সরল ভাষায় পুস্তকান্তর প্রস্তুত হইলে, অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনেক উপকার দর্শে। তদনুসারে, সরল ভাষায় কতকগুলি আখ্যানের সঙ্কলন এবং পূর্ব্বপ্রচারিত পুস্তক হইতে কতিপয় আখ্যানের উচ্চারণপূর্ব্বক, আখ্যানমঞ্জরীর প্রথম ভাগ নামে এই পুস্তক প্রচারিত হইল।"

সেই সময় ইংলন্ডে অনেকেই শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। ধর্মীয় মতবাদের পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তার মহিমা প্রচারের জন্য তাঁরা সুপারিশ করেন। জর্জ কুম্বে ছিলেন উক্ত বিষয়ে বিশেষভাবে অগ্রগণ্য। তাঁর মতে, স্কুলে ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের ফলে জাতির শিক্ষা ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের আচরণ সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মকানুনগুলিকে তুলে ধরে যুবকদেরকে নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করা।[৫০]

উপরোক্ত মতের সঙ্গে 'বোধোদয়' প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের মতের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। এখানে তা উল্লেখ করা হল :

"ঈশ্বর সকল পদার্থের সৃষ্টিকর্তা, তিনি প্রধান চেতন, অবচেতন, উদ্ভিদ, সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র, পর্বত, তরু, লতা, মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকল তাঁহার সৃষ্টি। এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা কহে।

"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, আমরা যাহা করি তিনি তাহা দেখিতে পান; এবং যাহা মনে ভাবি তাহাও জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু এবং সকল বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন। তিনি যাবতীয় জীবজন্তুকে আহার দেন ও রক্ষা করেন। অতএব ঈশ্বরকে ভক্তি, স্তব ও প্রণাম করা আমাদের কর্তব্য।"

'বোধোদয়' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তাতে ঈশ্বর বিষয়ে কোনও কথা ছিল না। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এ-সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি তাঁকে কথা দেন, পরবর্তী সংস্করণে ঈশ্বরের কথা থাকবে। সেইমতো পরবর্তী সংস্করণে ঈশ্বর সম্পর্কে একটি পাঠ 'বোধোদয়'-এ যুক্ত হয়। অনেকে মনে করেন, বোধোদয়ের মতই তাঁর ধর্মমত। তিনি নিজেও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে স্বীকার করেন,

"এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে, ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে, নিশ্চয়ই তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করি না।"[৫১]

বজ্রের থেকে কঠোর কিন্তু কুসুমের থেকে কোমল—ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে—"Spare the rod and spoil the child—অর্থাৎ বেত না মারলে ছাত্রগণ নষ্ট হয়ে যাবে। বিদ্যাসাগর কিন্তু এর ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। তিনি নিজের স্কুলে ছাত্রদের বেত মারা তুলে দেন। শুধু বেত মারাই নয়, যেসব শাসনে ছাত্রদের ক্ষতি হতে পারে তা তিনি বন্ধ করে দেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকান্দ) মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। কোনও এক কারণে মাস্টারমহাশয় এমনভাবে কান মলে দেন যে, তাঁর কান দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। বিদ্যাসাগর ঠিক সেই সময়ে স্কুলে উপস্থিত ছিলেন। গোলমাল শুনে তিনি

উক্ত ক্লাসে গিয়ে সব ঘটনা শুনে সেই মাস্টারমহাশয়কে তিরস্কার করে বলেন : আমি জানতাম, তুমি একজন মানুষ। এখন দেখছি, তুমি একটা পশু।

তবে অন্যায় করলে ছাত্রদের তিনি কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। অন্যায় করার জন্য মেট্রোপলিটনের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চের দ্বিতীয় শ্রেণীর সব ছাত্রকে তিনি একবার ক্লাস থেকে বের করে দেন। পরের দিন ওরা বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গিয়ে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় বিদ্যাসাগর তাদের ক্ষমা করেন। আরেকবার মেট্রোপলিটনের ছাত্ররা বিদ্যাসাগরের কাছে পৌষপার্বণের ছুটি প্রার্থনা করায় তিনি তা মঞ্জুর করেন এবং পরক্ষণেই প্রশ্ন করেন যে কলকাতার বাসায় তারা পিঠা পাবে কোথায়? ছাত্রদের মধ্যে একজন উত্তর দেয়, "আপনার বাড়িতে।" বিদ্যাসাগর হেসে তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে নিজের বাড়িতে ছেলেদের জন্য বিস্তর পিঠার ব্যবস্থা করেন।[৫২] বিদ্যাসাগর শিশুদের যে কত ভালবাসতেন, তার প্রকৃত উদাহরণ হল "প্রভাবতী সম্ভাষণ"।[৫৩]

শিক্ষক-শিক্ষণ : উপরোক্ত সমস্যাগুলির মতো উপযুক্ত শিক্ষকের সমস্যাও ছিল সেই সময়ে। তৎকালীন সংবাদপত্রে এ নিয়ে প্রায় আলোচনা প্রকাশিত হত। লর্ড হার্ডিঞ্জের পরিকল্পনা কার্যকরী করার পথে উপযুক্ত শিক্ষকের সমস্যা উল্লেখ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' মন্তব্য করে,

"এই সকল শিক্ষকেরা কেবল শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা ও অঙ্ক শিক্ষা করাইবেন। ইহাতে ইংরাজীর কোন সম্পর্ক থাকিবেক না। ইহার অভিপ্রায়ে দেশভাষা চলনার্থে যে আইন হইয়াছে তাহা যথার্থরূপে চলে না যেহেতু সে সকল ভাষা লিখন-পঠনে প্রাচীন কর্মকারকেরা অপটু।"[৫৪]

উক্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য রামচন্দ্র মিত্রও শিক্ষকদের উপযুক্ততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।[৫৫]

হ্যালিডের কাছে লিখিত পত্রে বিদ্যাসাগরও গ্রামের গুরুমহাশয়দের উপযুক্ততা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।[৫৬] শিক্ষা পরিষদের নির্দেশে ১৮৫৫ সালের প্রথমদিকে তিনি হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত পাঠশালাটি পরিদর্শনে যান এবং ফিরে এসে যে-প্রতিবেদন দাখিল করেন, তাতেও তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তিনি বিরূপ মন্তব্য করেন।[৫৭]

শিক্ষক-শিক্ষণের কাজ সর্বপ্রথম মিশনারি প্রতিষ্ঠানেই শুরু হয়। ১৮১৬ সালে মিঃ মে শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য চুঁচুড়ায় একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উক্ত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে কিছুদিন 'সর্দ্দার পোড়ের' শিক্ষা শেষ করে শিক্ষকেরা গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে যেতেন।[৫৮]

শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষ থেকেও একই সময়ে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা হয়েছিল।[৫৯] উক্ত নরম্যাল স্কুলে গ্রামবাসীদের মনোনীত কোনও ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়া হত। উক্ত ব্যবস্থায় উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন গ্রামের পক্ষ থেকে শিক্ষকতায় পারদর্শী করার জন্য মনোনীত ব্যক্তিদের শ্রীরামপুর পাঠানো হয়। এর ফলে উক্ত অঞ্চলে উনিশটি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।[৬০]

১৮৪৭ সালে ইংরেজি স্কুল ও কলেজের জন্য কলকাতায় একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে'র শিক্ষকদের জন্য একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপনের দাবি করে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'য় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এখানে উক্ত বক্তব্যগুলি তুলে ধরা হল :

(ক) যেহেতু মাতৃভাষায় বই লেখার জন্য উপযুক্ত লোকের অভাব নেই, সেইহেতু বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপন বেশী প্রয়োজনীয়।[৬১]

(খ) উপযুক্ত দেশীয় ব্যক্তিদের উপর উক্ত নরম্যাল স্কুলের দায়িত্ব দিলে শিক্ষক-শিক্ষণের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক দেশীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে।[৬২]

(গ) ছাত্রদের পাশ্চাত্য জ্ঞানদানের জন্য হার্ডিঞ্জ ১০১টি বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন, কিন্তু তৎকালে ঐ কাজের উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব থাকায় তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। সুতরাং সরকার যদি সেই অভাবটুকু বুঝতে অক্ষম হন অথবা বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপনে অনিচ্ছুক হন তাহলে উক্ত বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত।[৬৩]

জোরালো বক্তব্য রাখা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে নিউ মডেল ভার্নাকুলার স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিদ্যাসাগর কর্মপ্রার্থীদের একটি পরীক্ষা গ্রহণ করেন। উক্ত পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় শিক্ষা পরিষদের অধিকর্তার কাছে নরম্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য তিনি অনুরোধ করেন এবং তাঁর আবেদন অনুযায়ী ১৮৫৫ সালের ৬ জুলাই একটি নরম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়।[৬৪] প্রথমে অক্ষয়কুমার দত্ত ও পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি এবং রাজকৃষ্ণ গুপ্ত নরম্যাল স্কুলের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত হন। শিরঃপীড়া ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত কাজ ছেড়ে দেওয়ায়, রামকমল ভট্টাচার্য উক্ত পদে যোগ দেন।[৬৫]

প্রথমে স্থানাভাবের জন্য উক্ত নরম্যাল স্কুলের কাজ সংস্কৃত কলেজেই শুরু হয়। সকালবেলা দু' ঘণ্টা করে শিক্ষক-শিক্ষণের ক্লাস নেওয়া হত। এক বছরের মধ্যেই বিদ্যাসাগর বুঝতে পারেন শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য দু' ঘণ্টার পরিবর্তে ছয় ঘণ্টার প্রয়োজন। সুতরাং আলাদা বাড়ির প্রয়োজন। এরপর মাসিক ৭০ টাকা দিয়ে একটি পৃথক বাড়ি ভাড়া করার জন্য তিনি শিক্ষা-অধিকর্তার কাছে আবেদন করেন।[৬৬]

উক্ত নরম্যাল স্কুলে শিক্ষকদের সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, পাটীগণিত, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত। তার জন্য মাত্র দু'জন শিক্ষককে নিযুক্ত করা হয়েছিল।তাঁদের পক্ষে অতগুলি বিষয়ে পাঠদান করা কখনও সম্ভব নয়। তাই বিদ্যাসাগর মাসিক ৪০ টাকা মাহিনায় আরেকজন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষা-অধিকর্তাকে পত্র লেখেন।[৬৭] পরবর্তীকালে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং অভিমতের জন্য ১৮৫৭ সালে অক্টোবর মাসে বিদ্যাসাগরকে একখানি চিঠি লেখেন। এর উত্তরে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-অধিকর্তার কাছে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি পেশ করেন,

(১) শুধুমাত্র সাধারণ শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বর্তমানে নরম্যাল স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়েছে। উঁচু স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষা দিতে শুধুমাত্র পাঠ্যসূচি পালটালে চলবে না, উচ্চতর শিক্ষকমণ্ডলীর প্রয়োজন।

(২) ছাত্রদের কাছে পরিষ্কারভাবে কোনও বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত এমন শিক্ষকের প্রয়োজন যিনি ইংরেজিতে দক্ষ এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে সুপরিচিত অথচ মাতৃভাষায় ভাল জ্ঞান আছে। এইরূপ একজন শিক্ষকের মাহিনা মাসে ৩০০ টাকা হওয়া প্রয়োজন। কারণ কেবলমাত্র সাধারণ শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য হুগলি ও ঢাকার নরম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের মাহিনা মাসে ৩০০ টাকা। তদুপরি ইতিহাস ও বিজ্ঞানের জন্য একজন

এবং সাহিত্যের জন্য আরেকজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আর তাঁদের মাহিনা কমপক্ষে মাসে ১০০ টাকা হওয়া দরকার।

(৩) ছাত্রদের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা হারে ৬০টি বৃত্তির প্রয়োজন। বিভিন্ন বিষয়ের কথা মনে করে শিক্ষাদানের সময় দুই বছর হওয়া উচিত।

(৪) মডেল স্কুলের প্রথম শ্রেণী এবং সংস্কৃত কলেজের নিম্নবিভাগের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের এখানে পড়ার সুযোগ দিতে হবে। কেননা, বিভিন্ন কারণবশত উক্ত প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম তাদের পক্ষে শেষ করা সম্ভব হয়নি। তবে পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ততা যাচাই করে বহিরাগত ছাত্রদেরও উক্ত নরম্যাল স্কুলে পড়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

(৫) সরকারের নির্দেশে পাঁচ বছরের জন্য মাসিক ৩০ টাকা মাহিনায় শিক্ষকতা করার অঙ্গীকারে বৃত্তিপ্রাপ্ত ও বিনা মাহিনার ছাত্রদের সম্মতি দিতে হবে।

(৬) সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পরিচালনার জন্য উক্ত স্কুলটি সংস্কৃত কলেজের কাছেই স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য মাসিক ৭০ টাকা হারে বাড়ি ভাড়ার প্রয়োজন। তবে লাইব্রেরি বাদে হিন্দু কলেজের কেন্দ্রীয় ভবনের বাকি অংশটুকু যদি সংস্কৃত কলেজকে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত বাড়ি ভাড়ার প্রয়োজন নেই। সেই সময়ে সংস্কৃত কলেজের তৃতীয়তলার পশ্চিম-পার্শ্বস্থ অংশ প্রেসিডেন্সি কলেজের দখলে ছিল। সেই অংশটা উক্ত কলেজের মূল বাড়িতে স্থানান্তরিত করলেই উক্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে।

(৭) পাঠসূচি

(ক) **ভূগোল** : সংক্ষিপ্ত ভূগোল এবং ভারত ও প্রাকৃতিক ভূগোল।

(খ) **গণিত** : পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি।

(গ) **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান** : প্রাথমিক সাধারণ বিজ্ঞান, সংক্ষিপ্ত জ্যোতির্বিদ্যা।

(ঘ) **ইতিহাস** : সংক্ষিপ্ত সাধারণ ইতিহাসসহ গ্রিস, রোম, ইংলন্ড, ভারতবর্ষ ও বাংলার ইতিহাস।

(ঙ) **জীববিজ্ঞান**।

(চ) **অর্থনীতি**।

(ছ) **নীতিবিজ্ঞান** [৬৮]

তিনি শুধু শিক্ষক-শিক্ষণের প্রতিবেদন পেশ করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিটি স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা ও তাঁদের মাহিনা সম্পর্কেও তিনি সুনির্দিষ্ট বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর মতে, প্রাতিটি স্কুলের তিন থেকে পাঁচটি শ্রেণী একজন শিক্ষকের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সেখানে কমপক্ষে দু'জন শিক্ষকের প্রয়োজন। যোগ্যতা ও পারিপার্শ্বিক ও অন্যান্য ঘটনার কথা বিচার করে শিক্ষকদের মাসিক মাহিনা ২০, ২৫ ও ৩০ টাকা করার জন্য তিনি সুপারিশ করেন। উপরোক্ত পাঠ্যপুস্তকগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার পর প্রতিটি স্কুলে মাসিক ৫০ টাকা মাহিনায় একজন করে হেডপণ্ডিত নিয়োগের পরামর্শ দেন।

তিনি বুঝেছিলেন, মাতৃভাষার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ কার্যকর করার জন্য সাক্রিয় ও দক্ষ তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন। তাই মাসিক ১৫০ টাকা মাহিনায় দু'জন দেশীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিয়োগ করতে বলেন। তাদের মধ্যে একজনের উপর মেদিনীপুর ও হুগলি এবং অন্যজনের উপর নদীয়া ও বর্ধমানের দায়িত্ব থাকবে। তাঁদের কাজ হবে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করে ছাত্রদের পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষাপদ্ধতির সংশোধন করা।

সর্বোপরি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের উপর সমগ্র পরিকল্পনাটির দায়িত্ব দিতে হবে। এজন্য তাঁকে ভাতা হিসেবে ৩০০ টাকা দিতে হবে। তিনি বছরে একবার বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করে কর্তৃপক্ষকে একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন। সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ, পাঠ্য-বই প্রকাশনে সহায়তা করতে এবং প্রধান পরিদর্শকের অনুপস্থিতিতে তাঁর কাজ চালানোর জন্য মাসিক ১০০ টাকা মাহিনা, আরেকজন সহকারী প্রধান পরিদর্শক নিয়োগের জন্য তিনি সুপারিশ করেন।[৬৯]

শিক্ষাপদ্ধতি : শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেই সময়ে কলকাতা ও তার পার্শ্বস্থ অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন পদ্ধতি চালু হয়েছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ল্যাঙ্কেস্টার পদ্ধতির কিছুটা অদলবদল করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। চুঁচুড়ায় পিয়ার্সন বেল পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং তার জন্য 'পাঠশালার বিবরণ' নাম দিয়ে একখানি বই প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ডেভিড স্টোর পরিকল্পনা অনুসরণ করে জনাইতে জনাই ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। পেস্তালজির পরিকল্পনা অনুসরণ করে রেভারেন্ড লঙ ঠাকুরপুকুরে নতুন একটি শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেন। বিদ্যাসাগর উক্ত পদ্ধতিগুলির কোনওটাই গ্রহণ করেননি। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের সুবিধার্থে বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে তিনি বর্ণযোজনার নির্দেশিকা লিপিবদ্ধ করেন। যেমন :

ব র্ণ প রি চ য়

প্রথমভাগ	**দ্বিতীয়ভাগ**
আ-কার যোগ	য-ফলা—্য
ক আ কা / ম আ মা	ক য ক্য * * *
ই-কার যোগ	হ য হ্য
ক-ই কি / ব ই বি	র-ফলা—্র
ঈ-কার যোগ	ক র ক্র * * *
ক-ঈ কী / ত ঈ তী	হ র হ্র
* * * ইত্যাদি।	ল-ফলা—ল ল্ল
	ক ল ক্ল * * *
	হ ল হ ল্ল

সমালোচনা ও প্রশংসা : শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং তাকে কার্যকরী করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও কর্মজীবনের প্রথম দিকে পাঠ্য-বই নিয়ে তাঁকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি পিছু হটেননি।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য-বই হিসেবে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নির্বাচিত হতে পারে কি না তা নির্ধারণের দায়িত্ব রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর দেওয়া হয়। উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় তিনি তাকে পাঠ্য-বই হিসেবে নির্বাচিত করতে আপত্তি জানান। তখন বাধ্য হয়েই বিদ্যাসাগর শ্রীরামপুরের মিশনারিদের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং মার্শম্যান বেতাল পঞ্চবিংশতিকে তৎকালে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে একখানি প্রশংসাপত্র দেন।[৭০]

অশ্লীল ও প্রণয়োদ্দীপক—এই অজুহাতে হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষও 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'কে পাঠ্য-বই হিসেবে গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কারণ এই বই পড়লে

ছাত্রদের নৈতিক ক্ষতি হতে পারে। প্রত্যুত্তরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সচিব মার্শাল বলেন, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে তা সবচেয়ে উঁচুস্তরের। সুতরাং ছাত্রদের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' পড়তে দেওয়া যেতে পারে।[৭১]

তবে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রশংসা প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রভাকরের মতে, 'পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন কেবল তাহাই বালকদের শিক্ষোপযোগী হইয়াছে।'[৭২] অন্যত্র বলা হয়, "আধুনিক পুস্তকাদির মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'জীবনচরিত' প্রভৃতি যে কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ববিধায়ে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তৎপাঠে সকলেরই প্রয়াস জন্মে।"[৭৩]

কেবল পত্রপত্রিকাতেই নয়, সরকারি ও বেসরকারি মহলেও পাঠ্য-বইয়ের লেখক হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। এইচ· রিকেটস[৭৪] ও রামগোপাল ঘোষের[৭৫] বক্তব্য থেকে তা ভালভাবেই জানতে পারা যায়। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার্থীদের জন্য পরবর্তীকালে তাঁরই লেখা 'চরিতাবলী' পাঠ্য-বই হিসেবে নির্বাচিত হয়।[৭৬]

বিদ্যাসাগরের কাছে শিক্ষা ছিল মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর করে সুস্থ মানবিকবোধ জাগিয়ে তোলার অস্ত্র। তাই তিনি সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করে বাংলা শিক্ষার বনিয়াদকে রচনা করতে চেয়েছিলেন।[৭৭]

অপরদিকে বিদেশী শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল শাসনকার্যের উপযোগী আমলা তৈরি করা। তাই, উভয়ের মধ্যে সঙ্ঘাত ঘটা খুবই স্বাভাবিক। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে সরকারি দায়িত্ব থেকে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু সামাজিক কুসংস্কারগুলি আজও দূর হয়নি। তাই তা দূর করার জন্য বিদ্যাসাগরকে আমাদের বেশি করে স্মরণ করা প্রয়োজন।

নির্দেশিকা

১· চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর। আনন্দধারা প্রকাশন, পৃ· ৫৬
২· তদেব। পৃ· ৫৭
৩· ইন্দ্রমিত্র : করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। পৃ· ৬৫
৪· তদেব। পৃ· ১৫০-১৫১
৫· ইন্দ্রমিত্র : করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। পৃ· ২৭৫-২৭৬
৬· Arabinda Guha. (ed.) : Unpublished letters of Vidyasagar.pp. 125-127
৭· বিনয়ভূষণ রায় : শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়। পৃ· ১-২
৮· যোগেশচন্দ্র বাগল : বাংলার জনশিক্ষা। ১৮০০-১৮৫৬। কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃ· ৮
৯· তদেব। পৃ· ৫৭
১০· তদেব। পৃ· ৬৩
১১· বিনয়ভূষণ রায় : শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়। পৃ· ৩-৭
১২· বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। পৃ· ৫৭৩
১৩· তদেব। পৃ· ১৬৫
১৪· বিহারিলাল সরকার : বিদ্যাসাগর। কলিকাতা, ১৩০২, পৃ· ১৭৪

১৫· ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বেতাল পঞ্চবিংশতি । ২য় সংস্করণ । কলিকাতা, সংবৎ ১৯০৬ । পৃ· ভূমিকা ১-২

১৬· বিনয়ভূষণ রায় : শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয় । পৃ· ১২

১৭· বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ । পৃ· ২১৮

১৮· মদনমোহন তর্কালঙ্কার : শিশুশিক্ষা, প্রথম ভাগ । কলিকাতা, সংবৎ ১৯০৭, বিজ্ঞাপন

১৯· শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত । কলিকাতা, ১২৯৮, পৃ· ৮২

২০· ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বোধোদয় । নবমবার মুদ্রিত । কলিকাতা, ১৮৫৭, প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

২১· রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় : নীতিবোধ । দশমবার মুদ্রিত । কলিকাতা, ১৮৬১, বিজ্ঞাপন

২২· ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : জীবনচরিত । কলিকাতা, ১৮৪৯, পৃ· ভূমিকা ১-২

২৩· Selections from Records of Bengal Govt. No. XXII, Calcutta, 1855, pp. 71-72

২৪· Arabinda Guha (ed.) : Unpublished Letters of Vidyasagar. Calcutta, 1971, p.25

২৫· Ibid. p.33, Letter No. 69, 70

২৬· Ibid. p.89. Letter no.202

২৭· শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত । পৃ· ১২০

২৮· ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : কথামালা । ঈসপ্ রচিত পুস্তক হইতে সংগৃহীত । অষ্টবিংশ সংস্করণ । কলিকাতা, সংবৎ ১৯৩৫ (১৮৭৮), বিজ্ঞাপন

২৯· ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : আখ্যানমঞ্জরী । ২য় ভাগ । ষষ্ঠ সংস্করণ । কলিকাতা, সংবৎ ১৯২৬ (১৮৬৯) প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

৩০· ইন্দ্রমিত্র : করুণাসাগর বিদ্যাসাগর । পৃ· ৫৯৫

৩১· Arabinda Guha (ed.) : Unpublished

৩২· মদনমোহন তর্কালঙ্কার : শিশুশিক্ষা । তৃতীয় ভাগ । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক সংশোধিত একনবতিতম. সংস্করণের বিজ্ঞাপন

৩৩· Smith. F. and Miller. G.A.(ed.) : The genesis of language. a phychometric approach. London. 1966. p.18

৩৪· Ibid. p. 173-186.

৩৫· মদনমোহন তর্কালঙ্কার : শিশুশিক্ষা । তৃতীয় ভাগ । পঞ্চদশবার মুদ্রিত । পৃ· ১

৩৬· তদেব । একোনত্রিংশদধিকশততম সংস্করণ । বিদ্যাসাগর সংশোধিত । পৃ· ১

৩৭· An Important reform in the Bengali alphabet. Friend of India. 1838. 26 April.

৩৮· সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (শিক্ষা ও বিবিধ) । কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃ· ২৫৯

৩৯· উক্ত ভাষণের Xerox copy সিদ্ধার্থ ঘোষের কাছে আছে

৪০· "শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়"—এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে

৪১· Curtis, S. J & M. E. A. Boltwood : A short history of educational ideas. London, 1953, p.383.

৪২· Ibid.p.384

৪৩· Ibid.p.386

৪৪· Ibid.p.388

৪৫· Ibid.p.390

৪৬· Ibid.p.399

৪৭· Ibid.p.406

৪৮· William, J. : The education of the people: a practical treatise on the means of extending its sphere and improving its character. London, 1849, pp.119-120.

৪৯· শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত। পৃ· ১২০

৫০· Combe, George : Lectures on popular education delivered to the Edinburgh Philosophical Association in April & November, 1833, 3rd ed., Edinburgh, 1848 p. preface VI

৫১· চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর। আনন্দধারা প্রকাশন। পৃ· ৪৬৫-৪৬৬

৫২· ইন্দ্র মিত্র : করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। পৃ· ৪১১-৪১৩

৫৩· তদেব। পৃ· ৬১২

৫৪· গভর্ণমেন্ট স্কুল। সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮৪৫, ৪ আগস্ট

৫৫· Selection from records of Bengal Govt., 1855, No.22, p.76

৫৬· Ibid. p.73

৫৭· General Report on Public Instruction in the lower provinces of Bengal Presidency, 1855, pp.51-52.

৫৮· বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৪৯ শক, ২২ কল্প, ভাগ ১, পৃ· ২২৫

৫৯· Hints relative to Native Schools. Serampore, 1816, p. 86.

৬০ বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৫০ শক, ২২ কল্প, ভাগ ২, পৃ· ২৩৯

৬১ The Normal School in Calcutta. Friend of India, 1847, 2 September.

৬২· Vernacular Education. Friend of India, 1848, 16 March.

৬৩· Normal School English and Vernacular. Friend of India. 1849, 18 October.

৬৪· General Report on Public Instruction in the lower provinces of Bengal Presidency. 1855-56, Appendix (A) p.37

৬৫· শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত। পৃ· ৯৯-১০০

৬৬· Arabinda Guha (ed.) : Unpublished letters of Vidyasagar. p.92

৬৭· Ibid. p. 186

৬৮ Ibid. p. 123-125

৬৯· Selections from records of the Bengal Govt. 1855, No. 22, pp 72-73.

৭০· চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর। আনন্দধারা প্রকাশন, পৃ· ১৩৯

৭১ Arabinda Guha : Unpublished Letters of Vidyasagar. Appendix I. pp.151-153

৭২ সম্পাদকীয় : সংবাদ প্রভাকর। ১৮৪৪, ১০ সেপ্টেম্বর

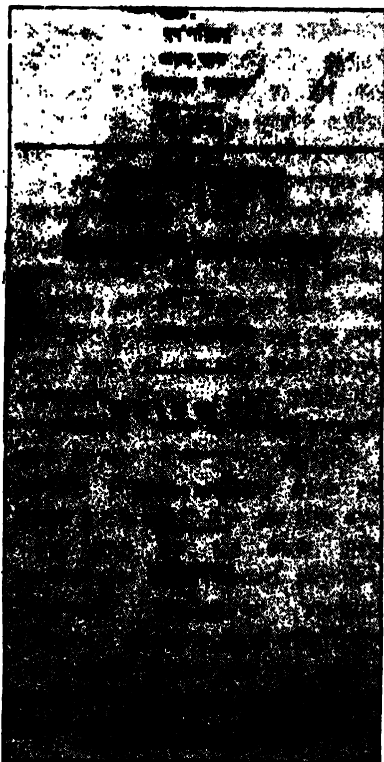
৭৩ তদেব। ১৮৫৪, ২৯ নভেম্বর

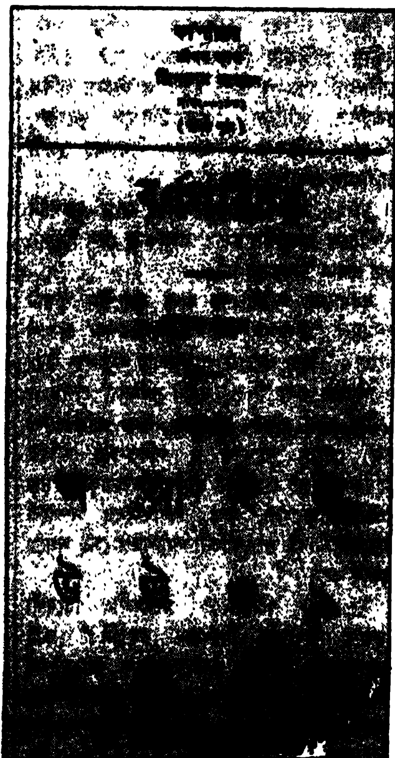
৭৪ Selections from records of the Bengal Govt 1855. No. 22, p.50.

৭৫ Ibid. p. 53

৭৬ Blumhardt, J.F. : A vocabulary of all the words occuring in the text of Charitabali of Isvarchandra Vidyasagar. London 1885, p. Preface III

৭৭ বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। ১৯৭৩, পৃ· ১৮৮-১৮৯





বর্ণপরিচয়: প্রথম পাতা

বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন কি না—এ প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে তাঁর সময়কাল থেকে, কিন্তু এর কোন সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি আজও। এ প্রশ্নটি যেন আবৃত হয়ে আছে রহস্যের ধূম্রজালে। সেক্সপীয়র সম্বন্ধে প্রযুক্ত ম্যাথু আর্নল্ড-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর মানসের এই আধ্যাত্ম-চেতনার দিকটি সম্পর্কে আমরাও যেন বলতে পারি তাঁকে উদ্দেশ্য করে :

"We ask and ask—Thou Smilest and art still, out-tapping knowledge !"

আভিধানিক সংজ্ঞা অনুসারে নাস্তিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বেদ ও পরকাল স্বীকার করেন না। গুণানুসারে নাস্তিকদের আবার ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা, মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্ত্রিক, বৈভাষিক, চার্বাক ও দিগম্বর।

সংস্কারের এই কষ্টিপাথরে বিচার করলে বিদ্যাসাগরের নাস্তিকতা নির্ণীত হয় কি না এবং হলেও তিনি কোন শ্রেণীতে পড়েন—এ ধরনের কূট তর্ক বা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। সাধারণভাবে বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটি সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়াই এর উদ্দেশ্য।

বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মমত নিয়ে এত জল্পনা-কল্পনার উদ্ভব হওয়ার মূলে রয়েছে এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বিস্ময়কর নীরবতা। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁর "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থে লিখেছেন : "জীবনে একটি বারের জন্যও তিনি ধর্ম বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করেননি। ঘরোয়া বৈঠকেও না।" এ বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁর যেটুকু মন্তব্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা' অধিকাংশই লঘু হাস্য-পরিহাস, শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে। তাই এইসব মন্তব্য ও টিপ্পনীকে অযথা গুরুত্ব দিয়ে তাঁর সত্যকার মত বলে মেনে নেওয়া সমীচীন হতে পারে না। মুস্কিলটা এখানেই।

তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্য শ্রেয়,—তাই তাঁর জীবন-কাহিনী থেকে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ নিঃসন্দেহে আলোকপাত করবে আলোচ্য বিষয়টির ওপর।

একবার এক বন্ধুর বাড়ীতে বারান্দায় বসে শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য কয়েকজন পরিচিত লোকের সঙ্গে গল্প করছেন বিদ্যাসাগর, এমন সময় সেখান দিয়ে এক বাঙালী খ্রীষ্টান-পাদ্রী যাচ্ছিলেন। সেখানে উপস্থিত কয়েকজন বালককে সেই পাদ্রি ভদ্রলোক যীশুখ্রীষ্ট ভজন করলে কি-ভাবে Salvation বা মুক্তি মেলে তা' বোঝাতে প্রবৃত্ত হলেন। সকৌতুক কৌতুহলে কিছুক্ষণ সেই Sermon বা ধর্ম্মোপদেশ শোনবার পর বিদ্যাসাগর তাঁকে ডেকে বললেন : "ও বেচারাদের ছেড়ে দিন মশাই, ওরা নিতান্ত বালক, ওদের Salvation এর কথা চিন্তা করবার অনেক সময় আছে এখনও। তার চেয়ে বরং আমাকে বোঝান, আমার বয়স হয়েছে, আজ বাদে কাল মরব।" খ্রীষ্টনধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি পাওয়া গেছে ভেবে সেই বাঙালী পাদ্রি-সাহেব তো পরম উৎসাহে তাঁকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন যীশু-মাহাত্ম্য। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের শ্লেষ আর বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ হয়ে তাঁকে অনন্ত নরক বাসের অভিশাপ দিতে দিতে সে-স্থান ত্যাগ করলেন।

শশীভূষণ বাবু নামে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রচারক সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্রের বৃদ্ধ পিতা চাঁদমোহন মৈত্রকে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে বাদুরবাগানে তাঁর বাড়ীরই আশে-পাশে বহুক্ষণ ঘোরাঘুরি করেন, কিন্তু কিছুতেই বাড়ী খুঁজে পান না। পরে মৈত্র মশাই নিজেই অনুসন্ধান করে বিদ্যাসাগরের বাড়ী বার করেন এবং তাঁকে ঘটনাটি বলেন। বিদ্যাসাগর যখন জানতে পারলেন যে পথ-প্রদর্শক শশীভূষণ বাদুড়বাগানেই বাস করেন তখন তাঁর আর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন : "এত কাছে বাস করেও তুমি বুড়ো মানুষকে আমার বাড়ীতে আনতে এত বেগ দিয়েছ, তবে তুমি মানুষকে কি করে পরলোকের পথ দেখাচ্ছ ? এখানে থেকে এখানেই যখন তোমার এত গোলোযোগ, তখন তুমি কি করে সেই অজানা পথে লোক চালান দাও ? তুমি বাপু ও-ব্যবসা ত্বরায় ত্যাগ কর, ও তোমার কর্ম্ম নয়।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ধর্ম্ম-প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করলে তিনি শ্লেষোক্তি করেন : "তুমি নাকি কি একটা হয়েছ ?"

নানা দশের অসংখ্য নরনারী সমেত "স্যার জন্ লরেন্স্" নামে ষ্টিমারখানি জলমগ্ন হলে তিনি গভীর মনস্তাপ সহকারে বলেছিলেন : "দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর যে নানা দেশের অসংখ্য লোককে একত্র ডোবালেন ! আমি যা পারি না, তিনি পরম কারুণিক মঙ্গলময় হয়ে কেমন করে এই ৭০০/৮০০ লোককে একত্র এক সময় ডুবিয়ে ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বেলে দিলেন ? দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ ? এসব দেখলে কেউ মালিক আছেন বলে বোধ হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "বিদ্যাসাগর চরিত"-এ একটি ঘটনার কথা লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপট চিত্তে উত্তর দিলেন—'এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই।' ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, 'তবে আপনি কি মানেন।' বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন—"আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।'

অগ্রজপ্রতিম বিদ্যাসাগরের স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত—সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মণীষী—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য "পুরাতন প্রসঙ্গ" নামক পুস্তকে বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মবিশ্বাস বিষয়ে বলেছেন : "বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন একথা বোধ হয় তোমরা জাননা ; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না ; কেবল রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত তিনি পরলোকতত্ত্ব লইয়া হাস্য-পরিহাস করিতেন।"

সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে, একসময় বেদান্তকে ভ্রান্তদর্শন বলিতেও কুণ্ঠিত হননি বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বর, পরকাল ও বেদ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মনোভাবের এই সব সাক্ষ্য নিঃসন্দেহে তাঁর নাস্তিকতার প্রতিপাদক—অন্ততঃ উপরোক্ত আভিধানিক সংজ্ঞা অনুসারে তো বটেই ! কিন্তু বিষয়টি গূঢ় ও জটিল এবং সেই হেতু এটি তাঁর সমগ্র জীবনের চিন্তা ও কর্ম্মধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য্য—কেবলমাত্র অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি উক্তির নিকষে নয়।

বিদ্যাসাগর-চরিত্র বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার দুটি বৈশিষ্ট্য—আর এই দুটিই হল 'রেনেসাঁস' বা 'নবজাগরণ'-এরও প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য দুটি হল মানবমুখিনতা (Humanism) আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র (Individualism)। চরিত্রের এই দুটি মৌলিক গুণ বিদ্যাসাগরের সারা জীবনের চিন্তা ও আচরণকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করেছে। বিদ্যাসাগর চরিত্রের সম্যক উপলব্ধির জন্যে তাই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের তাৎপর্য ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

মানুষের মন মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও প্রথার অন্ধ দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে একদিন যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির আলোকে ধীরে ধীরে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মোহাচ্ছন্ন ও জড়ত্বপ্রাপ্ত মনের এই জাগৃতিই 'রেনেসাঁস' বা 'নবজাগরণ' রূপে ইতিহাসে আখ্যাত। ইওরোপে এই রেনেসাঁসের সূত্রপাত হয় ইতালীয় ফ্লোরেন্স নগরীতে, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে। তারপর তার তরঙ্গ ক্রমে বিস্তৃত হয় জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে। এই রেনেসাঁসের ঢেউ ভারত-তটে এসে উপনীত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। একদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের ব্যাপক অনুশীলন ও অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ শিক্ষিত ও বিদগ্ধ মনে জাগালো নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা। "তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি" বিচারের যে স্রোতঃপথ গ্রাস করে ফেলেছিল, তার থেকে জাগরিত হল ভারতীয়-মানস এই—"নূতন যুগের ভোরে।"

উনিশ শতকের এই নবজাগরণে বাংলাদেশ নিয়েছিল অগ্রণী ভূমিকা। ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন আদর্শ ও চিন্তাধারার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছিল এই দেশে, এই কালে। বাংলার নবযুগের এই নবজাগরণে যে-সব মনীষীর অবদান অগ্রগণ্য, বিদ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রামমোহনের পর নবজাগরণের ভাবধারা তাঁর মধ্যে দিয়েই বিকাশ ও প্রকাশ লাভ করেছিল।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত ছিল Individualism বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদ এবং Humanism বা মানবমুখিনতার ওপর। মধ্যযুগের চিন্তাধারা ছিল ঈশ্বর ও ধর্ম্মকেন্দ্রিক, সুতরাং রেনেসাঁস যুগের এই মানব-কেন্দ্রিক ও ইহজগত-কেন্দ্রিক চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক বলে অভিহিত ও অভিনন্দিত হবার যোগ্য। মানবজীবনের মহত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন চিন্তার মূল্য স্বীকার করাই এই নবজাগরণের ভাবাদর্শ। Authority-র অন্ধ অনুকরণ নয়,—আপনার যুক্তি ও ভাবনার আলোকে প্রতিটি বিষয়ের সত্যাসত্য বিচার করে তার মূল্যায়ন করা—এই মনোভঙ্গীই রেনেসাঁসের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কোনো কিছুকে না বুঝে, নির্ব্বিবাদে, দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে এই প্রবল প্রকৃতিই আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাষায় Scientific Method বা বৈজ্ঞানিক চিন্তা-প্রণালী বলে অভিহিত। এই চিন্তাধারার মূলে রয়েছে সংশয় প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের সত্যাসত্য ও যথার্থতা যাচাই করে দেখার মনোভাব। বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিলো পরিপূর্ণভাবে। তাই তিনি প্রকৃতই নবযুগের পথিকৃত রূপে পূজিত হবার যোগ্য।

এই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর প্রতিটি চিন্তা-ভাবনার ওপর, ধর্ম্মমতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এর ফলেই ধর্ম্মক্ষেত্রে কোনরকম গোঁড়া মনোভাব ধারণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ধর্ম্মবিষয়ে অযৌক্তিক গোঁড়ামি সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী (J. B. S. Haldane) তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন : খ্রীষ্টধর্মের মধ্যেও নানারূপ দলাদলি ও

অযৌক্তিক বিশ্বাস দেখা যায়। খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের বিষয়টিও সব সন্দেহের উর্দ্ধে নয়।

যেখানে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে একত্ব (Unitarianism) ও ত্রিত্ব (Trinitarianism) নিয়ে এত মতানৈক্য ও কলহ সেখানে ত্রেত্রিশ কোটি দেব-দেবীতে বিশ্বাসী হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে মতৈক্যের কথা তো অকল্পনীয়। বিদ্যাসাগর তাই হিন্দুধর্ম্মের উপাস্য তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী সম্বন্ধে সারা জীবন মৌন থেকেছেন, কোনো মন্তব্য করেননি। যে ঈশ্বর বা পরলোকের স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোনো ধারণায় উপনীত হওয়া কারো পক্ষেই কদাচ সম্ভবপর নয়, তা' নিয়ে বাদানুবাদ বা হানাহানিতে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁর মত যুক্তিবাদী মনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রথম জীবনে বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মসমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরে এর মধ্যে গোঁড়ামি-হেতু মতভেদ ও কলহ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি সেখান থেকে সরে আসেন। এ-সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "তিনি নিজে আমাদের নিকট বলিয়াছেন—'এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা' বেশ বুঝি, তবে ঐ-পথে না চলিয়া এ-পথে চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না। লোককে বুঝিয়ে শেষটা কি ফ্যাঁসাদে পড়ে যাব ? অন্যকে পথ দেখাইতে গিয়া তাকে বিপথে চালাইয়া শেষটা পরের জন্য বেত খাইয়া মরিব ?"

ব্যঙ্গ ও পরিহাস সহকারে উক্ত হলেও এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে Haldane কথিত "Rational View"। তিনিও বৈজ্ঞনিক-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মত যা নিশ্চিতরূপে জানেন না তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তাই নীরব থাকতে চেয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র। Herbert Spencer—এর মতে যিনি অজ্ঞাত ও অচিন্ত্যনীয় (the unknown and the unknowable) সেই বিশ্বনিয়ন্তা সম্পর্কে তাই তাঁর "বোধোদয়" গ্রন্থে প্রথমে কোনো উল্লেখই করেননি তিনি। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশাই একবার তাঁকে বলেন, অনেকে নাকি দুঃখ করে বলছেন যে বিদ্যাসাগর মশাই এমন একখানা পাঠ্য পুস্তক রচনা করলেন যাতে ছেলেদের জানবার সব কথাই রয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে কোনো কথা নেই। বিদ্যাসাগর হেসে তাঁকে বললেন : "যাঁরা তোমার কাছে ওকথা বলেন তাঁদের বোলো যে এবার যে 'বোধোদয়' ছাপা হবে তাতে ঈশ্বরের কথা থাকবে।" সত্যিই বোধোদয়ের পরবর্ত্তী সংস্করণ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা পাঠ যোগ করেন তিনি। কিন্তু সে ঈশ্বরের সংজ্ঞা হল 'নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ'। বলা বাহুল্য, এই সংজ্ঞা তাঁর যুক্তিসিদ্ধ মনের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের মনের এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : "এই সংস্কারমুক্ততা, এই সাহস এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর এই নির্ভরশীলতা তাঁহার মধ্যে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল ! তাঁহার পারিবারিক ইতিহাসের মধ্যে— রামজয়-ঠাকুরদাস-ভগবতীর মধ্যে, মেদিনীপুর-বীরসিংহের মধ্যে—অথবা সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে—এই সমস্যার সমাধান নাই।"

সত্যই তাঁর সামাজিক বা পারিবারিক পরিবেশে এ সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজলে বিফল হতে হবে। এর সমাধান খুঁজতে হবে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে—তাঁর দার্ঢ্যে, তাঁর অপরাজেয় পৌরুষে, আর সর্ব্বোপরি তাঁর অনন্যসাধারণ মানবহিতৈষনায়। তাঁর ধর্ম্ম অসহায় আর অক্ষমের অবলম্বন-স্বরূপ নয়,তা তাঁর পৌরুষকে "করেনি শতধা", আর "তুচ্ছ আচারের

মরুবালুরাশি" তাঁর "বিচারের স্রোতঃপথ" গ্রাস করে ফেলতে পারেনি। সে ধর্ম্মের প্রধান ব্রত মানব-প্রীতি ও মানব-সেবা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন : "আসলে বিদ্যাসাগর দেবত্ব ও ব্রাহ্মণ্যের সকল গৌরব-বর্জিতভাবে মানুষকে মানুষরূপেই মহৎ ও মহনীয় দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহা চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই গুরু ও শালগ্রামশিলার দেশে তাঁহাকে অপরিসীম "লাঞ্ছনা" ভোগ করিতে হইয়াছিল।... বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই মানব-প্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর কাণ্ড।"

মানুষের দুঃখে তাঁর প্রাণ যেমন করে কেঁদেছে, তেমন করে আর কিছুতেই নয়। চণ্ডীদাসের মত তিনিও বিশ্বাস করেছেন : "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" যেখানেই সেই মানুষের দুর্দ্দশার কথা শুনেছেন, সেখানেই ছুটে গেছেন তিনি, যথাসাধ্য নয়, সাধ্যের অতিরিক্ত দান করে ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছেন, সেবা শুশ্রূষা করেছেন প্রাণপাত করে। মানুষের অকৃতজ্ঞতা তাঁকে ব্যথা দিয়েছে কিন্তু বাধা দিতে পারেনি তাঁর সেবাব্রতকে। নরই তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে নারায়ণ রূপে। তিনিও মেনে নিয়েছেন প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস (Pythagorus) এর নীতিকে : "Man is the measure of everything."

বিদ্যাসাগরের এই ধর্ম্মবোধের সঙ্গে আশ্চর্য্যরকম মিল আছে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মবোধের। বিবেকানন্দ সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেছেন : "জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" রবীন্দ্রনাথও তাঁর ধর্ম্মবোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালায়, যথাক্রমে The Religion of Man এবং 'মানুষের ধর্ম্ম' নাম দিয়ে। এই ধর্ম্মের মূলকথা মানব-প্রীতি। দিলীপ কুমার রায়কে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : "আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে ও ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিত্বে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।"

তাই বিদ্যাসাগর যে-অর্থে নাস্তিক, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথও সে-অর্থে নাস্তিক বলে গণ্য হবার যোগ্য। এ নাস্তিকতা তথা কথিত আস্তিকতা হতে লক্ষ গুণে শ্রেয়—একথা বলাই বাহুল্য।

বিদ্যাসাগর সন্ধিৎসা

কমল সরকার

হর্ম্যস্থাপত্যের অঙ্গ হিসেবে প্রাসাদ অথবা তৎসংলগ্ন বাগ-বাগিচাকে শোভন-সদৃশ করে তোলার জন্যে ভিনাস অথবা ডায়না কিংবা পুরাণ আশ্রিত অন্য কোনও গ্রিক দিগম্বরীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অনেক। কিন্তু এযুগে বসতবাটীর বহির্ভাগে বিদ্যাসাগরের পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি স্থাপন করে বাসগৃহকে দর্শনীয় করে তোলার দৃষ্টান্ত বোধহয় আর দ্বিতীয় নেই কোথাও।

উনিশ শতকের কোনও রাজা-মহারাজা অথবা কিংবদন্তি জড়ানো ঐশ্বর্যশালীর গৃহ নয়; এ যুগে গড়ে তোলা চারতলা বসতবাড়ির দোতলার বহির্ভাগে বিশেষভাবে তৈরি প্রকোষ্ঠে এমনভাবে বসানো হয়েছে বিদ্যাসাগরের ওই প্রতিমা যা হরিশ মুখার্জি অথবা কালীঘাট রোড দিয়ে যেতে চোখে পড়বে সকলেরই। কৌতূহলের সূচনা সেদিন থেকেই যেদিন প্রথম শুনি ওই মূর্তির কথা। বিদ্যাসাগর কি ছিলেন ওই বাড়িতে কখনও, না বিদ্যাসাগরের কোনও আত্মীয়-পরিজনের বসবাস ওখানে। তাই আত্মীয়তার গৌরব ঘোষণা করতে চাইছেন উত্তরপুরুষেরা ওই প্রতিমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আমার সব কৌতূহলের সমাপ্তি টেনে ওই বাড়িরই এক যুবক জানিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা নেই ওঁদের। নব্বই অতিক্রান্ত তাঁর পিতা কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শের অনুরাগী। তাঁর সেই জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কৃষ্ণমোহন বরেণ্য বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর স্মৃতিকে ধরে রেখেছেন নিজের ভদ্রাসনে।

৩৯/১ কালীঘাট রোডের ওই বাড়িতে বাঁ হাঁটুর ওপর ডান পা তুলে সোজা হয়ে বসে রয়েছে বিদ্যাসাগরের শ্বেতপাথরের মূর্তিটি। মূর্তির গায়ে জড়ানো চাদর। ঘূর্ণির কার্তিকচন্দ্র পাল গড়েছেন মূর্তিটি। মূর্তির নিচে দেওয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে :

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণে—
মাইকেল মধুসূদন
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে
দীন যে দীনের বন্ধু

স্থাপনা ১৯৬৯ ইং ৬ জুন। আটুর জন্মদিনে ॥

চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে সে দিন ওই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বার বার মনে হচ্ছিল বাঙালি কি সত্যিই আত্মবিস্মৃত জাতি। না— কখনওই নয়। তা হলে ওই বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় নিজের অর্থব্যয়ে গড়ে তোলা হত না বিদ্যাসাগরের ওই প্রতিমা।

বিদ্যার অতল সাগরে রত্ন অন্বেষণের শপথ নিয়ে যে সামগ্রীগুলি খুঁজে পেয়েছি তার একমাত্র নিদর্শনই নয় ওই প্রতিমা। সাগরে ডুব দিয়ে যে বিপুল প্রত্নরত্ন হাতে ঠেকেছিল তা বিছিয়ে দিলাম তাঁরই মৃত্যুর স্মরণ শতবর্ষে। আবার এ কথাও ঠিক, থেকে গেল হয়তো বা না-পাওয়া না-দেখা আরও কত কি। সাগর-সন্ধানে গিয়ে অন্য কেউ তা তুলে আনবেন একদিন।

ফণী সেনের আলেখ্য

'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'খ্যাত ফণিভূষণ সেনের আঁকা বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে গিয়েছিলাম।

নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতাকালে সংস্কৃত কলেজে দুর্গা মিস্ত্রির গড়া শ্বেতপাথরের বিদ্যাসাগরের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন লেফট্যানান্ট গভর্নর স্যার জন উডবার্ন। সে সময়ে মূর্তির সঙ্গে আঁকিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁর এক তৈলচিত্রও। কারণ, যে কলেজের ছাত্র ও অধ্যক্ষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র সে কলেজে তাঁর কোনও প্রতিকৃতি ছিল না। উডবার্ন একই অনুষ্ঠানে মূর্তি ও ফণিভূষণ সেনের আঁকা প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন (২৮ মার্চ ১৮৯৯)।

পরের দিন মূর্তি ও তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচনের খবর প্রকাশিত হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ' পত্রিকায়। দুর্গার গড়া ও ফণিভূষণকে দিয়ে প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নেবার ইতিবৃত্তটি পরিবেশিত হয়েছিল ওই খবরে। অধ্যক্ষ প্রদত্ত সে বিবরণীতে ফণিভূষণের প্রতিকৃতি অঙ্কনের যে উল্লেখ ছিল তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল :

"The President of the Committee having kindly acceded to the request of the Principal of the Sanskrit College, a portrait of Vidyasagar has been prepared by a Well-known painter of the city, Babu Phanibhusan Sen, and the Committee avail themselves of this opportunity to ask your Honour to unveil both the statue and the portrait."

কৃষ্ণনগরের ফণিভূষণ কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে চিত্রবিদ্যা অনুশীলনের পর ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওর সঙ্গে যুক্ত হন (১৮৭৮)। অন্নদাপ্রসাদ বাগচী, ফণিভূষণ সেন এবং নবকুমার বিশ্বাস, কৃষ্ণচন্দ্র পাল ও যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যুগ্মভাবে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্টুডিও প্রকাশিত দেব-দেবীর রঙিন লিথোগ্রাফগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) তাঁর 'আত্মকথা'য় (১৩৫৩) ফণিভূষণের কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন : "ফণী সেন বলে কৃষ্ণনগরে একটি যুবক ছিলেন। তিনি এবং আরও তিন-চারজন আর্ট স্কুলের ছোকরা মিলে সরস্বতী, চৈতন্য প্রভৃতির ছবি এঁকে আর ছাপিয়ে বাংলা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে রকম ছাপানো ছবি আমি বহু লোকের ঘরে দেখেছি।" ওই শিল্পী ফণিভূষণকেই দেওয়া হয়েছিল বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি আঁকার দায়িত্ব।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দপ্তরে তাঁর পশ্চাতে বিদ্যাসাগর ও ই বি কাওয়েলের দুটি তৈলচিত্র টাঙানো রয়েছে। কিন্তু অধ্যক্ষ জানেন না বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতির শিল্পী কে। তিনি বললেন, ছাত্রবয়স থেকেই বিদ্যাসাগরের ছবিটি ওই দেয়ালেই দেখছেন। তাঁর একাধিক পূর্বতন অধ্যক্ষের সময়েও ছবিটি যথাস্থানেই ছিল। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতির শিল্পী সম্পর্কিত কোনও দলিলও নেই কলেজে। ওই তৈলচিত্রটিই ফণিভূষণের আঁকা। অর্থাৎ কলেজে বিদ্যাসাগরের মূর্তির সঙ্গে ওই তৈলচিত্রটিরও আবরণ উন্মোচন করেছিলেন স্যার জন উডবার্ন। দেখেই বোঝা যায় পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে (রেস্টোরেশন) প্রায় একশো বছরের পুরনো ওই ছবিতে রঙ প্রয়োগ করা হয়েছিল। ছবিতে শিল্পীর স্বাক্ষরও চোখে পড়ে না। তা সত্ত্বেও বলতে হবে প্রতিকৃতিটি ফণী সেনেরই আঁকা। অধ্যক্ষের দপ্তরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আরও কয়েকজন শিক্ষাব্রতীর তৈলচিত্র আছে। কিন্তু কলেজের কোথাও বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় তৈলচিত্র নেই। তা ছাড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারি

শিক্ষায়তনে গভর্নর উন্মোচিত 'মেমোরিয়াল পোর্ট্রেট' অন্যত্র অপসারণের প্রশ্নও ওঠে না। অতএব, সিদ্ধান্তে আসা যায়, সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিটি ফণিভূষণ সেনেরই চিত্রাঙ্কনের নিদর্শন। কলকাতার মার্বেল প্যালেসে ফণী সেনের আঁকা প্রতিকৃতি সংগৃহীত আছে।

উত্তরপাড়ার চিত্রপট

সে সময়ে সংস্কৃত কলেজেই বিদ্যাসাগরের আর একটি প্রতিকৃতির রঙিন প্রতিলিপি দেখি কলেজের সার্ধশতবার্ষিকী প্রকাশন 'আওয়ার হেরিটেজ' (১৮২৪-১৯৭৪) গ্রন্থে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও অদৃষ্টপূর্ব ওই প্রতিলিপির শিল্পীর নামের উল্লেখ পাইনি গ্রন্থটিতে। ফলে, শুধু শিল্পীর নামই নয়, সে দিন জানতেও পারিনি মূল প্রতিকৃতিটি সংগৃহীত আছে কোথায়।

ইতিমধ্যে এক সহকর্মীর কাছে জানতে পারি উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে সংগৃহীত আছে বিদ্যাসাগরের এক তৈলচিত্র। উত্তরপাড়া লাইব্রেরিতে গিয়ে যে প্রতিকৃতিটি দেখি সেটিরই প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে সংস্কৃত কলেজের সার্ধশতবার্ষিকী গ্রন্থে। কিন্তু এ প্রতিকৃতিতে শিল্পীর স্বাক্ষর নেই। ছবিটি অত্যন্ত পুরনো হলেও এ তৈলচিত্রে রঙ প্রয়োগ করা বা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হয়নি। উত্তরপাড়ার প্রতিকৃতিটি স্বাক্ষরবর্জিত হওয়ায় গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাছে শিল্পীর নাম জানতে চাওয়াতে তাঁরা অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

ওই সময়ে উত্তরপাড়ার লাইব্রেরিতেই জানতে পারি, বিদ্যাসাগরের অনুরূপ আরও দুটি তৈলচিত্র সংগৃহীত আছে কলকাতা ও নবদ্বীপের বিদ্যাসাগর কলেজে। কিন্তু কোন প্রতিকৃতিটি মূল তা তাঁদের অজ্ঞাত। তাঁরা শুনেছেন মাত্র, দেখার সুযোগ হয়নি।

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়ে আবিষ্কার করি চিত্রপট বিদীর্ণ হওয়া উত্তরপাড়ার অনুরূপ আরও এক মলিন প্রতিকৃতি। অধ্যক্ষের ঘরে আলমারির ওপরে বিপরীত মুখে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে প্রতিকৃতিটিকে।

ছবিটি নামিয়ে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করি নানা প্রশ্নও। অধ্যক্ষের কাছে জানতে চাই ছবিটি কার আঁকা। কার কাছ থেকে এসেছে কলেজে। সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন আরও কয়েকজন অধ্যাপক। সকলেই শিল্পীর নাম বলতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তাঁদের জানা নেই কোন শিল্পীর আঁকা ছবিটি। ইতিমধ্যে ধূলিমলিন চিত্রপটটি পরিষ্কার করায় আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিল্পীর স্বাক্ষর। চিত্রপটের বাঁ-দিকে নিচে ইংরেজিতে লেখা 'বি হাডসন পেন্টার'। পটে শিল্পীর স্বাক্ষর স্পষ্ট হলেও সাল-তারিখের উল্লেখ নেই। প্রতিকৃতিতে শিল্পীর নাম আবিষ্কারের আনন্দে মুহূর্তের জন্যে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠি। তখুনি মনে পড়ে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তাঁর লেখা 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে বিদ্যাসাগরকে সামনে বসিয়ে হাডসনের ছবি আঁকার ঘটনাটি। চোখের সামনে আমারই হাতে ধরা রয়েছে তখন দেড়শো বছরের পুরনো হাডসনের আঁকা দুর্লভ সেই চিত্রপট। কিন্তু চণ্ডীচরণ গ্রন্থে হাডসনের পূর্ণ নাম দেননি। ছবির স্বাক্ষর দেখে জানা গেল তাঁর পুরো নাম বি হাডসন।

বিদ্যাসাগর কলেজে প্রতিকৃতি আবিষ্কারের পর স্পষ্ট হয়ে উঠল একটি বিষয়। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে রক্ষিত প্রতিকৃতিটি 'কপি'। কিন্তু কপি হলেও নিখুঁত সৌসাদৃশ্যের

প্রতীক এটি। রঙ প্রয়োগের মুনশিয়ানাও অনবদ্য। উত্তরপাড়ার ছবিটি স্বাক্ষরবিহীন হওয়ায় কপি সিদ্ধান্তটি নেবার সময় মনে হয়েছে, হয়ত হাডসন অনুরুদ্ধ হওয়ায় নিজেই এঁকে দিয়েছেন উত্তরপাড়ার ছবি। যদি তাইই হয় তবে কপি না বলে বলতে হয় 'রেপ্লিকা'। অর্থাৎ অন্য কোনও শিল্পী নয়, মূল শিল্পীই যখন তাঁর নিজের ছবির অনুসরণে আঁকেন দ্বিতীয়টি তখন সেটিকেই বলা হয় 'রেপ্লিকা'।

বিদ্যাসাগরকে সামনে বসিয়ে হাডসনের ছবি আঁকার ঘটনাটি চণ্ডীচরণ এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর শান্ত মূর্তি লাবণ্যে ঢল ঢল করিত। আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের নয়নের তৃপ্তি বিধানার্থেই সেই দেবীমূর্তির প্রতিকৃতি এখানে প্রদান করিলাম। সেই চিত্র অঙ্কনের একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। পাইকপাড়া রাজবাটীতে হডসন নামে একজন সাহেব চিত্রকর কার্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বদাই সেখানে গতিবিধি ছিল। ...

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেকালের মূর্তি যে কত সুন্দর ও হৃদয় মুগ্ধকর ছিল তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সে সময় প্রতিভায় উদ্ভাসিত মুখের প্রকৃতি লইবার জন্য হড্‌সন সাহেব বড়ই সাধ্য-সাধনা করেন। তিনি প্রথমত সম্মত হন নাই, পরিশেষে সাহেবের অত্যধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া সম্মত হন, সেই চিত্রের প্রতিকৃতি পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। হড্‌সন সাহেব চিত্র প্রস্তুত করিয়া পারিশ্রমিক কিছুই লইতে সম্মত হন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়াও সাহেবকে টাকা খাওয়াইতে পারেন নাই। ... বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন সাহেবকে টাকা লওয়ানো বড়ই কঠিন। লোকটি কিছু শক্ত লোক। তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া ত্বরায় পিতা-মাতাকে কলিকাতায় আনাইলেন এবং হড্‌সন সাহেবকে দিয়া বহু অর্থব্যয়ে তাঁহাদের দুইজনের দুইখানি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করাইয়া লইলেন।"

প্রতিকৃতিতে সালের উল্লেখ না থাকায় হাডসন কোন সময়ে এঁকেছিলেন ছবিটি তা জানার উপায় নেই। কিন্তু ছবিটি দেখেই বোঝা যায় অল্পবয়সের চেহারা ধরা রয়েছে তৈলচিত্রে। বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের সাহায্যে সিদ্ধান্তে আসা যায়, হাডসন ছবিটি এঁকেছিলেন ১৮৫১ সালের শেষদিকে কিংবা ১৮৫২ সালের গোড়ায়। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং তাঁর বয়স একত্রিশ অথবা বত্রিশ বছর। ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন তিনি। তৈলচিত্রটি তাঁর বাড়িতে সংগৃহীত ছিল।

বিহারীলাল লিখেছেন :

"প্রিন্সিপাল পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার ৫/৬ মাস পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হন। ... তিনি তখন ভাল করিয়া ঘাড় বাঁকাইতে পারিতেন না। কঠোর পীড়ার আশঙ্কা করিয়া ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায় দুইবার তাঁহার ঘাড়ের ফস্ত খুলিয়া খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার সে তেজস্বিনী মূর্তির একখানি প্রতিকৃতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে এখনও দেখা যায়।"

বিদ্যাসাগরের যে মুখাকৃতি ধরে রেখেছেন হাডসন তা প্রকৃতই অনিন্দ্যসুন্দর। নান্দনিক আবেদনে সমৃদ্ধ এ চিত্রপটটির সম্মোহনী শক্তিও অনস্বীকার্য। বিদ্যাসাগরের অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের স্বচ্ছন্দ রূপায়ণের সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়ব্রতী রূপটিও। তৈলচিত্রটি পরিশীলিত চিত্রাঙ্কনের পরিচ্ছন্ন প্রতিরূপ হিসেবে হয়ে উঠেছে অদ্বিতীয়।

ওই সময়ে বিদ্যাসাগর কলেজেই দেখি কলেজের 'শতবর্ষ স্মরণিকা'-টি। সংস্কৃত

কলেজের 'আওয়ার হেরিটেজ' গ্রন্থের মতো বিদ্যাসাগর কলেজের স্মরণিকাটিতেও (১৮৭২-১৯৭২) সংকলিত হয়েছে হাডসনের বিদ্যাসাগর। কিন্তু এ স্মরণিকাতেও কোনও উল্লেখ নেই হাডসনের। অথচ মূল প্রতিকৃতিটি রয়েছে বিদ্যাসাগর কলেজেই। বেশ কয়েক বছর আগে তৈলচিত্রটি যখন অক্ষত ছিল তখনই করা হয়েছিল ছবির ব্লক।

হাডসনের অন্যান্য তৈলচিত্র

সম্ভাব্য প্রায় সব সূত্র অনুসন্ধান করেও বি হাডসনের পূর্ণ পরিচয় দুষ্প্রাপ্যই হয়ে রইল। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া না গেলেও তিনি যে ইংরেজ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। টিলি কেটল, জন জোফানি বা চিনারি কিংবা ড্যানিয়েলদের মত এ দেশে এসে রাজা-মহারাজা ও নবাব-বাদশার প্রচুর ছবি এঁকেছিলেন তিনি। উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদে গিয়ে হাজারদুয়ারী প্রাসাদের জন্যেও বৃহৎ আকারের কয়েকটি তেলরঙের ছবি আঁকেন হাডসন। হাজারদুয়ারী প্রাসাদে রক্ষিত তাঁর অঙ্কিত তেলরঙের ছবিগুলির অন্যতম—রাত্রে ভাগীরথীতে প্রদীপ জ্বেলে ভেলা ভাসানোর (বেড়া ভাসানো) দৃশ্য। এই ছবিটি ছাড়া অন্য তৈলচিত্রগুলির সবকটিই প্রতিকৃতি। এই প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে নবাবনাজিম ফেরেদুন জাঁ, বালক নবাব হুসান আলি ও হোসেন-এর যুগ্ম প্রতিকৃতি এবং রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য। হাডসনের আঁকা অন্য প্রতিকৃতিগুলি মেজর ও কর্নেল পদমর্যাদার কয়েকজন ইংরেজ সৈনিক ও তাঁদের একজনের সহধর্মিণীর।

কলকাতার পাইকপাড়া রাজবাটীতে ছবি আঁকতে এসে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল হাডসনের— লিখেছেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অতঃপর আঁকেন তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি।

পাইকপাড়া রাজবাটী বলতে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের বাড়ি বোঝায়। রাজা প্রতাপচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অগ্রণী সমর্থক হওয়ায় তাঁর অন্যতম সুহৃদ হিসেবে পরিচিত। সে কারণে, রাজা প্রতাপচন্দ্রের বাড়িতে যাতায়াত ছিল বিদ্যাসাগরের। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সে যাতায়াত ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাড়িতে না প্রতাপচন্দ্রের পাইকপাড়া-বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ি 'বেলগাছিয়া ভিলা'-য় তা সঠিক জানা যায় না।

হাডসন প্রকৃতই রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের প্রাসাদে ছবি আঁকতে গিয়েছিলেন কি না তা জানার জন্যে যাই বেলগাছিয়া ভিলায়। এ ছাড়াও, প্রচ্ছন্ন একটি ভাবনা ছিল, হাডসন কাদের ছবি এঁকেছিলেন সেখানে—ছবিগুলো কি আজও আছে। বলা বাহুল্য, বেলগাছিয়া ভিলাতে আবিষ্কার করি হাডসন অঙ্কিত আটটি তৈলচিত্র। চিত্রগুলি রাজা প্রতাপচন্দ্র (মৃত্যু ২১ জুলাই, ১৮৬৬) ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের (১৮৩১-১৮৬০)। প্রতাপচন্দ্র সিংহের দুটি প্রতিকৃতি ছাড়াও ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বিশাল তৈলচিত্রটি সংগৃহীত আছে বেলগাছিয়া ভিলায়।

প্রতাপচন্দ্রের কন্যা প্রভাবতী দেবীর যে ছবি এঁকেছিলেন হাডসন সেটিও রয়েছে বেলগাছিয়া ভিলায়। সঙ্গে রয়েছে রাজা প্রতাপচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরীশচন্দ্র সিংহের বালক বয়সের তৈলচিত্র।

বেলগাছিয়া ভিলায় অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী নাটক' ও মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও রাজা প্রতাপচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

গোপীমোহনের যে দুটি তেলরঙের প্রতিকৃতি আঁকেন হাডসন সে দুটিও রয়েছে বেলগাছিয়া ভিলায়।

ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবীর প্রতিকৃতি

হাডসনের বিদ্যাসাগর আবিষ্কৃত হলেও তাঁর অঙ্কিত বিদ্যাসাগরের পিতামাতার প্রতিকৃতির সন্ধান পাইনি। হাডসন ওঁদের দুজনেরই ছবি এঁকেছিলেন। বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় ছবি তুলাইবার জন্য মাতাকে সঙ্গে লইয়া হডসেন সাহেবের বাটী গিয়াছিলেন।" চণ্ডীচরণের গ্রন্থে ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবীর যে লিথো ছবি প্রকাশিত হয়েছিল সে দুটি হাডসনের প্রতিকৃতি দেখেই এঁকেছিলেন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। অন্নদাপ্রসাদের লিথো ছবি থেকেই হাডসনের আঁকা মূল ছবির আভাস পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর কলেজে হাডসনের বিদ্যাসাগর আবিষ্কারের সময় সেখানেই দেখি তাঁর পিতামাতার দুটি স্বতন্ত্র তৈলচিত্র। স্বাক্ষর দেখে জানা গেল দুটি ছবিরই শিল্পী রাসবিহারী দত্ত। স্বাক্ষর রয়েছে : 'আর দত্ত দত্তপুকুর ২৪ পরগনা।' কোন সালে আঁকা হয়েছিল ছবি দুটি তার উল্লেখ নেই স্বাক্ষরে।

রাসবিহারী দত্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল। কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধীনে অনুশীলন করেন। প্রতিকৃতিকলায় নৈপুণ্যের জন্যে 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী' গ্রন্থে তার আলোচনা করেছি। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পিতামাতার প্রতিকৃতি আঁকার বিষয়টি জানা ছিল না। বারাসাতের দত্তপুকুরেই তাঁর পিতৃভূমি। জন্ম ১৯০৬। প্রায় বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় বেলগাছিয়ার বাড়িতে (১৯৭৮)। হাডসনের আঁকা বিদ্যাসাগরের পিতামাতার অনুসরণে রাসবিহারী এঁকেছিলেন তৈলচিত্র দুটি।

কার্টুন পত্রিকায় বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরকে উপজীব্য করে আঁকা হয়েছিল ক্যারিকেচার বা সমধর্মী ছবি। উনিশ শতকের সে ব্যঙ্গচিত্রগুলির মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশে ব্যক্ত হয়েছিল সমর্থন ও শ্রদ্ধা। গত শতকের 'বসন্তক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দি ফ্রগ অ্যান্ড দি বুল' কার্টুনের প্রসঙ্গটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য হলেও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটির পটভূমিকায় প্রকাশিত 'বসন্তক'-এর ওই কার্টুনের বিষয়টি বিদ্বজ্জনেদের অজ্ঞাত নয়। মনুষ্যেতর প্রাণী বলীবর্দ ও ভেকের রূপারোপের মাধ্যমে চিত্রায়িত বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের ওই ব্যঙ্গচিত্রটিতে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা সমর্থন করা হলেও উচ্চাঙ্গের অথচ বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গচিত্রের দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণীয় নয়। চিত্রাঙ্কনের মানও ছিল নিকৃষ্ট।

গত শতকের কার্টুন পত্রিকাগুলির অন্যতম কলকাতার 'ইন্ডিয়ান শেরিভেরি'। জন্মসূত্রে এক অ্যামেরিকান কর্নেল পার্সি উইন্ডহ্যাম পাক্ষিক এই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক (১৮৭২)। উচ্চাঙ্গের কার্টুন আর বিষয়বস্তুর জন্যে সাময়িকটি ইংরেজিভাষী মহলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পত্রিকার লেখক ও শিল্পীরা আত্মগোপন করে থাকতেন ছদ্মনামের আড়ালে। এঁদের অনেকেই ছিলেন বিদেশাগত।

উইন্ডহ্যাম অন্যের হাতে পত্রিকাটি হস্তান্তরিত করে চলে যান বর্মায়। 'ইন্ডিয়ান শেরিভেরি'-তে কয়েকজন খ্যাতনামা ভারতীয়ের পূর্ণপৃষ্ঠা প্রতিকৃতি প্রকাশ করা হয়েছিল।

চিত্রাঙ্কিত ওই পৃষ্ঠাটির নাম 'শেরিভেরি অ্যালবাম'। ওই অ্যালবামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের ছবি (৪ জানুয়ারি ১৮৭৮)। বিদ্যাসাগর তখন খ্যাতকীর্তি। 'ইসকা'-র আঁকা তাঁর ওই ছবির ক্যাপশন 'এ লারনেড পণ্ডিত'। তখন আটান্ন বছর বয়স বিদ্যাসাগরের। ছবির বিপরীত পৃষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের বৈদগ্ধ্য আর শিক্ষাব্রতের উল্লেখে ছোট্ট একটি পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছিল।

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর

হাডসনের পরে বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি আঁকেন বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯৩২)। উনিশ শতকেই কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালির প্রতিকৃতি আঁকার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। এঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনের বাড়িতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতিটি আঁকা হয়। এটি সংগৃহীত রয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। বঙ্কিমচন্দ্রের ওই মূল প্রতিকৃতি অনুসরণে আরও কয়েকটি ছোট-বড় তেলরঙের ছবি আঁকেন তিনি। সব কটি প্রতিকৃতিই আঁকা হয়েছিল সাহিত্যসম্রাটের স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজনে।

সম্ভবত, ১৮৯০ সালে বামাপদ বিদ্যাসাগরের তেলরঙের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতিটি এঁকেছিলেন। কারণ, ওই বছরে বামাপদকে লেখা বিদ্যাসাগরের এক প্রশংসাপত্র পাওয়া যায় সেটি উদ্ধৃতি করা হল :

Babu Bamapada Banerjee has painted a portrait of me which is well executed. My friends who have seen it consider it a very good piece of work, and I am also very well satisfied with it.

Iswar Chandra Sarma
Calcutta, 29th July 1890

বামাপদর দুই কন্যা বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় ও লতিকা চট্টোপাধ্যায় 'দেশ' পত্রিকায় এ বিষয়ে লিখেছেন (৫ জুলাই ১৯৫২) : "পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। বামাপদবাবু প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইতেন। তাঁহার ও তদীয় জননীর যে তৈলচিত্র তিনি করিয়াছিলেন তাহার জন্য কোনও পারিশ্রমিক তিনি গ্রহণ করেন নাই।" তবে বিদ্যাসাগর তাঁকে দুটি কাশ্মিরী শাল উপহার দেন তাঁর প্রতিকৃতি আঁকার জন্য এ কথা লিখেছেন কন্যাদ্বয়।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে বিদ্যাসাগর

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে বিদ্যাসাগরের তেলরঙের একটি ছবি সংগৃহীত আছে। কিন্তু ছবিটিতে শিল্পীর স্বাক্ষর চোখে পড়ে না। অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে চিত্রটি সম্পর্কে কোনো বিবরণও লিপিবদ্ধ নেই।

সত্তরের দশকে অ্যাসোসিয়েশনে বিদ্যাসাগরের ছবিটি দেখার সুযোগ হয়। তখন সেখানে একজন প্রবীণ কর্মী ছিলেন। তাঁরই সাহায্যে ছবিটি পরীক্ষা করি। ছবির শিল্পী কে তখন জানার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করি। শিল্পীর নাম জানা নেই বলে তিনি জানান। অনুমান, প্রতিকৃতিটি বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রকলার নিদর্শন। তখন প্রবীণ ওই ভদ্রলোক বলেছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের ছবিটি অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে দেখে

বিস্মিত হন। ব্রজেন্দ্রনাথ পরে ছবিটির ফোটোগ্রাফও নিয়েছিলেন। সেটি 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী'তে (সাহিত্য) [সম্পাদক-সঙ্ঘ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস] সংকলিত হয়।

সাহিত্য পরিষদে বিদ্যাসাগর

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিদ্যাসাগরের একটি প্রতিকৃতি সংগৃহীত ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরিষৎ-পরিচয়' গ্রন্থে ওই প্রতিকৃতির উল্লেখ আছে এবং ওই গ্রন্থসূত্রেই জানা যাচ্ছে প্রতিকৃতিটি দান করেছিলেন তাঁরই পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের তৈলচিত্রের শিল্পীর নামের উল্লেখ করেননি। ছবির শিল্পীর নাম না-জানায় শিল্পীর নাম লেখেননি ব্রজেন্দ্রনাথ। তদুপরি, সাহিত্য পরিষদে বিদ্যাসাগরের ওই প্রতিকৃতির সন্ধানও এখন পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সাহিত্য পরিষদে বিদ্যাসাগরের ঐ তৈলচিত্র এখন আর নেই।

তবে সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত আছে বিদ্যাসাগরের মাটির এক আবক্ষ মূর্তি। মূর্তিটি কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী যদুনাথ পালের (১৮২২-১৯২৯) গড়া।

উনিশ শতকের প্রখ্যাতনামা মৃৎশিল্পী যদুনাথ ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার একাধিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তাঁর গড়া মূর্তি প্রদর্শিত করেন। মেলবোর্ন (১৮৮০-৮১), আমস্টারড্যাম (১৮৮৩), ক্যালকাটা (১৮৮৩-৮৪), গ্লাসগো (১৮৮৮) এবং প্যারিস (১৮৯০) ইন্টারন্যাশনাল এগজিবিশনে তাঁর গড়া মূর্তি সরকারি উদ্যোগে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়। কলকাতার নানা প্রদর্শনীতেও তিনি পুরস্কৃত হন। মানবজাতির নানা গোষ্ঠী বিশেষত ভারতের দ্বীপ; অরণ্য ও অসমতল এলাকার আদিম নর-নারীর মূর্তি গড়ায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল সর্বাধিক। কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের নৃতত্ত্ববিষয়ক গ্যালারি এবং লন্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটে তাঁর পূর্ণাকারের নানা মূর্তি সংগৃহীত আছে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্ম-কথা'-য় যদু পালের কথাও লিখেছেন। তিনি বলেছেন : "কৃষ্ণনগরের কুমোরদের মত বাঙ্গালায় অপর কেউই ক্লে-মডেলিং-এ ওস্তাদ ছিল না। আমার ছেলেবেলায় যদু পাল নামক এক ব্যক্তি এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় কারিগর ছিলেন, তাঁকে নির্ভয়ে আর্টিস্ট বলা যায়।

"দাদা তাঁর অত্যন্ত ভক্ত হয়ে পড়েন এবং দাদার অনুরোধে তিনি বিলেতি বইয়ের ছবি দেখে ভিনাস গড়তেন। আমাদের বাড়িতে তাঁর রচিত ছোট ছোট দুটি-তিনটি ভিনাস ছিল: আমার সেকালে মনে হত যে তারা বিলেতি ভিনাসের অনুরূপ।"

সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি মাটির হলেও সাদা রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহে ছিল মূর্তিটি এবং তিনিই সাহিত্য পরিষদকে উপহার দেন (২১ অগ্রহায়ণ ১৩১৫)। বিদ্যাসাগরকে চাক্ষুষ দেখে যদুনাথ মূর্তিটি গড়েছিলেন কি না তা জানা না গেলেও এটি উনিশ শতকেই গড়া হয়েছিল বলে দৃঢ় বিশ্বাস।

ফোটোগ্রাফিতে বিদ্যাসাগর

বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের দোকানে তোলা বিদ্যাসাগরের দুটি ফোটোগ্রাফের সন্ধান পাওয়া যায়। আশির দশকে ৮ নম্বর চৌরঙ্গির বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের স্টুডিওতে গিয়ে তুলিয়েছিলেন তিনি ওই দুটি ফোটোগ্রাফ। দুটি আলোকচিত্রের একটির প্রতিরূপ প্রায় সকলেরই চেনা হাতলওয়ালা, গদি-আঁটা চেয়ারে বসে বই হাতে বিদ্যাসাগরের সে ফোটো তো প্রায়

সকলেরই দেখা। তবে, অনেকেরই জানা ছিল না ছবি দুটি কার তোলা। দুষ্প্রাপ্য এ ফোটোগ্রাফদুটি বিদ্যাসাগর নিজেই উপহার দিয়েছিলেন চিত্রশিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহের দুটি ফটোগ্রাফ তোলা হয়েছিল নিমতলার শ্মশানে। পালঙ্কে শায়িত আর শেষ স্নানের প্রাক্কালে ফোটোগ্রাফদুটি তুলেছিলেন এস সি অর্থাৎ শরৎচন্দ্র সেন।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল মরদেহের স্নানপর্বের প্রাক্কালে গৃহীত ফোটোগ্রাফটি। তবে হাফটোন ব্লকের মাধ্যমে নয়, মূল ফোটোগ্রাফটি লিথো ছবিতে রূপান্তরিত করে দেন অন্নদাপ্রসাদ বাগচী এবং সেটিই সংকলিত হয়েছিল চণ্ডীচরণের গ্রন্থে। বিহারীলাল সরকারের গ্রন্থে মুদ্রিত হয় পালঙ্কে শায়িত ফোটোগ্রাফটি।

।'-র শোক সংবাদ

উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে সঞ্জীবনী সংবাদপত্রের এমন একটি সংখ্যা সংগৃহীত রয়েছে যাতে প্রকাশিত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের মৃত্যুসংবাদ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর দু'দিন পরে প্রকাশিত (১ আগস্ট ১৮৯১ : ১৭ শ্রাবণ ১২৯৮) শোকসংবাদটি সচিত্র করা হয়েছিল কাঠখোদাই ছবি দিয়ে। বৃহৎ আকারের চার পৃষ্ঠার সঞ্জীবনী তখনও ছিল সাপ্তাহিক।

সঞ্জীবনী প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, গগনচন্দ্র হোম ও পরেশনাথ সেন প্রমুখ বিদ্বজ্জন। সে সময়ের ইংরেজি খবরের কাগজ সহজপ্রাপ্য হলেও একশো বছর আগেকার বাংলা সঞ্জীবনীর ওই সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু বাংলা সাংবাদিকতায় যে শোকের ছায়া ফেলেছিল তা প্রতিফলিত হয়েছে প্রায় পূর্ণ পৃষ্ঠার সেই সংবাদ পর্যালোচনায়।

মানকুমারী বসুর 'শোকোচ্ছ্বাস'

অয়েল পেন্টিং, মূর্তিকলা, লিথোগ্রাফি ও ফোটোগ্রাফিতে নয়, বিদ্যাসাগরের মুখচ্ছবি ধরা রয়েছে কাঠখোদাই ছবিতেও। হরিদাস সেন, ত্রৈলোক্যনাথ দেব, বিহারীলাল রায় ও প্রিয়গোপাল দাস প্রমুখ আরও অনেকে বিদ্যাসাগরের কাঠখোদাই ছবি করেছেন।

রচনাকে চিত্রাঙ্কিত করার প্রয়োজনে উনিশ ও এ শতকের অনেকদিন কাঠখোদাই ছবি ছিল অপরিহার্য। লিথোগ্রাফি ও ধাতব ব্লকের প্রচলন হওয়ায় কাঠখোদাই ছবির ব্যবহার কমে যায় এবং অবশেষে একেবারেই হয় বিলুপ্ত। এমন এক শিল্পীর কাঠ-খোদাই ছবি দিয়ে সচিত্র করা হয়েছিল 'শোকোচ্ছ্বাস' পুস্তিকাটি।

মাইকেল মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে নিমতলায় অন্তিম শয়ানে বিদ্যাসাগরকে দেখে শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। মানকুমারী তাঁর শোকপ্রকাশ করেছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় (৩২০ সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৮)।

তাঁর ওই রচনা এবং দুটি কবিতা ও চন্দ্রনাথ দাসের একটি কবিতা 'শোকোচ্ছ্বাস' নামে এক পুস্তিকায় সংকলিত হয়। ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে ছেপে উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী অফিস থেকে প্রকাশ করেন পুস্তিকাটি। 'স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস' পুস্তিকার প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছিল কাঠখোদাই ছবিটি। নিমতলার শ্মশানে বিদ্যাসাগরের মরদেহের যে ফোটোগ্রাফটি তুলেছিলেন শরৎচন্দ্র সেন সেটির অনুসরণে অজ্ঞাত এক শিল্পী করে দিয়েছিলেন প্রচ্ছদের কাঠের ছবিটি।

সংস্কৃত কলেজের মূর্তি

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর (২৯ জুলাই ১৮৯১) পর সংস্কৃত কলেজে প্রতিষ্ঠা করা হয় তাঁর প্রতিমূর্তি। তাঁর নশ্বর দেহের প্রতীক ওই প্রতিমা প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে ছিল বহু যশস্বী মানুষের উদ্যোগ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর টাউন হলে আয়োজিত এক মহতী সভায় গৃহীত হয় মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব (২৭ আগস্ট ১৮৯১)। শোকসভার উদ্বোধন করেন শেরিফ প্রিন্স মহম্মদ ফারুখ শাহ।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার চার্লস এলিয়টের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় একই সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের শোকপ্রস্তাব ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর তিন দিন আগে পুরাতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরলোকগমন (২৬ জুলাই ১৮৯১)। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁরও স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে শুরু হয় চাঁদা তোলা।

বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার সাধারণ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন কোচবিহারের মহারাজা। বিচারপতি আমির আলি সহ, মহারাণী স্বর্ণকুমারী, সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফট, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, শেখ মহম্মদ জিলানি সামসুল-উলেমা মৌলবি আহমদ, চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন ওই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

স্মৃতিরক্ষার কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হন বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রাজকুমার সর্বাধিকারী এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

বিদ্যাসাগরের মূর্তির সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে স্থাপন করা হয়েছিল তাঁর তৈলচিত্রটিও। কোনও ইংরেজ শিল্পী নয়, প্রতিকৃতিটি আঁকেন ফণিভূষণ সেন। মূর্তি ও প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জন উডবার্ন (২৮ মার্চ ১৮৯৯)। উন্মোচনী অনুষ্ঠানে বিচারপতি স্যার লরেন্স জেনকিন্স, নরেন্দ্রনাথ সেন, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে আরও বহু ছাত্র এবং শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি স্থাপনার মাধ্যমে অস্বীকার করা হয়েছিল প্রচলিত একাধিক ট্র্যাডিশনকে। বিদ্যাসাগরের প্রতিমা স্থাপনের আগে কলকাতায় বসানো হয়েছিল প্রায় ত্রিশটি পূর্ণাঙ্গ মূর্তি। ইংরেজ সৈনিক, প্রশাসনিক ও মহারানীর ওই মূর্তিগুলি গড়ে দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ব্রিটেনের শিল্পীদের এবং মূর্তিগুলি গড়ে এসেছে ইংল্যান্ড থেকেই। এমনকি বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠার আগে বসানো রমানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ দেব ও কৃষ্টদাস পাল প্রমুখ ভারতীয়ের মূর্তিও গড়ে দেন ব্রিটেনের শিল্পীরা। ইউরোপের শ্বেতপাথর কেটেই গড়া হয়েছিল ওই চার ভারতীয়ের মূর্তি।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রথম লঙ্ঘিত হয় ওই প্রথা। উদ্যোক্তারা সিদ্ধান্ত নেন ইউরোপের পাথর ও শিল্পীর পরিবর্তে ভারতের শ্বেতপাথর কেটে ভারতীয় শিল্পীই গড়বেন বিদ্যাসাগরের প্রতিমা। বিদ্যাসাগরের স্বদেশী শিল্পপ্রীতি ও স্বাবলম্বী মতাদর্শের কথাটি মনে রেখেই ভারতীয় ভাস্করকে দিয়ে জয়পুরের শ্বেতপাথরের মূর্তিটি গড়া হয়। বিদ্যাসাগরের মূর্তির রূপকার বারাণসীর দুর্গা মিস্ত্রি। বারাণসীতেই গড়া হয়েছিল মূর্তি।

বিদ্যাসাগরের মূর্তিই কলকাতায় বসানো প্রথম ভারতীয় শিল্পীর গড়া প্রতিমা।

প্রায় আট বছর পরে মূর্তিটি সংস্কৃত কলজ থেকে সরিয়ে এনে বসানো হয় 'হিন্দু কলেজ স্কোয়ারের' প্রধান প্রবেশ পথে (১৯০৭)। কলেজ স্কোয়ারে মূর্তি স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সভাপতি ছিলেন বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র। ওই কমিটির সদস্য ও কমিশনার ডাঃ হরিধন দত্তের সুপারিশে কলকাতা কর্পোরেশন কলেজ স্কোয়ারে মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে জমি দান করে। সেই সময় থেকে মূর্তিটি কলেজ স্কোয়ারে রয়েছে প্রায় চুরাশি বছর।

এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে মূর্তির মাথার ওপরে গড়া হয়েছে এক পাকা আচ্ছাদন বা পোর্টিকো। কিন্তু দুর্গা মিস্ত্রির মূর্তিটিকে সংস্কার করার নামে নতুন করে ঔজ্জ্বল্য আনতে সর্বাঙ্গে লেপন করা হয়েছে পুরু সাদা রঙ আর বার্নিশ। ফলে, বিদ্যাসাগরের চোখদুটি আর চোখেই পড়ে না। মাটির গড়া সরস্বতী বা দুর্গা প্রতিমার অঙ্গে চেকনাই আনতে যেমন ঘামতেল লেপন করেন মৃৎশিল্পীরা, বিদ্যাসাগরের মূর্তিটিকে ঠিক তাই করেছেন তথাকথিত সংস্কারকর্তারা। ফলে, দুর্গা মিস্ত্রির গড়া মূর্তির মূল রীতিবৈশিষ্ট্য হারিয়ে গেল। পুরনো পাথরের মূর্তি পরিষ্কার করার পদ্ধতি অবশ্যই আছে। বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে সে কাজ করা হলে বিদ্যাসাগরের মূর্তির এ দুর্দশা হত না।

সংস্কৃত কলেজে মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলেজের অধ্যক্ষ সংস্কৃত ও বাংলায় কবিতা রচনার জন্যে কবিদের অনুরোধ করেন। অনুরোধে সাড়া দিয়ে ছোট-বড় যে বাংলা কবিতা লেখেন নানা কবি তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি প্রতিষ্ঠার আগেই ওই কবিতাগুচ্ছ থেকে কয়েকটি নির্বাচিত কবিতা ও পাদপীঠের বয়ানসহ 'বিদ্যাসাগর প্রশস্তি' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় (মাঘ ১৩০৫)। নিজের লেখা ভূমিকাসহ ওই পুস্তিকার প্রকাশক নারায়ণচন্দ্র শর্মা। বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন : "কেবল বান্ধবমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারার্থ 'বিদ্যাসাগর প্রশস্তি' নাম দিয়া কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম।" এ পুস্তিকাতেও মূর্তির শিল্পী বারাণসীর দুর্গা মিস্ত্রির উল্লেখ আছে।

বিদ্যাসাগরের আরও দুটি মূর্তি

কলেজ স্কোয়ারে মূর্তি স্থানান্তরের পর সংস্কৃত কলেজের শূন্য স্থান পূরণ করা হয় নতুন এক মূর্তি বসিয়ে। শ্বেতপাথরের ওই মূর্তির শিল্পী সম্ভবত এভাঞ্জেলিনো বইস। ১৯১০ সালের মধ্যে বইসের গড়া মূর্তিটি বসানো হয় সংস্কৃত কলেজে। কিন্তু এ শতকের সত্তরের দশকে দুষ্কৃতীদের আক্রমণে মূর্তির নাক মুখ ও কপাল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দ্বিতীয় মূর্তিটিকে অপসারণ করা হয়। বছর কয়েক পরে ওই স্থানে আবার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে প্রমোদগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের গড়া শ্বেতপাথরের তৃতীয় মূর্তিটি (১৯৭৭)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতেই হবে কলকাতায় দুজন বইস ছিলেন। এঁরা দুজনেই ইতালিয়ান। এঁদের দুজনেরই কলকাতায় তোলা ফোটোগ্রাফ আছে এবং ফোটোদুটিকে দেখে বোঝা যায় দুই বইস স্বতন্ত্র মানুষ। একজন জ্যেষ্ঠ আর একজন কনিষ্ঠ। মুখাকৃতিও সম্পূর্ণ বিপরীত। হয়তো ওঁরা পিতা-পুত্র কিংবা জ্যেষ্ঠ অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

অনুমান সংস্কৃত কলেজের বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় মূর্তিটি জ্যেষ্ঠ বইসের গড়া। এ ছাড়াও, সাহিত্য পরিষদে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে পাথরের আবক্ষ মূর্তিটি রয়েছে সেটিও ওই

এভাঞ্জেলিনো বইসের গড়া।

দ্বিতীয় বইসের পূর্ণনাম জানা নেই। তিনি ই বইস নামে পরিচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারতলায় অর্থাৎ দ্বারভাঙা বিল্ডিং-এ (পুরনো 'ল কলেজে) মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি ব্রোঞ্জের আবক্ষ মূর্তি আছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের অনুরূপ আরও একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি আছে সাহিত্য পরিষদে। পাদপীঠে উল্লেখ না থাকলেও আবক্ষ দুটি মূর্তিরই দেহে শিল্পীর স্বাক্ষর 'ই বি' রয়েছে। ইনি কোন বইস তা বলা সম্ভব হচ্ছে না।

তবে নিশ্চিত বলা যায় দ্বিতীয় বইসের গড়া স্যার আশুতোষের একটি মূর্তি আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শ্বেতপাথরের স্যার আশুতোষের আবক্ষ মূর্তিটি রয়েছে আশুতোষ মিউজিয়ামের একতলায়। আসলে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের দোতলায় সিঁড়ির মুখে। ১৯১৫ সালে গভর্নর লর্ড কারমাইকেল স্যার আশুতোষের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়েই।

দ্বিতীয় অর্থাৎ কনিষ্ঠ বইসের কাছে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর মূর্তিকলা অনুশীলন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডের ফ্ল্যাটে। জনশ্রুতি, দ্বিতীয় বইস বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের অধীনে মূর্তি গড়ে দিতেন।

পৌরুষের সমাদর বা গুণগ্রাহিতা চিরকালীন। আর পৌরুষের সঙ্গে যদি একীভূত হয় মনুষ্যত্বের অঙ্গীকার তবে তার স্বীকৃতি হয়ে ওঠে অসীম। বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শের ভিত্তিমূলে ছিল দুটিই—'অজেয় পৌরুষ' আর 'অক্ষয় মনুষ্যত্ব'। তাঁর জীবনদর্শনের এ দুটি মূল মন্ত্রই তাঁকে করে তুলেছিল মহৎ। আর সেই মহত্ত্বের আকর্ষণে তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে নানা শিল্পসামগ্রী আর সাহিত্য। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশা থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর উদ্দেশে যে অর্ঘ্যপ্রদান তা আজ প্রত্নরত্নের সমতুল এবং এই প্রতীকী সামগ্রীগুলির মধ্যে দিয়েই বিদ্যাসাগরকে ফিরে পেতে হবে আমাদের বারবার।

সহায়তা : অধ্যক্ষ দিলীপ কাঞ্জিলাল (সংস্কৃত কলেজ); অধ্যক্ষ নরেশচন্দ্র মিত্র (বিদ্যাসাগর কলেজ); অশোক দেব, গণেশ পয়ড়া (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী); শ্রীমতী ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ ঘোষ (বালি সাধারণ গ্রন্থাগার); কমলেন্দু সরকার, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য ও জগদীশচন্দ্র সিংহ এবং সুজয় মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

এ কথা সত্য যে বিদ্যাসাগর বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করলেও তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। তবু বলে রাখা ভালো যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকলেও ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর সেই 'And beyond translating and primer making vidyasagar has done nothing — এই উক্তিকে অগ্রাহ্য করেই এই আলোচনা। শিক্ষার প্রসার, সমাজ সংস্কার, অনুবাদকর্ম ও বিতর্কমূলক গ্রন্থরচনায় তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হয়েছে। প্রচার পুস্তিকার মুক্তি ও দৃষ্টান্ত আহরণে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামে মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনে এবং ছাত্রদের শিক্ষার প্রয়োজন সাধনেই তিনি গলদঘর্ম হয়েছেন। সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি রবীন্দ্রনাথের কথায় সেই অপ্রয়োজনের জগতে বিচরণ করে 'দ্বিতীয় সংসার' সৃষ্টি করবার তেমন অবকাশ পাননি। তবু এই বাইরের ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝখানেও অল্প দু'চারটি মৌলিক সৃষ্টি যা তিনি করে গেছেন, এবং যার মধ্যে তাঁর সেই সৃজনশীল ও মননশীল প্রতিভার দুইদিকের স্পর্শ পড়েছে, তাতেও আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না।

প্রথমেই বিদ্যাসাগরের রচিত 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) পুস্তিকাটির কথা বলতে হয়। এ কোনো অনুবাদ রচনা নয়, সম্পূর্ণরূপে তাঁর স্বাধীন ও মৌলিক সৃষ্টি। অবশ্য এটি সৃজনশীল কল্পনার কীর্তি নয়, এ হলো তাঁর বিচারশীল সত্তার মৌলিক অবদান। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট ভারতপ্রেমিক জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের মৃত্যু হলে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর অনুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বেথুন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা করেন। এই সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশনে বাংলা, উর্দু ও ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করা হতো। এই হিসেবে ডাঃ সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এখানে কলকাতার পৌরস্বাস্থ্য, সংস্কৃত কাব্য এবং বাংলা কবিতা সম্পর্কে দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। এইরূপ এক অধিবেশনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠে অনুরুদ্ধ হন। তারই ফল ঐ আলোচ্য পুস্তিকা। ১৮৫৩-এর 'সংবাদ প্রভাকর'-এর মার্চ সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধটি প্রশংসিত হয়। 'রচনাটি যে সর্বাংশে উত্তম হইয়াছে' এবং 'তাহাতে লিপিনৈপুণ্য এবং সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শন' করা হয়েছে, একথা বলা হয়েছিল। পুস্তিকাটি কয়েকটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, আমাদের বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লেখার চেষ্টা এই প্রথম। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষ্য করা গেলেও আমাদের দেশে এই ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কৌতূহল তখনও জাগ্রত হয়নি। বিদ্যাসাগরের এ পুস্তিকা সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিল বহুলাংশে। দ্বিতীয়ত, সেই ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সমালোচনা সাহিত্য বলতে কিছুই ছিল না। সাহিত্যের বিচার কীভাবে করতে হয়, কোন মানদণ্ডে কোনো লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে হয়—বিদ্যাসাগরের এই পুস্তিকা স্পষ্টভাবে সেই পথনির্দেশ করেছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাধীন বিচারবোধ এবং মূলত সংস্কৃত শ্রেষ্ঠ আলংকারিকদের কাব্যবিচারের মানদণ্ড কাব্য বিচারের পরিচয়ই এ পুস্তিকায় মুখ্য। পাশ্চাত্য কাব্যতাত্ত্বিকদের সূত্রের সঙ্গেও দু'চারটি স্থলে তাঁর পরিচয়ের নিদর্শন এখানে মেলে। দুঃখের বিষয়, ঈশ্বরচন্দ্রের এই পুস্তিকার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় নেই এবং তাঁর পরে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত-সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাস কেউই রচনা করেননি। ছাত্রপাঠ্য বই বাধ্য হয়ে কোনো কোনো পণ্ডিত রচনা করলেও কেউ বিদ্যাসাগরের এই পুস্তিকার নামোল্লেখও করেননি।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৌলিক রচনার মধ্যে এর পরেই 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'-এর কথা বলতেই হয়। তাঁর বন্ধু ও আত্মীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা প্রভাবতীর জন্ম ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং মৃত্যু ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারিতেই। শিশুদের প্রতি স্বভাবধর্মেই বিদ্যাসাগর স্নেহশীল ছিলেন। কিন্তু এই বন্ধু ও আত্মীয়কন্যা প্রভাবতীর প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা ছিল সর্বাধিক। সংগ্রামী জীবনে আর কোনো শিশুকন্যা তাঁর হৃদয়দেশকে এতোখানি অধিকার করেনি। একে তো শিশুদের প্রতি স্নেহে বিহ্বল, তার ওপর তাঁর অন্তরটি তো বাঙালী মায়ের। এই দুয়ের সহযোগে বন্ধুকন্যার প্রতি মমত্বজনিত চিত্তকোমলতা অধিক হবারই কথা। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের ঘোরতর মানসিক অশান্তি চলছিল। ঘনিষ্ঠজনদের নিষ্ঠুর আচরণ এবং 'বিরস ও বিষময় সংসারের' তপ্ত জ্বালা তাঁর মতো মানবপ্রেমিককেও হতাশ ও বেদনার্ত করে তুলেছিল। দুঃসহ এই মানসজ্বালা থেকে মুক্ত হবার তাগিদে স্নেহশীল অন্তরের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে তিনি প্রভাবতীকে আশ্রয় করেছিলেন। সুখেই কাটছিল দিন। কিন্তু সে সুখটুকুও তাঁর অদৃষ্টে নেই। প্রভাবতী মাত্র তিন বছর বয়সেই চিরকালের জন্য এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। এই হৃদয়বিদারী শোক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো কোমল প্রাণ হৃদয়বান ব্যক্তির পক্ষে সহ্য করাই কঠিন। তাই এই রচনাটি লিখে তিনি সেই অসহনীয় ব্যথায় নিজেকেই নিজে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছেন। 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'-এর মতো এ কোনো বিচারমুখ্য পুস্তিকা নয়—হৃদয় দ্বারে সাহিত্যের রসাস্বাদন এবং বুদ্ধি ও যুক্তির কষ্টিপাথরে তার যাচাই নয়—একেবারে নিজ হৃদয়কে অর্গল মুক্ত করে নিজেরই নিভৃত কান্না। অত্যন্ত প্রিয় এই রচনাটি তিনি মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বেও গোপনে পাঠ করতেন।

কবিত্বসুরভিত, আন্তরিকতাপূর্ণ ও লেখকের হৃদয়াবেগ মিশ্রিত এই রচনাটি প্রকাশের ইচ্ছাও তাঁর কোনোদিন ছিল না।

বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী (বিদ্যাসাগর চরিত, স্বরচিত) ১৮৯১ সালে তাঁর পুত্র নারায়ণ-চন্দ্রের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। তাঁর বহুবিচিত্র কর্মবহুল জীবনের কথা অনেকেই শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তাঁদেরই অনুরোধে তিনি এই কাজে হাত দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র দু'টি পরিচ্ছেদ লেখার পর তিনি আর লেখার অবকাশ পাননি। এমন মানুষের আত্মজীবনীটি শেষ হলো না। হলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তা একটি মূল্যবান দলিল হয়ে থাকত এবং তাঁর জীবনের বহু রহস্যের সমাধান সহ এ গ্রন্থ বাংলা আত্মজীবনীর ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করত।

গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে ঈশ্বরচন্দ্র নিজ পিতা-মাতার বংশপরিচয়, তাঁদের চরিত্র, তাঁর জন্ম ও চার বছর বয়স পর্যন্ত নিজ জীবনকথা বিবৃত করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ তাঁর বাল্য কাহিনীরই পরিচয়। মাত্র আট বছর বয়সে গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে তিনি বড়োবাজারে ভগবতী সিংহের বাড়িতে আশ্রয় পান এবং তাঁর কন্যা রাইমণির অযাচিত স্নেহলাভে ধন্য

হন। এখানে কিছুদিন পাঠশালায় পড়ে তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই পরিচ্ছেদেই পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসার পথে তিনি কীভাবে রাস্তায় প্রোথিত মাইলস্টোনে খোদিত ইংরাজী রাশিগুলি লক্ষ্য করতে করতে তা অল্পক্ষণের মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলেন, সে কাহিনীও লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে গ্রন্থটি এই দুই পরিচ্ছেদেই সমাপ্ত হওয়ায় আমাদের ক্ষোভের শেষ নেই। দুরূহ-দুর্বহ তৎসম শব্দের গুরুভার সৌমবস্ত্র পরিত্যাগ করে ভাষালক্ষ্মী এখানে সাধুভাষার লঘুভার একখানি কীরূপ শাড়ি পরিধান করেছে, তা বোঝানোর জন্য একটু উদ্ধৃতি দিই—'আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অন্যেরা নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।'

ঈশ্বরচন্দ্রের আর একখানি আত্মকথাশ্রেণীর পুস্তিকা 'নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াস' (১৮৮৮, এপ্রিল)-এর কথা উল্লেখ না করলেই বোধ হয় ভালো হতো। শারীরিক অসুস্থতা, বন্ধুদের বিরোধিতা ও কুৎসা রটনায় মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি অত্যন্ত মানসিক কষ্টে ছিলেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের গ্রন্থকর্তৃত্ব দাবি করেন এবং তাঁর জামাতা যোগেন্দ্রভূষণ 'মদনমোহন' একটি ক্ষুদ্র জীবনীতে তাঁকে 'পরস্বাপহারী' বলেন। তাঁর 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থেরও গ্রন্থস্বত্ব দাবি করেন। তখন বাধ্য হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথার্থ সত্য প্রকাশ করতে হয়। তাঁদের সমস্ত অভিযোগ যে বিদ্বেষপ্রসূত এ প্রমাণ দেবার জন্যই তাঁর এই পুস্তিকা। তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পরেও তাঁদের পরিবারের প্রতি একদিকে তাঁর স্বভাবসুলভ করুণা ও অন্যদিকে তর্কলঙ্কার ও যোগেন্দ্রভূষণের আচরণে রুদ্র-রোষ দুয়েরই নিদর্শন এ পুস্তিকা।

'রামের রাজ্যাভিষেক' শীর্ষক রচনাটি ১৮৬৯ সালে লিখিত হয় মূল রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের সম্পূর্ণ ও পঞ্চম খণ্ডের কতক অংশের বিষয় অবলম্বন করে। অবশ্য একে আক্ষরিক অনুবাদ কখনোই বলা যায় না। ভাবের ক্রম ও বিষয়-সন্নিবেশের পদ্ধতিটি বামায়ণানুগত হলেও মূলের চরণ ধরে-ধরে এর যাত্রা নয়। তাই একে স্বাধীন রচনাই বলা উচিত।

আর একটি মাত্র রচনা উল্লেখ করেই এই ক্ষুদ্র রচনার উপসংহার। ডিমাই সাইজের মাত্র সাতপৃষ্ঠার এহ প্রবন্ধটি। 'সর্বশুভকারী' নামক পত্রিকায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের এ পত্রিকায় কোনো লেখকেরই নাম থাকত না। উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এই রচনাটির লেখকের নাম না থাকলেও এটি যে বিদ্যাসাগরের তা রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' এবং শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত্র' গ্রন্থ থেকে জানা যায়। বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা—এ বিষয়ে বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র যেরূপ শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্কে যুক্তি-তর্কের কণ্টকিত পথে বিচরণ করেছিলেন, এখানে সেই নৈয়ায়িক বিদ্যাসাগরকে আমরা দেখি না। শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তা মুখ্য হয়ে ওঠেনি।

ঈশ্বরচন্দ্রের যে সমস্ত রচনার কথা আলোচনা করা হলো, সেখানে বিস্তারিতভাবে তাঁর রচনারীতি সম্বন্ধে কিছু বলার সুযোগ ছিল না। বিষয়টি পৃথকভাবেই আলোচ্য, তবু দু'একটি কথা না বললেও নয়। বহুদিন পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভাষার প্রশংসা করে বলেছিলেন.

"বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।" বাংলা গদ্যে 'কলানৈপুণ্য অবতারণা'র কৃতিত্ব তাঁর।

বস্তুত, বিদ্যাসাগর, সাধুভাষার চলনের চালটি এমনভাবে বেঁধে দেন, যাতে সন্ধি সময়ের দৌরাত্ম্য, তৎসম শব্দের অকারণ জুলুম, বাক্যে দূরান্বয়ের অস্বচ্ছতা দূর হয়ে যায় এবং তাতে সাহিত্যিক শ্রী ও মাধুর্য ফুটে ওঠে। পরবর্তীকালে ভাষায় নানা বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন এলেও মূল কাঠামোটিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যাসাগর বাকরীতির পরিবর্তনের দিকে ততখানি মনোযোগী নন, যতখানি মনোযোগী বিষয়-অনুযায়ী ভাষার বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন সাধনে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে লিখিত এই মৌলিক রচনাগুলির দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যাবে তাঁর ভাষাভঙ্গি বিষয়ানুগ।

অবশ্য একথাও সত্য যে, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তে তাঁর রচনায় ভাষাগত কতকটা যে আড়ষ্টতা ছিল, পরবর্তীকালের রচনায় তা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়েছে। আর এই স্বাধীন ও মৌলিক রচনায় তাঁর নিজস্ব স্টাইলটি অর্থাৎ তাঁর বৃহৎ সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বটি রচনারীতির স্বচ্ছতা, গাম্ভীর্য ও বক্তব্য সন্নিবেশে চিন্তার ক্রমের মধ্য দিয়েও প্রসন্নতায় ও মাধুর্যে আমাদের চিত্তকে নাড়া দিয়ে যায়।

'বিদ্যাসাগর' উপাধির উৎস সন্ধানে

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

'বিদ্যাসাগর' ঈশ্বরচন্দ্রের নাম নয়, উপাধি। উপাধিটি দেশবাসীর দ্বারা এমনভাবে গৃহীত ও সমাদৃত হয়েছে যে, 'বিদ্যাসাগর' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। এমন সার্থকনামা উপাধি তিনি কী কারণে কখন কোথা থেকে পেয়েছিলেন বা অর্জন করেছিলেন তা নিয়ে তাঁর জীবনীকার, ঐতিহাসিক বা গবেষকরা স্পষ্ট কোনো সদুত্তর দেননি।

উপাধিপ্রাপ্তি বিভিন্ন সূত্রে ঘটতে পারে। শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কিছু উপাধি দেওয়া হয়। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বা বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যাঁরা গবেষণামূলক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন, তাঁরা মোটামুটি একমত যে, সংস্কৃত কলেজের অসাধারণ কৃতী ছাত্র হিসাবে তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকেই এই 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি পেয়েছিলেন। শ্রীরাধারমণ মিত্র তাঁর 'কলিকাতা'য় বিদ্যাসাগর প্রবন্ধে লিখেছেন—'এই কলেজে (সংস্কৃত কলেজ) সর্বসাকুল্যে ১২ বছর ৫ মাস অধ্যয়নের পর ৪-১২-১৮৪১ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের নিকট হইতে একটি ও অধ্যাপকবর্গের নিকট হইতে আর-একটি মোট দুইখানি প্রশংসাপত্র এবং 'বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন'। (ঐতিহাসিক ২, জুলাই ১৯৭৮)।

সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র যে বিপুল বিদ্যা অধিগত করেছিলেন তার খতিয়ান নিতে গেলে সত্যি অবাক হয়ে যেতে হয়। দরিদ্র পরিবারের সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রামে পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করে পিতার হাত ধরে যখন কলকাতায় চলে আসেন তখন বয়স কী-ই বা এমন। ১৮২৯ সালের ১লা জুন যখন তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র ৯ বছর। সেখানে ১২ বছর ৫ মাস অধ্যয়ন করার পর তিনি ১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর কলেজের পাঠ যখন সমাপ্ত করেন, তখন তাঁর বয়স ২১ বছর ৪ মাস। এর মধ্যে তিনি পড়েছেন ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, জ্যোতিষ, স্মৃতি এবং ন্যায়শাস্ত্র। কলেজে তিনি কখন কী বিষয় নিয়ে পড়েন, তাব একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র এই রকম—

১৮২৯ সালের জুন থেকে প্রথম ৩ বছর ৬ মাস তিনি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের কাছে ব্যাকরণ শাস্ত্রের পাঠ নেন। এ সময় তাঁর পাঠ্যতালিকায় ছিল মুগ্ধবোধ, অমরকোষ, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি। তারপর ১৮৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৩৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে পড়েন সাহিত্যশাস্ত্র। তাঁকে পড়তে হয় রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তররামচরিত, দশকুমার চরিত, কাদম্বরী প্রভৃতি। সাহিত্যশাস্ত্রের পাঠ শেষ করে প্রবেশ করেন অলঙ্কার শ্রেণীতে। সেখানে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের কাছে একবছর ধরে পড়েন, সাহিত্যদর্পণ কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর। তারপর ১৮৩৬ সালের মে মাস থেকে ১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত দু'বছর ঈশ্বরচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির কাছে বেদান্ত শ্রেণীতে পড়েন। ১৮৩৮ সালে তিনি প্রবেশ করেন

স্মৃতিশ্রেণীতে। সেখানে হরনাথ তর্কভূষণ ও হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে পড়েন মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ, ব্যবহারতত্ত্ব। ১৮৩৯ সালে তিনি প্রবেশ করেন ন্যায়শ্রেণীতে। বিখ্যাত নৈয়ায়িক জয়নারায়ণ তর্করত্নের কাছে মুক্তাবলীসমেত ভাষাপরিচ্ছেদ, গোতম সূত্র, নৈষধপূর্বভাগ প্রভৃতি অধিগত করেন। মধ্যে কিছুদিন জ্যোতিষ শ্রেণীতেও তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮৪১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে বের হয়ে এলেন তখন তাঁর হাতে দুটি সার্টিফিকেট।

একটি সংস্কৃত কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট (ইংরাজী বয়ানে), আর একটি সংস্কৃত কলেজের গুণমুগ্ধ অধ্যাপকদের দেওয়া দেবনাগরী বয়ানে স্বেচ্ছাপ্রশংসাপত্র। এতে সাক্ষর করেছেন ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ ও ধর্মশাস্ত্রের ৭ জন অধ্যাপক। লেখা হয়েছে, 'অস্মাভিঃ শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরয় প্রশংসাপত্রং দীয়তে…'। অধ্যাপকদের কাছ থেকে এই স্বেচ্ছাপ্রশংসাপত্র আর কোনো ছাত্র পেয়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। এ সব থেকে মনে হতে পারে এতগুলি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করার সুবাদেই তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা ঠিক নয়।

কেননা ১৮৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় পাশ করলে আদালতে জজ পণ্ডিতের চাকরি পাওয়া যেতো। এ সময় তাঁকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাতে দেখা যায়, তাঁর নামের শেষে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'Issurchandra Vidyasagar was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law.' সেই কারণে, বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন, "১৮৪১ সালে কলেজের পাঠ শেষ হবার পর অধ্যাপকরা মিলিত হয়ে তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দিয়েছিলেন এ ধারণা প্রচলিত হলেও ঠিক নয়। 'বিদ্যাসাগর' উপাধি কলেজের অধ্যয়ন শেষ হবার অনেক আগেই তিনি পেয়েছিলেন। অন্তত ১৮৩৯ সালের মে মাসের আগে পেয়েছিলেন।"

ইন্দ্র মিত্র'র নথিপত্র সমৃদ্ধ গ্রন্থ 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' বা ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠির 'Vidyasagar : The Traditional Moderniser' গ্রন্থও এ বিষয়ে বাড়তি কোনো অলোকপাত করেনি।' অনুসন্ধান করতে গিয়ে শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য প্রণীত 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' (২য় খণ্ড পৃ ৩৭) গ্রন্থে এমন কিছু তথ্য পেলাম যা দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র উপাধি-প্রাপ্তির রহস্যটি ভেদ করা যায়। শ্রীভট্টাচার্য মহেশচন্দ্রের 'ন্যায়রত্ন' উপাধি-প্রাপ্তি সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন :

"অবশ্য তখন সংস্কৃত কালেজ হইতেও 'ন্যায়রত্ন' হইতে ছাত্রগণ যে উপাধি লাভ করিতেন, তাহার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

সাধারণ সাহিত্য : বিদ্যারত্ন, বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যানিধি, কবিরত্ন।

হিন্দুদর্শন : ন্যায়রত্ন, ন্যায়ভূষণ, ন্যায়ালঙ্কার, তর্করত্ন, তর্কভূষণ, তর্কালঙ্কার, তর্কচূড়ামণি, তর্কবাচস্পতি, তর্কশিরোমণি, বেদান্তবাগীশ, তর্কপঞ্চানন, তর্কসিদ্ধান্ত, ন্যায়পঞ্চানন।

স্মৃতিশাস্ত্র : স্মৃতিরত্ন, স্মৃতিচূড়ামণি, স্মৃতিশিরোমণি, স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিকণ্ঠ।

বেদ : বেদরত্ন, বেদকণ্ঠ।

কৃতীছাত্রগণ ইচ্ছামতো উপাধি বাছিয়া লইতেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সংস্কৃত কলেজে উক্ত উপাধি অর্পণের রীতি প্রবর্ত্তিত হয়।"

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীর কৃতীছাত্র হিসাবে ১৮৩৫ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে অর্জন করেছিলেন 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি। এবং এই উপাধি তাঁর স্বনির্বাচিত।

চিঠিপত্রের বিদ্যাসাগর

অরুণ সান্যাল

বিশ্বের বহু মনীষীই চিঠিপত্রকে রচনার গুণে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করে তুলতে পেরেছেন বলেই আজ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট বিভাগ রূপে পত্র-সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছে। আমাদের দেশের বহু মনীষীও পত্রসাহিত্য সৃষ্টিতে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন ; দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছের উল্লেখ করা সঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রগুলির মাধ্যমে ব্যক্তিগত নানা ভাবনা প্রকাশ করলেও রচনার গুণে সেগুলি সাহিত্যরস সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস রচনায় এই চিঠিপত্র যেমন মূল্যবান উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যমূল্য বিচারেও এই চিঠিপত্রগুলি বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে। কিন্তু এমন অনেক চিঠি আছে সাহিত্যিক মূল্য বিচারে যেগুলি তেমন মূল্যবান নয়, যেমন মূল্যবান সেগুলি চরিত্র বিশ্লেষণে। এই প্রবন্ধে সেই ধরনের কিছু চিঠিপত্রের কথাই উপস্থাপিত হয়েছে।

উনিশ শতকের বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেশ কিছুসংখ্যক চিঠিপত্র বর্তমানে সংগৃহীত হয়েছে। গবেষক শ্রীবিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এইগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করে বাঙালী পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তি পরিচয় গ্রহণে ও চরিত্র বিশ্লেষণে এই চিঠিগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মনে রাখা দরকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব কাল বাংলা গদ্যের সবে মাত্র গড়ে ওঠার কাল এবং এই গড়ার দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। ঈশ্বরচন্দ্রের হাতেই বাংলা গদ্য যথার্থ শ্রীলাভ করে। সেই কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা গদ্যের-প্রথম যথার্থ শিল্পীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পবিণত বয়সে রচিত তাঁর চিঠিপত্রে আমরা এই গদ্যশিল্পীর পরিচয় পেলেও এই পত্রগুচ্ছকে পত্রসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত বলা চলে না। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের এইসব চিঠিপত্রে সাহিত্যরসের সন্ধান না পেলেও আমরা এইসব চিঠিপত্রের মধ্যে একজন বিশিষ্ট মানুষকে খুঁজে পাই, যাঁকে 'নবযুগের মানুষ' বলে চিনে নেওয়া যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক পরিচয়। তিনি 'বিদ্যাসাগর', তিনি 'দয়ার সাগর', তিনি 'সমাজ সংস্কারক', আরও কত কি ; কিন্তু তাঁর প্রথম ও প্রধান পরিচয় তিনি নবযুগের বাংলার আদর্শ হিউম্যানিষ্ট বিদ্যাসাগর। এই প্রসঙ্গে শ্রীবিনয় ঘোষ লিখেছেন : "হিউম্যানিজম হল মানবতন্ময়তা, মানবমুখিনতা। বিদ্যাসাগর এই অর্থে হিউম্যানিষ্ট। অসহায় নিপীড়িতের সমাজে স্বভাবতই তিনি 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগর-রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্য, বদান্যতা, মহানুভবতা, মাতৃভক্তি—সব কটি মানবচরিত্রের মহৎ গুণ হলেও ব্যক্তি চরিত্রের উপাদান হিসেবে তার বিশেষ কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। 'ঐতিহাসিক মূল্য' কথাটির উপর জোর দিয়ে বলছি। যুগে যুগে বহু মানুষের মধ্যে এই সব মহৎ গুণের সমাবেশ হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সব সময় এইসব গুণের প্রকাশ হতে দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠা না থাকায়, তাঁদের সেই সব গুণের সমাদর হয় না।

কেবল এই গুণগুলির সমাবেশের জন্য বিদ্যাসাগরের মতন ঐতিহাসিক চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হয়নি। তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ হল এই হিউম্যানিজম, এই মানবতন্ময়তা, এই মানবাচ্ছন্ন চেতনা।" [বিনয় ঘোষ, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', (১), পৃ· ৩-৪]

মানবমুখীন এই বিদ্যাসাগরেরই পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে তাঁর চিঠিপত্রে। চিঠিপত্রে প্রত্যেক মানুষেরই আসল চরিত্র-পরিচয় যেমন করে প্রকাশ পায় বোধহয় আর কোন রচনায় তেমন করে প্রকাশ পায় না। এর কারণ ব্যক্তিগত চিঠিতে মানুষের মনের আবরণ নিঃসঙ্কোচে খুলে যায়। তাই বিদ্যাসাগরের পত্রগুচ্ছের মধ্যে একদিকে যেমন তাঁর ব্যক্তিচরিত্র প্রকাশিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। এই অভিজ্ঞতা কখনও সুখকর, কখনও বা বেদনাদায়ক। বিশেষভাবে সমাজজীবনের প্রত্যেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালী চরিত্রের দোষ ত্রুটি ও দুর্বলতা এমন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে কয়েকটি চিঠিতে তা প্রকাশ না করে থাকতে পারেননি।

শ্রীবিনয় ঘোষ সংকলিত চৌষট্টিখানি চিঠি ও ডঃ সুকুমার সেন উল্লিখিত একখানি চিঠি বিশ্লেষণ করে এই প্রবন্ধটি রচিত। এই পয়ষট্টিখানি চিঠিকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে—(১) পারিবারিক চিঠি, যার সংখ্যা চৌত্রিশ এবং (২) অ-পারিবারিক চিঠি. যার সংখ্যা একত্রিশ। অ-পারিবারিক চিঠিগুলিকে আবার প্রধানতঃ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ; যেমন—সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত. ঋণ সংক্রান্ত, শোকে সান্ত্বনাজ্ঞাপক ইত্যাদি। পারিবারিকই হোক. আর অ-পারিবারিকই হোক—দুই ধরনের চিঠির মধ্যেই 'মানুষের মত মানুষ' বিদ্যাসাগরের পরিচয়টি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কোথাও তিনি শ্রদ্ধানত সন্তান, কোথাও তিনি স্নেহপ্রবণ ভ্রাতা, কোথাও তিনি বৈষয়িক ব্যক্তি, কোথাও তিনি বুদ্ধিমান বিবেচক, আবার কোথাও তিনি অন্যের সাফল্যে উৎফুল্ল , কোথাও বা অন্যায়ের প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ—এমনি নানা পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর এই চিঠিগুলোতো।

প্রথমেই লক্ষ্য করার মত দিকটি হল বিদ্যাসাগরের প্রতিটি চিঠির শিরোনামায় 'শ্রীহরিঃ শরণম্' লেখার অভ্যাস। শুধুমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করার মত মানুষ ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন না। এই অভ্যাস তাঁর কোন ধর্মবিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছে কি করছে না—এ বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও এটুকু বলা চলে, তিনি নাস্তিক ছিলেন না।

যে চৌষট্টিখানি চিঠির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই চৌষট্টিখানি চিঠির রচনা কাল মূলত ১৮৬৫-১৮৯০। মাত্র এক বছর পরেই ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাই চিঠিগুলি প্রধানতঃ তাঁর জীবনসায়াহ্নে রচিত। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র দেহের দিক থেকে হয়ে পড়েন অসুস্থ, অন্যদিকে মনের দিক থেকে হয়ে ওঠেন ক্লান্ত ও বীতরাগ। ১২৭৬ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ পিতাকে প্রেরিত চিঠিতে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "নানা করণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। আমার ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব।" কিন্তু শ্রদ্ধায় নত, স্নেহে দুর্বল ও কর্ত্তব্যে অটল বিদ্যাসাগরের পক্ষে নিজের এই সঙ্কল্প বজায় রাখা কি সম্ভব ? সম্ভবপর ছিল না বলেই পুত্র নারায়ণ বিধবা ভবসুন্দরীকে বিয়ে করলে বিদ্যাসাগর নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে

পারেননি। ভাই শম্ভুচন্দ্রকে তাই ১২৭৭ সালের ৩১শে শ্রাবণের চিঠিতে লিখেছেন : "ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবা বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে,... আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক ; আমরা উদ্‌যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি। এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে তাহার পথ করিয়াছে।" কিন্তু এইটুকুই সব নয়। নবযুগের আদর্শ হিউম্যানিষ্ট বিদ্যাসাগর এরপর তাঁর জীবনের আদর্শের কথা উচ্চারণ করেছেন : "বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন. সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা।" বলা বাহুল্য চিঠিটির প্রতি ছত্রে বিদ্যাসাগরের অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্বেরই স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

আপন আদর্শে অবিচল বিদ্যাসাগরের পক্ষে কর্মক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত হওয়া সম্ভব ছিল না, তাই ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ রায়কে বহু-বিবাহ প্রথা বিলোপ বিষয়ে লেখা একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন :

"নানা গুণালঙ্কৃত
শ্রীযুক্ত রাজা কালীনারায়ণ রায়বাহাদুর মহাশয় মদনুগ্রাহকেষু,
জয়দেবপুর, ভাওয়াল, ঢাকা।

বিনয়বহুমাননমস্কার পুরসরং নিবেদনমিদম্‌

তারপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম, কুলীনদিগের মধ্যে সর্ব্বদ্বারিক বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত তিনি উদ্যোগী হইয়াছেন এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে সেই প্রথা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি কহিতেছেন এ বিষয়ে মহাশয়ের সম্পূর্ণ যত্ন, উৎসাহ ও মনোযোগ আছে। এই ব্যাপার সম্পন্ন হইবার বিষয়ে মহাশয় যে সবিশেষ যত্ন করিবেন সে বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, উল্লিখিত কার্য্য সমাধাকালে আমি উপস্থিত থাকি। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত আছি। কিন্তু মহাশয়ের অভিপ্রায়-সূচক পত্র না পাইলে, আমার তথায় যাইতে সাহস হইবেক না। মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমি আর ১০/১২ দিন কলিকাতায় আছি, তৎপরে কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে যাইব। আমার অভিলাষ এই, যাইবার পূর্ব্বে মহাশয়ের অভিপ্রায়সূচক অনুগ্রহলিপি প্রাপ্ত হই। ১৯ শে পৌষ, ১২৮২ সাল।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

সংসার জীবনে বীতস্পৃহ হয়েও যেমন একদিকে কর্ত্তব্যের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেননি, তেমনি সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালনেও কোথাও মুহূর্ত্তের জন্যও শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। তাই ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লেখা একটি পত্রে তিনি ২৫ জন আত্মীয়কুটুম্বের বৃত্তি এবং গ্রামস্থ মাসহারা হিসাবে ৪৮০ টাকার বন্টনের ব্যবস্থা করেছেন। তার একটি অংশ তুলে দিচ্ছি।

বাটীর খরচ	২২৮৲
স্বসম্পর্কীয় মাসহারা	৬৮৲
বাটীর খরচ	
মাতৃদেবী	৩০৲
দীনবন্ধু	৭০৲
শম্ভুচন্দ্র	৭০৲
ছোটবৌ	৮৲
মনোমোহিনী	১৫৲
মন্দাকিনী	১০৲
সর্ব্বেশ্বর	১৫

সংসার জীবন থেকে দূরে থেকে নিভৃত অবসর যাপন করবেন বলে বিদ্যাসাগর তাঁর অভিপ্রায় প্রকাশ করলেও কিন্তু পারেননি তাঁর নিজেরই সেই সঙ্কল্পে স্থির থাকতে। বরং এমনি ভাবে সংসার থেকে দূরে থেকেও যৌথ-পরিবারের সদস্যদের সকলের জন্য এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মের জন্য অর্থসংস্থান করে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের যে পরিচয়কে প্রকাশ করেছেন, সেই বিদ্যাসাগরই authentic বিদ্যাসাগর বা আসল বিদ্যাসাগর।[১]

"মানুষের আসল চরিত্র তার সমাজনির্দিষ্ট বা আদিষ্ট আচার-ব্যবহার ও ধ্যান-ধারণা দিয়ে বোঝা যায় না। কারণ তখন সে সমাজের যান্ত্রিক Unit হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, individual বা ব্যক্তি হিসেবে নয়। তার ব্যবহার বা আচরণের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ও সাধারণের ব্যতিক্রম যা, তার মধ্যেই তার আসল ব্যক্তিচরিত্র ফুটে ওঠে। সমাজের বহুজনের মতন একসুরের যে ঝঙ্কার শোনা যায় কোন ব্যক্তির মধ্যে, তাতে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কোন আভাস পাওয়া যায় না। বেসুরো যে সব রাগরাগিণী ব্যক্তির জীবনে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, তার মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক মানুষের অন্তকালবর্ত্তী আসল মানুষটি, লিন্টনের ভাষায়, the authentic individual। বিদ্যাসাগরের জীবনে এরকম বেসুরো রাগরাগিণীর ঝঙ্কার অনেক শোনা গেছে এবং তার মধ্যেই authentic বা আসল বিদ্যাসাগরকে খুঁজে পাওয়া যায়।"
['বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' : শ্রীবিনয় ঘোষ, ১ম খণ্ড ; কলিকাতা, ১৩৭১, পৃঃ ২৫]

'বিদ্যাসাগর মানে হলো ইস্পাত, যে ইস্পাত দিয়ে তৈরী হয় জাতীয় চরিত্রের কাঠামো'

স্বপন মজুমদার

বিদ্যাসাগর নাম নয়, উপাধি। এ-উপাধি একজনই পেয়েছেন, এমনও নয় ; তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর বলতে একজনের কথাই প্রথমে মনে আসে বাঙালির ; তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নব্য বাঙালির বর্ণপরিচয় ঘটিয়েছেন তিনি : তাঁরই পাঠশালায় পড়ে প্রায় একশো বছর ধরে বিস্তারের ডানা মেলেছে বাঙালি। একদিকে কৃতজ্ঞতায় কৃতার্থ হয়েছে, আবার কৃতঘ্নতায় ভুলতে চেয়েছে অন্যদিকে। বিদ্যাসাগরচর্চার আরশিতে তাই ধরা পড়ে গত প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালির মনোবিকলনের ইতিহাস। অন্য সব যুগপুরুষের আলোচনায় জোয়ার-ভাঁটা আছে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে বাঙালির মুখরতা—নিন্দায় প্রশংসায়, সম্মানে অপমানে—অনর্গল।

বাঙালির বিদ্যাসাগরচর্চার 'একালে'র শুরু বর্তমান শতাব্দীর মধ্য-৫০ দশকে। স্বদেশি আন্দোলন, বিশেষত তার সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে বাঙালির যোগদান, দেশবিভাগের মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক স্বজনহনন, দেশত্যাগ ও পুনর্বাসন—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এই ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়ে এসে প্রথম সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার অবকাশ পেয়েছে তখন বাঙালি। প্রায় অর্ধশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের ওপর দাঁড়িয়ে সত্তাপরিচয় জিজ্ঞাসার, আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার এই সময়েই যেন নতুন তাৎপর্য পেল বিদ্যাসাগরচর্চা। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছিলেন "আজকের বাঙালীর পক্ষে সবচেয়ে বেশী দরকার হলো, সেই টিকিওয়ালা বাঙালী-ইংরেজকে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ক্ষেত্রে জ্যান্ত করে তোলা। ঈশ্বরচন্দ্রকে নতুন করে চিনতে হবে, দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে, কিশোর-কিশোরীদের কাছে নতুন করে চেনাতে হবে। বিদ্যাসাগর মানে মাতৃভক্তি নয়, বিদ্যাসাগর মানে বিধবা বিবাহ নয়, বিদ্যাসাগর মানে দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, বিদ্যাসাগর মানে হলো ইস্পাত, যে ইস্পাত দিয়ে তৈরী হয় জাতীয় চরিত্রের কাঠামো।" ("বর্ণপরিচয়", 'অবিস্মরণীয় মুহূর্ত', ১৯৫৪, পৃ ৪১।) এর ধ্রুবপদ অবশ্য বাঁধা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'চারিত্রপূজা'য়। সে-পূজা কোনও বিগ্রহ রচনার আগ্রহে নয়, আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠায়।

প্রায় কাকতালের মতো মনে হয় যখন দেখি, একালের বিদ্যাসাগরচর্চার প্রথম বইটিই কিশোরদের উপলক্ষ করে লেখা একটি জীবনী, পরবর্তী কালের এক প্রমুখ কবিরও প্রথম প্রকাশিত বই ; যেন তাঁর ইষ্টপুরুষস্মরণ : শঙ্খ ঘোষের 'বিদ্যাসাগর' (১৯৫৬)। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের বিচিত্র ঘটনাচূর্ণ সাজিয়ে এক প্রশ্নময় সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন জীবনীকার : "সারা জীবন তাঁর তপস্যা ছিলো স্বাধীনতার, তপস্যা মুক্তির। অন্য অর্থে আজ আমরা স্বাধীন। কিন্তু কোথায় সেই মুক্তি, জীবনের মুক্তি, মানুষের মুক্তি—যা বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন ? কে তুলে নেবে সেই তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার ? সে ভার তোমাদের সবার,

সে ভার আমাদের সবার।" ১৯৭৮-এর তৃতীয় সংস্করণে তৎকালীন অবমূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে, যুক্ত হয়েছিল আরও একটি প্রশ্ন : "কোথায় তাঁরা ভুল করেছিলেন কতটুকু, কেবলমাত্র তার হিসেব নিতে গিয়ে কি সময় বইয়ে দেব আমরা ?" তখন বোঝা যায়, আলঙ্কারিক এই প্রশ্নের আড়ালে আছে উত্তরাধিকার স্বীকার করে নেওয়ারই প্রতিজ্ঞা। আর তাই তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠক নবীন কিশোর সমাজ।

এর এক বছরের মধ্যেই আমরা পাব প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার' (১৯৫৭)—প্রায় এক দশকের জন্য যে-সংকলনটি হয়ে উঠবে বাঙালির বিদ্যাসাগর-পাঠের একমাত্র অবলম্বন। আর এরই ভূমিকায় স্মিত ব্যঙ্গে প্রনাবি চেতকের মতো জাগিয়ে দিতে চান বাঙালির বিশ্রস্ত মূল্যবোধ। শুধুমাত্র 'বিদ্যাসাগর' বা 'করুণাসাগর' নন, তিনি 'রসসাগর'ও—'বিদ্যাসাগর চরিত্রের সমগ্রতা' জানবার জন্যে এর সবগুলিই অপরিহার্য মনে করেন প্রমথনাথ।

এরই সমসময়ে খণ্ডশ প্রকাশ পেতে থাকে বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ' (১৯৫৭-৫৯)। তথ্যের বহুলতায় ও ব্যাখ্যায় এবং আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে ঈশ্বরচন্দ্রের চিন্তা ও কর্মের বিশ্লেষণে বইটি নতুন গতি সঞ্চার করে বিদ্যাসাগরচর্চায়। একদিকে পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীদের উপপাদ্যগুলি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজে প্রয়োগের ফলে যেমন প্রকাশ পেল অভাবিত সব কৌণিকতা, অন্যদিকে তেমনি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবৎকালেই তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য থেকে সূত্র নিয়ে তিনি দেখালেন বিদ্যাসাগরের স্ববিরোধ ও সীমাবদ্ধতা।

১৯৫৬-৫৭ সালকেই তাই বলা যায় আধুনিক বাঙালির বিদ্যাসাগর পুনর্বিবেচনার ভিত্তিকাল। তাঁর রচনা, জীবনাদর্শ আর সমাজকর্ম : এই ত্রিধারায় চলবে যে-আলোচনাপ্রবাহ, তারই পথ উন্মোচিত হল এই তিনটি গ্রন্থপ্রকাশে। এঁদের সব ভাবনাই যে অ-পূর্ব তা হয়তো নয় ; কিন্তু নতুন যুগের পরিভাষায় তাঁকে চিনে নেওয়ার চিনিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হল এইসময় থেকেই। প্রাচীন ধারার পুনরুক্তিপ্রবণ আলোচনাও অবশ্য চলেছে সমান্তরে। তবে তার যোগ একালের মানসতার সঙ্গে নয়।

প্রতিভা শ্রুতকীর্তি। তার ধর্মই এই, ক্রমে তা যতটা সর্বজনের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে, ততটা অধ্যয়নের নয়। অথচ স্বচ্ছ বিচারের জন্য প্রয়োজন তন্নিষ্ঠ পাঠ : পাঠের জন্য নির্ভরযোগ্য ও নিতালভ্য পাঠবস্তু। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই শুরু হয় সম্পূর্ণ রচনাবলি উদ্ধার ও প্রকাশ। দেবকুমার বসু সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' (৪ খণ্ড : ১৯৬৬-৬৯) বা গোপাল হালদার সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ' (৩ খণ্ড; ১৯৭২) সংকলিত হওয়ার পিছনে সেই উদ্দেশ্যই প্রধান ছিল। কিন্তু সম্পাদনায়—নিছক তথ্যপূরণে নয়, নির্ভরযোগ্য পাঠনির্ধারণে—প্রথমটি যে-মানে পৌঁছেছিল, দ্বিতীয়টিতে তার অভাবই ছিল প্রকট। কিন্তু বাণিজ্যিক সাফল্যে 'সংগ্রহ' যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তার থেকেই শুরু হয়েছিল বারোয়ারি প্রতিযোগিতা আর তার মধ্যে বড় একটা অংশই ছিল বিদ্যাসাগরের। অবশ্য সেগুলো আলোচনার যোগ্য নয়।

শুধু বাংলা রচনাই নয়, এই সূত্রেই শিক্ষাবিধায়ক হিসেবে বিদ্যাসাগরের ইংরেজি পত্রাবলির গুরুত্বও উপলব্ধি হতে থাকে। সংস্কৃত কলেজ ও রাজ্য অভিলেখাগার থেকে অরবিন্দ গুহ আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত 'আনপাবলিশ্‌ড্ লেটারস অব বিদ্যাসাগরে'র (১৯৭১) এই প্রায় পাঁচশো চিঠি বিদ্যাসাগরচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করে। বাংলা লেখায় ঈশ্বরচন্দ্রের

ব্যক্তিগত জীবনের কথা প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু কর্মজীবনের এই ইংরেজি চিঠিগুলোর মধ্যে তাঁর নিজের কথা অনেকটাই প্রকাশ পেয়েছে, বিভিন্ন সংস্কারচেষ্টার অন্তর্গত উদ্দেশ্যও প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি তিনি। এই সংকলনটিকে তাই একদিক থেকে বলা যায়, তাঁর স্বরচিত কর্মজীবনী। এই পত্রাবলি যেমন তাঁর জীবনীর নতুন উপকরণ, তেমনি বাংলাদেশে শিক্ষার ইতিহাসের অমূল্য উপাদান।

এমনই অসংখ্য অসংগৃহীত আকর দিয়ে বিদ্যাসাগরের অভিনব জীবনীটিও আমাদের উপহার দিয়েছেন অরবিন্দ গুহ, ইন্দ্রমিত্র ছদ্মনামের আড়ালে। বিদ্যাসাগরচর্চার গ্রাহকমহার্ণব তিনি, তাঁর 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' (১৯৬৯) বিদ্যাসাগর-বিশ্বকোষ। উপকথা, লোকশ্রুতি, বিদূষণ থেকে শুরু করে স্মৃতিকথা, প্রতিবেদন, চিঠিপত্র—যাবৎ তথ্যই তিনি দুই মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছেন পাঠকের কাছে। কোনও তত্ত্ব আরোপের চেষ্টা করেননি তিনি, কোনও পূর্বকল্পিত সিদ্ধান্ত প্রমাণের দায় ছিল না তাঁর। ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে প্রতিটি খুঁটিনাটিতেই তিনি উৎসুক, কিন্তু উচ্ছ্বাস নেই তাঁর। আর আছে তথ্যের প্রতি অ-তর্ক নিষ্ঠা। তথ্য আর অতিকথার নির্বিকার সমাহার হয়তো 'করুণাসাগর'কে মহৎ মৌলিক গ্রন্থ করে তোলেনি, কিন্তু বিদ্যাসাগর-সন্ধিৎসুর কাছে অপরিহার্য করেছে অবশ্যই।

চর্চা ও পাঠ যখন ব্যাপক হয়ে ওঠে তখন স্বাভাবিকভাবেই বহু বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা পায় বিচার-বিশ্লেষণ। ঈশ্বরচন্দ্রের সার্ধশতজন্মবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে তেমনি এক জোয়ার আসে বিদ্যাসাগরচর্চায়। এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থগুলির মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত জনাব আজহারউদ্দীন খান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ' (১৯৭৪) এবং বাংলাদেশে প্রকাশিত ও কলকাতা থেকে পুনর্মুদ্রিত গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত 'বিদ্যাসাগর' (১৯৭১)। অন্যান্য প্রকাশনার মধ্যে যোগেশচন্দ্র বাগলের 'বিদ্যাসাগর-পরিচয়' (১৯৫৯) থেকে সন্তোষ অধিকারীর 'বিদ্যাসাগর' (১৯৭০), সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকারের 'বাঙালী জীবনে বিদ্যাসাগর' (১৯৭৬), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর' (দ্বি মু ১৯৯১), গোপাল হালদারের 'প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর' (১৯৯১) প্রভৃতি বই—বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগে নবীনতা না থাকলেও—ঈশ্বরচন্দ্রের আদর্শ ও কর্মের নানা দিকের ওপর আলোকপাত করে। শুধু বই-ই নয়, সাময়িকপত্রেও প্রকাশিত হয় বিশেষ সংখ্যা। 'গাঙ্গেয়পত্র'র স্মারক সংকলন (১৯৭৪) বা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় সুরেশপ্রসাদ নিয়োগীর "প্রকাশক বিদ্যাসাগর" বা "সংস্কৃত কলেজ ও বিদ্যাসাগর" বা রাধারমণ মিত্রের পুস্তিকা 'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর' এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নতুন গবেষণার পাশে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিহারীলাল সরকারের প্রাথমিক জীবনীগুলি পুনর্মুদ্রণেরও আয়োজন হয়েছে গত দুই দশকে। রমাকান্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত বিদ্যাসাগর কলেজের 'শতবর্ষ স্মরণিকা'ও (১৯৭৩) ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনতথ্যের সম্পূরণ করে বিশদভাবে।

তবে এ-পর্বের সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা, ব্যক্তি ও সমাজ, প্রথা ও সংস্কারের আপেক্ষিক স্থানাঙ্ক বিষয়ে বিচার-বিতর্ক। মধ্য-৬০ দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ প্রচলিত সামাজিক মূল্যবিশ্বাস, বণ্টনব্যবস্থা ও উত্তরাধিকারের সমস্যা প্রসঙ্গে অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে থাকে। আজ শতাব্দীর প্রায় এক পাদ পর থেকে দেখলে সে-পুনর্বিচারে কেউ প্রাতিশয্য লক্ষ করতেই পারেন। এ-কথা ঠিকই যে প্রতিবাদের উত্তেজনায় তাদের কর্মে ও তর্কে শৃঙ্খলার

অভাব ঘটেছিল ; অভাব ছিল তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো প্রাজ্ঞ অভিভাবকের। এই ছত্রভঙ্গ অবস্থার সুযোগ নিয়েছিল রাজনৈতিক মুনাফাশিকারীরা। কিন্তু ছাত্রসমাজের উৎকণ্ঠাকে লঘু করলে, তাদের প্রশ্নের গভীরে আর্ত আত্মজিজ্ঞাসাকে উপেক্ষা করলে ইতিহাসের সত্যকে অস্বীকার করা হবে।

ঈশ্বরচন্দ্রকে বাদী করে প্রশ্নগুলি তুলেছিলেন অতিবাম মতাবলম্বী 'দেশব্রতী' পত্রিকা। তাঁরা তথ্যগত ও তাত্ত্বিক সমর্থন পেয়েছিলেন বিনয় ঘোষের ও বাংলাদেশের জনাব বদরুদ্দিন উমরের (তাঁর 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ' ঢাকা, ১৯৭৪, পশ্চিমবঙ্গেও পুনঃপ্রচারিত হয়েছিল) রচনা থেকে। একদিকে এর মধ্যে ধরা পড়ে আমাদের অস্থির অন্ধ ও উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের প্রতিবাদ। অন্যদিকে একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, এর বীজ উপ্ত ছিল ৫০ দশকের পশ্চিমবঙ্গে মার্ক্সীয় চিন্তাধারার যান্ত্রিক প্রয়োগের মধ্যেই। এক অস্পষ্ট ধারণা থেকেই মামফোর্ড আর ম্যাকলুহান একই নিশ্বাসে প্রয়োগ করেন তাঁরা দায়ভাগ-দীর্ণ ঔপনিবেশিক বাংলায়! ব্যক্তি সময় ও সমাজের তিনটি বাহুকে তাঁরা তাই জ্যামিতিক ত্রিভুজে স্থাপন করতে পারেননি। সময়-সমাজই যদি চূড়ান্ত নিয়ামক হয়, তাহলে ব্যক্তি তার সাক্ষী হতে পারে, শিক্ষক নয় কিছুতেই। সে ক্ষেত্রে সমালোচ্য হতে পারে একমাত্র সময়বিদ্ধ সমাজ ; ব্যক্তি গৌণ, করুণার পাত্র হতে পারে মাত্র। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রকে করুণা করা যায় না। যে-মানুষ নিত্যকর্মে তাঁর মর্ত্যসীমা চূর্ণ করে চলেছেন, তাঁর আর ঈশ্বরচন্দ্র যাঁদের বলেছেন 'টিকিদাস ভট্টাচার্য' তাঁদের বিচার এক সময়-সমাজ নিক্তিতে করা যায় না। করলে যে-বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় চিন্তায়, তাই হয়েছিল ৭০ দশকের পশ্চিমবঙ্গে।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্ববিরোধের বিচিত্র নজির তাঁদের কাছে : ঘরের দেওয়ালে ইংরেজ শাসকদের ছবি টাঙানো, সি আই ই খেতাব গ্রহণের লোভ, সামাজিক মর্যাদালাভের সূক্ষ্ম বাসনা, রেজিস্ট্রেশন বিবাহপদ্ধতির বিরুদ্ধতা, ধর্মাচার বিষয়ে দাসসুলভ মনোভাব, শিক্ষিকাশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনে অনাগ্রহ, জনশিক্ষার তুলনায় উচ্চশিক্ষা সমর্থন, সংস্কার হিন্দুসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ, কৃষক-সম্প্রদায়ের ওপর উৎপীড়ন বিষয়ে নীরবতা। এই অভিযোগগুলোর সূত্র সবই তাঁর সমকালীন প্রতিপক্ষদের সমালোচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই অনুযোগপরায়ণদের সামাজিক অবস্থান কোনদিকে, সে-বিচার করার মতো স্থৈর্যের অভাব ঘটেছিল এই গবেষকদের রচনায়। এঁরা বোধহয় বুঝতে পারেননি যে, বিধবাবিবাহের মতো একটি আন্দোলন, যা কোনভাবেই কায়েমি স্বার্থকে বিপন্ন করে না, তাই যদি সমাজে এমন বাধা পায়, তা হলে স্বযাচিত চক্রব্যূহে প্রবেশের মধ্যে শহিদ হওয়ার গৌরব থাকতে পারে, ব্রতযাপনের পূর্ণতা আসে না। তাই আমরা পেলাম এমন সিদ্ধান্ত : "বিদ্যাসাগর তাঁর সমসাময়িক আরও অনেক শীর্ষোন্নত ব্যক্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সামাজিক সারিতে। সেই সারি থেকে এক পাও তিনি নিচে নামেননি অবশ্য এক-আধ ইঞ্চির বেশি উপরেও ওঠেননি।" (বিনয় ঘোষ, "বিদ্যাসাগর একজন মানুষ যিনি বাবুবাঙালী নন", 'গাঙ্গেয়পত্র', ১৯৭৮, পৃ ১৪।) অথবা, "বিদ্যাসাগরের সংস্কারান্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় যতটা পুঁজিবাদী সভ্যতার প্রশ্রয়ে বিকাশোন্মুখ বাঙালীসমাজের প্রধান সামগ্রিক প্রবণতাগুলিকে রূপ দিচ্ছিল ততটুকুই তিনি সাফল্যে ভাস্বর, যতটুকু তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার ফলাফল, সামাজিক সম্পর্কের দোলাচলে যার সমর্থন ছিল না, ততটুকু তিনি ব্যর্থ—ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতা।" (আলী আনোয়ার, "বিদ্যাসাগর ও ব্যক্তির

সীমানা", 'বিদ্যাসাগর', গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত, ১৯৭১, পৃ ৩৫।) অর্থাৎ সফল হলে সমাজের সায়, ব্যর্থ হলে ব্যক্তির দায়! আর যদি ঈশ্বরচন্দ্র আরও অনেকের সঙ্গে এক সারিতেই ছিলেন, তা হলে তাঁর বিষয়ে ৬০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থরচনার প্রয়োজন কী ছিল? অন্য আর কারও সম্বন্ধে এতটা শ্রমস্বীকারের আবশ্যকতা বোধ করলেন না কেন লেখক?

এই ভ্রষ্টচিন্তা উত্তেজনার মধ্যে থেকেও বিচারের সমতা রক্ষা করতে পেরেছেন গোপাল হালদার ('বিদ্যাসাগর : এ রি-অ্যাসেসমেন্ট', নতুন দিল্লি, ১৯৭২), অমলেশ ত্রিপাঠী ('বিদ্যাসাগর : দ্য ট্র্যাডিশনাল মডার্নাইজার', ১৯৭৪) ও অশোক সেন ('ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যান্ড হিজ এলুসিভ্ মাইলস্টোনস্', ১৯৭৭)। এবং আশ্চর্যের, এঁদের তিনজনই আলোচনা করেছেন ইংরেজিতে!

শ্রীহালদার কোনও বিতর্কের মধ্যে যাননি। তবে তাঁর বইয়ের নাম থেকেই বোঝা যায়, তখনকার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন ঘটেছে। আর্থ-সামাজিক বিবেচনা তিনিও করেছেন, তবে ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মূল্য দিতে কার্পণ্য করেননি। আর এই সংঘাতে ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এক ট্র্যাজিক নায়ক হিসেবে।

শেষ জীবনে বিদ্যাসাগর বলতেন, "এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এ দেশের ভাল হয়।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর', ১৯৭০, পৃ ৪৪৬।) কিন্তু সে-বিপ্লবসাধনের মতো সময় ও সমাজ-পট প্রস্তুত ছিল না উনবিংশ শতাব্দীতে। তাই পরম্পরাগত প্রথাবদ্ধতার মধ্যে থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রকে আধুনিকতামুখী সংস্কার করতে হয়েছে। অমলেশ ত্রিপাঠীর এই সঙ্গত বক্তব্যও কিন্তু অনেকটাই ভুলভাবে গৃহীত হয়েছে সম্ভবত জরুরি অবস্থায় বইটির উৎসর্গের ('বিদ্যাসাগরের আধুনিক-কৃত ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠা দুহিতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধিকে') প্রতি বাঙালির বিরূপতাবশত। সমকালীন বিতর্কের উত্তাপ তিনি এড়িয়ে যাননি। তবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যে সরল বিভাজন বা ঐতিহ্যের আধুনিকতায় রূপান্তরের যে সহজ সমাধান করেছেন শ্রীত্রিপাঠী, একালের পাঠকের পক্ষে তার সঙ্গে সহমত হওয়া কঠিন।

তথ্য-নির্বাচন ও পর্যালোচনা, যুগকাল বিচার আর সর্বোপরি ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ অনুধাবনে শ্রেষ্ঠ বই অশোক সেনের। তাঁর আলোচনা পদ্ধতিও প্রধানত সমাজমুখী, কিন্তু যান্ত্রিক তত্ত্ব আরোপের চেষ্টা নেই তাঁর বিচারে। সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং এক বিকল্প শ্রেণী-নায়কত্ব গড়ে তোলবার জন্যে কর্মপন্থা নির্ধারণের চেষ্টায় ঈশ্বরচন্দ্রকে এক দুর্লভ উদাহরণ হিসেবে মনে করেছেন শ্রীসেন। অন্যদিকে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখেছেন এক বিভ্রমের শিকার হিসেবে, যাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যেও আধুনিকতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে-স্বপ্ন ক্রমেই মরীচিকার মতো দূরে সরে গেছে ঠিকই। কিন্তু সেই স্বপ্ন-বাস্তব রূপায়ণে তাঁদের প্রয়াস তাতে মিথ্যা হয়ে যায়নি। এই বিচার থেকে ত্রিপাঠীর দেওয়া তুলনায় ফিরে যেতে পারি আমরা। ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে নিঃসঙ্গ প্রমিথিউসের উপমা খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। মানুষের নিয়তি অজানিত নয়, তবুও তাকে স্বকর্ম করে যেতে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তারই দৃষ্টান্ত। সুখের সময় পূজার ছলে আমরা তাঁকে ভুলে থাকতে পারি। ক্রান্তিতে, সংকটে তিনিই নিত্যস্মরণ।

সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগর

স্বপন বসু

আঠারো শো উনত্রিশের ডিসেম্বর মাসে সরকার আইন করে সতীপ্রথা বন্ধ করে দিলেন। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি হিন্দুসমাজে সৃষ্টি হল প্রচণ্ড এক আলোড়ন। হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে এ ধরনের হস্তক্ষেপ যে অন্যায়—একদল মানুষ তা জোর গলায় বলতে লাগলেন। এইসব মানুষদের উদ্যোগেই 'হিন্দুশাস্ত্রবিহিত ধর্মকর্ম' বজায় রাখার জন্য ১৮৩০-এর জানুয়ারি মাসে স্থাপিত হল 'ধর্মসভা'।

এই 'ধর্মসভা'র অধিবেশন বসত কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। কেমন করে হিন্দুধর্ম রক্ষা করা যায় তা নিয়ে জোর আলোচনা চলত। আলোচনায় রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অংশ নিতেন সংস্কৃত কলেজের কোনো-কোনো অধ্যাপক। সতীপ্রথা আবার চালু করার জন্য 'ধর্মসভা'র পক্ষ থেকে বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করা হল। এই আবেদনপত্রে যাঁরা সই করেছিলেন. তাঁদের মধ্যে ছিলেন সংস্কৃত কলেজের একাধিক অধ্যাপক—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি। এইসব অধ্যাপকরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের কাছে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতেন কিনা জানি না। করে থাকলেও, তা অন্তত বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মনকে স্পর্শ করতে পারেনি।

পারেনি বলেই, পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র সমাজকে নাড়া দিতে পেরেছিলেন। নাড়া দেবার শক্তি একটু একটু করে তিনি সঞ্চয় করতে শুরু করেছিলেন তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই। বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের সূচনায় ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রশিষ্যদের কার্যকলাপে বাংলার সমাজজীবন রীতিমতো অস্থির। ডিরোজিওর শিষ্যরা বাঙালি হিন্দুসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন, দাবি জানালেন বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথা বন্ধ করার, বিধবাবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা চালু করার। পত্রপত্রিকায় এসব নিয়ে লেখালেখি শুরু হল, বিষয়গুলি আলোচিত হতে লাগল বিভিন্ন বিদ্বৎসভায়। এই ধরনের দু'চারটি বিদ্বৎসভার সঙ্গে ছাত্রজীবন থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র যুক্ত ছিলেন। ১৮৩৮-এ ডিরোজিও শিষ্যদের আগ্রহে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' স্থাপিত হয়। এই সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। এই সভায় যাতায়াতের সূত্রেই তিনি চন্দ্রশেখর দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী—ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর এইসব তরুণদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৩৯-এর জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র একটি অধিবেশনে মহেশচন্দ্র দেব হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটিতে বাঙালিসমাজে হিন্দু বিধবাদের দুরবস্থার এক করুণ ছবি তুলে ধরা হয়। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র এই অধিবেশনে তরুণ ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চয় উপস্থিত ছিলেন। শুধু 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সঙ্গেই নয়, নতুন গড়ে ওঠা

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের যোগ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। ঈষৎ পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত 'সর্বশুভকরী সভা' বা 'বেথুন সোসাইটি'র সঙ্গেও তিনি ছিলেন যুক্ত।

একদিকে যখন বিভিন্ন সভাসমিতিতে সামাজিক কুপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা চলছে, অন্যদিকে তখন সাময়িক পত্রগুলি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। ১৮৪২-এর এপ্রিল মাসে নব্যবঙ্গের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' 'বিধবার পুনর্বিবাহ' নামক একটি পত্রপ্রবন্ধে প্রশ্ন তোল হয়, 'পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহকরণে সক্ষমা না হয় ?' ঐ একই সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'বিদ্যাদর্শনে' বহুবিবাহের বিরুদ্ধে একের পর এক লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। এইসব লেখা পাঠ করে 'বিদ্যাদর্শনের' জনৈক পাঠক সম্পাদককে জানান 'বহুবিবাহের ঘৃণিত প্রথার উচ্ছেদ বিষয়ে মহাশয় যে সকল যুক্তিবিধান করিয়াছেন তাহার প্রত্যেক ছত্র পাঠ করিয়া আমার অন্তঃকরণে ঘৃণা, দয়া, লজ্জা, ক্ষোভ, প্রভৃতি নানা ভাবের আন্দোলন হইয়াছিল।' এইসব লেখালেখি ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চয়ই মনোযোগসহকারে লক্ষ করেছিলেন এবং ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য।

সেই প্রবেশের প্রথম প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করলাম ১৮৫০-এ। এই বছর 'সর্বশুভকরী সভা'র মুখপত্র হিসাবে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক জানালেন, আমাদের সমাজে কৌলীন্য ব্যবস্থা, বিধবাবিবাহ প্রতিষেধ, অল্পবয়সে বিবাহ প্রভৃতি যেসব 'অতিবিষম অশেষদোষাকর কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে তৎসমুদায় নিরাকৃত হইলে এতদ্দেশের অনেক দুরবস্থামোচন ও মঙ্গললাভ হইতে পারে।' এই উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়েই পত্রিকাটি প্রথম সংখ্যায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। প্রবন্ধটির লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর নিজে বাল্যবিবাহ করেছিলেন। শুধু বিদ্যাসাগর কেন, উনিশ শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেই যে বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছিলেন তা নিচের তালিকাটি দেখলে বোঝা যাবে—

	বিবাহের সময় বয়স	স্ত্রীর ব
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪	৬
কেশবচন্দ্র সেন	১৮	৯
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১	৫
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯	৮
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	১৬	১১
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭	৭
নবীনচন্দ্র সেন	১৯	১০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৪	৮
অমৃতলাল বসু	১৫	৯

বাল্যবিবাহ সমাজে চালু থাকলেও, এ প্রথা যে সমর্থনযোগ্য নয় তা উনিশ শতকের প্রথম থেকেই শিক্ষিত বাঙালিরা অনুভব করতে থাকেন। বিদ্যাসাগর এ প্রথার কুফল সম্পর্কে কলম ধরার আগেই বিষয়টি নিয়ে সভাসমিতিতে আলোচনা ও পত্রপত্রিকায়

লেখালেখি শুরু হয়। এক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। মাত্র ১৫ বছর বয়সে দুর্গামণিকে বিয়ে করার পর সারাজীবন বাল্যবিবাহের কুফল তিনি অনুভব করেন। আর সেই কারণেই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এক প্রধান ভূমিকায় তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখি। ১৮৪৭-এর জুলাই মাস থেকে 'সংবাদ প্রভাকরে' 'অল্পবয়সে বিবাহের ফল' নামে একটি লেখা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। ১৮৪৯-এ কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু ইন্টেলিজেনসারে' ধারাবাহিকভাবে বেরোয় 'আর্লি ম্যারেজ—দি সোর্স অব ম্যাচ ঈভিল ইন ইন্ডিয়া'। বিদ্যাসাগরের লেখাটি প্রকাশিত হবার সমকালেই ১৮৫০-এর মে মাস থেকে 'সংবাদ প্রভাকরে' 'বালককালে বিবাহের বিষয়' নামে একটি লেখা ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছিল। অর্থাৎ বাল্যবিবাহ ব্যাপারটি যে নিন্দনীয় তা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালিসমাজ উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল। তবু বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের লেখাটি দুটি কারণে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এটি তাঁর সমাজসংস্কার মূলক প্রথম লেখা—সেই দিক থেকে এটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়ত, পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বারবার শাস্ত্রের দোহাই দিলেও, বাল্যবিবাহ যে 'অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম' তা প্রমাণ করতে বিদ্যাসাগরকে কোনো শাস্ত্রের মুখ চাইতে হয়নি। সহজ বুদ্ধি ও নিজস্ব যুক্তির সাহায্যেই তিনি কাজটি করেন।

বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আরো লেখালেখি করার ইচ্ছা বিদ্যাসাগরের ছিল। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে 'সর্বশুভকরী'তে প্রকাশিত লেখাটি তাঁর নিজের মতেই 'কেবল উপক্রম মাত্র। এতদ্বিষয়ক হেতু, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আমাদিগের মনে মনে অনেক পরিশিষ্ট রহিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে ক্রটি করিব না।' একথা লেখার পর বিদ্যাসাগর আরো ৪১ বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু বাল্যবিবাহ বিষয়ে আর কোনো কথা লেখার তাগিদ তিনি অনুভব করলেন না।

না করার কারণটি স্পষ্ট। বাল্যবিবাহের দোষ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের লেখাটি সমাজে একটুও আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। এইকালে রক্ষণশীল অনেক ব্যক্তিও (যেমন কাশীপ্রসাদ ঘোষ) বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে এ নিয়ে কোনো বাদ-প্রতিবাদও হয়নি। বিষয়টি সম্পর্কে বাঙালিসমাজের এই নিস্পৃহতা বিদ্যাসাগরকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। আর তাই বিষয়টি নিয়ে আর এগোনোর কোনো প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন না।

বিদ্যাসাগর না করলেও, এই কালের সচেতন মানুষেরা বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেননি, পত্র-পত্রিকাগুলিতেও এ-প্রথার কুফল সম্পর্কে আলোচনাধারা অব্যাহত থাকে। ১৮৫২ সালের 'সংবাদ প্রভাকরে' ও ১৮৫৪-র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' বাল্যবিবাহের বিষময় ফল আলোচিত হয়। ১৮৫৯-এ শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় 'বাল্যবিবাহ' নামে একটি নাটক লেখেন, ১৮৬০-এ প্রকাশিত হয় শ্যামাচরণ শ্রীমাণির 'বাল্যোদ্বাহ নাটক'। ১৮৬৩-তে কৈলাসবাসিনী দেবী বাল্যবিবাহ যে, সমস্ত অনিষ্টের মূল তা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন। সত্তরের দশকে বাঙালি হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ বিরোধী মনোভাব বেশ দানা বেঁধে ওঠে। এইকালে ঢাকায় 'বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা' স্থাপিত হয়। ঢাকা কলেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় হন এর সভাপতি। এই সভার ছাত্রসভ্যরা ১৮ বছরের আগে কেউ বিয়ে করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। এই সভার মুখপত্র হিসাব ১৮৭৩-এ প্রকাশিত হয় 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ'।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এই পত্রিকাটি দু বছর টিকে ছিল। বিদ্যাসাগর অবশ্য এ সময় এ বিষয়ে বাড়তি কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেননি বা এইসব প্রয়াসকে অভিনন্দন জানানোর প্রয়োজনও অনুভব করেননি। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বইও এ সময় লেখা হচ্ছিল। ১৮৭০-এ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বাল্যবিবাহের কুফল দেখিয়ে লেখেন 'বাল্যবিবাহ'। রামচন্দ্র দত্তের 'বাল্যবিবাহ নাটক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৪-এ। এই সময়ই 'ভারত সংস্কারক' ও 'মিত্র প্রকাশ' বাল্যবিবাহের কুফল বর্ণনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ২-৭-১৮৭৫-এ 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকায় ভুবনেশ্বর মিত্র 'হিন্দুবিবাহ সমালোচন'-এ বাল্যবিবাহের তীব্র নিন্দা করেন। অথচ যে মানুষটি বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন, যিনি নিজের মেয়েদের বাল্যবিবাহ দেননি—তিনি এই কালে গ্রহণ করলেন নিছক দর্শকের ভূমিকা!

গ্রহণ করার কারণ বোধ হয় 'জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম' সম্পর্কে অতিমাত্রায় আগ্রহ। এই আগ্রহের জন্য তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন, কিন্তু পেছিয়ে আসেননি। এই পথে যাত্রা তিনি শুরু করেছিলেন ১৮৫৩-র শেষদিকে। কিন্তু বিধবাবিবাহের সমর্থনে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রেরণা বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন কোথা থেকে? তাঁর জীবনীকাররা এ বিষয়ে নানা কথা বলেছেন। সে সব কথার সত্যাসত্য নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়। আমরা মনে করি, বিধবাবিবাহ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন সমকালীন সমাজজীবন থেকে। সতীপ্রথা নিবারিত হবার পর থেকেই বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি বাঙালি সমাজে গুরুত্বসহকারে আলোচিত হতে শুরু করে। ব্রহ্মচর্যে সারাজীবন কাটানো যে সাধারণ মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়—এটা সেকালে অনেকেই অনুভব করেছিলেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য খোলাখুলি বলেন, 'বিধবাদিগের শরীর কি শরীর নয়। তাহারা কি মহাবল ইন্দ্রিয়দলকে হাত বুলাইয়া শান্ত রাখিবে?'

শান্ত রাখা সম্ভব নয়, তা উপলব্ধি করেই উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে বিধবাবিবাহের পক্ষে নানা কথা উঠতে থাকে। ১৮৩৭-এ কলকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উৎসাহ দেবার জন্য এক সভা-আহ্বানের কথা চিন্তা করেন। বিষয়টি নিয়ে হিন্দুরা যে চিন্তাভাবনা করছে ৭-১২-১৮৩৭-এ 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' তা স্বীকার করে। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে বিধবাবিবাহের বিষয়টি বিভিন্ন সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকায় আলোচিত হতে থাকে। ২৮-৪-১৮৪৯-এ 'সম্বাদ ভাস্কর' জানায় হিন্দু বিধবাদের বিবাহ নিয়ে যুবক হিন্দুদের মধ্যে নানারকম আলোচনা চলছে, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুরা এ বিষয়ে কঠোর। ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস করতেন—বিধবার বিয়ে প্রচলিত হবেই। তাই তিনি প্রাচীন হিন্দুদের কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন, 'প্রাচীন হিন্দু মহাশয়েরা এই সময়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে নিয়মবদ্ধ করিয়া যদি বিধবাদিগের বিবাহ প্রচলিত করেন তবে তাঁহারদিগের বংশাবলীকে উত্তরকালীন আপদ হইতে মুক্ত রাখিয়া যাইবেন।'

প্রাচীন হিন্দুরা এ আহ্বানে সাড়া না দিলেও, এ কাজ করতে এগিয়ে এলেন ঈশ্বরচন্দ্র। এই কালে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত, বিধবা বিয়ে অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। ঈশ্বরচন্দ্র তাই শাস্ত্র দিয়ে শাস্ত্রের মুখ বন্ধ করতে চাইলেন। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত রামমোহন থেকে। বিদ্যাসাগরও এখন থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে সেই পথ অনুসরণ করলেন।

বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহের সমর্থনে শাস্ত্রবচন সংগ্রহে ব্যস্ত, বাংলার নব্যযুবকরা তখন বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনায় মত্ত। ১৮৫৩-র গোড়ার দিকে বিধবাবিবাহের

সমর্থনে কলকাতায় খানতিনেক সভা হয়। এর প্রথমটিতে ৮০ জনের ও দ্বিতীয়টিতে ১০০ জনের মতো লোক হয়েছিল। শেষটিতে এত লোক হয়েছিল যে, সকলের বসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। সমবেত সকলে বিধবাদের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করে বিধবাবিবাহের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানান। এর অল্পদিন পরে ২৯ অক্টোবর, ১৮৫৩-এ, রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিধবাবিবাহকে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় (অবশ্য এই সভায় যাঁরা বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরাই আবার এর বিরোধিতা করেন)। বিধবাবিবাহের সমর্থনে শুধু বাক্যব্যয় না করে শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের দু-একজন বিধবা বিয়ে করতে এগিয়ে এলেন। এই রকম এক যুবক ১৮৫৪-য় 'বেঙ্গল হরকরা'য় চিঠি লিখে জানান, বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি বাংলার শিক্ষিত সমাজে প্রায় ৩০ বছর ধরে আলোচিত হচ্ছে। এ নিয়ে কাগজে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে, কয়েকটি পুস্তিকাও বেরিয়েছে, বিভিন্ন সভায় বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছু হয়নি। দেশবাসীর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ভয়ে এ কাজে কেউ এগিয়ে আসেনি। সেই কারণে দেশবাসীর ব্যঙ্গবিদ্রূপের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তিনি স্বজাতির (কায়স্থ) একজন বিধবাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হরকরা সম্পাদক যুবকটির মনোভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই সময়েই শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল বিধবাবিবাহ সম্পর্কে পণ্ডিতদের এক সভা আহ্বানে উদ্যোগী হন।

একদিকে যখন এত উদ্যোগ আয়োজন, অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র তখন খুঁজে পেয়েছেন বিধবাবিবাহের সমর্থনে পরাশর সংহিতার সেই বিখ্যাত বচন। এরই সাহায্যে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রীয় কর্ম তা প্রমাণ করে ১৮৫৫-র জানুয়ারি মাসে প্রকাশ করলেন 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।'

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি হিন্দুসমাজ হয়ে উঠল চঞ্চল, আলোড়িত। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বিদ্যাসাগরকে ১৫ হাজার কপি বই ছাপতে হল। বিদ্যাসাগরের বক্তব্য যে ঠিক নয়, তা দেখিয়ে প্রকাশিত হতে লাগল একের পর এক পুস্তিকা। এইসব পুস্তিকার বক্তব্যের উত্তর দেবার জন্য ১৮৫৫-র অক্টোবরে বিদ্যাসাগর লিখলেন, 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় সম্বাদ'।

বইপত্র লেখার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন, বিধবাবিবাহ চালু করতে গেলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় আইনের জোরে সতীপ্রথা নিবারণের কথা নিশ্চয়ই তাঁর মনে ছিল। তাই বিধবাবিবাহ আন্দোলনে একদিকে তিনি শাস্ত্রসন্ধানী, অন্যদিকে বিধবাবিবাহ আইন পাসের জন্য একটি আবেদনপত্র রচনা করে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে অবতীর্ণ। ৯৮৭জনের স্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদনপত্র ৪ অক্টোবর ১৮৫৫-য় তিনি ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠান। বিদ্যাসাগরের আবেদনটি জমা পড়ার পরই প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একের পর এক আবেদন প্রেরিত হতে থাকে। বিধবাবিবাহের বিরোধীরা চুপচাপ বসে রইলেন না। প্রস্তাবিত আইনটি পাস না করার জন্য তাঁরা সরকারের কাছে প্রার্থনা জানালেন। বিধবাবিবাহ আইনের বিরোধীদের সংখ্যা সমর্থকদের চেয়ে অনেক বেশি হলেও, ওপর মহলে নিজের ও সমর্থকদের প্রভাব প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে বিদ্যাসাগর কাজের কাজটি করলেন। ২৬ জুলাই ১৮৫৬-য় বিধবাবিবাহ আইন পাস হল, কয়েক মাসের মধ্যে ধুমধাম করে শহর কলকাতার বুকে বিধবার বিয়েও হল।

আইন পাস হল, বিধবার বিয়েও হল, কিন্তু বাঙালিসমাজে তা তেমনভাবে গৃহীত হল না। লক্ষ লক্ষ বিধবার মধ্যে গোটা উনিশ শতকে সামান্য কয়েকটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল (১৮৫৬-১৯১১ এই কালপর্বে অনুষ্ঠিত বিধবাবিবাহের সংখ্যা ৫০০-র মতো)। উনিশ শতকে যত বিধবাবিবাহ হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি না হলেও, প্রায় সমসংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা এই আন্দোলনের পক্ষে বিপক্ষে রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ যদিও বিদ্যাসাগরের আবেদন ছিল একান্তভাবে মানবিক, কিন্তু তাঁর আন্দোলনের সাফল্য মূলত আইন প্রণয়নেই সীমাবদ্ধ।

বিধবাবিবাহ চালু করার জন্য আইন চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু তা পেয়েও, সমাজের সর্বস্তরে বিধবাবিবাহ চালু করতে পারলেন না কেন? আসলে আইন করে সর্বক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন আনা যায় কিনা, এবং সমাজমন তাকে স্বীকার করে নেয় কিনা—এ এক জটিল প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখি, উনিশ শতকে বাঙালি সমাজজীবনে যে প্রথাগুলি অমানবিক (যেমন সতী) সেইসব প্রথারোধে প্রণীত সরকারি শাস্তিমূলক আইনকে জনগণ মেনে নিয়েছে। কিন্তু যেখানে প্রশ্নটি মূলত সংস্কারগত, সেখানে সম্মতিমূলক আইন প্রণয়ন করেও ব্যাপক কোনো পরিবর্তন আনা যায়নি, সমাজমনও তাকে স্বীকার করে নেয়নি। বিধবাবিবাহ আইনের ব্যর্থতাই তার প্রমাণ।

বিধবাবিবাহ আইন দীর্ঘদিনের সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করতে পারেনি। দু-চারজন ছাড়া অধিকাংশই বিয়ে করত অর্থলোভে বা রমণীভোগের প্রলোভনে। বিধবাবিবাহের যাবতীয় ব্যয় বিদ্যাসাগরকেই বহন করতে হত। প্রথম বিধবাবিবাহ উপলক্ষে তাঁকে হাজার দশেক টাকা খরচ করতে হয়েছিল। ১৮৬৭ সালের মধ্যে ৬০টি বিধবাবিবাহের জন্য বিদ্যাসাগরকে ৮২ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগর জীবনীকার চণ্ডীচরণ জানিয়েছেন, 'শতাধিক বিধবাবিবাহ তিনি নিজ ব্যয় সম্পন্ন' করেছিলেন। অর্থলোভে তাঁকে প্রবঞ্চনা করে বিধবাবিবাহের সুযোগ নিয়ে অনেকে বহুবিবাহ করত। এই বজ্জাতি বন্ধ করার জন্য তিনি শেষপর্যন্ত বিধবাবিবাহকারী পাত্রকে দিয়ে একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নিতেন। বিধবা কন্যার বিবাহ দিলে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে কিছু গয়নাগাঁটি আদায় করা যাবে—এই লোভেও অনেকে বিধবা মেয়ের পুনর্বিবাহে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এরকম গয়নাগাঁটি দেওয়া যে তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়, সেকথা তিনি তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রকে এক চিঠিতে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে লেখেন, '....অনেকের এরূপ সংস্কার আছে কলিকাতায় যে কন্যার বিবাহ হয় সে অনেক স্বর্ণ অলঙ্কার পায়.... অতঃপর যে সকল বিধবা কন্যার বিবাহ হইবেক তাহাতে আমি কিছুই খরচ করিব না।'

বিধবাবিবাহ আইন পাস হবার পর, বছর পনেরো বিধবাবিবাহের ধারা অব্যাহত থাকে। উনিশ শতকের ষাটের দশকে সংবাদপত্রগুলি মহা উৎসাহে বিধবাবিবাহের খবর ছাপত, পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত বিধবাবিবাহে ইচ্ছুক পাত্রপাত্রীর খবরাখবর বেরোত। এ ব্যাপারে 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ছিল বিশেষ আগ্রহী। ষাটের দশকে প্রকাশিত বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত এরকম একটি বিজ্ঞাপন নমুনাস্বরূপ দেখা যেতে পারে—

'জনৈক অতি সদ্বংশজাত মান্যগণ্য অতি প্রসিদ্ধ উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ, স্বশ্রেণীস্থ কোন বিধবাযুবতীর পাণিগ্রহণে প্রস্তুত আছেন। যুবতী বাহ্যসৌন্দর্যের সহিত বিদ্যাভূষণে বিভূষিত থাকিলে আর কোন আপত্তিই নাই। বিধবার কর্তৃপক্ষ কিম্বা বন্ধুবর্গ এ বিষয়ের সম্বাদ অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদককে জানাইবেন।'

কিন্তু সত্তরের দশক থেকে বিধবাবিবাহের স্রোতে ভাটার টান দেখা যায়। এই কালেই হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন মাথাচাড়া দেয়। সনাতন ধর্মের পবিত্রতা রক্ষায় আগ্রহী ব্যক্তিরা বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে নবোদ্যমে প্রচার অভিযান শুরু করেন। পত্র-পত্রিকায় নতুন করে বিধবাবিবাহের বিরোধী লেখা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। বিধবাবিবাহকারী ও এ ব্যাপারে উৎসাহদাতাদের ওপর সামাজিক নির্যাতন বেড়ে চলে। বরিশালে দুর্গামোহন দাস দুটি বিধবাবিবাহ দেওয়ায় তাঁর মক্কেলরা তাঁকে ত্যাগ করেন। রাস্তায় বেরোলে তাঁকে নিয়ে ছড়া কাটা ও গায়ে প্রায়ই ধুলোবালি ছোঁড়া হত। দুর্গামোহনের নাম উচ্চারণ করে 'হিন্দু ভদ্রলোকেরা' থুথু ফেলতেন। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক নিকট আত্মীয়ার বিধবাবিবাহ দিবার পর মেয়েটিকে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন ও অপমান সহ্য করতে হয়। নব্য হিন্দুয়ানির প্রভাবে বিধবাবিবাহের সংস্পর্শজনিত দোষ কাটানোর জন্য কেউ কেউ প্রায়শ্চিত্ত করতে শুরু করে। এমনকি প্রথম বিধবাবিবাহকারী শ্রীশচন্দ্র কালীমতীর মৃত্যুর পর পণ্ডিতদের ব্যবস্থানুযায়ী কয়েকটি 'আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম' করে জাতে ওঠেন। এসব দেখেশুনে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মোহভঙ্গ ঘটে। জীবনসায়াহ্নে জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্মের এই পরিণতি দেখে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্ষেপ করে তিনি লেখেন, 'আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।'

বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি নিয়ে বাংলার সমাজজীবন যখন উত্তাল, ঠিক সেই সময়ে ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫-য় বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ আইনের সাহায্যে বন্ধ করার জন্য ভারত সরকারের কাছে এক আবেদনপত্র পাঠান। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে প্রেরিত এই আবেদনটির গুরুত্ব স্বীকার করেও আমরা মনে রাখব, বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে উনিশ শতকের প্রায় সূচনা থেকেই বাঙালিসমাজ রীতিমতো সজাগ। তিরিশের দশকেই বিষয়টি নিয়ে 'সমাচার দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র বাদানুবাদ শুরু হয়। 'সম্বাদ কৌমুদী'ও এ-বিষয়ে লেখালেখি করে। 'এনকোয়েরার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ'—ইয়ং বেঙ্গলের এই দুটি মুখপত্রে কৌলীন্যপ্রথার কুফল নিয়ে রীতিমতো আলোচনা চলতে থাকে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মর' বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা নেয়। ১৮৩৩-এই শাস্ত্রবিরোধী, অমানবিক এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য 'রিফর্মর' সম্পাদক প্রসন্নকুমার আইন প্রণয়নের দাবি জানান। তিরিশের দশকেই সম্ভ্রান্ত কিছু দেশীয় ব্যক্তি এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁদের ইচ্ছা শেষপর্যন্ত কার্যে পরিণত হয়নি।

হয়নি বলেই, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে প্রথম আবেদন করার গৌরব লাভ করেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। ১৮৫৫-র গোড়ার দিকে তাঁর উদ্যোগে 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র পক্ষ থেকে বহুবিবাহ আইন করে বন্ধ করার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদনপত্র পাঠানো হয়। এটি পাঠানো হলে ব্রাহ্মণদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যায়। এই সমাজের প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি এই প্রথায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানোর উদ্দেশ্যে কুলীনদের এক সভা আহ্বানের ইচ্ছা নিয়ে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে দুটি প্রারম্ভিক বৈঠকে মিলিত হন। এরই ফলে 'বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য, তাহা রহিত হইলে হিন্দুদিগের ধর্মলোপ হইবেক, অতএব এ-বিষয়ে গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে'—এই মর্মে রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ১৬৩৮জনের স্বাক্ষরযুক্ত একটি পাল্টা আবেদন পেশ করা হয়। এই বছরের মার্চ

মাসের গোড়ার দিকে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কৌলীন্যপ্রথা রদকল্পে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সমাজের বিবেচনার জন্য একটি আইনের খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন। এ দেশবাসীর কাছ থেকে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে পরপর এরকম আবেদন আসতে দেখে সেকালের প্রভাবশালী দৈনিক 'মর্নিং ক্রনিকল' মন্তব্য করে, এরকম কোনো আইন হলে তা কৌলীন্যপ্রথার শেষশয্য রচনা করবে এবং তা হবে সভ্যতার পক্ষে হিতকর। এর ফলে উন্নতির পথের সবচেয়ে বড় বাধাটি হবে অপসারিত এবং হাজারো দুঃখের উৎসমুখটি হবে রুদ্ধ। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কিশোরীচাঁদ, প্রসন্নকুমার ও বিদ্যাসাগর আবেদন করার পর, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ-প্রথার উচ্ছেদকল্পে সরকারের কাছে একের পর এক আবেদন আসতে থাকে। ১৮৫৬-র জুলাই মাসের মধ্যে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ৩০টি আবেদন পেশ করা হয়। কিছুদিনের মধ্যে বহুবিবাহ-বিরোধী আবেদনের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে যায়। লোকে ধরেই নেয়—এ বিষয়ে আইন পাস হবেই। ২৫ নভেম্বর, ১৮৫৬-য় 'সম্বাদ ভাস্কর' এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে আশা প্রকাশ করে বলে, 'বহুবিবাহ নিবারণীয় রাজবিধান হবেই হবে ইহাতে সন্দেহ নাই'।

সন্দেহ হয়ত ছিল না। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাহি যুদ্ধ শুরু হলে সরকার নিজের অস্তিত্বরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বিদ্যাসাগরের ভাষায় 'বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে আর তাঁহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না'।

যুদ্ধ শেষ হল, কোম্পানির হাত থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কারকরা আবার বহুবিবাহ নিবারণে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ১৮৬৩-র অক্টোবর মাসে প্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা বহুবিবাহ নিবারণের জন্য সরকারকে একটি আইন প্রণয়ন করতে অনুরোধ জানালেন। এর ক'দিন পরেই, দুর্গাচরণ নন্দী ও অন্যান্য কিছু মানুষ এ-বিষয়ে আর একটি আবেদন পেশ করলেন। বহুবিবাহ নিবারণে হিন্দুদের প্রয়াসকে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' স্বাগত জানায়। ৩০-৩-১৮৬৫-তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে পত্রিকাটি বিদ্যাসাগরকে বহুবিবাহবিরোধী উদারপন্থী হিন্দুদের নেতা হিসাবে চিহ্নিত করে। বিরোধী শিবিরের নেতা তখনও রাধাকান্ত। ১ জানুয়ারি, ১৮৬৬-তে তাঁর উদ্যোগে সরকারকে এ-বিষয়ে কোনো আইন না করার অনুরোধ জানানো হল। এইকালেই কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্র বহুবিবাহ নিবারণের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাঁর উৎসাহে ও বিদ্যাসাগরের আগ্রহে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে পেশ করার জন্য একটি আবেদনপত্র প্রস্তুত করা হয়। এই আবেদনপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন বিদ্যাসাগর। আবেদনপত্রটি সরকারকে দেবার জন্য একটি প্রতিনিধিদল ১৮৬৬-র ১৯ মার্চ ছোট লাট বিডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই দলে অন্যান্যদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরও ছিলেন। প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনার পর বিডন বহুবিবাহ নিবারণের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। এর পরই বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে বহুবিবাহ সম্পর্কে একটি বিল আনার জন্য ভারত সরকারের অনুমতি চাওয়া হল।

অনুমতি কিন্তু এল না। ভারত সরকারের মনোভাব জানার পর বাংলা সরকার বহুবিবাহ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হলেন বিদ্যাসাগর। কমিটির অন্যান্য দেশীয় সদস্যরা (জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যশরণ ঘোষাল, দিগম্বর মিত্র ও রমানাথ ঠাকুর) জানালেন, গত কয়েক

বছরে বিষয়টি সম্পর্কে হিন্দুদের মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার ব্যাপারটাকে এখন সমাজ ভাল চোখে দেখে না। শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা আপনা থেকেই লোপ পাবে—আইনের সাহায্য প্রয়োজন হবে না। কয়েক বছর আগে যাঁরা বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরাই এখন বহুবিবাহ নিরোধক আইন পাসের বিরোধিতা করলেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু এ-ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। আইনের সাহায্য ছাড়া বহুবিবাহ যে বন্ধ করা যাবে না—এ বিশ্বাসে তখনও তিনি অটল।

এই কালেই 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' বহুবিবাহ নিবারণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাদের প্রচেষ্টাকে বিদ্যাসাগর অভিনন্দন জানান এবং তাদের কিছু আনুকূল্য হতে পারে এই কথা চিন্তা করে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' মুদ্রিত করেন। বহুবিবাহ ব্যাপারটি যে অশাস্ত্রীয় ও অমানবিক—এই বইতে তিনি তা প্রমাণ করলেন। কুলীনদের অত্যাচার আর আগের মতো নেই—এটা যে নিতান্তই কথার কথা, তা দেখাবার জন্য বেশ কিছু কুলীনের নামধাম, বিবাহসংখ্যা তিনি এই বইতে তুলে ধরেন। এ কাজ তাঁর আগে ইয়ং বেঙ্গল ও খ্রিস্টান মিশনারিরা করলেও, এত ব্যাপকভাবে করেননি। বিদ্যাসাগররের এই বইটিও সমাজে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে কয়েকটি বইও লেখা হয়। সেগুলির উত্তর দিতে গিয়ে ১৮৭২-এ বিদ্যাসাগর রচনা করেন 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার—দ্বিতীয় পুস্তক'। এই পুস্তকটিতে তাঁর আক্রমণের মূল লক্ষ্য তারানাথ তর্কবাচস্পতি। তর্কবাচস্পতি প্রথমে বহুবিবাহ নিবারণ সমর্থন করে আবেদনপত্রে সই করেছিলেন, পরে তাঁর মত পালটে যায়। তর্কবাচস্পতির প্রতি তাঁর কটাক্ষ শালীনতার গণ্ডি অতিক্রম করে গেছে—এই মর্মে বক্তব্য রেখে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

ঘুরেফিরে শেষপর্যন্ত বিষয়টি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। বহুবিবাহ ব্যাপারটা যে ভালো নয়—এ-বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। মতভেদটা কিভাবে তা বন্ধ করা যাবে তা নিয়ে। এক দলের মতে আইন ছাড়া এ-প্রথা বন্ধ করা যাবে না। অন্য দলের বক্তব্য, শিক্ষার প্রসার হলে ও চেতনা জাগলে এ-প্রথা আপনা থেকেই লোপ পাবে। চল্লিশের দশকে এ-ধরনের বক্তব্য আমরা বারবার শুনেছি। সত্তরের দশকে নতুন করে এসব কথাই বাঙালিসমাজকে শোনালেন বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণরা। তবে তাঁরা যাই বলুন, এই কালে পত্র-পত্রিকায় নতুন করে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ নিয়ে আলোচনা শুরু হল। বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় পূর্ববাংলায় বহুবিবাহ-বিরোধী রীতিমতো এক আন্দোলন গড়ে তুললেন। সব মিলিয়ে আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ নিবারণ করতে বিদ্যাসাগর পারেননি এ কথা সত্য, কিন্তু এ-প্রথার বিরুদ্ধে জনচেতনা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

একই সঙ্গে পারি না, এদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের প্রথম পর্বে তাঁর ভূমিকার কথা ভুলে যেতে। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই বাঙালি সংস্কারকরা রীতিমতো সোচ্চার। এক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গল ও রামমোহনপন্থীদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না। এ ব্যাপারে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের ভূমিকাও স্মরণযোগ্য। ১৮৪৯-এ স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে তারাশঙ্কর তর্করত্ন লিখলেন 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা'। মদনমোহন *'সর্বশুভকরী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখলেন।*

১৮৪৯-এ বেথুনের উদ্যোগে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় খোলা হলে বিদ্যাসাগর সর্বশক্তি নিয়ে একে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করলেন। বেথুনের একপাশে ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, অন্যপাশে মদনমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র। বেথুনের স্কুলে মেয়ে পাঠাতে ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ, ডিরোজিও-শিষ্য প্যারীচাঁদ, সংস্কৃত পণ্ডিত মদনমোহন কেউই ইতস্তত করলেন না। বিরোধীদের মধ্যে আমরা দেখলাম সংস্কৃতনবিশ নন্দকুমার কবিরত্ন আর ইংরেজিনবিশ কাশীপ্রসাদ ঘোষের বিচিত্র সহাবস্থান। ১৮৫০-এ বেথুন বিদ্যাসাগরকে স্কুলের সেক্রেটারি পদে নিয়োগ করেন। বেথুনের মৃত্যুর পরও দীর্ঘদিন বিদ্যাসাগর এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

শুধু বেথুন স্কুলের ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে নিজের কর্মপ্রয়াসকে সীমাবদ্ধ না রেখে, বিদ্যাসাগর গ্রামবাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য উদ্যোগী হলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বর্ধমান, হুগলি, নদীয়া ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। ছোট লাট হ্যালিডের মুখের কথায় উৎসাহিত হয়ে ১৮৫৭ সালের ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮৫৮-র ১৫ মে-র মধ্যে তিনি ৩৫টির মতো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এ-ব্যাপারে কোনো সরকারি নির্দেশ বা লিখিত আদেশ না থাকায়, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ইয়ং বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে অর্থসাহায্যের বিরোধিতা করতে থাকেন। অনেক লেখালেখির পর সরকার বিদ্যাসাগরকে আর্থিক দায়ভার থেকে মুক্তি দিলেও, বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য স্থায়ী কোনো সাহায্য দিতে অস্বীকৃত হন। অবশ্য এই কারণে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর উৎসাহে কোনো ঘাটতি দেখা যায়নি। ১৮৭৮-এ মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেবার দাবির বিরোধিতা কোনো কোনো মহল থেকে করা হলে তিনি ব্যথিত হন। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চন্দ্রমুখী বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, তিনি তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান।

মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার বিশ্লেষণ করলে দেখব, তাঁর প্রয়াস সমকালীন সংস্কার প্রচেষ্টার সঙ্গে একই সুরে বাঁধা। উনিশ শতকে বাঙালি সংস্কারকদের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নারীজাতির কল্যাণের প্রতি আগ্রহ ও মমতা। প্রায় সব সংস্কারকই নারীর বেদনায় বেদনার্দ্র এবং প্রায় প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের পেছনে নারীত্বের অবমাননা এবং নারীর বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। যাঁর প্রকাশ সতীদাহ নিবারণে, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়াসে। পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত এদেশীয় সংস্কারকদের কাছে স্বদেশীয় নারীর অসহায় লাঞ্ছিত রূপটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এ সময়ের বাঙালি নারী যেন 'ক্যাপটিভ লেডি', আর তার উদ্ধারেই যেন তাঁরা কৃতসঙ্কল্প। এই নারীমুক্তি আন্দোলনও আবার ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ—তা সমাজের সর্বস্তরের নারীকে স্পর্শ করেনি, কেবল উচ্চবর্ণের নারীকে নিয়েই ভেবেছে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগর শ্রেণীস্বার্থের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। বাংলার উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কারণ, বাংলার তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্যে ও বাঙালি মুসলমান সমাজে বিদ্যাসাগরী আন্দোলনের আগে থেকেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। এমনকি স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর লক্ষ্য ছিল সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা। ১৮৬২ সালে বেথুন স্কুল সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে গিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মেয়েদের ঠিকমতো স্কুলে পাঠাচ্ছেন না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। অবাক লাগে যখন দেখি, বিদ্যাসাগর উচ্চবর্ণের নারীর দুঃখমোচনে যতখানি

অগ্রসর, সর্বস্বান্ত জনগণের দুঃখদুর্দশা সম্পর্কে ততখানি উদাসীন (তাঁর ব্যক্তিগত দয়ার কথা ও ১৮৬৬-র দুর্ভিক্ষের সময় সেবাকার্যের কথা মনে রেখেই এ কথা বলছি)। ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম একই বছরে, দু'জনেই গ্রামবাংলা থেকে শহরে আসেন। গ্রামবাংলার মানুষের দুঃখকষ্টের সঙ্গে উভয়েই পরিচিত ছিলেন। এই পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে ১৮৫০-এ অক্ষয়কুমার লিখতে শুরু করলেন গ্রামবাংলার জনগণের দুঃখের কথা, আর বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের দোষ।

বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের মানুষ। উনিশ শতকের সংস্কারকদের অনেক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়ের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছিল—যে কারণে অনেক সময়ই তাঁদের কার্যকলাপ হয়ে উঠত স্ববিরোধী। এই স্ববিরোধিতা থেকে রামমোহন, দ্বারকানাথ, ইয়ং বেঙ্গল, কেশবচন্দ্র কেউই মুক্ত নন। স্ববিরোধী আচরণ বিদ্যাসাগর চরিত্রে খুব বেশি না থাকলেও, তাঁর অনেক কাজের আমরা কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যাঁর ভূমিকা প্রবাদোপম, তিনিই আবার নিজের স্ত্রী-কন্যার শিক্ষা বিষয়ে একান্ত উদাসীন। স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাবার কোনো চেষ্টা বিদ্যাসাগর করেননি। ঠাকুরদাস নাকি তাঁর পুত্রবধূদের লেখাপড়া শেখার একান্ত বিরোধী ছিলেন—এ কথা তাঁর অন্যতম জীবনীকার সুবলচন্দ্র বলেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, তাঁর সমসাময়িক শিবচন্দ্র দেব স্ত্রীকে লিখতে পড়তে শেখান। এই একই কাজ পরম উৎসাহে করেন প্যারীচাঁদ মিত্র। নিজের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ক্ষেত্রেও তিনি কতখানি উৎসাহী ছিলেন সন্দেহের বিষয়। কোনো মেয়েকে তিনি স্কুলে পাঠিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে তাঁর জীবনীকাররা নীরব। সামাজিক সংস্কারের জন্য আইন প্রণয়নের ওপর বিদ্যাসাগর বারবার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তিনিই আবার শেষ জীবনে সহবাস সম্মতি আইনের বিরোধিতা করলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, বাঙালিসমাজে তখন সংস্কারের ঢেউ। নানাদিক দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে শিক্ষিত যুবকরা কৃতসঙ্কল্প। সেই কারণে সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যখন অগ্রসর হলেন, তখন একদিকে ইয়ং বেঙ্গল, অন্যদিকে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। শিক্ষিত যুবকের দল ও সচেতন বেশ কিছু মানুষও সাগ্রহে তাঁর কার্যকলাপকে সমর্থন জানালেন। জীবনপ্রান্তে পৌঁছে বিদ্যাসাগর দেখলেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ছবি। শিক্ষিত যুবকের দল আর নতুন দিনের স্বপ্ন দেখছে না, অতীতের সুখস্বপ্নে তারা বিভোর। বর্তমানকে অস্বীকার করে তারা আবার অতীতে ফিরে যেতে চাইছে। উনিশ শতকের প্রথমে শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের কণ্ঠে তিনি শুনেছিলেন, 'আমি ও আমার বন্ধুরা অন্তর থেকে ঘৃণা করি হিন্দুধর্মকে', আর শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে দেখলেন, শিক্ষিত যুবকের দল হিন্দু ধর্মকর্ম নিয়ে মেতে উঠেছে। শতাব্দীর সূচনায় শিক্ষিত যুবকরা বিধবাবিবাহের সমর্থনে ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। আর শতাব্দীর প্রান্তে এসে শুনলেন, চন্দ্রনাথ বসুর মতো এম-এ পাস যুবক বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিষোদ্গার করছেন! মুক্ত চিন্তাকে বেড়ি পরানোর চেষ্টা নতুন করে তাঁর চোখে পড়ল। তাঁর ছাত্রজীবনে 'ধর্মসভা'র পক্ষ থেকে 'সতীদ্বেষী' কোনো বই বা পত্র-পত্রিকা পড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, আর শতাব্দীর শেষে দেখলেন 'ঢাকা প্রকাশ' যেসব সংবাদপত্র 'বিধবাবিবাহ সমর্থন, বাল্যবিবাহ নিবর্তন বা যুবতীবিবাহ সমর্থন করে'

তাদের বয়কট করার ডাক দিচ্ছে। চোখের সামনে ব্রাহ্মসমাজীদের 'হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে শামিল হতে দেখেছিলেন তিনি। সহবাস সম্মতি বিল সম্পর্কে শিক্ষিত যুবকদের মনোভাবও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। এই বিলের প্রতিবাদে কলকাতার গ্র্যাজুয়েটদের পক্ষ থেকে স্টার থিয়েটারে একটি সভার আয়োজন করা হয়। কানায় কানায় পূর্ণ এই সভায়, একের পর এক শিক্ষিত যুবক বাল্যবিবাহকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন।

বাঙালিসমাজের এই পিছু-হটাকে বিদ্যাসাগর কি মেনে নিয়েছিলেন ? আর নিয়েছিলেন বলেই কি সহবাস সম্মতি বিলের বিরোধিতা করে, জীবনের অন্তিম লগ্নে প্রকারান্তরে বাল্যবিবাহকেই সমর্থন জানিয়ে গেলেন ? তাঁর এই অন্তিম কাজে 'সমগ্র হিন্দুসমাজ সুখী হয়েছিল'—এই মূল্যবান সংবাদটি জানাতে ভুল করেননি বিদ্যাসাগরের দুই প্রামাণ্য জীবনীকার বিহারিলাল সরকার ও সুবলচন্দ্র মিত্র।

সংবাদ সূত্র :

বিদ্যাসাগর, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (নতুন সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৯৪)
বিদ্যাসাগর, বিহারিলাল সরকার (নতুন সংস্কার, কলকাতা, ১৩৮৮)
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুবলচন্দ্র মিত্র (কলকাতা, ১৯০২)
বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন (কলকাতা, ১৯৬২)
করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, ইন্দ্রমিত্র (কলকাতা, ১৯৬৯)
বিদ্যাসাগর ও বাঙালিসমাজ, বিনয় ঘোষ (কলকাতা, ১৯৭৩)
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অ্যান্ড হিজ এলুসিভ মাইলস্টোনস, অশোক সেন (কলকাতা, ১৯৭৭)
নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল, প্রদীপ সিংহ (কলকাতা, ১৯৬৫)
সংকোচের বিহ্বলতা, গোলাম মুরশিদ (ঢাকা, ১৯৮৫)
উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সমাজ, মুনতাসীর মামুন (ঢাকা, ১৯৮৬)
নব্যভারত, ১২৯৮
অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮৬৮-৭০

(শ্রীবিনয়ভূষণ রায় ও শ্রীমতী সরস্বতী মিশ্রের সৌজন্যে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বই দেখার সুযোগ পেয়েছি।)

পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯১ সাল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয়ের মৃত্যুশতবর্ষ। ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি তার প্রতিষ্ঠার সময়েই একথা ঘোষণা করেছিল যে, তাঁর মৃত্যুশতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে, তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়ে। এই অভিমুখে কর্মসূচী প্রণীত হয় ১৯৮৮ সালেই। সেদিন এই সংগঠন যে কথা বলে, "আগামী ১৯৯১ সালের মধ্যে আমরা এ কাজের অনেকটাই এগিয়ে ফেলতে পারব।

"কেন এই ১৯৯১ সাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে? ১৯৯১ সাল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শততম মৃত্যুবার্ষিকী। ...তিনি যে সময় শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়েছিলেন সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় এই বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষার্ধে সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা আরও জটিল হলেও মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন।

"পরাধীন দেশে সাম্রাজ্যবাদ তার নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারে ও রক্ষায় যে শিক্ষামেধ যজ্ঞ শুরু করেছিল তার বাধাকে প্রতিরোধ করেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। একই সাথে সামন্তবাদী বাধাও তাঁকে প্রতিহত করতে করতে অগ্রসর হতে হয়েছিল।

"আজ যত জটিলতাই আমাদের সামনে থাকুক না কেন, আমরা স্বাধীন। সামন্ততন্ত্র তার সেই অবস্থানে নেই। এই সময়ে আমরা যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ শাসকশ্রেণীকেই দেখি না কেন, রাজনৈতিক সংগ্রামও আজ তার শাসন নীতির বিরুদ্ধে অধিকতর বেগবতী।"

বস্তুত স্যাক্ষরতা প্রসার, নারী সাক্ষরতা প্রসার ও শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে জগতের যা কিছু অগ্রগতি তার প্রবাহে যাতে সকলের অবগাহন সুনিশ্চিত হয়, তার জন্য যে কোন সংকল্প পূরণে যাঁর সাথে আমরা এই বাংলায় প্রথম শপথ উচ্চারণ করতে পারি তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আমাদের বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর মৃত্যুশতবর্ষ বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি নবসাক্ষর মানুষদের উৎসববর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করতে চায়। মৃত্যুশতবর্ষে উৎসব! কথাটি কি সুস্থ? কেউ কেউ একথা ভাবতেই পারেন। আমরা বলি, হ্যাঁ। মৃত্যুত্তীর্ণ মানুষের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া অনেক বেশি নিরাপদ। কারণ তাঁর পক্ষে আর নতুন করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির আড়ালে প্রতিক্রিয়াপন্থী হওয়া সম্ভব হয় না। এমনকি বহু পরীক্ষিত মানুষের পক্ষে জয়ধ্বনি উচ্চারকগণও কখনও-সখনও তাঁদের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নির্মম দোলায়মানতায় অবসাদগ্রস্ত হন।

জন্ম মানুষের করায়ত্ত নয়। করায়ত্ত কর্ম। এ কথার অর্থ জন্মবার্ষিকী পালনকে ছোট করে দেখানো নয়। জন্মোৎসবকেও ছোট করে দেখানো নয়। কিন্তু মৃত্যুবার্ষিকী পালন বা মৃত্যুশতবর্ষ পালন এবং সেটিকে উৎসবের আঙ্গিকে মাত্রা দেওয়া অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। এখন সেক্ষেত্রে বিবেচনা করে দেখা দরকার যে, আবেগ যেন যুক্তিকে অতিক্রম না করে।

সেই যুক্তির আলোকেই আমরা মৃত্যুশতবর্ষে তাঁকে আমাদের মধ্যে খুঁজে পেতে চাই।

বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান কাজ কী? এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হলে আমাদের

কুণ্ঠাহীন উত্তর হবে এই যে, তিনি অন্তত আমাদের দেশে মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়ার কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন। যাদের শ্রমে পৃথিবীর বিকাশ, বিকশিত সম্পদে সেই শ্রমজীবী মানুষের বঞ্চনা, আর তার কারণ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অজ্ঞাত থাকা, এইভাবে এখন এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছানো, আমাদের পক্ষে বিষয়টি দেখা এবং দেখানোর যে সহজ অবকাশ তা কিন্তু তখন ছিল আরো কঠিন। কাজেই বর্তমানে আমাদের বিবেচনায় সীমাবদ্ধ হতে পারে তার সেদিনের আবেদন। কিন্তু তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিত সেই কাজকেই সর্বজনীনতার মাত্রা দিয়েছিল।

এটা ঠিকই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিদ্যাসাগর রচনায় বলেছেন, 'তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গ-ভাষা'। তিনি আরও বলেছেন, 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।' একটি বিশেষ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ। তবে তাঁর (বিদ্যাসাগরের) এই শিল্পীরূপ মনুষ্য নিরপেক্ষ নান্দনিকতায় মূর্ত ছিল না। বরং শিক্ষায় পরিপূরক শক্তি হিসাবেই সাহিত্য ছিল তাঁর মূল জীবন সাধনার একটি খণ্ড অংশ মাত্র। তাঁর জীবন সাধনার কেন্দ্রমূলে ছিল সাধারণ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ীভূত চিন্তাটিই।

বাংলা সরকারের সচিব রিভার্স টমসনকে একটি চিঠিতে লিখেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান এতই নিচু যে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য কোন খরচই তারা করতে পারে না।...সরকার যদি এ ব্যাপারে মনস্থির করেন তাহলে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের জন্য তাঁদের তৈরি হতে হবে।

আজ স্বাধীনতার পরবর্তী যৌবন উত্তীর্ণ ভারতবর্ষে, আমাদের দাবি সর্বজনীন অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। সময়টা একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্ত। আর বিদ্যাসাগর তাঁর দাবি রচনা করেছেন স্বাধীনতারও প্রায় নব্বই বছর আগে। মানুষকে সঠিক মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয়। আর এখানেই তাঁর সার্থকতা যে, তিনি পূর্বাপর রহিত নন। উত্তরপুরুষের জন্য তিনি মঠ বানাননি। যোগ্য উত্তরপুরুষ তাঁর পথেই পথের সন্ধানে সফল হয়েছে। এখনো অনায়ত্ত, কিন্তু করায়ত্ত হওয়ার পথে শিক্ষা আন্দোলন আজ শিক্ষায় সাংবিধানিক অধিকার দাবি করছে. পাশাপাশি প্রথম শর্ত হিসাবে সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবিও তুলছে। স্বাধীন দেশের সংবিধানে শাসককুল যা ১৯৬০ সালের মধ্যে পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংশোধিত প্রতিশ্রুতির সময় নির্ধারণ করেন ১৯৮০, সেই প্রতিশ্রুতি পালনে এখনো ব্যর্থতার বিরুদ্ধে বিংশ শতকের নয়ের দশক ঐ দাবিতে এখনও আন্দোলনরত।

শ্রমিক পরিবারের শিশুদের শিক্ষার আঙিনায় আনার ক্ষেত্রে তাঁর যে সার্বিক চিন্তা তা নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রতিফলিত হয় নিম্নোদ্ধৃত অংশে।

"এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত তবে অস্মদ্দেশীয় বালক বালিকারা মাতৃ সন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প-বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত।"

বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি সাক্ষরতা প্রসার অভিযানে মহিলাদের সাক্ষরকরণে চূড়ান্ত সাফল্যকে নির্দিষ্ট করতে চায়। এর কারণ দু'টি। প্রথম যেমন সাক্ষর মায়ের শিশু নিরক্ষর হবে না তেমনি শিশুদের মধ্যে থেকে পরিকল্পিতভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব হলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর নিরক্ষরতার প্রবাহও বন্ধ হয়। অর্থাৎ নারীশিক্ষা নিরক্ষরতার উৎসমুখকে বন্ধ করে বয়স্ক নিরক্ষরতা সমস্যার সমাধান ঘটায়। ১৯৮৮ সালের আমাদের

এই চিন্তা ১৮৪৯ সালে তিনিও একইভাবে করেছিলেন। কোন বিতর্ক নেই যে, তিনিই পথিকৃৎ।

১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন, ইংরাজী ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন হুগলী জেলায় বীরসিংহ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইংরাজী ১৮৭৬ সালে ঐ অঞ্চল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, জন্ম হউক যথাতথা কর্ম হউক ভালো। এই প্রবাদের সঙ্গে তাঁর কর্মজীবন অচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছে। "ঈশ্বরচন্দ্র দরিদ্র পরিবারে সুদূর গ্রামাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে আপন কর্মে, সপাট ঔদার্যে, সব্যসাচীর ভূমিকা পালন করে একদিকে বাংলা ভাষাকে আধুনিকস্তরে উত্তীর্ণ করার পাশাপাশি সাধারণ্যের শিক্ষার বিস্তারসহ শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পুস্তক রচনা করেন। বস্তুত তাঁর শিক্ষানীতির আলোকে যদি তাঁকে বিচার করা হয়, তাহলে আজও রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। ....কাকের বাসায় কোকিল যেরূপ ডিম পাড়িয়া যায় মানব ইতিহাসের বিধাতা সেই রূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।" একই কথা আমরা মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছেও শুনি, "সেই দুর্দম প্রকৃতি ভাঙিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই। সেই উগ্র পুরুষকার যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেকাইয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে, ...তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ ...আমাদের মতো যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।"

এই গভীর আলোচনার বিষয়ই আমাদের উপজীব্য। না হলে রবীন্দ্রনাথের সত্য সন্ধানে কম্বু কণ্ঠে যে উচ্চারণ, "মানুষকে পুরা পরিমাণ মানুষ করিব ইহা আমাদের অন্তরের ইচ্ছা নহে।" বিদ্যাসাগর কেমন করে মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করার আন্তরিক ইচ্ছায় কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেন!

The man to whom I have appealed has genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত এইভাবেই তাঁকে চিহ্নিত করেন। 'যাঁর কাছে আমার আবেদন, তাঁর আছে প্রাচীন সাধকদের মতো জ্ঞান ও প্রতিভা, ইংরেজদের মতো কর্ম প্রবণতা ও বাঙালি মার মতো কোমল হৃদয়।' প্রকৃতই, তাঁর জ্ঞানের বিশালতাই তাঁকে স-প্রাণ কোমলতায় সাধারণ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে মানুষকে পুরো পরিমাণে মানুষ করাব কর্মযজ্ঞে ব্রতী করে।

শ্রীশ্রীদুর্গা —

১

মহামহিম শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক
সমাজাধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।—

নবদ্বীপ ত্রিবেণী ভট্টপল্লী বাঁশবাটী কলিকাতা প্রভৃতি সমাজস্থ ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ি পণ্ডিতদিগের বিহিত বিনয়পুরঃসর সমাবেদনমিদং। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামক কোন অভিনব পণ্ডিত নব্যসম্প্রদায়ের কতিপয় যুবক সহযোগে আপনকারদিগের সমীপে প্রার্থনা করাতে আপনারা হিন্দুজাতীয় বিধবাবিবাহবিষয়ক আইনের যে সূত্রপাত করিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমরা যে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে মনোযোগ করিতে আজ্ঞা হইবেক।—

প্রথমতঃ হিন্দুজাতীয় বিধবাবিবাহ বেদস্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ।

বেদ যথা —

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত ইতি।—

স্মৃতি যথা মনুঃ —

যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ। তং শুশ্রূষেত জীবন্তং সংস্থিতঞ্চ ন লঙ্ঘয়েৎ।। ১৫১

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ। ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।। ১৫৭

আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং।। ১৫৮—

নবদ্বীপ ভট্টপল্লীর পণ্ডিতদের আবেদনপত্র

নবদ্বীপ ভট্টপল্লী প্রভৃতি অঞ্চলের পণ্ডিতদের আবেদনপত্রের স্বাক্ষর। বিপক্ষে

বিধবাবিবাহ বিষয়ে সরকারী দপ্তরে প্রেরিত একখানি আবেদনপত্রের প্রতিলিপি

বিধবা-বিবাহকে ব্যঙ্গ করে বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে প্রকাশিত নিবন্ধ ও কবিতা

ভট্টপল্লীনিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও হিন্দুসন্তানের পাঠ্য। বঙ্গবাসী আফিস হইতে যে পরাশর-সংহিতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তর্করত্ন মহাশয়ের মত প্রকাশ পাইয়াছে।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥"

তর্করত্ন মহাশয় এই শ্লোকের এইরূপ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন,—

"যে পাত্রের সহিত বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে; তবে ঐ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চপ্রকার আপদে, ঐ কন্যা পাত্রান্তরে প্রদান বিহিত।"

এইরূপ অনুবাদ করিয়া তর্করত্ন মহাশয় ইহার এইরূপ টীকা করিয়াছেন,—

"যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু পণ্ডিতসম্মত। আরও একটি যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইতেছে। এতদ্দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিধবা-বিবাহ এখনকার প্রচলনীয় নহে। 'স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।'* এ বচনের ইহাই অনুবাদ, কিন্তু এই বচনের অনুমতি-রক্ষা বর্তমান সময়ে নিষিদ্ধ। যথা—পরাশর ভাষ্যকৃত আদিত্যপুরাণ।

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং......
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তা-কন্যা প্রদীয়তে।
কন্যানামসবর্ণনাং বিবাহশ্চ-দ্বিজাতিভিঃ ॥
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্ ॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য......
এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥"

অর্থাৎ কলি-প্রারম্ভের পর, মহাত্মা পণ্ডিতগণ পূর্বপ্রচলিত এই সকল কর্ম সমাজরক্ষার্থ ব্যবস্থাপূর্বক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য, দেবরের দ্বারা পুত্র উৎপাদন, পরিণীতা নারীর পত্যন্তর গ্রহণ, অসবর্ণা কন্যার সহিত দ্বিজাতিদের বিবাহ, দত্তক ও ঔরস ভিন্ন ক্ষেত্রজ প্রভৃতিকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ এবং গৃহস্থের দাস, গোপালক, কুলমিত্র, অর্ধসীরী

* মূল শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন করিয়াছিলেন।

শূদ্রজাতির মধ্যে ইহাদের অন্নভোজন ইত্যাদি কলিযুগারম্ভের পরেও এই বচননিষিদ্ধ কতিপয় কার্যের অনুষ্ঠান দেখাইয়া এবং স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতির বলবত্তা শাস্ত্রসম্মত, এই প্রমাণে কেহ কেহ এই বচনের অগ্রাহ্যতা প্রতিপাদন করেন। আমরা বলি, তাহা নহে। ঐ সকল কর্ম কলিযুগ-প্রারম্ভের পরে যে নিষিদ্ধ হয়, ইহা ঐ বচন প্রদর্শনেই সপ্রমাণ হইয়া থাকে। তবে ঠিক কোন্ সময়ে যে ঐ নিষেধবিধি প্রচলিত হয়, তাহা বলা কঠিন। যাহা হউক, যতদিন ঐ নিষেধ প্রচারিত হয় নাই, ততদিন কলিযুগেও ঐ সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, অতএব পরাশরসংহিতা কেবল কলিযুগের ধর্মনির্ণায়ক হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা, পরাশরের মত কলিতে কিছুদিন প্রচলিত ছিল, একেবারে স্থিতিশূন্য হইতেছে না। পরাশরমতে ইতিপূর্বে চতুর্বিধ পুত্র উক্ত হইয়াছে। ভবিষ্যতে দাস, গোপালক, কুলমিত্র ও অর্ধসীরী শূদ্রদিগের অন্ন-ভোজন বিহিত হইবে, এইরূপ সকল মতের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত কলিযুগের এই ধর্ম এইরূপ স্থির করিলে, আদিপুরাণ প্রভৃতির বচন স্থিতিশূন্য হইয়া পড়ে। প্রবলমতের সঙ্কোচ করিয়াও অপ্রবলমতের স্থিতিশূন্যতা দোষ পরিহার করা চিরপ্রচলিত শাস্ত্রকারীর ব্যবস্থা। আর সামাজিক নিয়মও দেখ, এক্ষণে ঔরস ও দত্তক ব্যতীত পুত্র নাই। কেহই দাস প্রভৃতির অন্ন ভোজন করে না। অতএব সর্বজন-পরিগৃহীত আদিপুরাণাদি বচনের অগ্রাহ্যতা প্রতিপাদনপ্রয়াস সর্বতোভাবে অকর্তব্য ইত্যাদি বিবিধ কারণে বিধবা-বিবাহ যে এখনকার অপ্রচলনীয়, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত।”

[পরাশরসংহিতার বঙ্গানুবাদ, ৭ পৃষ্ঠা]

“অনেকে বলেন, বঙ্গ বিধবাগণ চিরদুঃখিনী, তাহাদের কোন কার্যেই সুখ নাই, কোন প্রকার আমোদে তাহারা মিশিতে পারে না, মনের দুঃখে তাহারা সর্বদাই দুঃখিত, তাহাদিগকে আজন্ম এইরূপ কষ্টে রাখা অতি নৃশংসের কার্য, যাহার দয়া নাই, মায়া নাই, যে স্নেহমমতা কাহাকে বলে জানে না, পরের দুঃখে যাহার মন গলিয়া না যায়, সেই এইরূপ নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে সমর্থ। কিন্তু বিধবাদিগের দুঃখ যে অসহ্য, এমত আমাদের বোধ হয় না। যদি বাস্তবিক অসহ্য হয়, অথচ তাহাতে সমাজের উপকার থাকে, তবে তাহা মোচন করিবার আবশ্যক কি ? পাঁচজন বিধবার জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, সমাজস্থ সহস্র-সহস্র লোকের জন্য তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাওয়া উচিত। যিনি একজনের অঙ্গে সূচ ফোটা দেখিতে পারেন না, তিনি শত শত লোকের বলিদান কিরূপে দেখিবেন ? যদি পাঁচজন বিধবার দুঃখ মোচন না করিলে নিষ্ঠুরতা হয় তবে বিধবা-বিবাহ চালাইয়া সমাজের সহস্র ব্যক্তির অপকার করা চণ্ডালতা—গোরু মেরে জুতা দান ধর্ম নহে। বিধবার যদি দুশ্চরিত্রা হইবার আশঙ্কা থাকে, বিবাহ দিলেও সে আশঙ্কা একেবারে নির্মূল হয় না। অনেক সধবাও দুশ্চরিত্রা হয়। আমরা নরম প্রকৃতির লোক, এইজন্য কেবল দয়া করিতে শিখিয়াছি,—ন্যায়পরতার উগ্রমূর্তি আমরা সহ্য করিতে পারি না ; সুতরাং ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ অনুভবশক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহাকে স্পেন্সার সাহেব Emotional Bias অর্থাৎ আনুভাবিক পক্ষপাত বলিয়াছেন।” [বঙ্গদর্শন : জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৭]

শান্তিপুরে বিদ্যাসাগরপেড়ে নামক এক রকম কাপড় উঠিয়াছিল। তাহার পাড়ে এই গান লেখা ছিল—

“সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে।

সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে ॥
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম ;
মনের সুখে থাক্‌ব মোরা মনোমত পতি লয়ে ॥
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—
আলোচাল কাচকলা -মাল্‌সার মুখে দিয়ে ছাই,—
এয়ো হ'য়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় ল'য়ে ॥"

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই পদ্য রচনা করিয়াছিলেন,—

"বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল ॥
কত বাদী, প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়ি আদি করি, মাতিয়াছে সব ॥
কেহ উঠে শাখা'পরে, কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ জড়ো, পাঁজি পুঁথি খুলে ॥
এক দলে যত বুড়ো, আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখেনাকো গোড়া ॥
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে খাপা-খাপি, ছাপাছাপি কত ॥
বচন রচন করি, কত কথা বলে।
ধর্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে ॥
'পরাশর' প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এ যে দেখি, সাগরের ঢেউ ॥
কোথা বা করিছে লোক, শুধু হেউ হেউ।
কোথা বা বাঘের পিছে, লাগিয়াছে ফেউ ॥
অনেকেই এই মত, দিতেছে বিধান।
অক্ষত যোনির' বটে বিবাহ-বিধান ॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত, কিবা আর আছে ?
একেবারে তরে যাক, যত রাঁড়ী আছে ॥
কেহ কহে এই বিধি, কেমনে হইবে ?
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী, সিঁদুর পরিবে ॥
বুকে ছেলে, কাঁকে ছেলে, ছেলে ঝোলে কোলে।
তার বিয়ে বিধি নয়, উলু উলু বোলে ॥
গিলে গিলে ভাত খায়, দাঁত নাই মুখে।
হইয়াছে আঁত-খালি, হাত চাপা বুকে ॥
ঘাটে যারে নিয়ে যাব, চড়াইয়া খাটে।

শাড়ী-পরা চুড়ী-হাতে, তারে নাকি খাটে ?
শুনিয়া বিয়ের নাম, 'কোনে' সেজে বুড়ী।
কেমনে বলিবে মুখে, 'খুড়ী খুড়ী খুড়ী' ?
পোড়া-মুখ পোড়াইয়া, কোন্ পোড়া-মুখী।
'দুখী' 'সুখী' মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী ?
ব্যাটা আছে যার তরে, বেলগাছ এঁচে।
তুড়ি মেরে খুড়ী বলে, সে বসিবে কেঁচে ॥
গমনের আয়োজন, শমনের ঘরে।
বিবাহের সাধ সে কি মনে আর করে ?
যেখানে সেখানে শুনি, এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজী আছে সব ॥
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে ॥
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাঁখা ?
জ্ঞানহারা হয়ে যাই, নাই পাই ধ্যানে।
কে পাড়িবে 'সৎবাপ' মায়ের কল্যাণে ?"

[কবিতাসংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ, ৭৯-৮১ পৃষ্ঠা]

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কবি দাশরথি রায় অনেক ছড়া গান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে একটি ছড়া ও একটি গান উদ্ধৃত হইল,—

"বিধবার বিবাহ-কথা কলির প্রধান স্থান কলিকাতা,
নগরে উঠেছে অতি রব।
কাটাকাটি হচ্ছে বাণ ক্রমে দেখছি বলবান্,
হবার কথা হয়ে উঠেছে সব ॥
ক্ষীরপাই নগরে ধাম, ধন্য গণ্য গুণধাম.
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক।
তিনি কর্তা বাঙ্গালীর, তাতে আবার কোম্পানির,
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ॥
বিবাহ দিতে ত্বরায়, হাকিমের হয়েছে রায়,
আগে কেউ টের পায় নাই সেটা।
তারা কল্লে অর্ডর, যেতে করে অর্ডর,
চটীকে বুদ্ধি আটিকে রাখবে কেটা ॥
হাকিমের এই বুদ্ধি, ধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রজা বৃদ্ধি,
এ বিবাহ সিদ্ধি হলে পরে।
বিধবা করে গর্ভপাত, অমঙ্গল উৎপাত
তাতে রাজার রাজ্যে হতে পারে ॥
হিন্দু ধর্ম্মে যারা রত, প্রমাণ দিয়ে নানা মত,

হয়ে না বলে করিতেছে উক্ত।
ইহাদের যে উত্তর, টিকিবে নাকো উত্তর,
উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত ॥

গীত।

তোমরা ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কি রূপে।
রাখিতে ঈশ্বরের মত হইয়ে ঈশ্বর-দূত,
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর-রূপে ॥

অপ্রাপ্তবয়স্কা বিধবার পুনর্বিবাহের অনুমতি

পুনর্বিবাহোদ্যতা বিধবা অপ্রাপ্তবয়স্কা অক্ষতযোনি হইলে. পিতার অবর্তমানে পিতামহের, পিতামহের অবর্তমানে মাতার, ইহাদিগের অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ সহোদরের কিংবা জ্যেষ্ঠ সহোদরেরও অবর্তমানে তৎপর নিকট-আত্মীয় পুরুষের অনুমতিতে পুনর্বিবাহ করিবে।

এই ধারা-বিরুদ্ধ বিবাহে সহকারিতার দণ্ড

যে সমস্ত ব্যক্তি এই ধারার মর্মবিরুদ্ধ বিবাহে জ্ঞাতসারে সহকারিতা করিবে, তাহারা এক বৎসরের অনতিরিক্তকাল কারাগার কিংবা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

এইরূপ বিবাহের পরিণাম

এবং এই ধারার মর্মবিরুদ্ধ বিবাহ আদালত কর্তৃক অবৈধ বলিয়া অস্বীকৃত হইতে পারে।

কিন্তু এই ধারার মর্মবিরুদ্ধ বিবাহে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে, বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত পূর্বোক্তরূপ অনুমতি প্রদত্ত হইতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। এবং ঐরূপ বিবাহের পর পতিসহবাস হইয়া গেলে আর তাহা অবৈধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে না।

প্রাপ্তবয়স্কা বিধবার পুনর্বিবাহ-সম্মতি

প্রাপ্তবয়স্কা ক্ষতযোনি বিধবার পক্ষে তাহার আত্মসম্মতিমাত্র পুনর্বিবাহ আইনসঙ্গত এবং গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য যথেষ্ট হইবে।

সেই সময়ে প্রভাকর-সম্পাদক যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকটা এইখানে প্রকাশ করিলাম,—

কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে, যে সকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে, প'রে শাঁকা শাড়ী ॥
এ বড় হাসির কথা, শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে, মনের ভিতর ॥
শাস্ত্র নয়, যুক্তি নয়, হবে কি প্রকারে ?
দেশাচারে, ব্যবহারে, বাধো বাধো করে ॥
যুক্তি বোলে বিচার, করুন শত শত।
কোন মতে হইবে না, শাস্ত্রের সম্মত ॥
বিবাহ করিয়া, তারা পুনর্ভবা হবে।
সতী বলে সম্বোধন, কিসে করি তবে ?

বিধবাবিবাহ আইনের স্বপক্ষে লেখা আবেদনপত্র

শ্রীঃ —

মহামহিম শ্রীযুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক —
সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়গণ সমীপেষু —

বিনয়পুরঃসর নিবেদনমিদং —
কিয়দ্দিন হইল বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইনের
পাণ্ডুলেখ্য প্রচার হইয়াছে ঐ পাণ্ডুলেখ্য পাঠ করিয়া
আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম প্রার্থনাকারি
মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্বক ঐ আইন অবিলম্বে প্রচার
করেন তাহা হইলে এদেশে এককালে বিধবাবিবাহ
প্রথা প্রচলিত হইবে এবং ঐ প্রথা প্রচলিত না থাকাতে
যে সকল ঘোরতর অনর্থ ঘটিতেছে তাহা একবারে
দূর হইবে ইতি ।—

তাং ১৫ এপ্রেল —
১৮৫৬ —

Tarucknath Dey

Rusic Krishna Mullick

Kissory Chand Mittra

Radhanath Sickdhar

Obhoy Churn Mullick

Sreenauth Mookerjea

Peary Chand Mittra

Gooroodoss Chatterjea

Mudhoosoodun Bhuttacharjea

Harry Churn Ghose

Bromo nath Sen

Gopee Kissen Mitter

Hurrochunder Dutt

Mahendra Nath Roy

Harry Mohun Mullick

Jodoo Nauth Saha

ইয়ং বেঙ্গল দলের রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখের আবেদনপত্রের স্বাক্ষর। স্বপক্ষে

সেকেন্দ্রাবাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও হিন্দুদের বিধবাবিবাহের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর। স্বপক্ষে

তৎকালীন কবিকুলের রচনায় বিদ্যাসাগর প্রশস্তি

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে! পেয়ে সে মহাপর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরিশ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ শির তরুদল, দাসরূপ ধরি';
পরিমল ফুল-কুল দশ দিশ ভরে,
দিবসে শীতলশ্বাসা ছায়া, বনেশ্বরী
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।"

[চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ৮৬ পৃষ্ঠা।]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় এবং শ্রীমতী ভূপেন্দ্রবালা দেবীর লিখিত তিনটি কবিতা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। এই তিনটি কবিতাই হিতবাদী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর

ফুরাল বঙ্গের লীলা-মাহাত্ম্য সকলি,—
হরিল বিদ্যাসাগরে কাল মহাবলী।
হারালে মা বঙ্গভূমি, পুত্ররত্নে আজ,
বিশীর্ণ বিমর্ষ দুঃখে বঙ্গের সমাজ!
কি মহা পরাণ লয়ে জন্মেছিল ধীর,
কিবা বিদ্যা, বুদ্ধিপ্রভা, করুণা গভীর;
বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর,
বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর;—
তেমন সন্তান মাগো, কে আর তোমার।
কাঁদিছে, হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ,
দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন,

কেবা অন্ন দিবে আর, কে ঘুচাবে দুঃখ,
দরিদ্র কাঙ্গালে দেখে কে চাহিবে মুখ ;
কত রাজা রানী আছে এ রাজ্য ভিতর—
কাঙ্গালে হেরিয়া কেবা করে সে আদর ।
মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্তিমান,—
প্রাতে স্মরণীয় নিত্য যাঁর গুণগান !

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর বৈকুণ্ঠে

আমার ঈশ্বর প্রভু,
আমার প্রাণের প্রাণ,
আমার গুরুর গুরু, জ্ঞানের জ্ঞেয়ান ;
অপার দয়ার সিন্ধু,
অসংখ্য দীনের বন্ধু,
ভাষার ভাস্কর-ইন্দু, দেবতা মহান্ ।
বিধবার কাতরতা,
অনাথের প্রাণব্যথা,
ছাত্রের জীবন গুরু ঈশ্বর আমার ;
বিদ্যার সাগর ধীর,
সত্যের তেজস্বী বীর,
অন্যায়ের মহাবৈর ন্যায়-অবতার ।
গাম্ভীর্যের মহা মূর্তি,
রহস্যের মহাস্ফূর্তি,
শিষ্টের পালন প্রভু দুষ্টের দমন ·
অমর ঈশ্বর মোর,
অমরগণের সনে
হৃদয়-বৈকুণ্ঠে মোর বিরাজে কেমন
মোর মত শত শত
লক্ষ লক্ষ হৃদয়েতে
এতদিনে পূর্ণরূপে ঈশ্বর-বিকাশ ;
একটি বৈকুণ্ঠ নয়,
লক্ষ লক্ষ—ততোঽধিক
হৃদয়-বৈকুণ্ঠ এবে ঈশ্বর-নিবাস ।
কেন তবে কাঁদ সবে,
'জয়েশ্বর' উচ্চ রবে
তোল সুর বহু দূর আকাশ ভেদিয়া,
পৃথিবীর যে যেথায়,
শুনুক সে উচ্চ সুর,

কোটি কোটি চক্ষু মেলি দেখুক চাহিয়া,—
বাঙালীর ঘরে ঘরে,
লক্ষ লক্ষ ছয় কোটি
হৃদয়-বৈকুণ্ঠ মাঝে দয়ার সাগর
ঈশ্বর—ঈশ্বর—গুরু অমর ঈশ্বর ।

রাজকৃষ্ণ রায়

কে বলে ঈশ্বর নাই

কে বলে ঈশ্বর নাই ?
ঈশ্বর জীবনে ঈশ্বরের কার্য
জ্বলিছে দেখিতে পাই ।
মৃত লোকে ভরা, স্বার্থপর ধরা
ঈশ্বরে হারায়ে আজ,
মৃত শোক ভরে, কাঁদিতেছে সবে
ধরিয়া শোকের সাজ ।
বুঝে না তাহারা, অমর ঈশ্বর—
মরণ তাঁহার নাই ;
নিঃস্বার্থ প্রেমের, অমৃতের ছবি
সংসারে রহিল তাই ।
এ ছবি দেখিয়া কত মৃত প্রাণ
নূতন জীবন পাবে ।
পরবর্তী কত নূতন জীবন
আদর্শে গঠিত হবে ।
অমৃতের পুত্র, অমর ঈশ্বর
অমর-ভবন-বাসী,
প্রেম বিলাইয়া, অনন্ত প্রেমেতে
গিয়াছেন শেষে মিশি ।
অমৃতের পুত্র, অমর ঈশ্বর
তাঁহার বিরহে আজ—
কাঁদিতেছে লোক, অমৃত ভাষায়
দেখে হৃদে পাই লাজ !
অমর বিরহে, কাঁদিবার তরে
চাই গো অমর ভাষা ।
মৃত লোক তোরা, তুলেছিস্ কেন
তোদের এ মৃত ভাষা ?
অমৃতের পুত্র অমর যাহারা
এসো অগ্রসর হয়ে—
অমর ভাষায় বিরহ সঙ্গীত

উঠ গো তোমরা গেয়ে।
সে সঙ্গীত গিয়ে প্রতি মৃতপ্রাণে
ঢালুক অমৃতধারা,
মুহূর্তের তরে, সজীব হইয়া
হউক আপনাহারা।

শ্রীমতী ভূপেন্দ্রবালা দেবী

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগস্ট বা ১২৯৮ সালের ১১ই ভাদ্র টাউনহলে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুজন্য শোক-প্রকাশে এবং তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন-সঙ্কল্পে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর স্যর চার্লস্ ইলিয়ট্ সভাপতি হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পেথরাম সাহেব, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, অনারেবল গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রাখিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে তাঁহার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম বৎসরের নবজীবনে কবিবর হেমচন্দ্র যে সরল ও সরস ভাষায় এবং সম্যক্ উপযোগী গ্রাম্য-উপমায়, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া চরিত্র-চর্চার উপসংহার করিলাম। কবি সংক্ষেপে কয়েকটি কথায় লিখিয়াছেন,—

"আস্‌চে দেখ সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যার সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির।
বঙ্গের সাহিত্য-গুরু শিষ্ট সদালাপী,
দীক্ষা-পথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞানবাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি,
কাঙ্গাল বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে সেঁকুল কাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরেজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত 'ডিস্',
টোল স্কুলের অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস্।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যুঞ্জয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নানাদুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে.
যারা অন্যমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলোনা কখনো ।

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার উর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদের নিত্য পরিচয় ।

তাহাদের খর্ব করো যদি
খর্বতার অপমাণে বন্দী হয়ে র'বে নিরবধি ।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয় ।

বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা (কার্তিক—১৩৪৬) থেকে পুনর্মুদ্রিত ।

সাগর-তর্পণ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় ।
নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার !
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত-চমৎকার !
নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার ।
বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো, হায়,
বিশ বছরের পুরাণো শোক নূতন আজো প্রায় ;
তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !
কীর্ত্তি-ঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের 'পর ।
স্মরণ-চিহ্ন রাখ্‌তে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,—একটি তেমন লোক,—
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত !—যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক ।
রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,—
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,—
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ ক'রে লক্ষ্য রেখে স্থির,
তোমার মতন ধন্য হ'বে,—চাই সে এমন বীর ।
তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায় ;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠ্‌ত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কৃতে শিষ্ট ব্যবহার ।
সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,

খুঁজব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনার পিঁড়েয় রাখ্‌ব তারে, থাক্‌ব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয় ।
রাখব তারে স্বদেশপ্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কারো লাগ্‌বে নাকো, অটুট হ'বে ঘর !
উঁচিয়ে মোরা রাখব তারে উচ্চে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্য্যাদায় যার ।
শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,—
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর ।
দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,—
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ ;
স্মরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদিগের হার,
"বাপ্‌ মা বিনা দেবতা সাগর মানেই নাকো আর !"
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ?—এ কি বিষম লাজ
বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হ'য়েছে প্রত্যয় !

॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—প্রশস্তিঃ ॥

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রত্নে কালেঽভবন্ মহ্যাং তথা চ ভুবি ভারতে ।
মনীষিণ স্তথা ধীরা বীরাশ্চ করুণাঘনাঃ ॥ ১ ॥
ঋষয়ো যৈঃ প্রকাশিতং প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ।
জনানাং দুঃখতপ্তানাম্ আসন্ য আর্তিনাশকাঃ ॥ ২ ॥
পুণ্যশ্লোকাঃ পৃথিব্যাং যে পূজ্যন্তে সর্বমানবৈঃ ।
আর্য-ভূমৌ পুরা দৃষ্টা নৃপর্ষি-যতি-বুদ্ধকাঃ ॥ ৩ ॥
বৈদিকা ঋষয়ঃ সর্বে উপনিষৎ-কৃতশ্চ যে ।
ব্যাসঃ কৃষ্ণস্তথা বুদ্ধঃ পাণিনিশ্চ পতঞ্জলিঃ ॥ ৪ ॥
ভারত-বাৎস্য-কৌটিল্যা মহাবীরশ্চ মৌর্যকাঃ ।
অশোকঃ প্রিয়দর্শীচ চন্দ্রগুপ্তশ্চ বিক্রমঃ ॥ ৫ ॥
শ্রীহর্ষ-শঙ্করাচার্যৌ দ্রমিড়াশ্চ মনীষিণঃ ।
আড়বারাশ্চ নয়ন্নারাঃ শিববিষ্ণুপদাশ্রিতাঃ ॥ ৬ ॥
পৃথ্বীরাজ-শিলাদিত্যৌ বুক্ক-হরিহরাবপি ।
রামানুজস্তথা মধ্বো বসবঃ কৃষ্ণরাট্ তথা ॥ ৭ ॥
কবীরঃ করিরাজোঽসৌ নির্গুণ-ব্রহ্ম সাধকঃ ।
কবিসূর্যো হি বৈ সূরঃ কৃষ্ণলীলা-সুগায়কঃ ॥ ৮ ॥
শঙ্করদেব-চৈতন্যৌ শৈক্ষ্যাণাং নানকো গুরুঃ ।
অকব্বরশ্চ সম্রাড় বৈ মোঙ্গল-কুল-ভূষণঃ ॥ ৯ ॥
চিত্রকূটে রাণকোঽসৌ প্রতাপঃ সিংহবিক্রমঃ ।
তুলসীদাস গোস্বামী য আস ভক্তিবিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণদাসঃ সুধীর্ভক্তঃ কৃষ্ণে যস্য রতিঃ স্থিরা ।
গৌড়ীয় সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠৌ মুকুন্দভারতৌ কবী ॥ ১১ ॥
শিবরাজো মহারাষ্ট্রে মন্ত্রে তু দশমো গুরুঃ ।
শ্রীরামমোহনো রায়ঃ প্রজ্ঞায়াশ্চ প্রকাশকঃ ॥ ১২ ॥
ভারতস্য চিত্ত শক্তের্ আসন যে চ প্রবর্ধকাঃ ।
তেষু শ্রেষ্ঠ জমোঽভূদ্বৈ মনস্বী বঙ্কিমঃ সুধীঃ ॥ ১৩ ॥
রামকৃষ্ণ-বিবেকৌ চ রবীন্দ্র কবিরাট্ তথা ।
বিচারাঃ নূতনাঃ যৈর্হি প্রবর্তিতা হি ভারতে ॥ ১৪ ॥

নবীনে ভারতে বর্ষে এতে সর্বে বিভূতয়ঃ ।
স্থৈর্যে ধৈর্যে তথা বীর্যে নৃষু যে ত্রিদশোপমাঃ ॥ ১৫ ॥
এতেষু প্রথমং স্থানম্ ঈশ্বরস্য মহামতেঃ ।
বিদ্যাসাগর-নাম্না যো সর্বজনেষু কীর্ত্যতে ॥ ১৬ ॥
প্রজ্ঞানেনোজ্জ্বলা বুদ্ধিঃ বিদ্যায়াং সাগরোপমঃ ।
কারুণ্যে চ যথা বুদ্ধঃ সর্বেষু মৈত্র-ভাবনা ॥ ১৭ ॥
নিগ্রহং বিধবানাং বৈ পাপং মেনেঽতিনিষ্ঠুরম্ ।
উদ্বাহো হি পুনস্তাসাং শাস্ত্রসিদ্ধং প্রমাণিতম্ ॥ ১৮ ॥
এতাসাং পুনরুদ্বাহো ন পাপমিতিদর্শিতম্ ।
বিধবা-বিবাহে যাঽসীজ্ জুগুপ্সা সা নিবারিতা ॥ ১৯ ॥
বরায় বৈ কুলীনায়াপাত্রায় চাঽপি সর্বথা ।
কন্যাদানেন পুণ্যং স্যাদ্ ইত্যাসীদ্ মূঢ়-ভাবনা ॥ ২০ ॥
অকুলীনেষু বিপ্রেষু গৌড়-বঙ্গে বিশেষতঃ ।
যুক্তিতর্কেন চিন্তা সা বহুশো হি নিরাকৃতা ॥ ২১ ॥
অকুলীন-কুমারীণাং বিবাহো নিষ্ফলঃ সদা ।
আসন্ পত্যা পরিত্যক্তা কন্যাদানং যদা কৃতম্ ॥ ২২ ॥
সামন্ত-পাল-নামানো নিষাদাঃ কৃষিজীবিনঃ ।
বরাকা ধর্মশীলশ্চ তস্যাঽসন্ স্তোকবৎ প্রিয়াঃ ॥ ২৩ ॥
স্বধর্মেঽবিচলো বীরঃ কর্তব্যে চ দৃঢ়ব্রতঃ ।
আদর্শার্থং ধনং মানং পদং চ তৃণবৎ কৃতম ॥ ২৪ ॥
স্বকীয়ং সম্পদং সর্বং ঋণ-লব্ধং ধনং তথা ।
দূরীকর্তুং বিপন্নার্তিং হেলয়া দত্তবানসৌ ॥ ২৫ ॥
প্রজ্ঞানেন ঋষির্বৈ সঃ প্রজাহিতে প্রজাপতিঃ ।
বাঙ্ময়-সর্জনা-কৃত্যে বাক্পতিশ্চ কবিস্তথা ॥ ২৬ ॥
সংস্কৃতেঽস্যাচলা শ্রদ্ধা গৌড়গীঃ প্রীতির্ভাক সদা ।
দেবগিরো গুণগ্রামঃ গৌড়েবাচি সমাহৃতঃ ॥ ২৭ ॥
সংস্কৃত বাঙ্ময়স্য বৈ পঠনং পাঠনং তথা ।
শিশুনাঞ্চ সুবোধায় তেন হি সরলীকৃতম্ ॥ ২৮ ॥
এবং বহুপ্রচারো বৈ সংস্কৃতস্য চ ভারতে ।
ভারত-ধর্ম-মূলস্য শ্রীশ্বরশর্মণা কৃতঃ ॥ ২৯ ॥
ঈশ্বরে হি নিরাকারে চৈতন্য-রূপিণে মতিঃ ।
মাতুস্তথা পিতুঃ সেবা তাভ্যাঞ্চাস্থা দৃঢ়া সদা ॥ ৩০ ॥
যত্নো যস্য সদৈবাসীদ্ দীনদুঃখ-বিমোচনে ।
সর্বেষামার্তিনাশায় মাতা স্নেহময়ী যথা ॥ ৩১ ॥

চারিত্র্যাণি সদৈবাস্য মহাপুরুষবদ্ ভুবি।
বজ্রাদপি। কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" ॥ ৩২ ॥
এবং সর্বগুণোপেত ঈশ্বরীয়-বিভূতিমান্।
ভারতীয়-জনানাং হি পুণ্যরূপং বিরাজতাম্ ॥ ৩৩

বিদ্যাসাগরদেবস্য স্বপ্রদেশনিবাসিনা।
বিদ্যাসাগর-পাদেভ্যঃ প্রণামো মে নিবেদ্যতে।
কাশ্যপগোত্র জাতস্য সুনীতি দেবশর্মণঃ ॥ ৩৪ ॥

বাংলো অনুবাদ: সুকুমারী ভট্টাচার্য

প্রাচীনকালে পৃথিবীতে এবং ভারতভূমিতে ধীর মনীষী ও করুণাঘন বীররা ছিলেন। ১। আর ছিলেন ঋষিরা, যাঁরা শাশ্বতব্রহ্মের জ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন, যাঁরা দুঃখসন্তপ্ত মানুষের আর্তি দূর করতেন। ২। এই পুণ্যশ্লোকেরা পৃথিবীর সকল মানুষের পূজনীয় ছিলেন; পুরাকালে আর্যভূমিতে রাজর্ষি-সন্ন্যাসী এবং বোধিযুক্ত মানুষ ছিলেন। ৩। আর ছিলেন উপনিষৎকার বৈদিক ঋষিরা ব্যাস, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, পাণিনি ও পতঞ্জলি। ভারত, বাৎস্যায়ন, কৌটিল্য, মহাবীর, মৌর্যরা, প্রিয়দর্শী অশোক, বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত। ৫। শ্রীহর্ষ, শঙ্করাচার্য, দ্রমিড় মনীষীরা, বিষ্ণু ও শিবের চরণাশ্রিত অড়িবার ও নয়নারবা। ৬। পৃথ্বীরাজ, শিলাদিত্য, বুক্ক, হরিহর, রামানুজ, মধ্ব, বসুরা ও কৃষ্ণরাজ। ৭। কবি-রাজ কবীর, যিনি নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন, কবিকুলে সূর্যস্বরূপ সুরদাস, যিনি কৃষ্ণলীলাগানে বিশ্রুত। ৮। শঙ্করদেব, চৈতন্য, শিখগুরু নানক, সম্রাট্ অকবর যিনি মোগলকুলের অলংকারস্বরূপ। ৯। চিত্রকূটে সিংহ বিক্রম রাণা প্রতাপ, তুলসীদাস গোস্বামী, যিনি ভক্তির বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। ১০। পণ্ডিত ভক্ত কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণে যাঁর স্থির মতি, গৌড়ীয় সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র। ১১। মহারাষ্ট্রে শিবজী, মদ্রে দশম গুরু, শ্রীরামমোহন রায়, যিনি প্রজ্ঞার প্রকাশক। ১২। ভারতের চিৎশক্তির প্রবর্ধক ছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন সুধী মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র। ১৩। বামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ এবং কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ যাঁরা ভারতবর্ষে নবপর্যায়ের বিচারের প্রবর্তনা করেন। ১৪। নূতন ভাবতবর্ষের এঁরা সকলে অলংকারস্বরূপ—স্থৈর্যে, ধৈর্যে ও বীর্যে মনুষ্যকুলে এঁরা দেবস্বরূপ। ১৫। এঁদের মধ্যে প্রথম স্থান মহামতি ঈশ্বরচন্দ্রের। যিনি বিদ্যাসাগর নামে সর্বজনমধ্যে কীর্তিত। ১৬। প্রজ্ঞানে উজ্জ্বল তাঁর বুদ্ধি, বিদ্যায় তিনি সাগরস্বরূপ, কারুণ্যে বুদ্ধতুল্য, সর্বজনে তাঁর মৈত্রী ভাবনা। ১৭। যিনি বিধবাদের প্রতি অত্যাচার অতি নিষ্ঠুর পাপ বলে মনে করতেন, যিনি তাঁদের পুনরায় বিবাহকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলে প্রমাণ করেছিলেন। ১৮। এই (বিধবা)-দের দ্বিতীয়বার বিবাহ যে পাপ নয় তা তিনি দেখিয়েছিলেন, (ফলে) বিধবাবিবাহে যে জুগুপ্সা (পূর্বে) ছিল তা নির্ধারিত হল। ১৯। অপাত্র কুলীন বরে কন্যাদান পুণ্য কাজ, অকুলীন ব্রাহ্মণদের এই ছিল মূঢ় ভাবনা। যুক্তিতর্কের দ্বারা একে অনেকাংশে তিনি নিরাকৃত করেছিলেন। ২১। অকুলীন কুমারীদের বিবাহ সর্বদা নিষ্ফল হত, কন্যাদানের পরপরই এঁরা স্বামী পরিত্যক্তা হতেন। ২২। সামন্ত-পাল নামের যে নিষাদ কৃষকরা ছিল, সে ধর্মশীল বেচারিরা তাঁর সন্তানের মত প্রিয় ছিল। ২৩। স্বধর্মে অবিচল বীর, কর্তব্যে দৃঢ়ব্রত আদর্শের জন্য তিনি ধন, মান ও পদমর্যাদা তৃণবৎ জ্ঞান কবতেন। ২৪। নিজের সমস্ত সম্পত্তি এমনকি ঋণ করে পাওয়া ধনও অনায়াসে বিপন্নজনের দুঃখমোচনের জন্য দান কবতেন। ২৫। প্রজ্ঞানে তিনি সাক্ষাৎ ঋষি, প্রজাকল্যাণে স্বয়ং প্রজাপতির তুল্য। সাহিত্য সৃষ্টির কাজে বাক্‌পতি কবিস্বরূপ। ২৬। সংস্কৃতে তাঁর অচলা শ্রদ্ধা, বাংলাভাষায় সর্বদা প্রীতিশীল। সংস্কৃত সাহিত্যের গুণগুলি তিনি বাংলাভাষায় আহরণ করেছিলেন। ২৭। সংস্কৃতসাহিত্যের পঠন ও পাঠন শিশুদের সহজ অবগতির জন্য তিনি সরল করে দিয়েছিলেন। ২৮। ভারতবর্ষে সংস্কৃতের যা কিছু ধর্মমূলক তার বহুল প্রচার শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা করেছিলেন। ২৯। চৈতন্যরূপ নিরাকার ঈশ্বরে তাঁর মতি ছিল আর ছিল পিতামাতার সেবা, ও তাঁদের ওপরে দৃঢ় আস্থা। ৩০। সর্বদাই তাঁর চেষ্টা ছিল দরিদ্রের দুঃখমোচনে, সকলের ক্লেশ দূর করতে তিনি মাতার মত স্নেহপূর্ণ ছিলেন। ৩১। পৃথিবীতে সকল মহাপুরুষের মত তাঁর চরিত্র ছিল বজ্র অপেক্ষাও কঠোর, কুসুমের চেয়েও কোমল। ৩২। সর্বগুণযুক্ত মানুষটি ঈশ্বরের মত বিভূতিমান্, ভারতীয় মানুষের কাছে তাঁর পুণ্যরূপটি বিরাজ করুক।

বিদ্যাসাগর দেবের একই প্রদেশবাসী কাশ্যপগোত্রে জাত সুনীতি দেবশর্মার—আমার—প্রণাম বিদ্যাসাগরের চরণে নিবেদিত হল।

বিদ্যাসাগর

মধু গোস্বামী

ডাগর ডাগর নোন্‌তা সাগর,
বিদ্যাসাগর, একা
তোমার বুকেই পেলাম প্রথম
মিষ্টিজলের দেখা !

রাম মাহাতোর ছেলেরা নয়
বনমানুষের ছা—
বল্‌লে তুমি : থাকুক আকাশ
ওদের পানে চা,
মুখ্যু থাকার দুখ্‌খু ওদের
খিদের মতই জ্বালায়,
তাইতো ওদের বাঁচার ইচ্ছে
জীবন ছেড়ে পালায় !

সাক্ষরতার জীয়ন কাঠির
স্পর্শে ওদের বাঁচা
মেলুক পাখা, উড়ুক পাখি
ভাঙুক লোহার খাঁচা !

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর

পূর্ণেন্দু পত্রী

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
ভীষণ বাজে লোক
বলতো কিনা বিধবাদের
আবার বিয়ে হোক ?

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
দেখতে এলেবেলে
চাইতো কিনা লেখাপড়া
শিখুক মেয়ে, ছেলে ?

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
দেমাকধারী ধাত্
সাহেব যদি জুতো দেখায়
বদলা তৎক্ষণাৎ ।

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
বুদ্ধিসুদ্ধি কই ?
লিখেই চলে লিখেই চলে
শিশুপাঠ্য বই !

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
কপালে তার গেরো
ওষুধ দিয়ে বাঁচায় কিনা
গরীব-গুর্বোদেরও ?

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
মগজটা কি ফাঁকা ?
যে যেখানে বিপন্ন তাঁর
জোগানো চাই টাকা ?

"We are exceedingly glad to learn that the success which has attended the labours of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar in promoting high education in Calcutta, has induced him to add B.A. classes to the Metropolitan Institution."

Editorial in Hindu Patriot, 1879.

"But Iswar Chandra was not ocean of learning only ; he was an ocean of compassion, of generosity, as well as of many other virtues. He was a Hindu, and a Brahmin too. But to him, Brahmin and Sudra, Hindu and Muslim, were all alike."

Mohondas Karam Chand Gandhi

"The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage the energy of an Englishman and the heart of a Bengali Mother."

Michael M.S. Dutt.

Ishwarchandra Vidyasagar

Mahatma Gandhi

We have already given in these columns brief biographical sketches of a few good men and women of Europe. The purpose of these sketches is to enlighten our readers and to enable them to make their own lives fruitful by emulating these men and women.

The strong movement that is being carried on in Bengal to boycott British goods is of no mean significance. Such a movement has been possible there because education is more widespread and the people in Bengal are more alert than in other parts of India. Sir Henry Cotton has remarked that Bengal holds sway from Calcutta to Peshawar. It is necessary to know the reasons for this.

There is no gainsaying the fact that a nation's rise or fall depends upon its great men. The people who produce good men cannot but be influenced by them. The main reason for the special distinction that we find in Bengal is that many great men were born there during the last century. Beginning with Rammohan Roy[1] one heroic figure after another has raised Bengal to a position higher than that of the other provinces. It can be said that Ishwarchandra Vidyasagar was the greatest among them. "Vidyasagar", which means an ocean of learning, was an honorific of Ishwarchandra, conferred on him by the pundits of Calcutta for his profound Sanskrit learning. But Ishwarchandra was not an ocean of learning only; he was an ocean of compassion, of generosity, as well as of many other virtues. He was a Hindu, and a Brahmin too. But to him, Brahmin and Sudra, Hindu and Muslim, were all alike. In any good deeds that he performed, he made no distinction between high and low. When his professor had an attack of cholera, he himself nursed him. As the professor was poor, Ishwarchandra called in the doctors at his own cost and himself attended to the patient's toilet.

He used to buy *luchi*[2] and curds and feed the poor Muslims at his own cost, in Chandranagar[3], and helped with money those who needed it. If he saw a cripple or any one in distress by the roadside, he took him to his own house an

nursed him personally. He felt grief at other people's sorrows and joy at their joys.

Himself he led a very simple life. His dress consisted of a coarse *dhoti*, a shawl of a similar kind to cover his body, and slippers. In that dress he used to call on Governors, and in the same dress he greeted the poor. He was really a *fakir*, a *sannyasi* or a *yogi*. It behoves us all to reflect on his life

Ishwarchandra was born of poor parents in a small village in the Midnapur *taluka*[4] His mother was a very saintly woman, and many of her virtues were inherited by Ishwarchandra. Even in those days, his father knew some English, and decided to give his son a better education. Ishwarchandra began his schooling at the age of five. At the age of eight, he had to walk sixty miles to Calcutta to join a Sanskrit college. He had such a prodigious memory that he learnt the English numerals by looking at the figures on the milestones while walking along the road. At sixteen he became well versed in Sanskrit, and was appointed a Sanskrit teacher. Rising step by step, he at last became the Principal of the College where he had studied. The Government held him in great respect. But, being of an independent nature, he could not adjust himself to the Director of Public Instruction and resigned his post. Sir Frederick Halliday, the Lieutenant-Governor of Bengal, sent for him and requested him to withdraw his resignation, but Ishwarchandra flatly declined.

His nobility and humanity had their true blossoming after he had given up his job. He saw that Bengali was a very good language, but appeared poor for want of fresh contributions. He, therefore, began writing books in Bengali. He produced very powerful books, and it is mainly due to Vidyasagar that the Bengali language is at present in full bloom and has spread throughout India.

But he also realised that merely writing books was not enough ; and so he founded schools. It was Vidyasagar who founded the Metropolitan College in Calcutta. It is staffed entirely by Indians.

Considering that elementary education was quite as

---

1. (1774-1833), A great social and religious reformer, founder of the Brahmo Samaj, supported abolition of *sati* and worked hard for the spread of education.
2. A kind of unleavened and fried bread made from flour
3. In West Bengal, then a French possession.
4. In West Bengal

necessary as higher education, he started primary schools for the poor. This was a stupendous task in which he needed government help. The Lieutenant-Governor assured him that the Government would bear the cost ; but the Viceroy, Lord Ellenborough[1], was opposed to this and the bills preferred by Vidyasagar were not passed. The Lieutenant-Governor was very sorry and suggested that Ishwarchandra might file a suit against him. Brave Ishwarchandra replied : "Sir, I have never gone to a court of law to get justice for myself. How, then, is it possible for me to proceed against you ?" At that time other European gentlemen who used to help Ishwarchandra in his work rendered him good financial aid. Not being very rich himself, he often ran into debt by helping others out of their difficulties ; nevertheless, when a proposal was made to raise a public subscription for him, he turned it down.

He did not rest satisfied with thus putting higher and elementary education on a sound footing. He saw that, without the education of girls, the education of boys alone would not be enough. He found out a verse from Manu which said that the education of women was a duty. Pressing it into service, he wrote a book on the subject and, in collaboration with Mr. Bethune founded the Bethune College for imparting education to women. But it was more difficult to get women to go to college than to found it. As he lived a saintly life and was very learned, he was respected by all. So he met prominent people and persuaded them to send their womenfolk to the College ; and thus, their daughters began to attend the College. Today there are in that College many well-known and talented women of sterling character, so much so that they can by themselves carry on its administration.

Still not satisfied, he started schools imparting elementary education to small girls. Here food, clothing and books were supplied free of charge. Consequently, one can see today thousands of educated women in Calcutta.

To meet the need for teachers he started a Teachers' Training College.

Seeing the very pitiable condition of Hindu widows, he advocated the remarriage of widows ; he wrote books and

---

1 Governor-General of India, 1842-4

made speeches on the subject. The Brahmins of Bengal opposed him, but he did not care. People threatened to kill him, but he went on undaunted. He got the Government to pass a law legalizing remarriage of widows. He persuaded many men and arranged the remarriage of daughters of prominent men widowed in childhood. He encouraged his own son to marry a poor widow.

The *kulin* or high-born Brahmins were given to taking a number of wives. They were not ashamed of marrying as many as twenty of them. Ishwarchandra wept to see the sufferings of such women ; and he carried on his efforts till the end of his life to eradicate this wicked custom.

When he saw thousands of poor people in Burdwan suffering from malaria, he maintained a doctor at his own cost and personally distributed medicines among them. He went to the houses of the poor and gave them the necessary help. In this way he worked ceaselessly for two years, secured government help and called for more doctors.

In the course of this work, he saw the necessity of a knowledge of medicine. So he studied homoeopathy, attained proficiency in it, and began to prescribe medicines to the sick. He did not mind travelling long distances in order to help the poor.

He was equally a stalwart in helping big princes out of their difficulties. If any of them had injustice done to him or was reduced to poverty, Ishwarchandra used to help him with his influence, knowledge and money, and mitigate his distress.

While he was engaged in these activities, Vidyasagar passed away in 1890, at the age of seventy. There have been few in this world like him. It is said that, had Ishwarchandra been born among a European people, an imposing column, like the one raised by the British for Nelson, would have been erected as a memorial to him. However, a column to honour Ishwarchandra already stands in the hearts of the great and the small, the rich and the poor of Bengal.

It will now be clear to us how Bengal provides an example for the other parts of India to follow.

[From Gujarati]
Indian Opinion, 16-9-1905

Works and Activities In Retrospect

Gopal Haldar

"Introduction of widow remarriage has been the greatest good work I have done in my life", wrote Iswar Chandra Vidyasagar in the letter of 31 Sravana 1367 B.S. (about 11 August 1860) to his younger brother Sambhu Chandra Vidyaratna in emphatically declaring his active support to his only son—Narayan—marrying a widow of his own accord. Sambhu Chandra had desired the elder brother to prevent that marriage ; for it was bound to lead to their friends and relations boycotting them. Vidyasagar wrote the reply to that letter only after the marriage was an accomplished fact. We quote the relevant extract (the original, of course, is in Bengali) :

> "Narayan has married the girl of his own choice.....it would not have been at all proper for me to withhold my consent and put obstacles in the way...... I am personally responsible for getting widow remarriage legalised, and I have taken initiative in marrying many widows...... By this marriage at his own free will Narayan has not only added lustre to my name, but has also won his way to be rightly regarded as my son. Introduction of widow remarriage has been the greatest good work I have done in my life. There is hardly any possibility for me achieving anything greater in this life. I have ruined myself materially for it, and, if necessary, I shall not shrink from laying down my life for it......."

Such is the letter in brief ; it is worth reproduction in toto. It gives memorable evidence of Vidyasagar's character of which Tagore and others have spoken in deepest regard. It gives also Vidyasagar's own views of his activities and points to his scale of values too. This has to be fully acknowledged, although some of his activities may not appear equally relevant about a hundred years after.

Vidyasagar's activities fall mainly, as we see in retrospect, into three categories :

(1) Social reform : campaigns for (a) widow remarriage, (b) against polygamy, (c) for women's education.
(2) Educational activities : (a) work in Sanskrit College, (b) ideas on medium of education and languages to be learnt, (c) work for popular education, and (d) founding and running of schools, colleges, etc.
(3) Literary contributions : purpose, position in literature, varieties of style as revealed.

1. Social Reform

Act XV of 1856, which made the remarriage of Hindu widows valid, was really the biggest piece of achievement in the nineteenth century history of Indian social reform movement. Vidyasagar was the main figure and the object of orthodox hatred, and to a small extent of grateful admiration of the progressive section of Hindus. The prohibition of the suttee (1829) did not raise any big storm. But the Widow Remarriage Act is said to have added to the mistrust of the sepoys and orthodox society and acted as another cause for the rising of the sepoys (1857-58) ; and contemporary evidence goes to show that Vidyasagar and the active participants in widow remarriage in Bengal were supposed to be in danger from the rebel sepoys.

Widow Remarriage Movement

Looking back, we find that Vidyasagar was not really the first in the field. In 1819, along with the burning of widows, compulsory celibacy of the widows and polygamy prevailing in the Hindu society were being condemned by Ram Mohun Roy's members of the Atmiya Sabha.* The Young Bengal in their organ *The Bengal Spectator* raised the same question in 1842 in clear and definite terms, and even referred, in support of remarriage of widows, to the well-known couplet from *Parasara Samhita*, which was to serve as a powerful weapon in Vidyasagar's own hands.

But Iswar Chandra was the first to make the question a cause and the object of an immediate campaign. Iswar Chandra's first public entry in the field was marked by his article in *Tattvavodhini Patrika* (Phalgun 1776 Saka era—January 1855). A second was to come some months later in the same *Patrika* and both were reprinted as

* *Calcutta Journal*, Vol III, 9 May 1819, quoted by Binoy Ghosh, *Iswar Chandra Vidyasagar*.

pamphlets for campaigning. It is believed that he had been working on the question for some time, and had even, as was his habit, secured the approval of his father and mother before he launched the campaign. At any rate, as a man of very practical turn of mind, he knew he must beat the orthodox at their own game, prove with scriptural texts that widow remarriage is permitted by Hindu sastras, if he was to win complete victory, i.e. get the necessary legislation passed, first, and then make the widow remarriage an accepted practice in the traditional Hindu society. Equipped with sastric texts, he planned the campaign carefully, exerting all his influence on the rulers and on the Hindu society at large. He must have, therefore, known the views and works of the Young Bengal in the matter, for some of their stalwarts like Ram Gopal Ghosh were close to him. In practice, the group had now faded out.

As a leader of the editorial group of the *Tattvavodhini Patrika* in its heyday, Vidyasagar was the leading figure of enlightenment and education, and at the zenith of official position (1854-58) as well. His personality, position, energy and determination—all were put at the service of the widow remarriage campaign. Pamphlets were poured out and the counterattack was soon afoot as well. Raja Radhakanta Dev, the patron of the orthodox, was personally Vidyasagar's admirer, but the Raja allowed himself finally to be ranged against the movement, and the counterattack grew stronger. It was of burning interest to all. Poets like Iswar Chandra Gupta and bards like Dasarathi Ray were vocal in support of Vidyasagar in verse and song, and weavers of Krishnagore wove words of folk-songs on widow remarriage campaign into the saris they made.

In the midst of all this, the first petition in favour of the movement was submitted on 4 October 1855 by Iswar Chandra Sarma requesting the government to pass a law removing all obstacles to the marriage of Hindu widows. By this time the rest of India was also stirred, for it was to be a measure affecting Hindu widows everywhere. Support came from the influential circles of Maharashtra and South India. But opposition on the whole appeared to be more powerful. Bengal was the centre of the storm; about 20 petitions, for and against, were submitted with about 50,000 signatures. About 100 pamphlets were addressed to an

excited public. It is estimated that no more than a mere 10 per cent of them were on the side of Vidyasagar ; but these included the men of light and leading sections of Brahman houses like the Maharaja of Nadia, eminent Vaishnava pandits, and even a number of leading men from distant Chittagong. To cut the story short, the Act as desired was passed. It was only a permissive law which made widow remarriage valid in the eye of law. A new chapter now opened in the campaign to make widow remarriage socially valid and acceptable among Hindus. The traditional Hindu marriage customs and practices had naturally to be adhered to, to make that acceptance smooth as far as possible. The realist was a practical man.

With unbounded energy Vidyasagar threw himself into the practical task : widow remarriages were now to be arranged, and were to take place in the traditional Hindu way. He exercised all his influence to persuade eligible men and women (through guardians of the women, in fact) to contract such marriage ; he induced all his friends and sympathisers to join in the ceremonies, and broke with any, who like Radhaprasad Roy, son of Ram Mohun Roy, hesitated. He met the expenses of such marriages from his own pocket, made personal presents to the brides, and, as further inducements for the bridegrooms, paid for the ornaments demanded as dowry by them. And once that concession was made there was to be no end to it. With his usual impetuosity he ran into debts which he could not pay at that time. Worse still, cheats and charlatans were not slow to take advantage of all this ; and often such marriages proved failure, the newly wed husband leaving the wife and marrying another and deceiving everybody concerned.

While the movement was being undermined from within, the orthodox from the very beginning had launched their attack on Vidyasagar personally and on the participants in general. The first widow remarriage took place on 7 December 1856, the bridegroom was a junior colleague of Iswar Chandra at Sanskrit College—Sris Chandra Vidyaratna. Others were to follow. Contemporary reports show what a sensation the first occasion made in Calcutta and how excited were the people on both sides. For Vidyasagar and his friends those were days of triumph and hope ; for the opponents of anger and vituperation. Personal vili-

fication of Vidyasagar was always their main argument ; they began to add to it physical attack. In streets rowdies were set to throw stones or dust and dirt at him while passing. His life was threatened. All that only steeled the pandit, who took up the challenge fearlessly. His will and energy won the day for some time.

Then things began to take a different turn, particularly in Bengal. The sepoy outbreak in 1857 indirectly proved a damper ; it made the British rulers cold to social reform movements in general. Of course, Vidyasagar was not to be put out. Often he found the marriages involving him into debts and proving at the same time disappointing, as we saw. Friends began to cool off as time passed ; his debts mounted and put him into trouble. His experience made him wary ; his disappointment grew deeper and in spite of his unflagging zeal he was getting completely disillusioned even of his friends and one-time supporters. There are ample proofs in the matter. A letter to his friend Dr Durga Charan Banerjee, extracts from which we quote, speaks for itself :

> ".....I have not been able to find out any means of clearing the debt I owe you.... You are well aware.... I had borrowed it for the expenses of the widow remarriages ; you are not the only creditor ; there are many others also. I expected the promised sum of the patrons of widow remarriage would be received soon, and that I should be able to clear my debts Unfortunately most of the rich men (*dhani lok*) who wanted to patronise it did not keep their promise..... and I am hopelessly getting into debts without any hope of discharging them.... If I had an idea of the worthlessness, dishonesty and lack of integrity of the big people (*bara lok*) of our country, I might perhaps not have ventured on this (movement of) widow remarriage....."

Yet Durga Charan was only irregular and slack, he did not withdraw his support. Of course, Vidyasagar continued the venture to the last days of his life. Could he have acted otherwise, if even at the beginning he had known that friends would let him down ? And unscrupulous men would make a victim of him for his passion for widow remarriage ? Anybody having an insight into Vidyasagar's character would hold that that would be out of question

for him. He outlived the material assault, but not the spiritual assault—entirely. The widow remarriage movement began to languish in Bengal. It has been accounted for variously, viz the stubborn opposition of the orthodox ; the gradual rise of Hindu nationalism (from about 1870) and Hindu revivalism in the educated Hindu circle (cf. Bankim Chandra). This made reform through government legislation by alien rulers suspect, even undesirable and indirectly put a premium on orthodoxy, and even on obscurantism.

The Indigo Revolt (1859) was followed by the steady rise of political consciousness (Hindu Mela, 1865 ; Indian Association, etc.) among the public spirited educated set in Bengal. From all these Vidyasagar held himself aloof, and deprived himself, as we noted, of his best potential workers ; and his most sincere allies, the young Brahmos. They were partially weakened by their own schism (1878) ; and quite rightly they were further attracted by political work. Even the Ramkrishna Paramahansa movement, let by that fiery preacher of aggressive Hinduism, Swami Vivekananda, fed indirectly Hindu orthodoxy and the antimodern Sanatanist proclivities.* For the time being at any rate in Bengal Vidyasagar was alone. Yet in his last days he must have felt that where Bengal failed, the Arya Samajists in the Punjab and Northern India and the Prarthana Samaj in Maharashtra had come forward to make of his dear cause, the widow remarriage programme, a steady success. Maharashtra in particular produced from the last quarter of the nineteenth century some of the most capable, rational and sincere leaders in the cause of widows and of women in general : Ranade, Malabari, Ganesh Vasudeb Joshi and last, but not the least, Dhonodo Keshav Karve. The shameful indifference of the Bengali Hindus, particularly of its rich men and big men, and of the bhadralok in general, and the low morality of the men who often contracted widow remarriage in Bengal made Vidyasagar feel utter disgust. He succeeded in paying off the debts he had incurred, thanks to the income he had from his publishing business ; but his faith in the goodness of man was badly shaken by the dismal experience of the widow remarriage movement.

* It is pardonable to hold that the "ajeya paurusa" was an unconscious legacy for men like Vivekananda, and for the fighters for freedom like Subhas Chandra Bose. They appear to have had the Vidyasagar spirit in them

Against Polygamy

Widow remarriage campaign had at least obtained partial success—it got legal sanction. But the campaign against polygamy, and against kulinism in particular in Bengal, was not able to get even that legislative seal. Polygamy prevailed in India, as in many other man-made societies, from ancient times. It had taken a most cruel and heinous form in Bengal in the shape of kulinism in the upper sections of Bengali Brahmans. It divided them into a few exclusive compartments ; and a girl of a set had to be married to a man of corresponding set or was to remain unmarried ; and that again meant gréat sin for the girl, her parents and family. The kulin Brahman men were in high demand naturally and some made a paying business of it, marrying, for a fee, scores of girls and of different ages, from children to greying maids, to save their souls. There was no sastrik injunction in favour of kulinism, neither however any against polygamy too.

No voice against polygamy appears to have been raised in India before modern education made its inroads. Here too Ram Mohun Roy and the Young Bengal were first in the field. *Kulin-kula-Sarvasva*, the first original Bengali drama to be staged in 1854, written by Ram Narayan Tarkaratna (*b* 1822), was a faithful exposure of kulinism. The very popularity of the play showed that the public disapproved of kulinism. Vidyasagar had first written against polygamy in 1850.

The passing of the Widow Remarriage Act in 1856 encouraged Vidyasagar to take up the cause against polygamy and seek its abolition through the same channel, i.e. through a legislation banning polygamy. He set himself to work without delay. He organised the first deputation for banning polygamy in December 1856. A mass petition to the governor-general was also addressed. A bill was promised by the government side. But the sepoy rising intervened and led to a policy of retreat, as we said, on the part of the British rulers from progressive social legislation in general in deference to the socio-religious susceptibilities of their native subjects. The campaign gathered some momentum again in 1866, and a sympathetic lt-governor of Bengal, Sir Cecil Beadon, promised support. But the governor-general-in-council would not advance beyond appointing a committee to inquire and report on the position. All the Indian members of the committee except

Vidyasagar wanted to leave redress of the evil to time and education. Finally, the secretary of state for India objected to any measure of legal interference with social and religious customs.

Vidyasagar did not realise that it was not in the interest of imperialism to help Indian society to purge itself of its social evils. (We know polygamy among Hindus was banned only after independence, with the passing of the Hindu Code Act.) But to return to the antipolygamy fight of Vidyasagar, he was not silenced by the government's refusal to ban the evil. He took up his pen and produced his first tract against polygamy in 1871, twenty-one years after that of the first unsigned article in a journal. The second antipolygamy tract came out in 1873. There were more polemical anonymous pieces. These were brilliant satirical pamphlets. But neither would the authorities be persuaded nor could the national sentiment be won over from its growing feeling against "reforms through legislation by the foreigners."

Vidyasagar could not appreciate the point. The failure made him doubt the sincerity of his countrymen. Did they try on their own—forswearing legislative interference—and take positive means to fight against social evil, national shame and inhumanity ?

Women's Education

Vidyasagar's passion for removing social backwardness told him from the very beginning that two things were basic for any reform : firstly, education to rouse consciousness of the people, i.e. schools and educational literature ; secondly, removal of the crying evils through legislation. So, he was active in the cause of women's education from the beginning. His main activities here consisted of his service to the Bethune School as its first and very capable honorary secretary ; his efforts at founding girls' schools in villages when he was the special inspector of schools, which brought him into conflict with authorities and led in a way to his resignation ; his running girls' school at Birsingha at his own expense ; his lifelong interest in the cause of women's education and in their higher education also (e.g. his happiness was overflowing at the success of Chandramukhi Bose, the first woman M.A. of the Calcutta University) ; and, lastly his service in amelioration of the women's condition (e.g. the opinion on the Consent Bill was written in 1890—almost on his death bed).

Without going into details, we may recall the main features of these activities.

Women's education was, of course, first taken up by the Christian missionaries in Calcutta and its neighbourhood (about 1819) as an ancillary to their missionary work. Raja Radhakanta Dev founded a girls' school (about 1829) in the Sovabazar House. The government evinced interest later when Sir J. E. Drinkwater Bethune, president of the then Education Committee, founded the Calcutta Female School on 7 May 1849. This school came to be renamed the Bethune School in 1851 in grateful memory of its founder. Sir Drinkwater had enthusiastic support from the Young Bengal group (especially from Dakshina Ranjan Mukherjee) and Vidyasagar and his friends. Sir Drinkwater knew the views and efficiency of Vidyasagar, and invited him to be its honorary secretary in December 1850. No other man, Bethune felt, would be so capable in practical management, so determined in fighting all opposition and so respected by the people in general. Bethune unfortunately passed away a few months later, but the government of Dalhousie had already bestowed its patronage on the school, and Vidyasagar continued as honorary secretary of the Bethune School Committee till March 1869—though his energy and attention at the time were not confined to the school alone. Its progress was continuous. Reports spoke of its rise in public estimation, and Vidyasagar's personal efforts to disabuse the Hindu minds of age-old prejudices against girls being sent to schools. He drove from house to house persuading parents to send girls to the school ; and took very good care of each and every such girl.

The strong-willed individual as Vidyasagar undoubtedly was he was capable of reasonable—but not of doubtful—compromise. An occasion, however, later arose when the school was sought to be turned into a training school for women teachers. Very correctly Vidyasagar, who admitted the necessity for such teachers, pointed out that in that state of Bengali society suitable grown-up women as would command the confidence of the Hindu parents would not be forthcoming for training. The authorities, however, insisted and very quietly Vidyasagar stepped down in 1869—though, as foreseen by him, the scheme proved a failure and had to be abandoned three years later (1872).

The Bethune School, however, had been placed on a firm footing by Vidyasagar and continued to flourish to become the

first women's college in Calcutta; and Vidyasagar's friendly eyes never ceased to watch its advance, nor to greet the first women students—Kadambini Bose (later Dr Mrs Ganguli) and Chandramukhi Bose, when they took the university entrance examination from the school in 1878. They became the first women graduates of Bengal in 1883. It was an ailing Vidyasagar who rejoiced and presented Chandramukhi Bose in 1884 a copy of Cassell's illustrated *Works of Shakespeare* with warmest words of congratulation when she passed the M.A. examination in English. In those years of dejection it was a great solace for Vidyasagar to know that his educational efforts were not all in vain.

Looking back, everybody must agree with Benoy Ghosh, one of our contemporary biographers of Vidyasagar, "No cause was nobler or dearer to him than this, and against nothing did he fight so intrepidly as he did against subjection of women." He took up concrete issues like widow remarriage, polygamy, etc. and chose his method and technique of campaign with intrepidity. Unlike the Young Bengal, to a certain extent unlike the Brahmos of Bengal as well, Vidyasagar was no rebel, but a reformer ; and he was unwilling to be alienated from the mainstream of Hindu life and to cause any violation or dislocation in the traditional society. He was essentially practical, even businesslike as we know. But he would not yield for the matter on any major point nor make any concession out of expediency. He would not be driven to the nationalist revivalist direction ; neither would he break with traditional norms, if they were not harmful, simply because they were meaningless.

Indeed, though Vidyasagar's reform efforts were of all-India character, undoubtedly due to the very undeveloped state of the Bengali society, those were limited in scope and character. Widow remarriage, for example, has always prevailed in the lower strata of Hindu society, i.e. among more than 80 per cent of the Hindus. It was banned only among the upper castes. So also kulinism prevailed among a very narrow section of Bengali Brahmans. Both were actually harmful, and, as he felt, inhuman. Both, particularly widow remarriage, have ceased today to be important problems with the socio-economic developments in the twentieth century. Medievalism did not die so easily for the matter. And what a storm they raised !—and how Vidyasagar, even in apparent defeat, stood against that like a rock, solitary, unique and tragic

in his loneliness—as is often the lot of a hero.

Educational Activity

In many of his activities Vidyasagar was in his day robbed of his final victory. The crown of success in the field of education should have been his. It was the life he was called upon from the very start to accept , and in all his activities he remained an educationist. It is not possible to review his activities here in detail.

Administrative Success

Bengalis were not generally trusted with administrative responsibility in those days ; they are even now not famous for that ability. Vidyasagar, who resigned one post after another, was often said to be incapable of teamwork with all and sundry. But no one could but admire his capacity as administrator, whether in Sanskrit College as its principal or in the education inspectorate as a Special Inspector (in addition to the principalship), in the management of the Bethune School, or of his own Metropolitan School and College. With unparalleled competence he worked directing many noneducational bodies and activities he was connected with (like the Hindu Family Annuity Fund ; relief works for the famine-stricken or the sick). And everybody feels that laxity, muddleheadedness and even stupidity of the authorities and of his fellow-workers were no less a factor than his own strong individuality and inflexibility for the many clashes and breaches with them. The stubbornness he inherited from his grandfather was admittedly there, but not indolence or inefficiency or semifeudal slackness. Nor any personal ambition or selfinterest could be traced in the least in him. Energy, drive, stubbornness, absolute honesty and infinite capacity for hard work—these were the outstanding marks of that individualism and these enabled him to turn a messy body like the former Sanskrit College into a modern institution fit to impart modern knowledge.

These qualities made Halliday's popular educational scheme in vernacular and girls' schools a resounding success in an unbelievably short time ; and a badly run Calcutta school developed into a well-conducted school at first, then into the first nonofficial Indian college, the Metropolitan College (now called the Vidyasagar College) He worked for this last institution very hard and

supervised its teaching almost day to day. He managed it directly even when he was ailing and made the students thoroughly disciplined, and at the same time his friends, won over by personal affection. He chose the teachers like Surendranath Banerjee with care ; and with love, sternness and sympathy he made them the best teachers of the time, and his college one of the best in teaching and discipline. It was a nursery for future public men of Bengal. This was a proof of administrative capacity of a Bengali and nobody can rob him of this success.

Educational Ideas

But above all, we should recall that Vidyasagar was no mere day-to-day routine worker or aimless slave-driver. In everything he did, he had a well-thought-out plan and programme. From the very first, when he joined Sanskrit College in 1846, we find that his plan embraced the entire field of education. He had already thought out what was to be the content of our education, and what the form ; and further what other measures were needed to spread education among the people in the countryside and make knowledge fruitful.

The first clear hint about the kind of education Vidyasagar desired to be imparted is found in his suggestions for reforms in the Sanskrit College and in the letter in which he explained the reason for his resignation from the assistant secretaryship of the Sanskrit College. The reforms he desired to introduce were to facilitate—the extract is worth repeating, we feel—

> "the acquirement of the largest store of *sound Sanskrit and English learning combined*, under the impression that such a training is likely to produce men who will be highly useful in the work of *imbuing our vernacular dialects with the science and civilisation of the Western world*" (emphasis added).

Here, in fact, is the keynote of Vidyasagar's educational ideas—Vidyasagar was only 25 then. He was emphasising the three crucial points of it : combining Sanskrit and English learning ; making the vernacular the properly equipped medium of education ; and, lastly, the point that we wanted to be emphasised at the moment, the content of that education was to be "the science and civilisation of Western world", by which was meant what we popularly call modern knowledge. Modern knowledge was

essential for modernising Indian society ; Vidyasagar had realised this truth even before he was 25. Five years later, we find these points elaborated in the very business-like "Notes" on the Sanskrit College dated 12 April 1852 (see supra p. 31). There we are told that competent men were to collect such educational materials (as Vidyasagar himself did) "from European sources and to dress them in elegant, expressive, idiomatic Bengali". If widow remarriage was the greatest act of Vidyasagar's life, as he thought, introduction of "the science and civilisation of the Western world", dressed "in elegant, expressive idiomatic Bengali" for the Bengalis, was the central purpose of Vidyasagar's educational plan. The pandit, a former student of Sanskrit College, had better insight into the revolutionary role of English education than all the Young Bengal and the rebellious products of the Hindu College. He knew the content of the education that we must have ; he knew what form our education must take ; viz, the modern Indian languages of India, like Bengali, Hindi, Tamil, etc. must be media of such education. The foundations of Indian national education, its ideology and shape, were thus clearly envisaged and indicated first by Iswar Chandra Vidyasagar. Modern knowledge must be naturalised through our own languages and become our national possession.

Policy, Plan and Programme

Certainly our modern Indian languages were not as yet competent to embody the modern knowledge ; that had to be done with the help of some European language. English was the richest storehouse for that. Vidyasagar, the Sanskrit College scholar, had a better grasp of the situation than most other Anglicists and Orientalists of his time, or most other English-medium-wallas or rastra-bhasa-medium-wallas of our day. And he was a man who had a policy and a plan with which he set to work ; he was never the man to talk in the air. His plan, the part of it with which he was immediately concerned, was twofold ; it was to equip the modern languages like Bengali, properly ; and that could be done by men who must first learn Sanskrit, the source of most of our tounges, so well as to be able to understand the genius of their own languages (like Bengali) and be capable of feeding the latter with the gifts of the former. Secondly, such men must at the same time learn as much of the English language

as would enable them to draw from that source essential modern knowledge. Both Sanskrit and English, the two languages, in addition of course to their own vernacular (mother-tongue or the regional language), have to be learnt and their gifts combined, for equipping that vernacular as the medium of education. Vidyasagar put the points clearly in his "Notes" on the Sanskrit College of 12 April 1852. We quote here the most relevant portions of the 26 para "Notes"—leaving out the details of the programme, the scheme of studies, administrations, etc. :

> "(1) The creation of an enlightened Bengali literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of education in Bengal.
>
> "(3) An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanscrit scholars. Hence the necessity of making Sanscrit scholars well versed in the English language and literature."
>
> "(4) Experience proves that mere English scholars are altogether incapable of expressing their ideas in elegant and idiomatic Bengali. They are so much anglicised that it seems at present almost impossible for them, even if they make Sanscrit their afterstudy, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali style."
>
> "(5) It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali literature."

Vidyasagar then goes on to ask "(6) Our next question is what sort of instruction in the Sanskrit College is necessary for the purpose ?", and in course of answer explains his attitude to the traditional studies of Sanskrit

> "(15) As to the utility of the study of these in a college course I should quote the words of my report dated the 16 December 1850,
>
> "(16) 'True it is that the most part of the Hindu system of philosophy does not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is absolutely required.' By the time that the students come to the darshana or philosophy class their

acquirements in English will enable them to study the modern philosophy of Europe. Thus they shall have ampler opportunity of comparing the system of philosophy of their own, with the new Philosophy of Western World. Young men thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy, than if they were to derive their knowledge of philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why I have ventured to suggest the study of all the prevalent systems of philosophy in India is that the student will clearly see that the propounders of different systems have attacked each other and have pointed out each other's errors and fallacies. Thus he will be able to judge for himself. His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems."

The whole attitude is to be understood keeping in view his earlier polemical answer to Ballantyne's plea for depriving Sanskrit studies of modern perspectives. Vidyasagar asserts in his letter to F. J. Mouat*

"....For certain reasons which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanscrit College. That the Vedanta and Sankhya are false systems, as they command unbounded reverence from the Hindus. Whilst teaching these in the Sanscrit course, we should oppose to counteract their influence. Bishop Berkeley's *Inquiry*, which has arrived at similar or identical conclusions with the Vedanta or Sankhya and which is no more considered in Europe as a sound system of Philosophy, will not serve that purpose. On the contrary, when, by the perusal of that book, the Hindu students of Sanscrit will find that the theories advanced by the Sankhya and Vedanta system are corroborated by a Philosopher of Europe, their reverence for these two systems may increase instead of being diminished."

And later,

".....What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of vernacular

* Dated 7 September 1953

schools, let us prepare a series of vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country. To raise up such a useful class of men is the object I have proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of our Sanscrit College should be directed."*

And once more—writing to Dr Mouat :

"Leave me to teach Sanscrit for the leading purpose of thoroughly mastering the vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of English and you may rest assured that before a few years are over I shall be enabled if supported and encouraged by the Council to furnish you with a body of young men who will be better qualified by their writings and teachings to disseminate widely among the people sound information than it has hitherto been possible to accomplish through the instrumentality of the educated clever of any of your colleges whether English or oriental. To enable me to carry out this great, this darling object of my wishes I must (excuse the strong word) to a considerable extent be left unfettered...."

Apart from the polemical tone, these letters shed very useful light on Vidyasagar's character and his educational ideas.

It may be presumed that once our vernaculars (like present-day Bengali) reach the take-off stage, and become the natural vehicle of our education and cluture, Sanskrit will come to be regarded as less urgent, having served its main purpose as a nurse-mother to them (Sanskrit is also not so urgent for Dravidian languages ; Vidyasagar's immediate concern was Bengal, we should remember). But English, further developed now as the world language of communication, culture and scientific researches, is to take the second position, next to the vernacular, in such a three-language educational programme for the India of the present day.

* Lette to F. J. Mouat, 5 October 1853

Looking back, we emphatically hold that Vidyasagar had the first clear conception of Indian national education fit for modern times. He had a clear conception of the language problem of India as well in the educational sphere. And, if his educational policy and plan had a chance, his three-language formula would have placed our national languages on their feet by this time. His plan, therefore, remains, with timely modification as hinted above, highly relevant still.

The other item of Vidyasagar's policy was popular education. Even in the report of 1846 he had observed the basic purpose was to spread education among the people. Education at that time (before 1850) was confined to some towns and townships, mostly near about Calcutta. English was its medium, Sanskrit was studied in tols. But the mother-tongues, i.e. study of modern Indian languages, were almost ignored. The "filtration" theory in education of the 19th century held that knowledge learnt through English by the few elite boys in their schools would filter down to the people and to the villages. In fact it was a ruling class plan for the production of the office clerks. If people in general were to be educated, they could be educated only through their own language and not through any foreign language. Moreover, people must have direct access to knowledge through schools and should not be left outside waiting for education to filter down. So an essential part of Vidyasagar's educational plan was to carry education through vernaculars to the villages, to the boys and girls, as quickly and as widely as possible. Halliday's scheme, which took shape as a result of "several consultations with Vidyasagar", gave Vidyasagar a brief chance (1854-58) to carry forward his plan for popular education with the "Banga Vidyalayas" The story is known. British rulers, as also the Indian bhadralok classes, had no sympathy for such popular education, nor for education through people's languages. Vidyasagar was disappointed with the authorities, and hinted that in his letter of resignation (1858), though he had not visualised universal education then.

A great programme got no chance. So the first attempt at introducing national education failed. It took long for the Bengali language to find even a "place in the step-mother's hall". i.e. in the Calcutta University studies. Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chatterjee and Gurudas Banerjee had vainly pleaded for the cause of Bengali in the university's higher education

system during the last decades of the 19th century. Bengali as the medium of education was unthinkable !

Literary Contribution

While resigning his post in 1858, Vidyasagar clearly declared that he intended to devote himself to the service of Bengali literature and writing more and more Bengali books for schools and for spreading knowledge among his countrymen. Vidyasagar, in fact, did not try to create a "literature of power" but a "literature of information" in the main. He thus worte mostly for educational purposes or for social reform. But he knew that even for the purpose his style should be elegant, expressive and idiomatic. These qualities elevate what he wrote to the high level of literature.

Literature of Purpose

Vidyasagar hardly wrote anything without a purpose – except a few things like *Prabhavati Sambhasan* and *Atmacharit* which remained in manuscript and are highly revealing pieces of literature. Of the educational books, some like *Upakramanika*, *Rijupatha*, etc. were meant to make the way to Sanskrit easy for students. Of the Bengali educational books, some are free translations like the *Betal Panchavimsati*, but others are mostly compilations from original English, like *Banglar Itihas* (1848), *Jivan Charit* (1849), *Bodhodaya* (1851), *Kathamala* (1856), *Charitavali* (1856), etc. But a few, though classed as "translation" or "compilation"—e.g. *Sakuntala* (1854), *Sitar Banavas* (1860), and even *Bhranti-vilas* (1869) based on the *Comedy of Errors*, are more original literary compositions than translations. The pamphlets on widow remarriage, against polygamy, etc. are undoubtedly original and very good examples of argumentative prose. But the polemical pseudonymous pamphlets like *Ati alpa haila* (1873), to *Ratna-pariksa* (1886) etc. are revealing examples of limpid and satirical prose, very different from the chaste style, "Vidyasagari-bangla", associated with his name. It is not possible here to take proper notice of Vidyasagar's contributions, book by book. We have to confine ourselves to pointing out their nature and their main features, their place in Bengali literature and their essential value as literature.

As in all other things, here too we find his realist outlook and methodical mind at work in writing educational literature. His

books were to equip the Bengali language, and Bengali as a language was so far unsure of itself in its prose construction, syntax, vocabulary, etc. It must draw on Sanskrit, its great Indo-Aryan predecessor, to equip itself as desired. So the way to Sanskrit, writing, printing, publication, everything connected therewith, had also to be planned ; and graded textbooks in both languages, suitable with regard to matter and manner, had to be prepared from the primary classes onwards.

The road to Sanskrit must open with a first grammar. In *Upakramanika* he explained in Bengali the essentials of Sanskrit grammar in a nutshell. It must be *in Bengali*, and not in Sanskrit, if it was to serve its purpose. Next came, grade by grade, the reading texts selected from Sanskrit in the *Rijupatha* (3 parts). The main source for the first part was *Panchatantra* ; for the second were the *Mahabharata*, *Ramayana* ; and for the third, the *Mahabharata, Hitopadesa, Ramayana* ; and for the third, the *Mahabharata, Hitopadesa, Bhattikavyam.* The second Sanskrit grammar again, *Vyakaranakaumudi*, simplified the sutras of *Siddhanta-kaumudi* and added lucid Bengali explanations to make them easily apprehendable, and this prepared students for further readings of the kavyas, natakas, etc. Vidyasagar had critically edited the texts of *Abhijnana-Sakuntalam, Meghadutam*, etc. and they showed his insight and judgment as editor. Thanks to his efforts and wisdom Sanskrit has been a more negotiable study for Bengali students ever since the middle of the 19th century.

But Vidyasagar's first object was creation of an enlightened Bengali literature. Study of Sanskrit was to help that. This was done with graded textbooks, students' help books and general books of enlightenment in Bengali. What Vidyasagar the realist and modernist considered most urgent was to present to the students and readers the knowledge of "science and civilisation of Western world", the useful knowledge and moral values of the modern age, rather than the lores, legends, etc. of India mixed up with religious lessons. The Vidyasagar-Ballantyne controversy on Sanskrit studies should be recalled in this connection. It is evident that Vidyasagar stood in favour of a scientific and humanistic world, of the modern age, as we hold, and wanted to impart objective knowledge and, as far as permitted, moral ideals consistent with modern outlook. His aim was also to give everything

in "elegant, idiomatic and expressive Bengali"

Bengali prose had a late start—it started practically with Ram Ram Basu's *Pratapadityacharitra* of 1801. Between 1801 and Vidyasagar's emergence (the *Mahabharata portion in translation* belongs to 1850-54, or *Bodhodaya* to 1851), so far as Bengali prose style is concerned, only the following attempts are worth mentioning. If *Kathopakathan* is Carey's own, and not of Mrityunjay Vidyalankar's, then he deserves to be called a pioneer of idiomatic Bengali prose. Ram Mohun Roy tried to shape with some success his expression to the difficult demands of his acute and manysided intellect. He himself lacked *rasa-bodh*, and probably had no sense of style. Mrityunjay Vidyalankar had more of it, but he was uneven and often scholastic in his manner, though he was capable of considerable *tour de force*. Akshoy Kumar Datta was Vidyasagar's friend and contemporary and shared almost the same ideals—only Akshoy Kumar was a thoroughgoing materialist. He was a painstaking writer but did not have elegance of style. Of course, another contemporary, "Tekchand Thakur" (the pen-name of Pyari Chand Mitra, formerly of Young Bengal), had command over idiomatic Bengali. His entertaining novel *Alaler Gharer Dulal* is a good example of it. But he excelled in another line, homely spoken Bengali, which still lacked strength and solidity. As an educational writer imparting knowledge Vidyasagar could not indulge in "Alali-bhasa" His style was also to vary accordingly.

In writing textbooks in Bengali for beginners and young boys, Vidyasagar proved to be a gifted pioneer He put his plans into operation with the *Varnaparichay* (acquaintance with alphabets) of 1855. It is the first book in two parts for beginners. and shows scientific accuracy in systemising the Bengali orthography, step by step, from the simple alphabets, *varnamala*, orderly arranging of sounds, *yukta-varnas* ; then of monosyllablic, dissyllablic words, etc. of simple alphabets followed by those of digraphs ; leading to musical rhyming sentences like *megh dake, jal pare* (the clouds rumble, it rains)* and so on. Finally, the young reader comes across the two moral stories famous to all Bengalis, of Rakhal the bad boy and Gopal the good boy. The *Varnaparichay* has never been excelled ; it set the model and all later works for beginners benefited by the above arrangement.

Kathamala, based on Aesop's Fables (1856), was a reader for the second grade. It gave in simple sentences mostly animal stories with a moral. The book for the third grade was probably *Charitavali** (1856), "Biographies", short accounts of some great men ; readers were now to draw lessons from the men's lives. The earlier *Jivan Charit* of 1849 which gave biographical accounts of the lives of the scientists, like Copernicus, Galileo, Newton, etc.—not of saints and warriors, it may be noted—could come next ; but its style was unwelcome.

The series would then close with the famous reader *Bodhodaya* of 1851. The subject-matter of the book was collected from English, but the manner, arrangement, composition, style, etc. were entirely Vidyasagar's own. It is a book of useful knowledge and gives accurate description of natural phenomna and objects of everyday experience in simple and expressive Bengali. It equipped generations of Bengal's educated men to face the world. Patently, the book was meant to introduce the young readers to the objective world and the world of simple noble virtues. There is an interesting anecdote in connection with its lesson on the creator. It was not there at the time of the first edition when Vijaya Krishna Goswami (or was it Maharshi Devendranath Tagore ?) saw the book and wondered that there was so much about the world, but nothing about its creator. He requested Vidyasagar that boys should be told of Him. So, a lesson was added—he was possibly urged also by the textbook authorities. It is a curious piece in a sense. For the young boys are told that the creator is not only formless but he is *nirakar chaitanyasvarup* (consciousness in purity without form). That is a typical Vedantic or Brahmo phrase ; and what that conveyed to the young boys, is not known. But it is taken by many to be Vidyasagar's personal declaration of belief in immanent god.

Akhyan-manjari, which finally (1868) took shape in three parts, should be an answer to the view. It was a late book and may be classed as a students' book which would also interest the general reader. It contains about 78 true stories, episodes, etc. from the life and travel accounts of persons from many countries (the surprising exception being India) with the object

---

* Rabindranath Tagore declared that he was in rapture to read in the *Varnaparichay* the first rhyming words *jal pare, pata nare*. But his memory played him a trick—those words actually were as given here.

to illustrate certain cardinal domestic and social virtues like truthfulness, friendship, hospitality, etc. Three stories added to them later reflect Vidyasagar's latterday pessimism, and are out of tune with the rest of the book. There is no story of Indian life, however ; and that could not be an oversight. It is said again that Vidyasagar was of the view that Indian stories are too religious and sectarian in tone and temper, and would be unsuitable for his purpose. He was, however, said to have planned a similar book with stories from Indian life. Needless to say he had no prejudice against ancient Indian literature. He had started translating the *Mahabharata* earlier, and he always considered it a great work. His respect for Kalidasa was boundless, while his silence over the Vedas, Upanishads and the Gita, in spite of the enthusiasm of Devendranath Tagore, the *Tattvavodhini* leader, for the first two, is meaningful.

Genius of Bengali Prose

The genius of Bengali language was revealed first in Vidyasagar's writing. In the first edition of *Betal Panchavimsati* (1847), his first effort in the line, it appeared not to be in his grip. The second edition (1850) reveals he has acquired it fairly. Unnecessary load of Sanskritic compound words have been thrown overboard. So, he makes surer and surer progress as he goes on writing textbooks and educational books, of different grades, in elegant, expressive and idiomatic Bengali. From *Bodhodaya* (1851) or rather from *Jivan Charit* (1849), all are excellent achievements. A different and higher level, however, is attained in *Sakuntala* (1854) and in *Sitar Banavas* (1860). Their matter is more literary than objective knowledge, and the manner is entirely suited to the matter, i.e. to the "literature of power". Similarly, a third level of Bengali style is reached in his matter-of-fact and argumentative pamphlets. His posthumous autobiography is the first best thing produced in Bengali in that genre, the acme of which is reached in Rabindranath's *Jivan-smriti*—but that came some thirty years later.

In these writings, the pamphlets and narrative-descriptive writings like the account of Sanskrit literature (1853), we find prose as the maid-of-all-work is at last coming to its own in Bengali. Before Vidyasagar, Bengali prose of this kind was groping its was almost blindly in Ram Mohun and other writers. A variety

of it, yet more remarkable, was Vidyasagar's pseudonymous polemic writings. In this we catch the voice and tone of Vidyasagar. The style comes close to spoken speech, and is sparklingly idiomatic. The echo of that laughter, humour and satire which kept Vidyasagar's company in cheerful and happy mood almost reach our ears from the printed pages. Yet a different Vidyasagar, a deeper man of emotion, crossed by death and disappointment, is seen in that posthumous piece called *Prabhavati Sambhasan* (words addressed to Prabhavati). It was called forth by the death of a dear child of three. She was a daughter of his friend Raj Krishna Bandyopadhyay and the fiery Pandit was fond of her. It is probably the first "personal essay" in Bengali, though it was not meant for other eyes. For, it is in a highly emotional language, and is directly poured out by a sorrowing heart. Too direct and too sacred to be an artistic achievement.

Prose Artist

To non-Bengali readers all this may sound abstract. Extracts of some adequate length alone from his writings can help to bring home what we have tried to say about Bengali prose before Vidyasagar and about the discovery by him of the genius of the language and its variety of expression at different levels. Space does not permit it and a satisfactory translation would be yet more difficult. Nor can we go into detailed analysis of its characteristics. "By all accounts", said Rabindranath Tagore, "Vidyasagar is the first artist in Bengali prose", and substantiates his point with finer insight. Bankim Chandra was the second master of Bengali prose after Vidyasagar. "No one before Vidyasagar", wrote Bankim Chandra, "and none after him, could write such elegant and graceful Bengali." Bankim has been here fair and rather polite in the statement. He was not always so in talking of Vidyasagar's Bengali. But certainly Vidyasagar was the first *artist* in Bengali prose ; fortunately also not the last. Those who came later like Bankim and were also as gifted with a sense of style could naturally advance further—and Bankim did really do that—for Vidyasagar had left them a rich legacy.

Vidyasagar emphasised the need of sound knowledge of Sanskrit and English as a prerequisite for intending writers of Bengali. The two languages are important we know, and not so merely for their literary wealth but also for constructive lessons

that an attentive student could draw from study of the two languages. As a modern Indo-Aryan language, Bengali has to lean on Sanskrit. Even Carey and others realised the fact. Sanskrit was a natural storehouse for Bengali to draw on. Of course, Bengali has since then outgrown that tutelage—thanks to Vidyasagar, Bankim Chandra, Rabindranath and other competent writers who knew what to take and where to stop as well. But a knowledge of Sanskrit is still essential for orthography, vocabulary and for word-building in Bengali. English was of still greater help in some respects. English literature made clear to Vidyasagar what was the real object of prose writing. The main function of prose is to be a vehicle of information ; then to be an organ of "literature of knowledge" for modern times. At another level, it is to be an organ of "literature of power" The former called for certain qualities of style like matter-of-factness, precision, clarity, logicality, order and balance, etc. The latter demanded all these and, in addition, other subtler qualities like sensitive evocation, imaginativeness, suggestiveness, etc. English held out numerous examples of both kinds of literature in different keys ; and Vidyasagar's intellect and instinctive rasa-bodh could make use of both the two kinds. He was the first Bengali writer who had the genius to combine the gifts of Sanskrit and those of English and blend them both to create out of that a Bengali prose style of all potentialities. The lesson has not been lost—at least on the best of Bengali writers, who also know how to meet the demands of the ever-expanding universe of knowledge and that of experience and imagination.

Direct Innovations

To be more concrete, Bengali literature owes to Vidyasagar two innovations which are part and parcel of it now With his sense of order, Vidyasagar was the first to introduce punctuation marks, like comma, etc. into our writing. This immediately removed much confusion and made Bengali easily readable by all. The second gift is much subtler. The rhythm of Bengali speech depends on our breaking up a sentence into breath-groups, modified also by sense or meaning, short pauses (marked if necesary by punctuation) coming in between each group. With the insight of a genius, Vidyasagar realised this, and thus discovered the genius and the inner music of Bengali speech. The rhythm of Bengali

prose thus discovered, Vidyasagar wielded it to his purpose, with his sense of balance and sound sense of the music of Sanskritic words, and of cadence of clauses and sentences, and created a prose of sweetness and grace (as in *Sakuntala*), of tenderness and beauty (as in *Sitar Banavas*), in "literature of power". He discovered also "the other harmony of prose"—limpid, elegant and expressive prose fit for the "literature of information" and knowledge.

There are two wrong notions which have gained ground regarding the nature and quality of Vidyasagar's contributions. Both are half-truths. It is thus wrongly supposed that Vidyasagar wrote nothing original. We have seen that he had original writings like pamphlets, fragment of the autobiography, etc. Besides the socalled translations his *Sakuntala* and *Sitar Banavas* are as good as original works. The second half-truth is the popular notion about "Vidyasagari bhasa", by which is meant a style heavy with Sanskritic words. Undoubtedly, compared to the modern Bengali standard prose style, Vidyasagar's style is Sanskritic. So was Bankim's style at first, though he employed "pure Bengali" in his later novels and essays. So did Vidyasagar in some of his pamphlets and polemic writings. Time has enabled us to profit by the examples of the forerunners. But as we have pointed out already, Vidyasagar's style always varied with the subject matter. He worked at many levels, his style was always suited to the subject, and at all levels Vidyasagar was elegant and chaste, but never really heavy. The dignity and the solemn musicality of the periods of Vidyasagar's sentences are in fact associated in our mind with classical subject matter. It is still the model style for classical subjects. Like all best styles, here again the style is the man. Vidyasagar's style reflects different aspects of Vidyasagar, the scientifically minded educationist, the serious minded reformer all eager to win his way by reasoning, even the man of wit and humour and sparkling repartee, the noble kindhearted man again tender at heart and deep in his compassion, with a fine ear for the musical qualities of words and clauses, and, lastly, the humanist lover of chaste refinements with an undoubted instinct for literature. These qualities did not forsake him at any time in the rough and tumble of busy life.

Relevancy Today

Now, looking back, across the gulf of over a hundred years, on that eventful life and its activities in the three directions, viz. social reform, education and contribution to Bengali literature—when the very passage of time means that the situation is surely changed—we may ask ourselves what part of Vidyasagar's works, if any, remains still relevant ? Let us try to answer briefly.

Vidyasagar the writer remains what he never probably hoped to be—the acknowledged creator of Bengali prose, and the pathikrit (pathmaker) in the literature for future workers. They all stepped into his shoes, the "Vidyasagari chati"

Vidyasagar the educationist is still more relevant today. He is the first and foremost educational thinker of modern India, whose vision, ideal and efficiency justify him to be called the first dreamer of national education on modern lines : (i) he placed before us the content that Indian education must have, viz "knowledge of the science and civilisation of Western world" ; (ii) the form that our education has to take ; our national language—regional languages, as we call them—is to be the medium, each one for the people speaking it. The two other languages of study are to be English as the language of modern life and science and culture to supply the content, and Sanskrit as the language of our heritage to continue the link, and to shape our modern tongues as suitable media of education ; (iii) he was besides the energetic leader of the drive for popular education which a foreign government was not ready to support (does our own government show a better record ?) ; and (iv) he remains, lastly, a shining example as founder and practical administrator of schools and colleges.

Finally remains to be assessed Vidyasagar's social reforms. Their limited character is due partly to the times and partly to the narrow social base of our Bengal renaissance—a Hindu bhadralok affair. Widow remarriage or ban on polygamy concerned only a small minority, though they consumed the energy of the biggest fighter in the cause of womankind of the times. It is not the particular item of reform (widow remarriage, ban on polygamy, etc.), but the attitude of the man, his social outlook, the strength

---

* *Pravasi*, Bhadra, 1329

and character and the courage and determination of the man—the idea and the manly qualities, that remain relevant here, and that will remain so always. Here, in fact, we see the manifestation of that "ajeya paurusa" the "akshaya manusyattva", at its best. For, the "woman question" is the acid test for all men professing to be "modern"—and swearing by "Liberty, Equality and Fraternity". It remains a test even today—and for socialists and communists too—to recall Lenin's observation to Clara Zetkin. None in our country in his day stood that test as manfully, and suffered as tragically.

Betrayed by his own countrymen in Bengal, bypassed by the nationalist leaders of the day, cold-shouldered by the colonial authorities, he lived to die "ekak", as Tagore reminds, a lonely tragic figure. He was a realist and modernist, out of accord with the Bengali middle class which was ambivalent with regard to the age and vacillating in its action. In spite of frustration, he lived ahead of his time and moved with the living stream of modern times, as Tagore said in 1922.*. To quote those exact words of Tagore (in Bengali).

> *"Bahaman kalagangar sange Vidyasagarer jivan-dharar milan chhila ; ei janyai Vidyasagar chhilen adhunik."*

Seen in retrospect this work for womankind was also a concrete expression of Vidyasagar's modernism, "adhunikata", contemporaneity, even more than the educational work—an expression of his deep humanism, "manusyatva", the unqualified testimony to the basic integrity of the man—Vidyasagar the Man.

Vidyasagar the Man remains more relevant than all his activities. His personality was greater than his deeds. It had an irresistible force which even those who opposed him or bypassed him had to admit, and unconsciously accept. In more subtler ways than known it came to influence his countrymen, his succesors more than his contemporaries, instilling into them the spirit of manliness, will to serve humanity and will to act up to the conviction, fearless of consequences. He has become a part of his people's heritage, a part of their history, and a hero—as the most illuminated of them, Tagore, came to hold.

(From Vidyasagar : A Reassessment)

Vidyasagar as an Educationist

Satyendra Nath Sen

The last quarter of the eighteenth century witnessed a momentous development in the classical learning in Bengal. The two Governors-General—Warren Hastings and Marquess Wellesley—did more than any other in fostering Persian and other Indian languages. When in 1784 Hastings founded the Asiatic Society of Bengal, his dream had been partially realised. Thus Hastings set in train a movement which enabled Wellesley to establish the College of Fort William in 1800 and to fulfil his dream of a University in the East. Before 1835 the attitude of the Company towards the English language was one of obvious nonchalance, though officials did not fail to emphasise its importance. As early as 1775 Philip Francis urged the authority in England to impose English by authority because the people had realised its importance. Charles Grant in his *Observations on the State of Society* in 1792 indicated the need for the introduction of English in India.

It is William Bentinck whose antithetical posture to Oriental Learning was more than any other responsible for the introduction of English education in India.[1] His views were considerably influenced by Macaulay, who was also a Law Member of the Governor-General's Council. Macaulay's famous piece of purple prose of February 2, 1835 in which he denigrated classical learning and elevated English language, has become the most oft-quoted Minute in the history of British India. His thesis merely strengthened Bentinck's belief of the superiority of English learning which was reflected in his resolution of March 7, 1835 :

> "The great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India ; and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone."

But it should be borne in mind that not all the Englishmen were parochial in their outlook. Elphinstone, as Governor of

---

1 V N Datta. Social and Educational Policy, 1800-1835 , *Ideas in History*, edited by Bisheshwar Prasad (1968), P 45

Bombay, envisaged a system of education where learning might be pursued in vernacular languages, where traditional Indian learning might co-exist along with English-style education.[2] Elphinstone looked forward to the establishment of a 'superior sort of school, teaching English as well as the languages of the country, at each Collector's station ; and a smaller school for the native languages, in each pargunnah.'[3] Though Elphinstone attached considerable importance to English education, he always thought that vernaculars were of more far-reaching importance in the diffusion of culture among the masses.

In the late eighteenth and early nineteenth century, Calcutta became the Florence of Asia. The aggregation of various institutions—Calcutta Madrasa (founded in 1781), Calcutta School Book Society and Hindu College (1817), General Assembly of the Church of Scotland (1823), Sanskrit College (1824), etc.—in Calcutta breathed an intellectual atmosphere unequalled in any other city of India. But very little had been done to educate the masses through the medium of vernacular. In 1844 there remained in Bengal only 33 Vernacular schools with 1400 students, whereas Bombay made considerable headway as there were 216 vernacular schools with 12,000 pupils.

Born and nurtured in this facade of intellectual background, Vidyasagar combined in his person a happy blending of classical and western learning. Born in 1820, he passed through vicissitudes of various educational assignments. He was Sheristadar of the College of Fort William from December 1841 to March 1846, Assistant Secretary to the Government Sanskrit College from April 1846 to July 1847, Head Writer and Treasurer of College of Fort William from March 1849 to November 1850, Professor of Literature in the Sanskrit College from December 1850 to January 1851 and Principal of Sanskrit College from January 1851 to 1858. Vidyasagar was far in advance of his age and he freed the study of Sanskrit from the trammels of dry bones of grammar. In the Sanskrit College, pupils had to begin their study of Sanskrit grammar with *Mugdhabodha* written in Sanskrit and had to spend four or five years upon it. He discontinued the study of *Mugdha-*

2 George D Bearce *British Attitudes Towards India, 1784-1858* (Oxford, 1961), P 146

3. Kenneth Ballhatchet · *Social Policy and Social Change in Western India, 1817-1830* (Oxford, 1957), P 274

bodha and in its stead introduced outlines of Sanskrit grammar in Bengali and three Sanskrit Readers, consisting of easy selections in Prose and Verse. "To complete this course, a student of ordinary ability and ordinary application, does not require more than three years. After finishing this course, a student is well grounded in the elements of Sanskrit Grammar, and is thoroughly prepared to be introduced to the study of standard works in the Sahitya or Literature class."[4]

Vidyasagar's panacea for removing the ills that affected the then examination system merits attention. He decried the system of annual examination in the Sanskrit College. Writing to F. J. Mouat, Secretary to the Council of Education on 21 January 1854, Vidyasagar observed rightly :

> "Under this system the pupils relax their labours after the close of a session and do not resume them in earnest till the time of the examination draws near. During the first months of the year they attend to their routine course of study in a most indifferent manner, while the 'cramming' system is in requisition during the concluding months. The consequence is that a habit of industry is not acquired, from the want of which the great majority of students do not keep up their studies in after-life though they distinguished themselves while at College. Moreover, the over-exertion of the last months of the session induces several chronic diseases, such as headache, dyspepsia, dysentry, opthalmia, etc."[5]

Vidyasagar made a fervent plea to adopt the following system

1. Examinations to be held every month in the Junior Classes and every two months in the Senior ones.
2. The award of scholarship and other rewards to be decided by the aggregate result of these examinations.
3. Of the Sanskrit and Vernacular portions of studies examinations to be conducted by the Principal with the co-operation of the Professors.
4. Of the English portion of studies, the examinations to be conducted by the Principal with the co-operation of the

4 General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of Bengal Presidency, from 27 January to 30 April 1855 · quoted in *Unpublished Letters of Vidyasagar*, edited by Aravinda Guha (Calcutta, 1971), P. 10.

5. Letter No. 124, P. 57 , *Unpublished Letter of Vidyasagar*, Edited by Arabinda Guha

6. *Ibid.* P. 58

masters and professors.

5. The final examination alone to be conduced by the examiners appointed by the Council.[6]

In addition to his duties as Principal of Sanskrit College, Vidyasagar was made Assistant Inspector of Schools, South Bengal from May 1, 1855. He felt the necessity of a Normal School for training teachers and accordingly it was opened on July 17, 1855 in Sanskrit College premises. As an Assistant Inspector, Vidyasagar established Model Vernacular Schools in the districts of Hooghly, Burdwan, Nadia and Midnapore. In his report for the quarter ending January 1857, Vidyasagar submitted : "The progress made by the pupils of the Model Schools is really surprising, considering that the oldest among them have not been established more than eighteen months."[7] He appealed to the authorities to give due weightage to the successful students of Vernacular schools in filling vacancies of lower posts in judicial and revenue departments of the government. He observed very pertinently :

> "People are eager to give their children an English education, because they believe that such education would ensure for them public employment, and that education in any other language would be of no avail. This latter impression should be removed from their minds by providing Vernacular students with suitable employment.... It may, I believe, be safely affirmed that subordinate officers from their class would be more efficient as well as trustworthy than the class of men who at present fill those offices (in the judicial or revenue departments)."[8]

Having put the Model School into working order, Vidyasagar turned his attention to the propagation of female education in Bengal. Anticipating the Government approval of his scheme, Vidyasagar established 40 girls' school in the districts of Nadia, Hooghly, Burdwan and Midnapore, the total number attending amounted to 1348. He observed very prophetically : "A change may be said to have come over the spirit of the times, and this

---

7. General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1856-57. App. A, Quoted in *Unpublished Letters of Vidyasagar*, P 28.

8. *Unpublished Letters of Vidyasagar* edited by Arabinda Guha, P. 29.

9. *Ibid*, P. 38.

may be reckoned as a new era in the history of education in Bengal."[9] There is no doubt about the sincerity of Vidyasagar but what gave umbrage to the authorities was that he did not obtain their previous sanction. Gordon Young, the newly appointed Director of Public Instruction, therefore, did not approve of the foundation of the Girls school and refused to pass the teachers salary bill. The bill was ultimately passed by the Lieutenant-Governor but the difference between Vidyasagar and Young could not be settled and the former resigned the post in 1858.

A new chapter opened in Vidyasagar's life after his resignation when he applied himself to the preparation of school books, by the sale of which his salary of Rs 500/- per month was to be compensated. He also found a breathing-space to devote his constructive energy in educational reform without being tied by the labyrinth of government regulations. Metropolitan Institution was founded in May 1859 by Thakurdas Chakraborty and some other gentlemen. Iswarchandra Vidyasagar acted as a principal member of the School Committee. A new Committee was formed which took over the administration of the School when some members of the old Committee who had insisted upon the expulsion of a teacher for alleged misconduct joined together and founded the Calcutta Training Academy. A new committee was thereupon formed ; and it was unable to manage the School satisfactorily, so the management very soon devolved upon Vidyasagar.[10]

The onerous burden of managing the School which Vidyasagar shouldered with single-minded devotion evoked admiration even from official quarter. He started college classes in January 1873. G. Bellet, officiating Director of Public Institution stated :

> "Among Unaided Colleges, the Metropolitan Institution maintains its numerical supremacy.... The General Assembly's College stands second and the Presidency College holds the third place in point of numbers."[11]

Bellet in his report for the B.A. Examination held in January 1883 stated :

---

10. Shambhu Chandra Vidyaratna, brother of Vidyasagar to DPI, 24 February 1897 : *Unpublished Letters of Vidyasagar*, Letter No. 134, PP. 210-11.

11 General Report on Public Instruction in Bengal for 1882-83, P. 12, quoted in *Unpublished Letters of Vidyasagar*, P. 57

12. Ibid., PP 16-17

"The Government Colleges passed 43.8 per cent of these candidates, against 40.5 per cent in 1882 and 46.5 per cent in 1881 ; the Aided Colleges passed 40 per cent against 24 per cent in 1882 and 43 per cent in 1881, while the unaided Metropolitan Institution passed 44.4 per cent against 16.6 per cent in 1882 and 42 per cent in 1881."[12]

The same officer continued :

["Metropolitan Institution] is a first grade college and provides for the education of students up to the M.A. degree.... Fifty three candidates went up for the B.A. Examination and 24 passed, 2 in the First Division, 5 in the Second, and 17 in the Third. Of the passed candidates, one stood second in order of merit..... and another student stood fifth in order of merit."[13]

Metropolitan Institution having been affiliated to Law Degree Course in 1882 the popularity of Presidency College in the same course declined considerably. A. W. Croft, Director of Public Instruction furnished a statement showing the results of the examination for the Degree of Bachelor Law and stated :

"All the College have done fairly well, the Metropolitan Institution taking the lead. It passed 24 out of 39 candidates, four of them being in the First Division.... The attendance at the Law lectures of the Presidency College dwindled to six owing to the affiliation in Law of the Metropolitan Institution and the City College and the classes were closed at the end of the year (1883)."[14]

In the General Report on Public Institution in Bengal for 1888-89, it has been observed : "The Metropolitan Institution continues to be by far the largest of all the Colleges in the Province (and probably in India), though its increase during the year has been but small."[15] The Metropolitan Institution had been described by Gooroodas Banerjee in his Convocation Address for 1892 as "the first affiliated private college under native management, which has served as a model for many others that have since come into existence." It came to be known as Vidyasagar College in 1917.

13 *Ibid*, PP. 24-25

14 *Unpublished Letters of Vidyasagar*, PP 58-59

15 *Ibid*, P 60

VIDYASAGAR AND POPULAR EDUCATION

Amalesh Tripathi

The state of popular education was sadly remiss at the beginning of the nineteenth century. It was not, however, for dearth of elementary schools. In 1803 Ward found that in Bengal, "almost all villages possessed schools for teaching reading, writing and elementary arithmetic".[1] In 1835 Adam computed one lakh schools in about a lakh and half of villages.[2] Lord Moira alluded to "the humble but valuable class of village school masters" teaching "the first rudiments.... for a trifling stipend which is within reach of any man's means."[3] This was considered to be sufficient for the needs of the village zamindar, the village accountant and the village shop-keeper Improvement of the standard and diffusion of such education to places and persons, out of its reach, could be the two objects of government. The former was "positively incumbent", especially as the village school masters, themselves devoid of moral principles, were incapable of imparting them.

The missionaries thought likewise. In his *Hints Relative to Native Schools* (1816), Joshua Marshman observed that they contributed little to character-building, which was so necessary because of the native "disregard of justice, and all good faith." Reverned J. Long, in his preface to the 1868 edition of Adam's Reports, and Adam himself had left a harrowing picture of the village school and its teacher. The schools were housed in *Chandimandaps* or shabby huts and were even held in the open air. "Little respected and poorly rewarded", the *Guru Mahasayas* taught from memory or tattered manuscripts of a dubious nature, and kept discipline literally with an iron hand. A faulty orthography made spelling chaotic ; antiquated texts, culled from an odd assortment of hymns, epic stories and didactic verses, were neither interesting nor instructive. Arithmetic was memorised from verses of *Subhankari*. There was no relation between elementary and higher education. For lack of follow-up the pupils regained their primitive ignorance in little time.

While the Government's limited financial resources preclu-

ded it from embarking upon schemes of elementary education, the field was taken over by the missionaries whom the Marquis of Hastings lent some ad hoc support. It is impossible, however, to maintain with Kenneth Ingham that the object of missionary education was "to make the Indians themselves desire reform."[4] In their original constitution the Baptist Missionary Society thought of the establishment of schools "as one of the means to be adopted for the introduction of Christianity in India."[5] A Bengali school was started at Serampore in 1800 with fifty to sixty pupils but they were removed by their parents when Krishna Pal was converted.[6] Owen Leonard's attempts to open schools at Dacca were resisted. Fear of loss of caste was dissipated after many years when a general desire to learn English could be fully exploited by the missionaries. By 1818 the Baptists had founded 92 schools in or near Serampore, 11 at Katwa, 3 near Murshidabad and 5 at Dacca, with about 10,000 pupils in all.[7] By 1831, however, the Serampore Mission controlled 21 schools only (with 1,195 pupils), though it had started female schools in 1823. The London Missionary Society (L.M.S.), the Church Missionary Society (C.M.S.), the Society of the Propagation of the Gospels (S.P.G.), the Society for Promoting Christian Knowledge (S.P.C.K.) and the Established Churches of Scotland (E.C.S.I.) were all active in spreading education among the masses with roughly the same object of proselytization. Robert May of L. M. S. was helped by Government grants and, at the time of his death in 1818, had founded 36 schools in and near Chinsurah with about 3,000 students. The General Committee of Public Instruction took up May's schools in 1824 but turned them over to S. P. G. in 1832. The C. M. S. (Calcutta) was active in Burdwan area, controlling 9 schools by 1834. From Adam's First Report (1835) and other missionary accounts we can compute the position in 1833. There were altogether 134 boys' and girls' schools of all types run by the missionaries and about 8,000 pupils on their rolls.[8]

J. Marshman planned for quick expansion on the Bell and Lancastrian method and opened a normal school for training teachers. May had a method of his own. Everywhere the emphasis was placed on vernacular medium, as a foreign language was considered ill-adapted "for conveying ideas which shall raise

and renovate a whole country."[9]

The efforts of the Calcutta School Society, already mentioned, were doomed to failure by the collapse of their bankers in 1825 and 1833. It continued to survive for sometime on government grant of five hundred rupees a month, Hare's charity and Bentinck's private gifts till it was forced to discontinue aid to native schools. The Government had followed a policy of drift since 1813. Although Lord Moira had proposed two experimental schools (one for the Hindus and the other for the Muslims) at each of the district headquarters and John Shakespeare had proposed a native school master at each *thana*, two at the district headquarters and six at each of the sites of the Provincial Court of Appeal and Circuit, nothing was done for popular education. On the contrary, Holt Mackenzie declared in 1823 that support and establishment of colleges for the educated and influential classes, who would themselves be teachers and translators from the European into native languages, should be the more immediate objects of the care of the Government than providing elementary education for the masses. "To provide for the education of the great body of the people seems to be impossible, at least, in the present state of things. .... Further, the natural course of things in all countries seems to be that knowledge introduced from abroad should descend from the higher, or educated classes and gradually spread through their example." After the Anglicists had won the battle in 1835, the newly constituted Committee of Public Instruction reiterated this famous filtration theory with two prime objects—to widen the foundations of the system and to consolidate and improve it. "It would be our aim, did the funds at our command admit of it, to carry the former process on, until an elementary school for instruction in the vernacular language should be established in every village in the country, and the latter, until a college for Western learning should be endowed at the principal town of every commissionership or circle of two or three zillahs, and ultimately in every zillah."[10] Till a vernacular literature was developed, however, the emphasis in education must fall on English. "The natives must learn before they can teach. The best educated among them must be placed in possession of our knowledge before they can transfer it into their own language." The Committee proposed to confine its efforts to encouraging

translations in vernacular, adopting vernacular books, appointment of vernacular language-teachers and awarding prizes for translation after each annual examination. Its field of activity was concentrated in the chief towns and sudder stations of districts and among the upper and middle classes, in the expectation that through these scholars educational reform would percolate downwards to rural vernacular schools.

John Adam showed clearly the falsity of this theory in his last report submitted on 28 April 1839. Brian Hodgson poured unmixed scorn on the fantastic unreality of the project of "the training of a promiscuous crowd of English smatterers". But the failure of the plan of vernacular education at Chinsurah, Dacca, Bhagalpore, Saugor and Ajmere weighed heavily with Auckland. His personal preference for English apart,[11] scarcity of funds remained a stumbling block. "There are more villages at the Presidency than we have rupees annually at our disposal." Though education got more in 1840 than in 1836, the Council of Education, which replaced the General Committee in 1842, clung tenaciously to the latter's filtration theory. Improvement of village schools was postponed but preparation of class books in vernacular was taken in hand, although they were really translations from original English texts. The Bengali Pathsala, founded by Radhakanta Deb and the Tagores (1840), and the Tattvabodhini Pathsala, founded by Debendranath Tagore (1843),[12] kept the idea of vernacular schools dimly burning till, at the end of 1844, the Bengal Government decided to set up 101 vernacular schools (known as Hardinge schools or Banga Vidyalaya) in the rural areas of the Bengal Presidency. The administrative indiscretion of the Board of Revenue, to which was committed the care and control of these infant seminaries, somthered these in the bud although Vidyasagar took great pains in selecting teachers for them. As the Inspector, "who knew nothing of Bengali", reported on these schools, and "was even requested to draw up a scheme of school-books for them", while the over-worked Collector was insturcted to supervise, the students thurst their books in their masters' hands and brawled for English education, which, by India Government's resolution of 10 October 1844, had become a passport to service.[13]

Rajnarayan Bose commented on the deplorable state of popular

education at a Hare Memorial Meeting in 1848. That only eight per cent of boys in Bengal and Bihar had any schooling and only 6 per cent of the adults were literate clearly showed the utter futility of the Anglicist plan. In twenty-five years since the establishment of the General Committee of Public Instruction, about two thousand in all had learnt English. Yet how many of these could write in that language with conviction and without blemish ? Little learning proved a dangerous thing. It led to woeful neglect of the Indian languages and culture and high-brow contempt for the masses. Enamoured of Newton, the Bengalis had forgotten Aryabhatta ; carried away by Homer and Virgil, they had abandoned the Ramayana and the Mahabharata. If European languages should be learnt for their richness, Sanskrit, Arabic and Persian had no lesser claims on that count. Bacon and Locke could be best understood when explained in vernacular. Hardinge schools had failed for lack of books, teachers and regular inspection. This stepmotherly attitude must go and elementary schools be founded all over the country to teach through vernacular tongue.[14]

John Drinkwater Bethune, the new President of the Council of Education, echoed the same sentiments when he exhorted the young aspirants for fame as English poets and essayists to turn to Bengali.[15] The Council's report on the schools in 1851-52 told the same tale : "Most .... (of the Hardinge schools) appear to be in a languishing state, and not to have fulfilled the expectations formed on their establishment" As desired by the India Government, the Council of Education (to which the vernacular schools had been transferred in April 1852) was asked to draft a plan for vernacular education. One of the Minutes of the Council, written by F. J. Halliday (dated 24 March 1854), came to have the greatest impact, for its author was appointed the first Lieutenant-Governor of Bengal on 1 May the same year. Behind this Minute the mind of Vidyasagar worked.[16]

Halliday wanted to draw upon Thomson's successful experiments in North West Provinces to establish a system of model schools with a regular plan of visitation. This was to be confined at first to four or five zillahs near Calcutta and two zillahs in Bihar, and to consist of five schols in each district, with two teachers to each school. Though admission to such schools would

be gratuitous in the beginning, they were expected to be self-supporting, which meant that extension of the system would involve a less proportionate expenditure. He was also prepared to aid missionary schools and other approved vernacular schools, provided they were open to visitation by the Government superintendents.

In his Memorandum (7 February 1854) Vidyasagar unambiguously opted for education through vernacular, and expressed his willingness to help as Chief Inspector of the model schools, in addition to his duties as Principal, though for this extra exertion he wanted nothing more than a travelling allowance of three hundred rupees per year. Halliday was too eager to accept the suggestion. "Pundit Ishwar Chunder Surma is an uncommon man, ... and I should be well pleased to let him try an experiment, in the result of which he is greatly interested, and which I really think will succeed in his hands." He generously proposed to grant him two hundred rupees a month, travelling allowance included.

Meanwhile, Sir Charles Wood's Education Despatch (no. 49 of 19 July 1854) arrived in India. R. J. Moore has recently laid bare the contributions made by James Marshman, Charles Trevelyan, C. H. Cameron and Alexander Duff to the framing of this "Magna Charta of English Education in India."[17] Wood departed from the policy of encouraging higher humanistic education only among the upper classes in society and repudiated the filtration theory in its extreme form. He wanted to create opportunities for "the acquisition of such an improved education as .... (would) make those who possess(ed) it more useful members of society in every condition of life". The higher classes were called upon to bear a considerable part of their own educational expenses, so that the funds thus released could be devoted to the hitherto neglected task of spreading "useful and practical knowledge, suited to every station of life, to the great mass of the people." The practice in Bengal had been so far to direct students' ambitions to distinctions in European literature and philosophy. This reflected the Anglicist dream of providing a class of interpreters between the rulers and the ruled. Wood turned away from it, as suitable careers could not be provided for those who distinguished themselves. India needed "good clerks, good judges, perhaps,

good policemen and village accountants and measurers" [18] Para 4 of the Despatch clearly stresses that the energies of the students should be channelised into regenerating a backward economy. Scholarships should provide a path from the lowest school to the highest, and ultimately into technical and professional careers[19]

Para 14 of the Despatch reads, "....while the English language continues to be made use of as by far the most perfect medium for the education of those persons who have acquired a sufficient knowledge of it to receive general instruction through it, the vernacular languages must be employed to teach the far larger classes who are ignorant of, or imperfectly acquainted with, English." Duff spoke of two sets of schools, the lower, teaching the great mass through the vernaculars and the higher, through English. Wood refused to grade schols on a linguistic basis. English and vernacular were to be done together as, otherwise, there would be "no chance of having the means of imparting generally European knowledge."

The cornerstone of the charter was the grant-in-aid system, taken from Kay-Shuttleworth's theory and the English and Irish experience. Paragraph 52 of the Despatch commended the grant-in-aid system as "fostering a spirit of reliance upon local exertions", while paragraph 61 remarked that the government would "supply the wants of particular parts of India by the establishment, temporary support, and management of places of education of every class....." Wood looked forward to a time "when any general system of education entirely provided by Government may be discontinued...... and when many of the existing Government institutions.... may be safely closed, or transferred to the management of local bodies." Among other recommendations of the Despatch were the abolition of the Council of Education and the creation of a separate Education Department. A Director of Public Instruction was to be appointed to supervise the new system in operation with the help of a body of Inspectors. Universities were foreshadowed—on the model of London University. Importance was given to training of school-masters and compilation and composition of original vernacular texts—not to translation from European works.

The Government of India informed the Bengal Government that funds were available for grants-in-aid to vernacular schools

under Wood's Despatch. Halliday's scheme of model schools was approved, "but the terms of the Court's Despatch will not allow of his (Iswar Chunder Surma's) being made a Superintendent of Vernacular education—the function of such an office, having now to be performed by the Director and by the Inspectors whom it is intended to employ......."[20] On a verbal communication from Halliday, Vidyasagar had already made a quick tour of some of the districts to select sites for the model schools during the summer vacation of the Sanskrit College in 1854.[21] The Director of Public Instruction suggested that Vidyasagar be employed temporarily to superintend schools in Hooghly, Burdwan and Nadia, *vice* Hodgson Pratt, whose services as Inspector of Schools would not be available for a month or two. On Pratt's return the D.P.I. would report whether the Pundit's services would be further required.[22]

At this cavalier treatment of his protege Haliday was furious. "I should not anticipate any advantage", he wrote, "from a merely temporary employment of Pundit Eswar Chunder. He is a man of very decided character who has formed and expressed strong views on the subject of vernacular education, which if permitted he will no doubt endeavour to carry into effect with energy and intelligence according to the scheme approved of. But I do not see that he could be expected to effect much if temporarily employed, and left to understand that at any time, three weeks or three months hence he is to retire from the work on the appearance of Mr. Pratt as Inspector." Halliday desired him to be permanently employed under some name, like Offg. Sub-Inspector, over the three or four districts where the experiment of model schools was to be made. Pratt might inspect what Vidyasagar had done. "I believe", he continued, "the method which I devised with great pains and after much enquiry to be the most promising, and it would be a pity to wish its failure by placing one of the chief instruments of its execution in an embarrassing and erroneous position in which it would be difficult for him to exert himself with effect."[23] It was entirely due to the stubborn stand of Halliday that Vidyasagar could circumvent red tape and racial complexes. He was appointed Assistant Inspector of Schools, South Bengal, on a monthly salary of two hundred rupees over and above his pay as Principal, from 1 May 1855.

Vidyasagar set to work with his characteristic zest and appointed four sub-inspectors who immediately went out selecting sites. Twenty schools were founded, five in each of four districts—Hooghly, Burdwan, Nadia and Midnapur—between 22 August 1855 and 14 January 1856. The villagers pooled their resources for construction of school-buildings and the Government offered a monthly grant-in-aid of fifty rupees to each school and free tuition for the first six months. "The inhabitants of nearly all the villages", reported Vidyasagar, "take a lively interest in them. The elders frequently visit the schools and sit for hours together, hearing the boys read and explain their lessons...."[24] The superiority of the new system over the older one was apparent even to the unlettered.

After three years the pupils acquired a thorough knowledge of the Bengali language and made respectable progress in several branches of useful studies.[25] Their number swelled with time. By the beginning of 1856 it was 2,738, and Vidyasagar, carried away by the success of his exertions, promised funds from his private means right and left. He set up a free school in his home-village in 1853, lodged and fed a good number of students at his own house and left a legacy of a hundred rupees a month in his last will for the maintenance of the institution. The teachers were selected with great care after an examination, and the Bengali school, formerly attached to the Hindu College (now the Presidency College) was transferred to the care of Vidyasagar for conversion into a normal school for teachers' training. It was put in charge of Akshoy Kumar Datta, whom he had known as a fellow-member of the Tattvabodhini Sabha and who was the foremost writer in Bengali on scientific and philosophic topics.[26] Vidyasagar showed how the genuine love of one determined and dedicated invididual for learning and for people, could do in dispelling the appalling darkness that enveloped the countryside. All this time he had been fighting against the near impossibility of working the grants-in-aid system under the prescribed rules which made Pratt despair and Woodrow circumvent.[27] Yet he took keen interest in the progress of his model schools, published text books for them and pestered the Government for appointing their alumni to the lower posts in the Judicial and Revenue Depertments.[28]

The curriculum he proposed should interest us. Besides Literature, a little Johnsonian to our taste (Rasselas and Telemachus

were texts), History with a wide coverage of countries and cultures (Greece, Rome, England and India), Geography and Biography (Vidyasagar was over-fond of them and translated a good deal from Chambers), Arithmetic, Astronomy, Elements of Natural Philosophy, and even Physiology were to be taught in mother tongue. The attention paid to History reminds us of the attitude the great Renaissance humanists, one of whom (Salutati) wrote, "The knowledge of things done warns Princes, teaches people, and instructs individuals.... It is the most certain basis for the conduct of affairs. History teaches us the doctrines of philosophy." A conception of history that combined a real interest in the past with a belief in its relevance for the present had begun. A Sanskritist must have travelled a long way to arrive at the conception of an all-rounded and wholesome education which attempted a synthesis of C. P. Snow's two contending cultures.

II

VIDYASAGAR AND FEMALE EDUCATION

Peary Chand Mitra writes of his "Grand mother, mother and aunts reading Bengali books" in the second decade of the century.[1] We know also that some ladies of the Tagore families of Jorasnko and Pathuriaghata, the Dev family of Sobhabazar and the Roy family of Posta had some sort of education. But they were a mere drop in the ocean of illiteracy which, according to Raja Rammohun Roy, was one of the basic causes of woman's tragic lot at home and in society.

Robert May of the London Missionary Society is reported to have started a girls' school at Chinsurah in 1818, probably the first institution of this kind.[2] Systematic female education in India began with the Baptist Mission Society's efforts in 1819. The wives of the Baptist Missionaries in Calcutta set up "the Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengali Female Schools" in 1819 with the Rev. W. H. Pearce, Secreatry of Calcutta School Society, as its President. It founded the first girls' school at Gauribari about the middle of the year, which was surprisingly free of caste taboo. The second year's report (14 December 1821) shows an increase of pupils at this school from 8 to 32 and the establishment of several others, that bore the names of places in England which sent donations. By 1823 there were eight schools run by this Society. About one hundred and forty Hindu and Muslim girls appeared for examination at the parent institution this year before William Carey, H. H. Wilson and Zetter. Divided into six classes, they did spelling, reading (in the form of dialogues between a mother and her daughter), geography and elementary ethics. Vernacular was the medium of instruction. Embroidery was soon added and, more disquietingly, lessons from the Bible and Christian tracts followed. Through the patronage of Radhakanta Dev and active propagation of the idea by Gaurmohan Vidyalankar in a book called *Strisiksha Vidhayaka* (published by the Society and made a compulsory text at its schools), the Female Juvenile Society

came to manage twenty schools in 1829. But its Christian orientation made it increasingly unpopular. We learn from its Thirteenth Report (1834) that it maintained only three schools in Calcutta and neighbourhood five years later.

The Church Missionary Society had, meanwhile, started a 'Ladies' Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity' in 1824 and made over to it the supervision of twenty-four schools which the gifted teacher-organiser, Mary Anne Cook, Mrs. I. Wilson on her marriage with a C. M. S. missionary, had built up since her arrival in 1821. Although Radhakanta Dev shunted her off from Calcutta School Society to the missionaries on the ground that "none of the good and respectable Hindu families will give her access to their women's apartments, nor send their females to her school, if organised", the leaders of the Hindu society helped her efforts in more ways than one. Radhakanta himself assisted her to collect a number of high caste girls for lessons on a veranda within the compound of a rich Indian residence. A central female school was founded with the princely gift of Raja Baidyanath Ray in 1828. The number of its pupils rose from 58 to 320 in 1834. Once again, the Missonary got the upper hand on the educator, and a few conversions from the student-body alienated the upper class Hindus who had begun to these schools. This Society had the distinction of starting the first normal school in India.

The Ladies' Association, formed in 1825 with pious middle class women in Calcutta and catering chiefly to the Moslem community, spent its force by 1834. The Serampore Baptists, or rather their wives, were active in this field in the twenties and thirties. By 1829 their schools in Calcutta-Serampore area taught 448 pupils, in Dacca area—190, in Chittagong area—101 and in Birbhum—90. Though the Society ventured beyond Bengal, activities shrank after 1838.

The agencies by which the missionaries tried to promote female education were day schools for girls, boarding establishments for orphans and domestic instruction in the middle and upper class families. The proselytizing zeal of the Missionary Societies outran their discretion and soon their schools became the resort of Anglo-Indians, Indian Christians or low-caste Hindu girls. Prasanna Kumar Tagore commented on the futility of sending their products, fed mostly upon the Bible and Tracts, into

respectable homes for teaching the purdah-bound upper class women. He recommended a more liberal system of education, offering general knowledge and paying a particular attention to national prejudices.[3]

A lively controversy in the Bengali newspapers between 1831 and 1838 shows a growing interest in female education in society. The Derozians took a lead in this matter in the 1840's. K. M. Banerjea's prize-essay, *Native Female Education* (1841), Pearychand Mitra's paper before the Society for the Acquisition of General Knowledge, Madhusudan Dutt's essay on female education (1842), the approach of the Uttarpara Mukherjees to the Council of Education (1845), Peary Churan Sirkar's school at Baraset (1847), all point to the ferment in Hindu society itself created by the spirit of the times.

A great boost was given to the cause of female education when John Drinkwater Bethune became the Law Member in Dalhousie's Executive Council and President of the Council of Education in 1848. Ramgopal Ghosh, his principal adviser in this matter, was a Derozian. Another Derozian, Dakshinaranjan Mukherjee, offered him a whole house, free of rent, for a school, pending the construction of its permanent habitation on a plot of land which, too, he offered free together with a cash donation. The Calcutta Female School was started on 7 May 1849 with eleven girls, and Bethune set its tone in his address on the occasion : "As far as literature, therefore, is concerned, we shall make Bengali the foundation, and resort to English only for some of those subsidiary advantages, and when we know that the communication of such knowledge is not in opposition to the wishes of the parents." Needle work, fancy work, drawing, etc. were to be taught as well. All religious instruction was excluded. None but the girls of respectable Hindus would be admitted. A Sanskrit College-bred *pundit*, Madan Mohan Tarkalankara, not only sent his two daughters to this school but gave gratuitous instruction in Bengali for the facility of which he also wrote elementary text books. At the close of the year there were 25 girls on the rolls, though, at one time, they numbered 54.

The school was the joint product of Cambridge, the Hindu College and the Sanskrit College. The Government came straggling behind, its only contribution being the actual site of the school, which, again, it had exchanged for two plots of land, offered by

Dakhinaranjan and Bethune. The President of the Board of Control, Hobhouse, was much annoyed at Bethune's going over his head to secure the Queen's permission to associate the school with her august name. He poohpoohed the noble project of Bethune as "carving out idols for himself to play with and others to laugh at", and denied the name of Victoria. The foundation stone was laid on 6 November 1850, and Bethune contributed all the cost of the building. He brought to its service another illustrious alumnus of the Sanskrit College, Vidyasagar, as Secretary. Efforts of the indefatigable Pundit and the patronage of influential men, like Debendranath Tagore, attracted eighty students before death cut short the noble life of its principal benefactor (12 August 1851).[4]

Lord Dalhousie took over the financial commitment of Bethune and, after his own retirement in 1856, left the school in the hands of the Government. On Cecil Beadon's suggestion, the committee to superintend the affairs of the school, now named after Bethune, was reconstituted with Vidyasagar as secretary.[5] There was a steady increase on the rolls after an initial setback, and in 1862 there were 93 girls taking lessons in reading, writing, arithmetic, biography, geography, history of Bengal, needle work, sewing and gallery work on objects. Lack of conveyance, early withdrawals and absence of enthusiasm of the wealthier classes worked as drags.[6] As Woodrow reported two years later, "The *Bhadralok* (the respectable), not the *Dhoni lok* (the rich), send their children to the Bethune School." His proposal to introduce a small fee (the Court of Directors had suggested it in the previous decade) was unanimously rejected. Vidyasagar, on his part, found no response to his repeated requests to the Government for additional establishment (even amounting to seven and a half rupees a month). "I see no reason", said Woodrow, "why the wealthy Baboos of Calcutta could give to the Bethune School a less sum than is given by the people of the mofussil to their female schools." When the school was in doldrums in 1867 and the Government thought of winding it up, Vidyasagar came to its rescue with a poignant reference to the memory of Bethune, the need of an organised female school in the heart of the city as a model to others in the interior, and its moral influence on native society in general.[8] The *Lieutenant-Governor had been insisting on opening a* normal school at the premises and Vidyasagar resisting it

since 1863. When the former directed a combination of normal school and the Bethune school under a single superintendent, the latter resigned at the beginning of 1869.[9]

Bethune's letter to Dalhousie (29 March 1850) and the latter's Minute (1 April 1850) had launched the indifferent Government on a positive policy towards female education, which was further stimulated by Sir Charles Wood's sympathetic observations in 1854. "Among the shameless expedients", wrote Bethune, "to which the opponents of female education have resorted to has been an unblushing assertion that the Government is not merely indifferent but actually hostile to it." He wished Dalhousie to inform the Council of Education that "it is henceforward to consider its functions as comprising also the superintendence of Native female education, and that wherever any disposition is shown by the Natives to establish female schools, it is to give them all possible encouragement and further their plans in every way....." The magistrates were not to overlook "any attempt to illtreat or intimidate those who are engaged in furthering a work which Government considers so beneficial."[10] Dalhousie's Council (except for Sir John Littler who contended, to Dalhousie's derision, that a little education in females would lead to immorality !) endorsed Bethune's views.[11] The Court's despatch of 4 September 1850 gave the green signal. Wood's despatch made the principle of grants-in-aid applicable to female schools, since by this means "a far greater proportional impulse is imparted to the educational and moral tone of the people than by the education of men."[12]

Halliday knew one man who could take up the burden of Atlas on his shoulders—Vidyasagar—and to the latter, spreading female education was a labour of love. He was ideally fitted to dispel the hostility of the upper classes by his Brahmin pundit's image and he was able to rouse not only public sympathy but some active public co-operation. We find him applying for government grant for female schools from May 1857 [13] When the Government obliged him in two cases in Hooghly and two in Burdwan,[14] he concluded, erroneously as we shall see, that it had taken up a generous policy of expanding female education in rural areas. In anticipation of Government sanction, he went on blithely opening one female school after another and finished

with a record of 40 schools with 1,348 pupils between November 1857 and June 1858.[15]

The formal applications for grants followed and the D.P.I. forwarded them in due course. But the Lieutenant-Governor was alarmed at this spurt-of enthusiasm. He could not comply with the request unless the rules for grants-in-aid were relaxed. The Court's despatch of 1 October 1856 had held out hopes that fees would not be demanded from the pupils. But some further encouragement from the local public was required. The Lieutenant-Governor proposed "that whenever a suitable school house is provided, and the attendance of as many as 20 girls is promised the payment of all the other expenses of maintaining the school shall be defrayed by Government.

When the Government of India communicated on 7 May 1858 its unwillingness to allow any abrogation of grants-in-aid rules in favour of female schools, the D.P.I. proposed to establish 24 model schools, eight in each of three districts of Hooghly, Burdwan and 24 Parganas, at Government expense. He also recommended that Vidyasagar be reimbursed for the expenses he had already incurred in maintaining female schools which he had established "in anticipation of the sanction and approbation of Government" The actual amount was Rs. 3439-3-3. "The Pundit admits", wrote the D.P.I., "that he acted 'without orders', but he says that at the commencement of his operations he was 'not discouraged' either by the Director or by the Government, and that if he had been, he would not have ventured to open so many schools and incur so heavy a responsibility." The Lieutenant-Governor lent his support to the D. P. I.'s recommendation and prayed for a revision of the Government of India's order of 7 May. The Pundit acted in good faith, he pleaded, though in contravention of the Court's orders[16]

Vidyasagar never denied that he had committed an official *faux pas* in establishing these various establishments without orders. "But I must be permitted to mention", he argued, "that at the commencement of my operations I was not discouraged either by yourself (D. P. I.) or Government. If I had been, I would never have ventured to open so many schools. .... The establishment, having been appointed by me, naturally look up to me for payment, and it will certainly be a great hardship if I am made responsible for it, especially when the expenditure has been incurred on

furtherance of an object of public utility."[17] The D. P. I. corroborated the story. Concluding from a letter of Bengal Government (21 October 1857) that it regarded Vidyasagar's activities favourably, he and Woodrow had forwarded Vidyasagar's reports on the establishment of new schools "without delay, discouragement or remark" [18] The Lieutenant-Governor confessed that he had sanctioned grants to four schools "under a mistaken view of authority ...." which, when continued, seemed, "not unreasonably, to have led the Pundit to suppose that all other such schools would receive grants on similar terms."[19]

It is quite clear from the official correspondence that over-enthusiasm fostered a misconception in Vidyasagar and the misconception was strengthened by the easy-going Lieutenant-Governor, who genuinely appreciated Vidyasagar's work and wanted to give him a free hand, and by the D. P. I., who was awed by the personal contact between his official subordinate and the Executive Head of the province, till the whole fabric was brought tumbling down by the pettifogging bureaucrats of India Government, which was itself caught in the fury of the Mutiny and was worrying more about survival than about saving a few benighted Bengalee females.

The Government of India ultimately sanctioned the three thousand and a half rupees spent by Vidyasagar, but stood firm on the principles of grants-in-aid which had neither been fulfilled nor were likely to be fulfilled by his female schools. The Court's despatch of 22 June 1858 forbade the India Government to grant aid to schools such as Vidyasagar had opened. The latter could only forward the correspondence home, recommending that a grant, not exceeding 1000 rupees per month, might be made for the establishment of female schools in Hughli, Burdwan and 24 Parganas, a part of which might be allocated to Vidyasagar's schools.[20]

What began with a bang ended in a whimper. Where the principle of grants-in-aid went wrong was, as Sir Charles Wood realised later, that it was available to those who had some means, and did nothing for those who had *none*.[21] In a letter to Cecil Beadon (Lt.-Governor of Bengal) he admitted that "Government aid is best bestowed on the poor and those who cannot provide... (education) for themselves ; and if no private contributions can

be had, it may be necessary to have schools supported exclusively by Government". At the same time, he wished the Government to accept responsibility at the last stage, when no public support was likely to be forthcoming. "I would say to the Hindoos, 'Find some funds & we'll aid you as we aid... the missionaries'.[22] It was a pity that the Government was not prepared to wait for the emergence of local support which Vidyasagar promised. It stood strictly by the letter of the Despatches and allowed the middle classes to take full advantage of the grants-in-aid, while the poor peasantry looked helplessly at the process. Most of Vidyasagar's dream children were "strangled at their very birth",[23] though he continued to struggle gamely to gain public or private support, including even that of Lady Canning.

The Government's dicision hurt his *amour-propre*. But other disappointments were not lacking. He expected to fill the leave vacancy of Hodgson Pratt as Inspector of Schools for Sourthern Bengal, or at least to be put in charge of four districts, where the model schools had been established by himself, the Government colleges and schools being excluded from his supervision.[24] To ask for so little shows his humility rather than his ambition. Bureaucracy prevented Halliday from appointing an Indian to the post of Pratt and Vidyasagar was deeply wounded, not so much for being deprived of a cushy job as for the racial discrimination which lay behind it and which his patron was unwilling or unable to overcome. He exaggerated his differences with Gordon Young, the D. P. I., a sure sign of his irritation with authority.

He informed Young of his desire to resign as early as 29 August 1857. It was in deference to Halliday's request that he continued as Principal of the Sanskrit College for another year and he tendered his resignation formally on 5 August 1858. The major cause was ill health. "Among the minor causes that have led me to my taking so serious a step," he added, "are the absence of all further prospects of advancement and the want of that immediate personal sympathy with the present system of education, which every conscientious servant of the Department, should possess. ... My heart is not in my work, and that thereby my efficiency is, and must, be impaired."[25] May we not say that the Bengal Government's prevarication about grants-in-aid to his

The renaissance man

Hiren Bose

The year 1857. The wildfire of the Sepoy Mutiny was spreading unabated taking the alien rulers by surprise. It was the first organised challenge to the rule of the Britishers who having arrived as traders had enslaved the country. The officers of the East India Company decided to shift some of their soldiers stationed at Fort William to Sanskrit College, Calcutta.

But the principal of the Sanskrit College would have nothing of it. For him, the sanctity of the educational institution was much more important than his job. Despite being paid for his services by the Britishers and uncaring for the consequences, he strongly opposed the decision of the EIC. Considering the background of those turbulent years it was remarkable of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar to stand for his ideals.

Vidyasagar, besides being an educationist, was also a social reformer. He epitomised the finer qualities of a renaissance man. A man who used education as a weapon to fight the social ills. He would be remembered for the achievement acquired in the 19th century-English education, beginning of women's education, social upliftment and creation of Bengali prose.

Before the presence of Vidyasagar was being felt in the 19th century Bengal it had 33 schools and only 1,400 persons who could read and write. Such was the poor state of education in Bengal that there was no quality primer to learn the language. There was a dearth of Bengali literature, and the syllabus in schools were not original works but translated works from Hindi. Whatever education was imparted was through handwritten books.

Despite the establishing of a printing press in Calcutta there was no change in this regard, for there was a widespread belief that one who read published books would lose his caste. The British formed the Calcutta School Book Society to publish books both for the instruction of the teachers and students.

But the books published by the Society reached only the missionary schools.

In 1841, after having completed his studies from the Sanskrit College, Vidyasagar joined as head of the Bengali department at

Fort William College. At the instance of the principal he translated the popular Hindi book *Betal Pachhisi* into Bengali which became a part of the syllabus. Meanwhile, the British decided to establish 101 schools in Bengal, and Vidyasagar was given the task of interviewing and appointing the teachers. During this period, he realised the absence of a quality primer.

In 1850, at the insistence of J.E.D. Bethune who had founded the Calcutta Female School a year before, Vidyasagar joined the school as a secretary. From then onwards Vidyasagar authored *Bodhoday, Kathamala* based on Aesop's fables and *Charitavali* comprising biographies of famous men from the Western civilisation. But his main achievement for which he will be remembered by everyone who learns the Bengali alphabets is the *Varna Parichay* in three parts.

According to modern psychologists, the child speaks in short sentences like the language used in telegrams for they are unable to remember long sentences. And Vidyasagar used short sentences in his *Varna Parichay*.

Being a forerunner educationist his views ran contrary to the prevalent methods and traditions. He was against the policy of spare the rod and spoil the child and he stopped caning of students in his school. Besides, he stopped all other forms of discipline which he thought would have a bad effect on the students. Once on a visit to the Metropolitan school he came to know that a student's(Narendranath Dutt who later became famous as Swami Vivekananda), ear was bleeding after a teacher had punished him. Vidyasagar reprimanded the teacher by saying : "I thought you were a human being. But now I see that you are an animal."

To encourage education in Sanskrit, the British expressed their desire to establish a Sanskrit College. But it failed to impress Raja Ram Mohan Roy, and he wrote a letter to Lord Amherst in support of English education. Meanwhile, the missionaries of Srirampur supported the initiative of the British officials on the condition that the syllabus should also contain books about Western science and civilisation.

In later years, Vidyasagar, who became the principal of the Sanskrit College at the age of 31, used the college to initiate not only educational reforms but also reforms in the social fabric. In 1829, the British government made *sati* illegal by an enactment

which greatly stirred the Hindu society.

Groups sprang up all over Bengal opposing the Government's action and many leading lights including the then principal and teachers of Sanskrit College (where Vidyasagar was studying then) gave a call to save the Hindu religion. But there were many who were against *sati* and child marriage and they organised meetings and wrote articles castigating the social evils of Hindu society.

Vidyasagar, like many of his contemporaries and predecessors including Devendranath Tagore, Keshav Chandra Sen, Bankim Chandra Chatterjee and others, had married at a very early age. In 1850, he wrote an article against child marriage. But the article failed to arouse the consciousness of society. Despite that, Vidyasagar forged ahead to stop the evil which was plaguing 19th century Bengal and initiated the movement in support of widow marriage.

The abolishing of *sati* had saved many lives but the lives of these widows was pitiable for they were considered the dregs of society. The remarriage of these hapless women was considered an act against the *Shastras*. Vidyasagar took upon himself to study the *Shastras* and found references in support of widow marriage in "*Parasar Samhita*" He published a book supporting widow marriage quoting the Shastras in 1855.

The book created a sensation and, within months, over 15,000 copies were sold. But the traditionalists were not sitting quiet, they too published books challenging the arguments put forward by Vidyasagar. In the same year, Vidyasagar wrote a second book supporting his earlier contention.

Vidyasagar forwarded an appeal by 987 signatories to the Indian government to enact a law in support of widow marriage. Despite opposition from several quarters, the government passed the Widow Marriage Act in 1856. But the Act failed in its purpose for widow marriage ran counter to the tradition unlike *sati*, which was inhuman and abominable.

But for a few exceptions widow marriage for the majority of men became avenues to gain wealth and sexual pleasure.

Just as the Bengal's social life was witnessing an upsurge due to widow marriage Vidyasagar wrote an appeal to the government for banning polygamy by enacting a law. And soon after, the government received hundreds of appeals to make

polygamy illegal. The newspapers then predicted that time was not far when the government would pay heed to the appeals of the people. But the Sepoy Mutiny of 1857 delayed things and the government became occupied countering the rebellion.

Vidyasagar was a man of the nineteenth century. A century where reformers had to find their way through hesitation, contradiction and doubts which at times made their work self-contradictory. Though we do not find much self-contradiction in Vidyasagar's activities, we are unable to explain his disinterest in educating his wife and daughter.

His biographers have failed to provide information as to whether Vidyasagar took any effort to educate his womenfolk. Maybe in his death centenary year -- Vidyasagar died at the age of 70—we will be able to know more about this renaissance man.

Courtesy · Blitz 31-8-91

Selected Correspondence

পরিশিষ্ট ১ .

Source : *Unpublished Manuscript Records*
Sanskrit College, Calcutta.

To

Baboo Russomoy Dutt,
Secretary to the Sanscrit College.

Sir,

Agreeably to your instructions dated 21 April, I now beg to submit my reasons for tendering the resignation of my appointment.

I studied the Sanscrit Language and Literature in the Government Sanscrit College and there imbided my respect and zeal for these subjects. Impelled by these feelings and without any other strong motive, I applied for this appointment. I had hopes that I might be enabled to remove the impediments which I knew existed to the pursuit of effectual study and that I might be instrumental in introducing new and efficient methods, but finding my hopes of being useful frustrated and that there were circumstances of disgrace super-added I thought it high time to resign. I now proceed to state in detail the principal reasons for this step.

I was well aware of the causes which had conduced(?) to render the scholarship examination of 1845 so unsatisfactory and on my appointment in April 1846, I found all these causes existing in full vigour. There was no rule or method for securing the course of reading necessary for the Junior Scholarships. One of the subjects is Grammar but the students of the Kavya and Alankar classes (in the Junior Department) were almost, without exception, utterly unfit to stand the most superficial Examination on that subject. Again, Arithmetic is another of the subjects : but the scheme then existing did not admit any of the Junior Department to the Jyotish class, of course they failed in Arithmetic. The students of the Senior Department only were directed to study Jyotish ; this branch formed no part of their examination. Consequently with very few exceptions they paid no attention to this study. The badness of such an arrangement is self-evident. Again for Junior scholarship, it is necessary to make translations

from Sanscrit into Vernacular and vice versa. But there were no proper arrangements for that constant and regular practice in these branches which is so absolutely... and Books fitted for the purpose were also entirely wanting. Again Kavya is another subject, but the late Professor, about for two years previously to his death which occurred in May 1846, was quite unable from bodily infirmity to do justice to his class. He used to instruct three or four of his senior scholars and leave to them the duty of instructing the rest and the person whom he occasionally gave as a substitute sometimes for long periods was very deficient in the necessary qualifications. When I joined, the class was divided into 10 sections reading different lessons and such had been the state of things for a considerable period. These irregularities were no doubt the cause why the scholarship examination of the Junior class for 1845 was so unsatisfactory.

The students of the senior class have always been through the efforts of the Professors well trained in the two branches which.... the subjects of their immediate study viz. *Smriti* and *Nyaya* ; but in the other subjects for a senior scholarship, viz. General Literature, Essays, and Translations, they were generally with a few exceptions found deficient owing to the want of an arrangement for regular practice in these points. In short, from the above and other similar reasons the instruction given fell far short of the objects proposed. Therefore the necessity of a complete revision of the system struck me forcibly on my first joining my appointment, but as it only wanted five months to the annual examination I determined then to confine my efforts to those points alone which were most immediately concerned. I consequently commenced daily to give to the Senior Department Bengali Papers to be translated into Sanscrit. In the *Cavya* and *Alankara* classes of the Junior Department I ... to revise daily a fixed portion of grammar and by threatening to degrade into the grammar class those who were found deficient at examinations taken by me every fortnight, I induced them to pay so much attention to this subject as in a great degree to remove the deficiency in this subject as was apparent at the next examination. And as regards Jyotish I represented to you the state of thing and with your sanction directed the students of the *Cavya* and *Alankara* classes to attend at fixed times the instruction of the Jyotish Pundits, thereby providing in some degree against the deficiency

in this respect. The 10 sections of the *Cavya* class were also with your sanction rearranged and reduced to three sections. The appointment of well qualified and diligent professor to this class about that time finally removed all the impediments to effecting study which had previously existed. In addition to all these, two months previous to the examination I put a stop by authority to all new lessons and caused all the students of the Institution to employ themselves solely in revising their former studies. In these two months the *Cavya* and *Alankara* classes went entirely through the two text books of general Literature in the Junior Scholarship examination viz. "Roghu-Vansha and Kummar Sambhava" and at the same time labored...at Translations, Arithmetic and Grammar. The Bengalee Books necessary for practising translation, I borrowed to the amount of about 50 copies from the College of Fort William and other sources and lent to the students. In all my efforts I was warmly supported by the able and zealous professors of these two classes and I felt confident that the next examination would show a marked improvement in the Junior Department. In the Senior Department the chief efforts were directed to remedy the dificiency of the students in the higher books of Poetry. A number of works were revised and to meet the want of Books I was again obliged to apply for copies of Magha and Bharavy to the College of Fort William and other sources before referred to. The deficiency on this point was thus in a great degree provided for. But for want of leisure so much attention could not be spent to composition and translation. Thus from the day of my appointment I devoted all my energies to the object producing a marked improvement by the next examination and I had hoped that if such should prove to be the result that I should be thought deserving of approbation by my superiors. The Examination proved satisfactory and the Examiner reported favourably and I naturally looked for the praise, I thought I had deserved ; but from your letter no 239 dated 4th January 1847 to the address of the Secretary of the Council of Education forwarding the Draft of your General Report, it is clear that you were not satisfied with the degree of commendation bestowed by the Examiner and in fact you considered his laudatory remarks on the progress of the students as altogether unfounded. My just hopes of commendation were thus at once quashed ; but I can boldly affirm and I appeal to all

the professors and students that the means and efforts which I employed in the four or five months which preceded the Examination of 1846 and the zeal and diligence with which these were seconded by the other parties concerned have never been equalled since the scholarships were first instituted and this I will also venture to assert that if the former system had not undergone such serious alterations the Examination of 1846 would certainly have proved worse than that of 1845.

I cannot expect... your approval of my conduct from your personal observation as your other heavy duties seldom allow of your visiting the college. I can therefore look only to the report of the Examiner, but this resource has been also cut off by the bad spirit in which you have received the favourable sentiments of that officer. It cannot however be denied that the method of instruction has in the course of the last year greatly changed for the better and that I have spared no exertions on my part in effecting this object. Every Pundit and student can bear testimony to these points. It must be inferred that the state of the college as to instruction before my arrival and the changes introduced by me must both have been hidden from your knowledge. I would submit if a person receiving such a return for his disinterested exertions had not just cause to be dissatisfied and if he can be expected again to take so much trouble upon himself.

I now advert to a second subject in which my well-meant endeavours have been similarly rewarded with disappointment. On my joining the college when I made provision for meeting the most pressing necessity of preparing the students for appearing with credit at the approaching examination, I cherished designs of a more... I knew that a thorough and constant rearrangement of the whole system of study was necessary to develop and keep in permanent activity the resources of the Institution. Accordingly during the months of April, May and June, I watched and revolved in my mind the working of the whole system and when I was obliged by sickness to go home on leave for 3 weeks in July I took advantage of that leisure to commit my ideas and conclusions to writing. On my return I consulted... five of the Pundits on the subject and obtained their entire approval of my Plan. It was also approved of by Major Marshall who recommended me to transmit it to you for submission to the Council of Education. Thus encouraged I put the plan in an official form into your hands

requesting you to bring the matter at once before the authorities so that during the 3 weeks vacation then commencing from Durga Poojah the matter might be taken into consideration and the new scheme if approved of by the Council might be adopted when the College re-opened. You read the whole and observed there was no necessity to submit it to the Council as you could yourself adopt the new arrangements. After the vacation when I had often urged you to put in force the provisions of my new Plan you one day remarked that you felt at liberty to adopt the changes recommended on the subject of the Grammar classes but you are not empowered to carry into effect the other proposals without the permission of the Council. On a subsequent day you came to the College with my plan in your hand and observed to me it would not be advisable to make any change without consulting the Council and that you would apply for their sanction to the new scheme as far as it regarded the Grammar classes. I suggested that as an application was to be made to the Council it might as well embrace the whole Plan, to which you replied that it was no use sending up so many subjects for consideration as they would not be attended to, not even read,—the members would take fright at such a voluminous document and it would therefore be better to bring it forward in separate portions. After all this the only report made by you on the subject was one dated 16th October 1846 embracing only the Grammar classes and even as regards them you omitted mention of 3 class Books recommended by me which formed a prominent feature of the scheme and in fact without which one of the classes must be crippled and almost useless. Thus out of all my suggestions one only was submitted by you to the Council and that even in a mutilated form. All my other proposals have been treated as totally unworthy of consideration, but I nevertheless feel confident that each of them is calculated in no way to injure the college but on the contrary to promote its efficiency. Nay, I am enabled to say on the coinciding Judgement of others highly qualified to give an opinion that if my scheme or some other very similar be not substituted for the present defective system, the Institution will not fully answer its two purpose, namely of imparting Sanscrit Literature primarily and of teaching English secondarily. At any rate it is highly unsatisfactory to find my endeavours and labors frustrated without any due consideration of their merits.

There is another circumstance connected with this Report of mine justly calculated I think to cause me much dissatisfaction.

Major Marshall at the close of his report on the Scholarship examinations recommended to the Council to adopt the suggestions made by me which have so often been alluded to. On this in the Annual Report of the Sanscrit College for 1846-47... you remark : "The report referred to by Major Marshall was prepared by direction of and mostly from data furnished by the Secretary to the College by whom the chief recommendations contained in it which accorded with his expressed views have already been submitted to and approved of by the Council of Education and are contained in the introductory portion of this Report." 'Now I respectfully deny even having received from you any data for the Preparation of that report and the only thing in the shape of direction I can remember was your instruction to devise a plan for reducing the number of sections in each class and introducing... into the Grammar Classes. As to my chief recommendations, having been submitted to and approved of by the Council· that is briefly answered by referring to what has been shown before, namely that out of the numerous subjects referred to in my long report only part of one has been thought by you worthy to be laid before superior authority.

From the length to which this paper extended I must bring it to a close, but I shall always be ready to meet any proper enquiry into the subjects mentioned. I think I have brought forward sufficient to show that my labors have not met and are not likely to meet with due appreciation and this is the ground of my resignation.

I studied 12 years and 5 months in the Sanscrit College with some distinction. I was the next 5 years Head Pundit of the College of Fort William, during which period my time was also wholly devoted to Sanscrit studies, and my assistance was every year required by Major Marshall for preparing questions for the Sanscrit College Scholarship Examinations as for Examining the Replies given in. In giving up that appointment for my present one, I was elevated by the hope that I was entering on a sphere where my acquirements in Sanscrit Literature added to my long experience in the affairs of the Sanscrit College would prove of great benefit but as I have already stated I consider my expectation to have been frustrated.

One point affecting the credit and comfort of the College I had almost omitted. I allude to the privilege assumed by the Principal of the Hindu College to take occasionally a portion of the stools and desks of the Sanscrit College for the accommodation of his own students at particular Examination for 3 or 4 days together. Some of our students are obliged to sit on the ground and it must be remembered the rooms are not matted. This irregularity has been frequently reported to you and although you have frequently promised to take efficient steps for putting a stop to such unjust interference, yet you do not appear to have taken any such steps either because you approve of such conduct or because you are not impressed with the inconvenience and unseemliness of our half of a class sitting on the bare ground whilst the other half sit on stools. Such a disregard of the comfort of the students and of the rights of the institution is to me highly distasteful.

I have thus stated some of the principal reasons for tendering my resignation. The assigning of such reason in detail did not appear to me to be at all necessary ; but in compliance with your especial requests I have frankly submitted them.

I must therefore..that allowances will kindly be made for any expressions which may carry an appearance of undue freedom.

I have the honour to be
Sir
Your most obedient servant
Ishwar Chandra Sharma
Assistant Secretary, Sanscrit College.

Sanscrit College.
3rd May, 1847

পরিশিষ্ট ১ খ

Source : *Unpublished Manuscript Records*
Sanskrit College, Calcutta.

To

Babu Russomoy Dutt,
Secretary to the Sanskrit College.

The Memorial of the Pundits and Teachers of the Sanskrit College.

Respectfully Sheweth,

That your memorialists beg to express their sincere regret at

learning that Essur Chandra Biddasagore, Assistant Secretary to the Sanscrit College, has for reasons unknown to them resigned his situation as they are really afraid that his resignation at a time when the college is, as it were being altogether remodelled, will prove very much prejudicial to its true interests.
The Assistant Secretary by his personal abilities, and industrious habits, and zeal in the welfare of the College, has as is already known to you, introduced several beneficial changes and proposed such salutary innovations in the system of Education hitherto pursued there, as your memorialists expect, will soon place that Institution on a very solid efficient footing. Your memorialists are of opinion that the appointment of the said Bidya Sagore does great credit to your judgement, who determined on the last occasion of filling up the vacant... of your assistant upon nominating one, intimately acquainted with the sanskrit and tolerably versed in the English language as they believe that the Assistant Secretary has been in a great measure enabled by the above qualifications to plan the revised system already noticed. Under these circumstances your memorialists cannot but be sorry that he has tendered his resignation and they sincerely trust as his loss cannot easily be supplied that you will be pleased to adopt such measure as will induce Essur Chunder to continue his services at the college which will no doubt be greatly conducive to the prosperity of our Institution.

In conclusion your memorialists beg to state for your information that the resignation referred to, being tendered to the Secretary to the Council of Education your memorialists have with a view to prevent delay, presented a similar memorial to Dr. Mouat in the hope that he may not take hasty steps to accept the resignation of an office, who might otherwise be induced to continue his services to the college if not for his own, at least for the interest of the institution which he was appointed to look over.

And your memorialists as in duty bound shall ever pray :

Sanskrit College, 10th April, 1847.

শ্রী কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননস্য	শ্রী তারানাথ শর্ম্মনং
,, জয়নারায়ণ শর্ম্মনং	,, প্রেমচন্দ্র ,,
,, ভারতচন্দ্র ,,	,, গিরীশচন্দ্র ,,
,, দ্বারকানাথ ,,	,, যোগধ্যান ,,

,, রামগোবিন্দ ,, Russick Lull Sen
,, প্রাণকৃষ্ণ ,, Shama Churun Sircar
,, মদনমোহন

পরিশিষ্ট ১ গ

Source : *Unpublished Manuscript Records*
Sanskrit College, Calcutta.

'NOTES' ON THE SANSCRIT COLLEGE

1. The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal.

2. Such a Literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali.

3. An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanscrit scholars. Hence the necessity of making Sanscrit scholars well versed in the English language and literature.

4. Experience proves that mere English scholars are altogether incapable of expressing their ideas in elegant and idiomatic Bengali. They are so much anglicised that it seems at present almost impossible for them, even if they make sanscrit their after-study, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali style.

5. It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali Literature.

6. Our next question is what sort of Instruction in the Sanscrit College is necessary for the purpose ?

7. The students of the Sanscrit College should be thoroughly instructed in Grammar and Literature—the latter including poems, dramas and prose works.

8. In Rhetoric, they should be instructed in two or three capital works, such as Kavya Prakasha...and two or three chapters of Sahitya Darpana.

9. The study of these, that is Grammar, Literature and Rhetoric will enable the student to acquire a complete mastery of the Sanscrit Language.

10. In Law they should study the following works : The Institutes of Manu, Metakshara Sec. II vivada.....Dayabhaga Duttakamimunsa and Duttakachundrika. The study of these is sufficient to make one conversant with the Hindu Laws current in almost every part of India.

11. In mathematics, Lilavati and Vijaganita are the text books. Lilavati treats of arithmetic and mensuration and Vijaganita of Algebra. These two works are very meagre and from a curious perversion of Ingenuity and obsessed of a right sense of real value and object of such studies, the author has made them so difficult by putting the rules and questions all in verse that the students cannot go through them in less than three or four years. The examples are very few. The fact is, the study of Sanscrit-mathematics is not only nearly useless in itself, but it interferes largely with other studies and engrosses a great deal of time and labour which might be employed in far more useful pursuits.

12. Hence the study of mathematics in Sanscrit should be discontinued.

13. It is not to be understood from this that I undervalue a knowledge of Mathematics as an essential element of a complete education. Far from it. I wish to substitute the pursuit of it in English, whence in less than half the time now given to it an intelligent student will acquire more than double the amount of sound information that he could obtain by the most perfect acquaintance of all that exists in the Sanscrit language in the subject.

14. There are six prominent schools in Hindu Philosophy namely Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Patanjala, Vedanta and Mimansa. The Nyaya system of Philosophy principally treats of Logic and Metaphysics and occasionally touches upon subjects of Chemistry, Optics, Mechanics etc. The same description applies more or less to the other systems respecting Mimansa and Patanjala which treat, the former of religious ceremonies and the latter of abstract contemplation of the Deity.

15. As to the utility of the study of these in a college course I should quote the words of my report dated the 16th., December 1850.

16. 'True it is that the most part of the Hindu system of Philo-

sophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is absolutely required. By the time that the students come to the Darshana or Philosophy class their acquirements in English will enable them to study the modern Philosophy of Europe. Thus they shall have ampler opportunity of comparing the System of Philosophy of their own, with the new Philosophy of Western World. Youngmen thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy than if they were to derive their knowledge of philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why I have ventured to suggest the study of all the prevalent systems of philosophy in India is that the student will clearly see that the propounders of different systems have attacked each other and have pointed out each other's errors and fallacies. Thus he will be able to judge for himself. His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different system.

17. Another advantage is, that students so prepared, wishing to transfer the philosophy of the West into a native dress will possess a stock of technical word, already in some degree familiar to intelligent natives.

18. A profound knowledge of these is not required. It will suffice if the students go through these works. In Nyaya, Aphorisms of Gotama and Kussumanjali ; in Vaisheshika, Aphorisms of Kanada ; in Sankhya, Aphorisms of Kapila and Tutta Koumudi ; in Patanjala, Aphorisms of Patanjala ; in Vedanta the Vedantasara and the I & II Books of the Aphorisms of Vyasa ; in Mimansa, Aphorism of Jaimini. In addition to this the students should read the Sarbadarshana Sangraha being review of all the Systems of Philosophy presented in India. The study of these works will make one familiar with Hindu Philosophy without much loss of time.

19. The students of the Sanscrit College while they are in the Grammar and Literature classes should direct their attention principally to Sanscrit studies devoting two thirds of the time to the Sanscrit and one third to the English. When they are in the Rhetoric, Law and Philosophy classes their chief attention should be directed to English devoting two thirds of the time to this important branch of Education.

20. At present the following are the subjects for the Senior

Scholarship Examination in the Sanscrit College ; Literature, Rhetoric, Mathematics, Law and Philosophy, Sanscrit Prose, Essays. These should be modified, Literature and Rhetoric should form our subject. Mathematics in Sanscrit and Sanscrit Essays should be dispensed with and in their stead three branches in English namely, History, Mathematics and Natural Philosophy should form each a subject of Senior Scholarship Examination in the Sanscrit College. Moral and Mental Philosophy, Logic and Political Economy should form also subjects of the same examination being in turn selected every succeeding year.

21. The English Department consisting of two teachers is quite inadequate to fulfil the object in contemplation. Moreover the present teachers are not sufficiently familiar with Mathematics and Natural Philosophy. I am fully convinced that they are not the class of teachers which the necessities of the Sanscrit College absolutely requires. They would do well if transferred to other Institutions where they will not be required to teach more than the elementary portions of an educational course.

22. This Department should therefore be remodelled and made to consist of four efficient teachers with salaries of Rupees 100, 90, 60, and 50 respectively. With these remunerations the services of good teachers may be secured. This arrangement requires 300 Rupees per mensem for the English Department.

23. By the discontinuance of the Sanscrit Mathematics class and the transfer of the two present teachers there will be a saving of 250 Rupees per month, the remaining 50 Rupees should be supplied from the funds appropriated to the Institution which are Rupees 24,000 per annum and out of which only 19,000 and some odd hundreds are at present expended.

24. But if the state of the Education funds would not at present in anyway admit of this additional expense, the demand may be supplied in other ways. There are at present two writers who copy manuscripts, one in Bengali and one in Nagree, each receiving 16 Rs. per mensem. The manuscripts which they copy are quite useless. Manuscripts are generally very incorrect, and every time they are copied the mistakes and omissions get at least doubled. Thus manuscripts copied by mere copyists become almost unintelligible. Besides, the two writers employed in the Sanscrit College can copy in one month little more than 5 or 6 Rupees work while they draw 32 Rupees per mensem. Their

services therefore should be dispensed with and the 32 Rupees will be saved. There is a Junior Scholarship of 8 Rupees per month allotted to the English Department. If History and other branches alluded to before be added to the Senior Scholarship Examination, there will be no use of allotting a separate scholarship for the English Department and the 8 Rs. thus saved together with the 32 Rs. saved by dispensing with the services of the two writers raises the amount to Rs. 40 per month. So only 10 Rs. will be required to be paid from the appropriated funds.

25. When I joined the Institution at the end of 1850 the views which I entertained respecting the course of studies to be adopted in the Sanscrit College I submitted to the Council of Education in report on the Institution. Since that time experience has made me modify my views on some few points. This will explain why these notes disagree in a few particulars with my report.

26. It appears to me that unless the Sanscrit College be remodelled according to the principles now stated, there exists no prospect of material improvement or of fully carrying out the objects of the Institution.

Sd/- Eshwar Chunder Sarma.
12th April, 1852.

The accompanying paper has been drawn up by the Principal of the Sanscrit College at my request.

It is the result of several consultations I have held with the Principal and I lay it before the Council as deserving, in my humble judgement, of very careful consideration.

Sd/- Halliday.
30th June, 1852.

পরিশিষ্ট ১ ঘ

Source : *Council of Education* : Copies of Correspondence between the Council of Education and the Principal of the Sanskrit College, Benares, 1853. (Education Dept. Records, Govt. of West Bengal).

(A)

From

James R. Ballantyne,
Principal of the Benares College.

To

The Secretary of the Council of Education,
Calcutta.

Sir,

I have the honour to forward for submission to the Council of Education, the following observations suggested by the visit which I have paid to the Calcutta Sanscrit College, by invitation of the Council, and under the sanction of the Government of the North West Provinces.

2. From my personal intercourse with the accomplished Principal, Pundit Eswar Chender Vidyasagur, I have derived the gratification which I was led to anticipate both by his reputation and by his report on the College, on which the Council some time ago, did me the honour to request my opinion.

3. With the arrangement of the classes in the Sanscrit College, and with the apparent zeal both of teachers and pupils, I have been much pleased. The course of studies (if the appliances of the institution suffice for its being completely carried out) is very full, especially in the English division of the course. On some points of detail in regard to the selection of class book, I may have occasion to offer remarks in the sequel. Leaving out of consideration here various topics on which I shall hope to have opportunities of consulting with Pundit Iswar Chender by letter, I address myself to the question which I conceive the Council to have proposed to me, viz. is there anything in the working of the Calcutta Sanscrit College, or of the Benares Sanscrit College, which might be advantageously adopted by the one from the other ? To reply briefly, I think there is, in both although in consequence of the difference of local circumstances, the two institutions may still judiciously be left to differ in several respects. The bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom, and uniformity is dearly purchased when purchased by the sacrifice of more serious interests.

4. A noticeable source of distinction between the two Institutions is the fact that the Benares Sanscrit College contains no

Bengalis, while the Calcutta College contains nothing else. To prevent misconception here, a misconception which has been sometimes turned to mischievous account, it may be observed that it is the Sanscrit College of Benares, that is spoken of not the English School associated with it under the same roof. The English school is indeed mainly recruited by Bengalis, but the application of a Bengali for admission into the Sanscrit College of Benares is a thing scarcely known. The Bengalis who are students of Sanscrit College, participating in the general desire for the acquisition of English, which they see in those around them may advantageously be introduced to the study of English at that point, in the course which Pundit Eswar Chunder has fixed upon. It does not follow that the same arrangement would work well at Benares. To supply instruction to him who craves it and to force instruction on him who does nót seek it, are very different things. At the same time I quite approve of its being compulsory, as it is now in the Calcutta Sanscrit College, to begin English at the stated date, whether the pupil feel inclined to it or not, this arrangement being rendered indispensible by the system of class teaching, the introduction of which, into the Calcutta Sanscrit College has been effected by its present Principal. On the advantage of the class system, in enabling the same teacher to take charge of a very much greater number of pupils, it is unnecessary to dwell. Of the difficulties in the way of adopting the system to the same extent, at Benares, this is not the occasion to speak. It may suffice here to remark that the Bengali boys are in general more plaint (?) than those of the Upper Provinces, and that Calcutta is so far inoculated with Anglican feeling, consciously or unconsciously, that an argument from Calcutta to the Upper Provinces is very apt to mislead. This holds also conversely and therefore I would offer any suggestion, for the imitation of either College by the other, under this express proviso, that regard be had to the different circumstances of the two places—

5. Holding, then generally, that the Sanscrit course, in the Calcutta Sanscrit College, is a good one and also with a competent staff of teachers the English course, I yet desiderate sufficient provision for obviating the danger that the two courses may end in persuading the learner that "truth is double". This danger is no chimerical one. To take an example, I am acquainted with Brahmins who, being well versed in Sanscrit Literature and also

familiar with English, are aware that the European theory of Logic is correct, and also the Hindoo theory, while at the same time, they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other. If this be the case with the very best of those who have studied both Sanscrit and English independently, it is not likely that the case will be different with the general run of pupils similarly trained. One reason why this is to be regretted, is that men so educated cannot satisfactorily communicate to their educated fellow countrymen who are unacquainted with English much of that valuable knowledge which they themselves have gained through the English. They cannot show that our English sciences are really developments and expansions of truths the germs of which the Sanscrit systems contain, and therefore, to the mind of their hearers those valued germs appear to be ignored by or opposed to, English Science, when they might easily be shown to be involved in it. It is unncessary to dwell longer upon this consideration, because the very constitution of the present Sanscrit College, with its English course and its Sanscrit course implies the understanding that it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe, and to interpret between the two, removing unnecessary prejudice by pointing out real agreement where there was seeming discordance & conciliating acceptance, for the advancing science of Europe by showing that European Science recognises all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation.

6. With the view of determining what points in the Hindu system corresponded with points in European science, some years ago I took up the system called the Nyaya, and, in a work now partly printed in Sanscrit and English, under the title of "Synopsis of Sciences" I showed the points, in that comprehensive system, from which our various sciences branch out—some portions of this work I have read and discussed with Pundit Iswar Chunder, in company with one of my co-adjutors, Pundit Vethala Sastri of the Benares College. Pundit Iswar Chunder promises to introduce it to the Notice of his classes, and to communicate to me by letter any doubts or difficulties that may arise in the course of the study, so that the crudenesses incidental to a first attempt of such a kind may be gradually eliminated in due time. The next

Volume will commence with the theory of Inductive Investigation. In dealing with this important branch I hope to enjoy the advantage of Iswar Chunder's co-operation. I observe that he places in his list Mill's great work on the subject—As introductory to the perusal of that work I have prepared an abstract of it, in which I have traced, to some extent, the correspondence between its technical terminology and that of the Nyaya system in its treatment of the same topics. This abstract (printed by order of Govt. N.W.P.) being from its price &ca more suitable for a class-book than the entire work, I propose its adoption into the course. At the annual examinations, I should be glad to supply questions, on this and other works here suggested, the replies to which might not only furnish evidence as to the progress of the pupils, but might be so contrived as to lead to a still more complete determination of the way in which the mind of the native literate might be best conciliated to Baconian speculations—

7. Besides the Nyaya system, there are two other systems taught in the college, vizt. the *Sankhya* and the *Vedanta*, a text book of each of the three has been printed, with English Version and Notes, for the use of the Benares College—This might with equal advantage be read in the Sanscrit College here, and the criticism both of the pupils and of the teachers might here also lead to a more complete determination of the precise relation between the philosophical nomenclature of India and of Europe. As there is much in the two systems last named that finds its counterpart in the speculations of Bishop Berkeley, I have reprinted Berkeley's "Inquiry", with a commentary indicative of these correspondences ; I should like that the acuteness of the Calcutta Sanscrit College should be brought to bear upon this exposition also. Where speculation, in countries so widely separated as India and Europe, has arrived at similar or indentical conclusions, the conviction of the fact should naturally tend to beget mutual respect ; and mutual respect must naturally tend to facilitate the reception, by the less advanced nation, of the science and philosophy of the more advanced one—

8. In offering these remarks and suggestions, I have had in view almost exclusively the desirableness of bridging the chasm between the Sanscrit and the English—between the learning of India and the Science of England ; because the endeavour to bridge the chasm is what peculiarizes the measures introduced,

within the last few years, into the Benares College, and it was this peculiarity (if I mistake not) that attracted the attention of the Council—Pundit Iswar Chunder is perfectly competent to work the same system, and to aid me in improving it. As the Sanscrit College at present stands, there is a good Sanscrit course, and a good English course but the pupil is left to determine for himself whether the Principles inculcated in these correspond to one another, or altogether conflict, or correspond partly and if so how far. The pupil, left to determine this for himself does not, as we have seen, determine it satisfactorily at all and therefore not in the way of substitution for any part of the established course, but as an additional feature necessary to the completion of the design, I have suggested the employment of the treatises above-mentioned—

9. If the general principles of this report obtain the approval of the Council as I have reason to believe they have the concurrence of the intelligent Iswar Chunder. I shall co-operate with him most gladly in the endeavour to complete the arrangements for such a course of Anglo-Sanscrit Education as shall raise up successive bands of men qualified thoroughly to interpret the mind of Europe to that of India ; for this is indeed the great end of such an institution as we may hope for in the Sanscrit College—

I have &ca.
Sd/- James R. Ballantyne
Principal of the Govt. College Benares.

(True Copy)
Sd/- F. Mouat
Secry. Council of Edut.

(B)

From

The Principal of the Sanscrit College,

To

F. I. Mouat Esqr., M.D.,
Secry. to th Counil of Educn.
Dated Fort Willia Sepr, 1853

Sir,

I have the honor to acknowlede the receipt of your letter No. 1494 dated 29th Ultimo enclosin Reort on this Institution from Dr. Ballantyne, Principal of the Government College, Benares and

requesting me to report upon te same—

2. In reply I beg leave to state that I am very happy to observe that all the measures lately ntroducd into this Institution have met with the entire approbatio of a nofDr. Ballantyne's talents and abilities—

3. With regard to the adoption of class Books recommended by Dr. Ballantyne I regret to sa Icant agree with him on all points. He appears to recommend the adoptin o his Abstract of Mill's Logic in substitution of the original. Uner the present state of things the study of Mill's work in the Sancrit College is, I am of opinion, indispensable. Dr. Ballantyne princial reason for recommending the abstract seems to be the high price of Mill's work. Our students are now in the habit f purchasing standard works at high prices, so we need not o be dterre from the adoption of this great work ; on that considration D. Ballantyne's abstract might be read, to quote his own words, "as introductory to the perusal of that work". But the great atho himself, in his preface, strongly recommends Arch-BishopWhatley's treatise on Logic as the best introduction to his work. I leave the matter to the decision of the Council. Dr. Ballantyne also recmmnds to adopt as class Books three text books of each of he hree systems of Philosophy—Vedanta, Nyaya, and Sankhya, printed with the English Versions and notes. Of these the "Vedantasara", text book on Vedanta, is already a class book here and its version in English might be read with advantage. The two other text books recommended by him, the "Tarkasangraha", the text book on Nyaya, and the "Sattwasamasa", that on the Sankhya, are very poor treatises in their own Departments. We have better treatises in our Curriculum. With regard to Bishop Berkeley's Inquiry I beg leave to remark that the introduction of it as a class book would beget more mischief than advantage. For certain reasons, hich it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanscrit College. That the Vedanta *(sic !)* the Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute. These systems false as they are, command unbounded reverence from the Hindus. Whilst teaching these in the Sanscrit course, we should oppose them by sound Philosophy in the English course to counteract their influence. Bishop Berkeley's Inquiry, which has arrived at similar or identical conclusions with the Vedanta or Sankhya and which is no more

considered in Europe as a son system of Philosophy, will not serve that purpose. On the contrary, when, by the perusal of that book, the Hindu Students of Sanscrit will find that the theories advanced by the Sankhya and Vedanta system are corroborated by a Philosopher of Europe, their reverence for these two systems may increase ionstead of being diminished. Under these circumstances I regret I cannot agree with Dr. Ballantyne in recommending the adoption of Bishop Berkeley's work as a class-book—

4. I also beg leave to state that I cannot quite agree with Dr. Ballantyne when he admits that both the Sanscrit & English Courses in the Calcutta Sanscrit College are good and yet desiderates sufficient provision forobviating the danger that the two courses may end in persuading the learner that "truth is double" "This danger", says Dr. Ballantyne "is no chimerical one" "To take an example" he continues "I am acquainted with Brahmins who being well versed in Sanscrit Literature and also familiar with English, are aware that the European theory of Logic is correct, and also the Hindu Theory, while at the same time they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the others". I believe, the danger that Dr. Ballantyne apprehends is not so inevitable in the case of an individual who has intelligently studied both English and Sanscrit sciences and literatures. Truth is truth if properly perceived. To believe that "truth is double" is but the effect of an imperfect perception of truth itself, the effect which I am sure to see removed by the improved courses of studies we have adopted at this Institution. It must be considered as a singular circumstance if an intelligent student cannot perceive identity of truths where there is real identity. Suppose students read Logic or any other department of science or Philosophy both in Sanscrit and English. If they be found to assert, "that the European Theory of Logic is correct and also the Hindu Theory, while at the same time, they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other", the hearer is naturally led to conclude that either they could not comprehend the subject with sufficient clearness or that their familiarity with the language, in which they are found unable to express themselves, is not sufficient. It must be confessed, however that there are many passages in Hindu Philosophy which cannot be rendered

into English with ease and sufficient intelligibility only because there is nothing substantial in them.

5. I further beg leave to state that I regret I cannot but differ a little from Dr. Ballantyne when he observes "that the very constitution of the present Sanscrit College with its English course and its Sanscrit course implies the understanding that it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe and to interpret between the two, removing unnecessary prejudice by pointing out real agreement where there was seeming discordance, and conciliating acceptance for the advancing science of Europe by shewing that European Science recognizes all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation." It is not possible in all cases I fear that we shall be able to shew real agreement between European Science and Hindu Shastras—Even if we take it for granted that we shall be able to point out agreement between the two, it appears to me to be a hopeless task to conciliate the learned of India to the acceptance of the advancing science of Europe. They are a body of men whose longstanding prejudices are unshakeable. Any idea when brought to their notice either in the form of a new truth or in the form of the expansion of truths the germs of which their Shastras contain they will not accept. It is but natural they would obstinately adhere to their old prejudices. To characterize them as a class I can do no better than quote the words of Omar. When Amru, the Arab General, the Conquerer of Alexandria wrote to Omar about the disposal of the Alexandrian Library, the Caliph replied, "The contents of those books are in conformity with the Koran or they are not. If they are, the Koran is sufficient without them ; if they are not, they are pernicious. Let them therefore be destroyed." The bigotry of the learned of India, I am ashamed to state is not in the least inferior to that of the Arab. They believe that their Shastras have all emanated from Omniscient Rishis and therefore, they cannot but be infallible. When in the way of discussion or in the course of conversation any new truth advanced by European Science is presented before them, they laugh and redicule— Lately a feeling is manifesting among the learned of this part of India, specially in Calcutta and its neighbourhood, that when they hear of a Scientific truth, the germs of which may be traced out in their Shastras, instead of shewing any regard for that truth, they triumph and the supersti-

tious regard for their own Shastras is redoubled. From these considerations, I regret to say that I cannot persuade myself to believe that there is any hope of reconciling the learned of India to the reception of new scientific truths. Dr. Ballantyne's views may be successfully carried out in the North West Provinces where his experience has made him arrive at his conclusions with regard to the learned of India—

6. But in Bengal the case is very different. His remarks that "regard be had to the different circumstances of the two places" and that "the bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom" are very judicious. The local circumstances of this part of India compel us to pursue a different course for the dissemination of sound knowledge. I have with care and attention observed the state of things here, and my impression is, that we should not at all interfere with the learned of the country. We do not require to get them reconciled because we do not require their assistance in any shape. We need not fear the opposition of a body declining in their reputation. Their voice is gradually becoming more and more feeble. There is little chance of their regaining their former ascedancy. To whatever part of Bengal is the influence of education extending, there the learned of the country are losing their ground. The natives of Bengal appear to be very eager to receive the benefit of education. The establishment of Colleges and Schools in different parts of the country has taught us what we can do, without attempting to reconcile the learned of the Country. What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of Vernacular schools, let us prepare a series of Vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country. To raise up such a useful class of men is the object I have proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of our Sanscrit College should be directed. That the students of our Sanscrit College, when they shall have finished their College course will prove themselves men of this stamp we have every reason to hope. Nor is this hope an illusive one. That the students of the Sanscrit College will be

perfect masters of the Bengali language is beyond any possible doubt. If the contemplated new organization of the English department be sanctioned there is every probability of their being able to attain considerable proficiency in the English language and Literature and thereby acquire a considerable amount of useful information. It is very gratifying to observe that they have lately began to think in such a way as to promise that hereafter every qualified student will be found free from all the prejudices of his countrymen. As a specimen of what may be expected from the Sanscrit College here, I beg leave to enclose herein English translation of a Bengali Essay of the past Session by a senior student of this Institution who has still about three years to finish his collegiate course and has yet made but little progress in the English language and literature—

7th. In conclusion i beg most respectfully to state that if I may be so fortunate as to be permitted to carry out the system introduced, I can assure the Council with great confidence that the Sanscrit College will become a seat of pure and profound Sanscrit learning and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow countrymen.

8th. The Report of Dr. Ballantyne in original which accompanied your communication is returned herewith—

Signed/- Eshwar Chunder Sharma
Principal Sanscrit College.

(C)

Extract from the *Proceedings of the Council of Education* dated 14th September 1853.

No. XXI.

Read letter from Dr. Ballantyne submitting observations on the Sanscrit College of Calcutta suggested by his visit to the institution at the invitation of the Council and under the sanction of the Government, North West Provinces—

Read letter from Pundit Iswar Chunder Vidyasagar Principal of the Sanscrit College, No. 901 dated 7th September submitting his report on the above—

Ordered. That the Council are gratified to find that Dr. Ballantvne reports generally so favourably on the present course of instruction and state of progress in the Sanscrit College, and that the Principal of the College be informed that he will be expected by the Council to continue that course, the success of which must however obviously depend on the competency of the Teachers employed to give instruction in the most advanced works of Mental philosophy by English as well as by Sanscrit authors ; that for the attainment of such success, the Council relies mainly on the great zeal and ability of the Principal himself and that they would at the same time desire the Principal freely to avail himself of the Abstracts and Treatises compiled by Dr. Ballantyne the use of which must be in the highest degree valuable in explanation and illustration of the subjects of his own Lectures and those of the Instructors under him ; all students of these subjects would indeed in the opinion of the Council derive essential and form a familiarity with Dr. Balantyne's works. The Principal will, also, be in frequent communication with Dr. Ballantyne on the progress of his classes, and the Council would wish to see a free interchange of suggestions between the Heads of the two important Institutions at Benares and in Calcutta with a view to the continuing improvement of their several courses of instruction and to the establishment as far as possible of a common terminology in the rendering from English into Sanscrit or vice versa of the original expressions, in use in each language respectively, in the exposition or discussion of Philosophical subjects—

No. 1437

Copy forwarded to the Principal, Sanscrit College for information—

By order
Sd/- F. Mouat
Secry. Co. of Ed.

The 22nd Sep.
1853.

(D)

My dear Sir,

After the most attentive consideration of the orders of the Council in reference to Dr. Ballantyne's report on the Sanscrit College I feel compelled to inform you that those orders if carried

out in their integrity will involve a degree of interference with the scheme of study lately adopted by me with the sanction of the Council that will not only make my position in the College somewhat unpleasant but will tend I am convinced to impair the usefulness of the Institution itself—

In the hurry and bustle of closing the College and of preparing to go home, I am unable to write officially on the subject. But before I leave Calcutta I am anxious to state to you briefly some of the mere important objections to the carrying out of Dr. Ballantyne's plan which have occurred to me.

For the present at least I am unwillingly (sic) to mix up with the discussion of an important matter any question of a personal character in being forced to adopt a plan of study which I cannot approve of or in being obliged to communicate to a fellow Principal in the same position in the service with myself on the progress of my classes, conditions which I suspect few educated Englishmen will be found to submit to. Waiving such personal considerations I will come at once to the real question at issue—

Dr. Ballantyne's suggestions seem to me to be based upon the assertion that without their adoption the danger of the Anglo-Sanscrit scholar being a follower of "double truth" cannot be avoided. I will not pretend to question the Doctor's experience among his learned friends at Benares. But of this I am certain that not a single instance can be pointed out in Bengal of any sensible man who has studied English as well as Sanscrit being persuaded that "truth is double".

Leave me to teach Sanscrit for the leading purpose of thoroughly mastering the Vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of English and you may rest assured that before a few years are over I shall be enabled if supported and encouraged by the Council to furnish you with a body of young men who will be better qualified by their writings and teaching to disseminate widely among the people sound information than it has hitherto been possible to accomplish through the instrumentality of the Educated clever of any of your Colleges whether English or oriental. To enable me to carry out this great, this darling object of my wishes I *must* (excuse the stong word) to a considerable extent be left unfettered, so far as I can approve of Dr. Ballantyne's abstracts and treatises such for instance as his excellent Edition of the Novum Organan in English,

I will avail myself of them most readily and cheerfully. But if compelled to adopt all his compilations without any reference to my own humble judgement as to thir utility and value or to their adaptation to the peculiar wants of the Institution over which I have the honour to preside, my occupation is gone—such a system would break in upon and interrupt my own plan of instruction and in spite of my sense of duty as a servant of the Council the responsibility which I now keenly feel will be assuredly weakened if not destroyed.

I hope these hints somewhat ramblingly and hastily thrown out, will receive the kind and indulgent consideration of the Council so as to induce them to modify their Resolution of the 14th Ultimo so far as not to make the course of study in the Sanscrit College a compulsory one—

If required I shall be happy to send in an official and consequently a more formal letter on the subject after the termination of the holidays—

I remain,
My dear Sir
Yours very truly
Sd/- Eswar Chunder Surma
the 5th Octr., 1853.

F. J. Mouat Esq., M. Dn.

পরিশিষ্ট ১ ঙ

Report of the Committee appointed in 1866 by the Government of Bengal to Report on the necessity of Legislative measure on the Subject of Polygamy among the Hindoos.

Source : *Legislative Department Proceedings, March 1867* No. 26 Concluding Paragraph :

On these considerations, we find that it is not in our power to suggest the enactment of any Declaratory Law, neither can we think of any legislative measure that under the restricted instructions given for our guidance, will suffice for the suppression of the abuses of the system of polygamy as practised by the Koolin Brahmins, and we beg to report to that effect.

C. P. Hobhouse.
H. T. Prinsep.
Sutto Churn Ghosal.
Ishwar Chandra Surma.
Ramanauth Tagore.
Joykissen Mookerjee.
Degumber Mitter.

While subscribing to the report generally, we deem it due to record our opinion separately on the following points :—

1.—It is stated in page 6, Clause 4, that among other evils, of Koolin Polygamy the "number of wives is often as many as 15, 20, and 80." Whatever might have been the case in times gone by we can distinctly state that it is not so now. The rapid spread of education and enlightened ideas as well as the growth of a healthy public opinion on social matters among the people of Bengal has so sensibly affected this custom that the marrying of more than one wife, except in cases of absolute necessity, has come to be looked upon with general reprobation. Even among Bhongo Koolins of the 1st and 2nd class, the number of wives nowadays seldom exceeds four or five except in very rare instances, but there is ample reason to believe that this class of people will settle into a monogamous habit like the other classes of the community, as education will become more general among them and the force of special opinion be more widely felt.

2.—From the report it will appear that polygamy, as an institution, is confined to a certain class of Rarhi Koolins called Bhongo of the 1st and 2nd order and that at present the practice even amongst them obtains in a much more mitigated form than a few years before. We need not notice that the number comprised in that class forms but a fraction of the population of Bengal ; the catalogue of crimes must, it can be easily imagined, be infinitesimally small, so far as the same are traceable to polygamy as their immediate cause. However much we deprecate polygamy and lament its abuse we cannot still conceal from ourselves the fact that the evils which are plausibly enough inferred as inseparably associated with it are not wholly ascribable to it. They are seen to exist in full force even where polygamy is not known or is considered a crime, and would appear to be simply the natural consequence of an imperfect knowledge of social

laws not confined to India alone. A legislative enactment, however stringent and rigidly enforced, might be effectual in diverting those evils from their original course, but it is quite powerless to stop the source from which they take their rise.

3.—Our countrymen are already awakened to a proper sense of the duties which they owe to themselves and to their offspring to be swayed by those considerations which rendered polygamy at one time an unavoidable necessity. We are accordingly of opinion that this question may, without injury to public morals, be left for settlement to the good sense and judgment of the people. The Government cannot directly interfere with it without producing serious harm in diverse ways. All that it can and ought to do is to assist in the spread of that enlightenment which has already so much advanced the desired reform.

Some explanation is due from Baboo Joykissen Mookerjee, who had signed the petition, praying for a law for restricting the practice of polygamy. He desire (?) to initiated about ten years ago, he was strongly in favour of it from a belief that the evils flowing from it would not be rooted out without the force of law, and when it was revived last year, he also gave his adhesion. But he is now satisfied by enquiries instituted by himself, as well as from representations made to him by others, that a remarkable change in the opinion of his countrymen has, within the last few years, taken place on this subject that with other signs of social progress not the least is that which marks with strong disapprobation the old custom of taking a plurality of wives as a means of a man's subsistence, and that it would consequently be in accord with the true interests of morality as well as of the cause of improvement for the State to abstain from interfering in the matter.

Ramanauth Tagore.
Joykissen Mookerjee.
Degumber Mitra.

Calcutta
the 1st February, 1867.

I sign this report with the following reservations :—

I am of opinion that the evils alluded to in pages 434-5 are not "greatly exaggerated," and that the decrease of these evils is not sufficient to do away with the necessity of legislation.

I would translate the term "speaking unkindly" in page 458 to mean "habitually abusing" and the term "mischievous" to mean

"exceedingly cruel."

I do not concur in the conclusion come to by the other gentlemen of the Committee. I am of opinion that a Declaratory Law might be passed without interfering with that liberty which Hindoos now by law possess in the matter of marriage.

Ishwar Chandra Surma
(Vidyasagar.)

The 22nd January, 1867.

পরিশিষ্ট ৩

অব্রাহ্মণ হিন্দুদের সংস্কৃত কলেজে পাঠাধিকার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চিঠি।

From : The Principal of the Sanscrit College.

To

Captain F. F. C. Hayes, M.A.
Offg. Secretary, Council of Education.
Dated Fort William 28th March, 1851.

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of Secretary Dr. Mouat's letter No. 79 dated the 7th January last, requesting me to report on the subject of any other castes than Brahmanas and Vaidyas, being admitted to the Sanscrit College and to ascertain and submit to the Council the opinion of the Principal Professors of the Institution on the question.

2. In reply I beg leave to state that I see no objection to the admission of other castes than Brahmanas and Vaidyas or in other words, different orders of Shudras, to the Sanscrit College. But as a measure of expediency, I would suggest that at present Kayasthas only be admitted—they form a very respectable portion of the Hindu Community of Bengal. The prohibitions in the Shastras with regard to the Shudras do not apply in their full extent to the Kayasthas. The most orthodox Brahmins do not hesitate to give them instructions and even those Brahmanas who perform the part of spiritual guides to Kayasthas are not held in disrepute, but rather are highly esteemed in spite of the Dictum of Manu, "Let him not give temporal-advice to a Shudra ; nor what remains from his table ; nor clarified butter of which part has been offered to Gods, not let him give spiritual counsel to such a man, nor

inform him of the legal expiation for his sin"

3. In the days of Manu, the only duty prescribed for a Shudra was to serve the three superior orders, namely Brahmans, Kshatriyas and Vaishyas—but practice has now so far superseded precept that the Kayasthas, though considered to be of the Shudra class—not only perform almost all the duties of the higher classes, but are virtually the heads of the Religious Societies in Calcutta and its Suburbs.

4. There is no direct prohibition in the Shastras against the Shudras studying Sanscrit literature. The only portions of it, from the persual of which they are excluded are the sacred writings. But there are not wanting authorities which allow this privilege. From certain texts of the Bhagavata Purana clear inferences may be drawn to show that they are privileged to read the above works i.e. acknowledged to be a divine Revelation and to be the essence of all the Upanisads, the most sacred portion of the Vedas.

ইদং ভগবতাপূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপংকজে।
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্॥

B. XII, Ch. XIII, V. IX.

The (the Bhagavata) was first revealed by Vishnu to Brahma, situated in the Lotus (growing out) of his Naval and afraid of (being from into) the world.

সর্ববেদান্ত সারংহি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।

B. XII, Ch. XIII, V. XIII

The Bhagabata, is admitted to be the essence of all the Vedantas (Upanishads).

বিপ্রোহধীত্যাপ্নু যাৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্।
বৈশ্যোনিধিপতিত্বং চ শূদ্রঃ শুদ্ধেত পাতকাৎ।

By Studying it (the Bhagavata) a Brahmana obtains wisdom, a Kshatriya territory, a Vaisya wealth, a Shudra purification from sin.

5. Very lately a curious occurrence took place in this part of Bengal which to a certain extent, favours the admission of the Kayasthas to this Institution. An opulent Kayastha, the late Raja

Rajnarayan Bahadur of Andool attempting to prove that the Kayasthas are Kshatriyas and therefore not subject to the restrictions enjoyed against the Shudras, insisted orthodox Pundits to give this opinion on the subject and a host of them have subscribed in the affirmative.

6. By the existing rules of the Sanscrit College Vaidyas are admitted to it, though Raghunandana, whose works are the sole authority for the prevalent religious observances in Bengal classes them with the Shudras. I can therefore conceive no reason, why Kayasthas, who occupy the highest place amongst the Shudras should be excluded from sharing the boon with their brother—Shudras, the Vaidyas.

ইদানীন্তনক্ষত্রিয়াণমপি শূদ্রত্বমাহমনুঃ শনকৈ স্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা। এবম ম্বষ্ঠাদীনামপি ॥

Shuddi Tattwa, Page 150 Serampore Edn.

Manu has pronounced that the Kayasthas of the present age are become Shudras as "By degrees from the extinction of ceremonies and omission of the study of the Vedas, the Kshatriyas are become Shudras". So from the extinction of ceremonies, the position of the Vaishyas, is the same, and also of the ambasthas, (or Vaidyas) and the like.

7. It would not be irrelevant to state here that in the years 1828 and 1829 during the time of Dr. Wilson, some students of the Hindu College were allowed to study Sanskrit in this Institution, among whom was a Kayastha named Baboo Amritalall Mitter, a near connection of Radhakant Bahadur, who received instructions from our Pundits in Grammar and Literature, passed examinations in these branches and obtained prizes.

8. The reason why I recommend the exclusion of the other orders of Shudras at present, is that they, as a body, are wanting in respectability and stand lower in the scale of social considerations ; their admission, therefore, would I fear, prejudice the interests of the Institution.

9. In conclusion, I beg leave to submit the opinion of the Principal Professors of the College on the subject in original with

its English translation from which it will be seen that they are averse to this innovation.

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient servant,
ESHWAR CHANDRA SARMA

সংস্কৃত কলেজে সুবর্ণবণিক ছাত্রদের পাঠাধিকার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চিঠি।

From
The Principal Sanscrit College
To
G. Gardan Young Esq., Director of Public Instruction
Dated Fort William, the 21st Nov. 1855
Sir,

With reference to the Memorial of Baboo Shamacharan Sen forwarded for report under your endorsement No. 1289 dated 15 Aug. last, I have the honor to remark that up to year 1851 the admissions to the Sanscrit College, were confined to Hindoos of the Brahmin and Baidya Caste only. When under the order of the late council of Education the privilege of studying in that institution was extended to the Kayasthas the most repectable caste among the Sudras. In the year 1854 this privilege was further extended to all the respectable castes of Hindoos under further orders.

But these orders I regret cannot apply to the people of the caste to which the memorialist belongs nor would it in my humble opinion be expedient at present to admit applicants of that class. It is true that some families of Sonar Baniya of Calcutta are a popular men but in the scale of castes the class stands very low. Admission from that class will I am sure not only shock the prejudice of the orthodox Pundits of the Institution but materially injure to its popularity as well as respectability. Personally I have always been opposed to the exclusive system as will appear from my former reports to the late Council on the subject of admitting applicants of other castes than Brahmans and Baidyas, I would have been glad to admit the son of the memorialist. The greatest latitude that expediency would allow has I believe already been given and I regret that I cannot recommend any further extension under present circumstances.

The papers received under your endorsement are herewith returned as required.

I have etc.
ESHWAR CHANDRA SHARMA

'পরীক্ষা' সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের চিঠি।

From
The Principal, Sanscrit College.
To
F. J. Mouat, Esq. M.D.,
Secretary, Council of Education.

Dated Fort William, 21 January, 1854

Sir,

I have the honor to forward the following proposal which I beg to request, you will be so good as to submit to the Council for their consideration and orders.

The examinations in this Institution are held annually. This system of examination is in my humble opinion open to serious objections. The main object of an academic examination ought to be to supply a well regulated stimulus to proper exertion. This object is but very partially gained by making the examinations annual. Under this system the pupils release their labours after the close of the session and do not resume them in an earnest manner till the time of the examinations draw near. During the first months of the year they plod along with their routine course of study with indifferent attention while the "cramming" system is in requisition during the concluding months. Their industry therefore is unequable and the consequence is that a habit of industry is not acquired. Moreover the over exertion of the last two months of the session induces several chronic diseases such as headache, dyspepsia, dysentry, opthalmia, etc. This is another circumstance in the present system of examination which is deeply to be regulated and which though accidental is not altogether of rare occurrence. A student may be well known to be intelligent, industrious and attentive and one who would certainly be entitled to the highest records were it in his power to pass the examination, but he may suddenly fall ill at that time of examination, and all his exertions during the whole year would in the case remain un-.

rewarded. I have with care and attention observed this state of things for the last three years and am convinced that so long as the present system of examination continues it will be impracticable to remove the evils complained of.

Under the circumstances I beg most respectfully to propose that the present system of examination be discontinued and that in its stead the following plan be adopted.

1. Examination to be held every month in the Junior Classes and every two months in the senior ones.

2. The award of scholarships and other rewards to be decided by the aggregate result of these examinations.

3. Of the Sanscrit and Vernacular portions of studies examinations to be conducted by the Principal with the co-operation of the Professors.

4. Of the English portion of studies the examinations to be conducted by the Principal with the co-operation of the masters and Professors.

5. The final examinations alone to be conducted by the examiners appointed by the council.

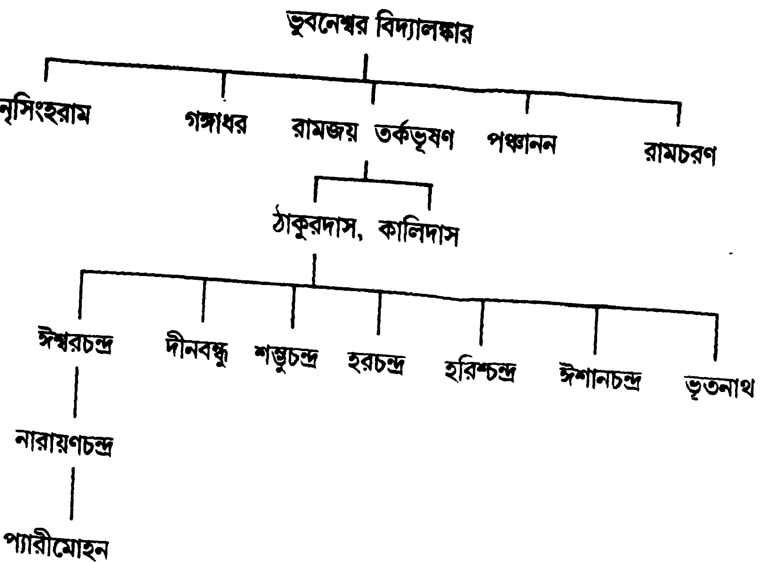
If the Council be pleased to sanction the proposal the students will make equal progress throughout the year. They will not be obliged to over exert themselves in the concluding months of the session and there is no doubt they will be thus enabled to attain greater proficiency than they usually manifest under the present system and, above all, they will acquire a habit of industry from the want of which it may be safely affirmed, the great majority of the students do not keep up their studies in after life though they distinguish themselves while at College.

In conclusion I beg leave to request the favour of your moving the council to sanction the proposal at least experimentally for three years.

I have the honor to be
Sir,
Your most obedient Servant
ESHWAR CHANDRA SHARMA

এই চিঠিগুলি শ্রীসুরেশপ্রসাদ নিয়োগী প্রথম প্রকাশ করেন (সমকালীন : ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৭৭)।

বংশলতিকা



ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার
নৃসিংহরাম
গঙ্গাধর
রামজয় তর্কভূষণ
পঞ্চানন
রামচরণ
ঠাকুরদাস, কালিদাস
ঈশ্বরচন্দ্র
দীনবন্ধু
শম্ভুচন্দ্র
হরচন্দ্র
হরিশ্চন্দ্র
ঈশানচন্দ্র
ভূতনাথ
নারায়ণচন্দ্র
প্যারীমোহন

বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটনাপঞ্জী

[ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য লেখকের বিদ্যাসাগর-জীবনী হইতে সঙ্কলিত।]

নভেম্বর, ১৮২৮	পিতার সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থে স্বগ্রাম বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় আগমন।
১·৬·১৮২৯	কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ।
২২·৪·১৮৩৯	হিন্দু-ল' কমিটির পরীক্ষা দান।
১৬·৫·১৮৩৯	হিন্দু-ল' কমিটির নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লাভ।
৪·১২·১৮৪১	সংস্কৃত কলেজে ১২ বৎসর ৫ মাস অধ্যয়নের পর কলেজের এবং অধ্যাপকবর্গের নিকট হইতে দুইখানি প্রশংসাপত্র লাভ। তাহার পূর্বেই 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ।
২৯·১২·১৮৪১ হইতে ৩·৪·১৮৪৬	মাসিক ৫০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগে সেরেস্তাদার্ বা প্রধান পণ্ডিতের কার্য।
১৬·৮·১৮৪৩	মাসিক 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ। প্রথমাবধিই ঐ পত্রিকার প্রবন্ধ-নির্বাচনী কমিটির সভ্য।
৬·৮·১৮৪৬	মাসিক ৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত।
১৮৪৭	মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগে সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটারি প্রতিষ্ঠা।
১৬·৭·১৮৪৭	সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে ইস্তফা দান।
১·৩·১৮৪৯	মাসিক ৮০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান কেরানি ও কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ।
আগস্ট, ১৮৫০	'সর্ব্বশুভঙ্করী পত্রিকা' প্রকাশিত। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বাল্য-বিবাহে দোষ কি' এই শিরোনামে প্রবন্ধ প্রকাশ।
১৮৫০	মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত সম্পর্ক ছেদ।
৪·১২·১৮৫০ পর্যন্ত	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান কেরানি ও কোষাধ্যক্ষের পদে কার্য।
৫·১২·১৮৫০	মাসিক ৯০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক পদে নিয়োগ।
১৬·১২·১৮৫০	সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদকে দান।
ডিসেম্বর, ১৮৫০	বীটন বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত।
৫·১·১৮৫১	সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ও কলেজের অস্থায়ী সম্পাদক।
২২·১·১৮৫১	মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ।

	এই সময় হইতে কলেজের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ লুপ্ত।
৯·৭·১৮৫১	ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়াও কায়স্থ সন্তানকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান।
নভেম্বর, ১৮৫১	সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়া স্বরচিত 'বাংলা সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র প্রচলন।
ডিসেম্বর, ১৮৫১	জাতি নির্বিশেষে সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তান মাত্রকেই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান।
১৩·১·১৮৫২	সংস্কৃত কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন। আবেদন সফল।
২৮·৮·১৮৫২	সংস্কৃত কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রগণের দুই টাকা প্রবেশ-দক্ষিণা দিবার রীতি প্রচলন।
নভেম্বর, ১৮৫৩	সংস্কৃত কলেজের ইংরাজি বিভাগের পুনর্গঠন। ইংরাজিকে ঐচ্ছিক বিষয় না রাখিয়া অবশ্যপাঠ্য বিষয়করণ।
জানুয়ারি, ১৮৫৪	বোর্ড অব এগজামিনার্সের সদস্য। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের মাসিক বেতন ৩০০ শত টাকা ধার্য।
জুন, ১৮৫৪	সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নিকট হইতে মাসিক ১ টাকা বেতন গ্রহণের নিয়ম প্রচলন।
জানুয়ারি, ১৮৫৫	বিশ্ববিদ্যালয়-গঠন কমিটির সদস্য।
১·৫·১৮৫৫	সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদের সঙ্গে অতিরিক্ত মাসিক ২০০ টাকা বেতনে দক্ষিণ বঙ্গের সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টরের পদে নিয়োগ।
১৭·৭·১৮৫৫	সংস্কৃত কলেজে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা ও অক্ষয়কুমার দত্তকে তাহার প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ।
৪·১০·১৮৫৫	বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন-পত্র প্রেরণ।
২৭·১২·১৮৫৫	বহুবিবাহ রহিত করণের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট প্রথম আবেদন-পত্র প্রেরণ।
১৬·৭·১৮৫৬	বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ।
নভেম্বর, ১৮৫৬	দক্ষিণ বঙ্গের সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টর স্থলে দক্ষিণ বঙ্গের স্পেশাল স্কুল ইনস্পেক্টর—পদের এই নূতন নামকরণ।
৭·১২·১৮৫৬	কলিকাতার বর্তমান ৪৯ নং সুকিয়া স্ট্রীট ভবনে প্রথম বিধবা-বিবাহ।
২৪·১·১৮৫৭	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। প্রথমাবধিই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত।
সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ হইতে	
১৩·১২·১৮৬০	সিপাহী বিদ্রোহের সময় সৈন্য বিভাগ আহত সৈনিকদিগের

	হাসপাতাল করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজভবন দখল করিয়া লইলে কলেজ ৯২ নং ও ১১০ নং ও নর্মাল স্কুল ১৩১ নং বহুবাজার স্ট্রীটে স্থানান্তরিত ও অবস্থিত।
২২·৩·১৮৫৮	বড়বাজারের গদাধর শেঠের বাটিতে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় দর্শন।
৩১·৭·১৮৫৮	বেলগাছিয়া নাট্যশালায়.বাংলা 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দর্শন।
৩·১১·১৮৫৮	সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ।
১৫·১১·১৮৫৮	সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' পত্র প্রকাশ।
১৮৫৮	'তত্ত্ববোধিনী' সভার সম্পাদক।
১৮৫৯	প্রতিষ্ঠাতাদের আহ্বানে শঙ্কর ঘোষ লেনের ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের পরিচালনায় অংশগ্রহণ ও স্কুলের সম্পাদক নির্বাচিত।
২৩·৪·১৮৫৯	রামগোপাল মল্লিকের সিঁদুরিয়া পটির বাটিতে 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয় দর্শন।
মে, ১৮৫৯	'তত্ত্ববোধিনী সভা' ব্রাহ্মসমাজের সহিত একীভূত হইয়া যাওয়ায় সম্পাদকের পদত্যাগ।
এপ্রিল, ১৮৬১	ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুলের পরিচালক কমিটির মধ্যে বিভেদ। নূতন কমিটি গঠন। ঐ কমিটির সম্পাদক।
ডিসেম্বর, ১৮৬১	'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ।
জানুয়ারি, ১৮৬২	মাইকেল মধুসূদনকে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদনার ভার দান।
মে, ১৮৬২	কৃষ্ণদাস পালকে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক পদে নিয়োগ।
নভেম্বর, ১৮৬৩	গভর্ণমেন্ট কর্তৃক ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের পরিদর্শক নিযুক্ত।
১৮৬৪	কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল নামের পরিবর্তে কলিকাতা মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন নামকরণ।
জুন, ১৮৬৪	ফ্রান্সের ভের্সাই নগর হইতে বিপন্ন মাইকেলের সাহায্যের জন্য আবেদন।
৪·৭·১৮৬৪	বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মাননীয় সদস্য নির্বাচিত।
২·৮·১৮৬৪	মধুসূদনকে ফ্রান্সে ১৫০০ টাকা প্রেরণ।
১৮৬৫-৭৩	মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে'র কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য।
১১·১·১৮৬৫	ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের পরিদর্শকরূপে গভর্ণমেন্টকে প্রথম রিপোর্ট দান।
১·৯·১৮৬৫	ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন সম্বন্ধে দ্বিতীয় রিপোর্ট দান।
১৮৬৫	ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশনের পরিদর্শক পদ ত্যাগ।
১·২·১৮৬৬	বহুবিবাহ রহিত করিবার জন্য দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন-পত্র প্রেরণ।
১৮৬৬	দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর নিকট হইতে 'দয়ার সাগর' উপাধি লাভ।
১৬·১২·১৮৬৬	কুমারী মেরী কার্পেন্টারের সহিত উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয়

	পরিদর্শনান্তে ফিরিবার পথে গাড়ি উল্টাইয়া যাইবার ফলে যকৃতে গুরুতর আঘাত।
জুলাই, ১৮৬৭	জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর বিবাহ।
২৬·৭·১৮৬৭	সাময়িক পত্রে বিধবা-বিবাহজনিত তাঁহার ঋণ মোচনের আবেদন প্রকাশিত হইলে পরের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইতে অস্বীকার।
জানুয়ারি, ১৮৬৯	বীটন বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদকের পদ ত্যাগ।
১৮৬৯	ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস ডিপোজিটারি দান।
জানুয়ারি, ১৮৭০	ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার জন্য ১০০০ টাকা দান।
১১·৮·১৮৭০	পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিধবার বিবাহ।
১২·৪·১৮৭১	মাতৃদেবীর মৃত্যু।
সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর, ১৮৭১	তারানাথ তর্কবাচস্পতির সহিত সম্পর্ক ছেদ।
২৫·১·১৮৭২	জজ দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল ও নিজেকে লইয়া মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনের নূতন পরিচালক কমিটি গঠন।
১৮৭২	মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত।
২৮·৫·১৮৭২	দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক 'দ্বাদশ কবিতা' উৎসর্গ।
১৫·৬·১৮৭২	হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইয়িটি ফান্ড (হিন্দু পরিবার বৃত্তি ভাণ্ডার) গঠন।
জুন-জুলাই, ১৮৭২	দ্বিতীয়া কন্যা কুমুদিনী দেবীর বিবাহ।
৪·২·১৮৭৩	জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যু।
১৬·৮·১৮৭৩	'বেঙ্গল থিয়েটারে'র উদ্বোধন ও বেশ্যা লইয়া স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়। ফলে ঐ থিয়েটারের কার্যনির্বাহক কমিটি হইতে পদত্যাগ (?)।
২৮·১·১৮৭৪	এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম পরিদর্শন করিতে যাইয়া দ্বারবান চটিজুতা পরিয়া ভিতরে যাইতে নিষেধ করিলে চিরতরে মিউজিয়াম বর্জন।
১৮৭৪	প্রথম এফ· এ·পরীক্ষায় মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার।
১৮৭৪	মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনের শ্যামপুকুর শাখা প্রতিষ্ঠা।
	পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গৃহ হইতে বিতাড়ন ও তাহার সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ।
১৩·৪·১৮৭৫	নবীনচন্দ্র সেন কর্তৃক 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ।
৩১·৫·১৮৭৫	উইলে স্বাক্ষর। পুত্র মাসিক বৃত্তি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত।
১৩·৭·১৮৭৫	তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবীর বিবাহ।
১৮৭৬	কলিকাতা বাদুড়বাগানে নিজ বাসভবন নির্মাণ।
ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬	তৃতীয় জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীকে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনের সম্পাদক ও মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ।

২১·২·১৮৭৬	হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইয়িটি ফাণ্ডের সহিত সম্পর্ক ছেদ।
১২·৪·১৮৭৬	পিতৃদেবের মৃত্যু।
১·১·১৮৭৭	দিল্লীর দরবারে ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রশংসাপত্র লাভ।
জানুয়ারি, ১৮৭৭	বাদুড়বাগানের গৃহে প্রবেশ।
এপ্রিল, ১৮৭৭	কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারী দেবীর বিবাহ।
১৮৭৯	মেট্রোপলিটন প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত।
১·১·১৮৮০	সি· আই· ই· উপাধি লাভ।
১৮৮৩	পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো' নির্বাচিত।
১৮৮৪	মেট্রোপলিটন কলেজে আইন শ্রেণী প্রবর্তন। কলেজের ছাত্র সংখ্যা—৫০০।
১৮৮৫	মেট্রোপলিটন কলেজে বি· এ· অনার্স অর্থাৎ এম· এ· শ্রেণী প্রবর্তন। শঙ্কর ঘোষ লেনে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন ও কলেজের জন্য ভূমি ক্রয়। মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনের বউবাজার শাখা প্রতিষ্ঠা।
জানুয়ারি, ১৮৮৬	সুকিয়া স্ট্রীটে 'দি ক্যালকাটা লাইব্রেরি' নামে পুস্তকের দোকান প্রতিষ্ঠা।
জানুয়ারি, ১৮৮৭	মেট্রোপলিটন কলেজের শঙ্কর ঘোষ লেনের নিজভবনে প্রবেশ। কিছু পরে স্কুলেরও নিজ ভবনে প্রবেশ।
১৮৮৮	মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রসংখ্যা—৮৩৭।
১৩·৮·১৮৮৮	পত্নী দীনময়ীর মৃত্যু।
সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮	জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীকে মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ পদ হইতে অপসারণ।
নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর ১৮৮৯	জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার নিকট হইতে রৌপ্যনির্মিত জলপানপাত্র গ্রহণ।
২৯·৭·১৮৯১	বাদুড়বাগানের গৃহে রাত ২টা ১৮ মিঃ পরলোকগমন।

বিদ্যাসাগর প্রণীত ও বিদ্যাসাগর বিষয়ক রচনাপঞ্জী

সংকলক—সংঘমিত্রা মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

১৮৯১ থেকে ১৯৯১—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের ঠিক একশ' বছর হল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই যাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম আজও প্রতিটি বাঙালীর কাছেই উজ্জ্বল। জাতির "বর্ণপরিচয়" তিনি যেমন করিয়েছেন, তার চেতনাকে বিশ্বমুখী করে তোলাও তেমনি তাঁরই হাতে ঘটেছে। দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াসে, শিশুশিক্ষা ও নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসারে তিনি আজীবন নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন এবং এজন্য একের পর এক পাঠ্যপুস্তক রচনা করে গেছেন। শিক্ষার পাঠক্রমের আমূল সংস্কার করে তিনি আধুনিক পৃথিবীকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। এক অশিক্ষিত, অধঃপতিত, সংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মান্ধ সমাজকে যিনি আপন মনীষা ও পৌরুষের প্রাবল্যে আধুনিক বিশ্বের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, নিছক সংস্কার নয়, সমাজের বনিয়াদের রূপান্তর ঘটানো যাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেই বিদ্যাসাগর সমাজ বিষয়ে বহু তর্ক-বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন—স্বনামে ও বেনামে। বহু বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন। বহু সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, তবে সেই অনুবাদ গ্রন্থগুলিও মৌলিকতার দাবী রাখে। এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচিত কিছু প্রবন্ধ।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিদ্যাসাগর 'বাঙালির মুখরতা--নিন্দায় -প্রশংসায়, সম্মানে-অপমানে—অনর্গল।' অবশ্য শুধু বাঙালী নয় ভারতীয় এমনকি বহু বিদেশীও আজকাল বিদ্যাসাগর চর্চায় মনোনিবেশ করেছেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর অনেক জীবনী প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়া বিদ্যাসাগরের বহুমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে নানারকম সমালোচনামূলক গ্রন্থ। তৎকালীন বহু লেখক বিদ্যাসাগরের বিষয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন। অন্যান্য মনীষীদের স্মৃতিকথা, জীবনী ও আত্মজীবনীতে এসেছে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিদ্যাসাগর বিষয়ে নানাপ্রবন্ধ। বিদ্যাসাগর বিষয়ে রচনা-সংকলনেরও শেষ নেই।

বিদ্যাসাগর প্রণীত ও বিদ্যাসাগর বিষয়ক এইসব রচনার পঞ্জী তৈরী করাই আমার উদ্দেশ্য। বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থের পঞ্জী তৈরী করতে গিয়ে তাঁর রচনাগুলোকে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল অনুযায়ী সাজিয়েছি। তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলিকেও প্রকাশকাল অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর রচনাসংগ্রহগুলিকে সম্পাদকের নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে (সব রচনাসংগ্রহের প্রকাশকাল জানতে না পারায়)।

বিদ্যাসাগর বিষয়ে রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের প্রকাশকাল জানতে না পারায় সেগুলোকে কালানুক্রমে সাজানো গেল না। লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হলো। কলকাতায় প্রকাশিত যে সব গ্রন্থের প্রকাশকের নাম পাওয়া গেছে সে সব গ্রন্থের প্রকাশ-

স্থানের নাম আর আলাদা করে লেখা হয়নি। বেশ কিছু গ্রন্থের প্রকাশস্থান, প্রকাশকাল কিছুই জানা যায়নি।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে প্রবন্ধকারের নামানুযায়ী সাজানো হলো। সঙ্গে পত্র-পত্রিকার নাম, মাস-বর্ষ বা সংখ্যা ও পৃষ্ঠাও নির্দেশিত হলো।

পরিশেষে বলি, বিদ্যাসাগর বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণার বিরাম নেই। কত জ্ঞানীগুণী তাঁর বিষয়ে কত কথা ভেবেছেন, লিখেছেন, আগামী যুগের মানুষও বিদ্যাসাগরের জীবন ও কীর্তির নব নব মূল্যায়নে উদ্যোগী হবেন। সুতরাং আজকের গ্রন্থপঞ্জী দু'দিন পরেই পুরোনো হয়ে যাবে। তাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পঞ্জীপ্রণয়ন সম্পর্কে বলা হয়—"The moment a bibliography is out of the press, it is out of date." বলা বাহুল্য, আমার এই পঞ্জী সে অর্থে সম্পূর্ণ নয়। সময়ের স্বল্পতা ও ব্যক্তিগত অক্ষমতাও এজন্য দায়ী। এই পঞ্জীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপূর্ণতার কথা স্মরণ করে আমি পাঠকসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনা বিদ্যাসাগর প্রণীত

কালানুক্রমে বিন্যস্ত

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল ও গ্রন্থনাম

১৮৪৭
বেতাল পঞ্চবিংশতি
১৮৪৮
বাঙ্গালার ইতিহাস (২য় ভাগ)
১৮৪৯ সেপ্টেম্বর
জীবনচরিত

১৮৫১ এপ্রিল
শিশুশিক্ষা (৪র্থ ভাগ)
১৮৫১
বোধোদয়
১৮৫১ নভেম্বর
সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা

১৮৫১ নভেম্বর
ঋজুপাঠ (১ম ভাগ)
১৮৫১ ডিসেম্বর

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল ও গ্রন্থনাম

ঋজুপাঠ (৩য় ভাগ)
১৮৫২ মার্চ
ঋজুপাঠ (২য় ভাগ)
১৮৫৩ মার্চ
সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত
সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব
১৮৫৩
ব্যাকরণ কৌমুদী (১ম ভাগ)
১৮৫৩
ব্যাকরণ কৌমুদী (২য় ভাগ)
১৮৫৪
ব্যাকরণ কৌমুদী (৩য় ভাগ)।
১৮৫৪ ডিসেম্বর
শকুন্তলা
১৮৫৫
বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয় প্রস্তাব
১৮৫৫ এপ্রিল

বর্ণপরিচয় (১ম ভাগ)
১৮৫৫ জুন
বর্ণপরিচয় (দ্বিতীয় ভাগ)
১৮৫৫ অক্টোবর
বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক।

১৮৫৬ ফেব্রুয়ারি
কথামালা
১৮৫৬ জুলাই
চরিতাবলী
১৮৫৯
পাঠমালা

১৮৬০ জানুয়ারি
মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ)
১৮৬০ এপ্রিল
সীতার বনবাস
১৮৬২
ব্যাকরণ কৌমুদী (৪র্থ ভাগ)
১৮৬৩ নভেম্বর
আখ্যান মঞ্জরী (৩য় ভাগ)
১৮৬৪
শব্দমঞ্জরী
১৮৬৮
আখ্যান মঞ্জরী (১ম ভাগ)
১৮৬৮
আখ্যান মঞ্জরী (২য় ভাগ)
১৮৬৯ ডিসেম্বর
ভ্রান্তিবিলাস
১৮৭১ আগস্ট
বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার।
১৮৭৩ এপ্রিল
বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক।
১৮৭৩
বামনাখ্যানম্
১৮৮৮ এপ্রিল
নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস
১৮৮৯ নভেম্বর
সংস্কৃত রচনা
১৮৯০ মে
শ্লোক মঞ্জরী
১৮৯১
বিদ্যাসাগর চরিত
১৮৯২ এপ্রিল
ভূগোল খগোলবর্ণনম
১৯০৯
রামের অধিবাস

[১৮৫১ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীতিবোধ' বইয়ের অনেকাংশ বিদ্যাসাগরের রচিত।]

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

কালানুক্রমে বিন্যস্ত

১৮৫০—'বাল্যবিবাহের দোষ'। সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা।
১৮৯২—'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। সাহিত্য পত্রিকা।
১৮৯৩ এপ্রিল—'মাতৃভক্তি'। সখা (ছোটদের পত্রিকা)।
১৮৯৪ জানুয়ারি—'ছাগলের বুদ্ধি'। ঐ।
১৩০৮—'শব্দসংগ্রহ'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

১৩১৬ চৈত্র—'ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস'। মুকুল।
১৩১৯ আষাঢ়—'আমেরিকার আদিম নিবাসীর ন্যায়পরতা'। ধ্রুব।

সম্পাদিত গ্রন্থ

ইংরেজী

1) Poetical Selections.
2) Selections from English Literature.
3) Selections from the writings of Goldsmith.

বাংলা (কালানুক্রমে বিন্যস্ত)

১৮৪৭
অন্নদামঙ্গল (১ম ও ২য় খণ্ড)
১৮৯০
পদ্যসংগ্রহ, ১ম ভাগ (কৃত্তিবাসের রামায়ণ থেকে সংকলিত)
১৮৯০
পদ্যসংগ্রহ, ২য় ভাগ (ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল থেকে সংকলিত)

সংস্কৃত (কালানুক্রমে বিন্যস্ত)

১৮৫৩-৫৮
সর্বদর্শন সংগ্রহ।
১৮৫৩
রঘুবংশম্।
১৮৫৩
কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।
১৮৫৭
শিশুপালবধ।
১৮৬১
বাল্মীকি রামায়ণ (টীকা সহ)।
১৮৬১
কুমার সম্ভব।
১৮৬২
কাদম্বরী।
১৮৬৯
মেঘদূতম্।
১৮৭০
উত্তরচরিতম।
১৮৭১
অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।
১৮৮৩
হর্ষচরিতম্।

হিন্দী

১৮৫২ জানুয়ারি
বৈতাল পচ্চীসী।

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থের অনুবাদ

- A guide to Bengali : 1850

  'বাঙ্গালার ইতিহাস' ২য় ভাগের ইংরেজী অনুবাদ। অনুবাদক—জি· টি· মার্শাল।
- Widow marriage : 1855

  'বিধবা বিবাহ' পুস্তকের অনুবাদ।
- Introduction to Sanskrit Grammar in Benglai : 1889

  'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' গ্রন্থের অনুবাদ।

  অনুবাদক—রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- Exile of Sita : 1904

  'সীতার বনবাস' গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদক—এইচ· জানা· হার্ডিং।
- A vocabulary of all words occuring in the text of the Charitabali:J.M. Blumhardt.